ডক্টর হরিশংকর শ্রীবাস্তব

মোগল সম্রাট হুমায়ূন

অনুবাদ। মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোগল সম্রাট হুমায়ূন

মূল হিন্দি

ডক্টর হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব

ভূমিকা

ডক্টর তারা চাঁদ

অনুবাদ

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

ঐতিহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোগল সম্রাট হুমায়ূন
মূল হিন্দি : ডক্টর হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব
ভূমিকা : ডক্টর তারা চাঁদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ
আশিক রহমান

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
সাতশত টাকা

MOGHAL SAMRAT HUMAYUN (Humayun The Moghal Emperor) by Dr. Harishankar Shreevastava
Translated into Bengali by Muhammad Jalaluddin Biswas
Published by Oitijjhya.
Date of Publication : February 2014.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Price : Taka 700.00 US$ 20.00
ISBN 984-776-300-3

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসিনী
দুই বয়োজ্যেষ্ঠ
সহোদরা
খাদিজা ও
শেফালির স্মরণে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

হিন্দি ভাষায় এমন ঐতিহাসিক পুস্তকের বড়ই অভাব রয়েছে যা মূল গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। ডক্টর হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তবের লেখা এ গ্রন্থ সেই অভাব পূরণে সহায়ক হয়েছে। তিনি হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ফারসি গ্রন্থ অবলোকন করেছেন এবং ইংরেজিতে যত জীবনী ও মোগল যুগের ইতিহাস লেখা হয়েছে তার সবই খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন। জীবনের ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক সমস্ত কর্মকাণ্ড তিনি সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অন্য লেখকদের যুক্তি ও চিন্তাধারার নিরিখে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। হুমায়ূনের বিস্তৃত, গম্ভীর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ণনা প্রস্তুত করেছেন যাতে সাধারণ পাঠকসহ ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক সকলের পক্ষে এই বাদশাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

হুমায়ূন তৈমুরী বংশের এক বিচিত্র রত্ন ছিলেন। ঐ বংশে অদ্ভুত সব বিভূতিরা জন্ম নিয়েছেন, যাঁদের ধারাবাহিকতা তৈমুর থেকে নিয়ে আওরঙ্গজেব—দশ-বারো পুরুষ অবধি চলতে থাকে। এমন রাজবংশ জগতে অতি দুর্লভ যে বংশে এমন ওজস্বী নায়কদের আবির্ভাব ঘটেছে। হুমায়ূন এই সুদীর্ঘ সোনালী শৃঙ্খলের এক অমূল্য সংযোজন ছিলেন। তাঁর চরিত্রে দোষ-গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল, যা তাঁকে একদিকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ, অন্য দিকে নির্বাসিত বাদশাহ রূপে ইরানের বাদশাহের অনুগ্রহের পাত্র বানিয়ে দেয়। এক সময় যিনি দিল্লির সম্রাট ছিলেন, যাঁর সামনে রাজা ও নবাবগণ অবনতমস্তক হতেন আর সেই হুমায়ূন বাদশাহ রাজস্থানের মরুভূমিতে নির্ধন, অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি সকল অবস্থাতেই খুশি ছিলেন, দুঃখ-দুর্দশায় তিনি নিরাশ হতেন না, আবার জয়-পরাজয়ে বিহ্বল হতেন না। তাঁর পঁচিশ বছরের রাজত্বকালের পনেরো বছরই তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়। ভাইয়েরা তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে। কখনো বা তিনি দুনিয়ার প্রতি এতটা উদাসীন হয়ে পড়তেন যে, রাজকার্য ত্যাগ করতে উদ্যত হয়ে যেতেন। কখনো বা তিনি বিলাস-ব্যসনে এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়তেন যে, শত্রু-মিত্রের পরোয়া থাকত না। যখন তিনি রাজসিংহাসনে বসেন তখন তাঁকে অসংখ্য সমস্যা ঘিরে রেখেছিল। এই সমস্ত সমস্যাই তাকে সাম্রাজ্যচ্যুত করে। এরপর ইরানিদের স্বল্পমাত্র সাহায্য নিয়ে সমস্ত শত্রু পরাজিত করে পুনরায় দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এমন আশ্চর্য উত্থান-পতনের ঘটনা বাস্তবিকই হৃদয়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। কালের নিষ্ঠুরতা ও মানুষের ধৈর্যের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব হুমায়ূনের জীবন-চরিতকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই নয়, মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তাবলী অনুধাবনের জন্যও হুমায়ূনের ইতিহাস জানা আবশ্যক। ডক্টর হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব এই গ্রন্থ রচনা করে আমাদের সাহিত্যের একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

তারা চাঁদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি কথা

মোগল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ূনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবুরের পুত্র ও তাঁর বংশের মহান সম্রাট আকবরের পিতা ছিলেন। তাঁর জীবনের উত্থান-পতন এমন কিছু সমস্যা উপস্থিত করে যা মোগল যুগের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য আবশ্যক। মোগল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ূনের রাজত্বকালটাই ছিল সবচেয়ে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল। তাঁর নির্বাসন ও বাতাবরণ থেকে প্রভাবিত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডকে সমালোচনাত্মক ও সংশায়ত্মক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এর বিপরীতে তাঁর ঘটনাবলী এতটা মার্মিক যে, তাঁর প্রতি আমাদের নিরন্তর সহানুভূতি জাগ্রত থাকে। এইভাবে তাঁর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি-তর্কের এমন একটা বাতাবরণে ছেয়ে যায় যে, বাস্তবে তার আসল রূপ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ ধ্যান-ধারণা থেকে প্রভাবিত ঐতিহাসিক অধ্যয়ন ইতিহাস থাকে না। এইভাবে হুমায়ূনের ওপর গবেষণা আমাদের অনুশাসিত চিন্তাধারার পরীক্ষামাত্র রয়ে গেছে। এমন বিবাদগ্রস্ত ব্যক্তির অধ্যয়ন ঐতিহাসিক তটস্থতার এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত করে।

হুমায়ূন সম্পর্কিত অধিকাংশ সমকালীন গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা। এগুলির অধিকাংশই তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর পুত্রের আমলে লেখা হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থাবলীর সূচি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তকের শেষে দেওয়া হয়েছে যা থেকে তাঁর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ইংরেজিতে হুমায়ূন সম্পর্কিত কিছু উপযোগী গ্রন্থ আছে যা হুমায়ূনের প্রতি ঐতিহাসিকদের বিশেষ রুচির পরিচয় বহন করে।

প্রস্তুত গ্রন্থখানি গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ শ্রেণীতে প্রদত্ত আমার ব্যাখ্যাসমূহের বিস্তৃত এবং পরিবর্তিত রূপ। এ বই সমকালীন গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত আধুনিক লেখকদের গ্রন্থাবলীও আমি অধ্যয়ন করেছি এবং অনেক স্থানে নিজের যুক্তি প্রস্তুত করে আমি তাঁদের চিন্তাধারার প্রতি বিনম্র অসহমতি প্রকাশ করেছি। পাঠক এ সমস্ত মতামত অনুশীলন করে নিজের মতামত নিজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। হুমায়ুন সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা যতটা সম্ভব আমি স্পষ্ট করার প্রয়াস চালিয়েছি। ঐতিহাসিক স্থানসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান আমি পাদটীকায় উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে স্থানসমূহের নির্ধারণে অনেক সুবিধা হবে এবং পুস্তকে প্রদত্ত মানচিত্রে এ সমস্ত স্থান দেখে নেওয়া যেতে পারে। হুমায়ূন সম্পর্কিত তারিখসমূহও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে হুমায়ূনের কালক্রম সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ করা যাবে। চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধের মানচিত্রও দেওয়া হয়েছে যাতে এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। ভৌগোলিক স্থান, ব্যক্তিদের নাম এবং ফারসি শব্দাবলীর যতটা সম্ভব সঠিক এবং প্রচলিত উচ্চারণ দেওয়ায় প্রয়াস চালিয়েছি। এই গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত ফারসি পুস্তকাবলীর অধ্যয়নে আমি মৌলবী মুহম্মদ সাদিক হুসেনের কাছ থেকে বড়ই সহায়তা পেয়েছি। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যক্ষ ড. মাহমুদ ইলাহী ফারসির অনেক শব্দের বিশ্লেষণে আমাকে সহযোগিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে শ্রী ভগবান প্রসাদ এম. এ, শ্রী রঘুনাথ প্রসাদ এম. এ, ও আমার কন্যাদ্বয় মধু ও নীলিমা আমাকে বড়ই সহযোগিতা করেছে। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রামচন্দ্র তেওয়ারী ও শ্রীমতী শান্তা সিংহ পুস্তকের ভাষা পরিশীলিতকরণে সহায়তা দিয়েছেন। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি লাইব্রেরিয়ান ড. কে. এস ভার্গব ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান ত্রিভুবননাথ গৌড় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয় থেকে গ্রন্থ সরবরাহ করে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। পুস্তক রচনায় যে সমস্ত পুস্তক হতে আমি সাহায্য লাভ করেছি সে সবের লেখক-প্রকাশকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পুস্তকে প্রদত্ত চিত্র দুটি আমি ভারত-সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত হয়েছি।

আমার পরমপূজ্য গুরুবর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. তারা চাঁদ অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার জন্য সময় বের করে এর পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এবং এ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে মোগল যুগের ইতিহাসের প্রতি আমি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি। তখন থেকেই এর ওপর লেখার আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ করে আসছিলাম ; কিন্তু অনুকূল সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বিগত কুড়ি বছর যাবৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে মোগল ইতিহাসের প্রতি আমার আকর্ষণ সদাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ মোগল সম্রাট হুমায়ূনের জীবন ও শাসনকালের ইতিহাস লিখতে পেরে আমি গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করছি।

পুস্তকের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি অনভিজ্ঞ। তবে, কেবল এই কারণেই আমি শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব করছি যে, অনেক কঠিনতা সত্ত্বেও আমি এই গ্রন্থ হিন্দিতে রচনা করতে সমর্থ হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় হল উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্র। তার সম্মুখে হিন্দি মাধ্যম হল একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এমতাবস্থায়, আমাদের ওপর, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং যাঁরা হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশসমূহের অধিবাসী, বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এ গ্রন্থ, এ প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি বিনম্র প্রয়াসমাত্র। এ গ্রন্থ বিদ্যার্থীদের লাভের অতিরিক্ত হুমায়ূন সম্পর্কিত সমস্যাবলীর নিরাকরণ ও হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের একটি সেবা বলে স্বীকৃত হলে নিজের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের ভূমিকা

অনেক কাল আগে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা 'মধ্য এশিয়া কা ইতিহাস' নামে একখানি বই পড়েছিলাম। তাতে তিনি তৈমুর বংশীয় এক মহান রত্ন জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবুর সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তার সার-সংক্ষেপ এরকম : বাবুর বাদশাহ তাঁর আপন দেশে চুগতাই তুর্কি ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রূপে পরিচিত। তাঁর রচনা সে দেশের সর্বনিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত ঐ ভাষার শ্রেষ্ঠ এবং প্রামাণ্য রচনা হিসেবে পড়ানো হয়। সার কথা, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সে দেশে বাবুরের লেখা গদ্য-পদ্য-ইত্যাদি রচনা সর্বশ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য। বলাবাহুল্য, ওদেশের মানুষের কাছে এর বাইরে সাম্রাজ্য-বিজেতা বাবুরের পরিচয় যেমন নগণ্য তেমনি গৌণ। কিন্তু পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ, এখানে তাঁর সাম্রাজ্য-বিজেতা ও মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পরিচয়টি মুখ্য ; কিন্তু কবি ও সাহিত্যিক পরিচয়টি অপেক্ষাকৃত গৌণ। তবে, এ কথাও ঠিক যে, বিশ্বইতিহাসে বাবুরের ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তির দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল, যিনি এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কলম নিয়ে বিশ্বজয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তরবারি দিয়ে তিনি ভুবন জয় না করলেও কিছু ভূখণ্ড তো জয় করেছিলেন, আর সন্দেহ নেই যে, তিনি কলম দিয়ে বিশ্বমানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। সত্যিই জগতের ইতিহাসে এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বিরল।

বাবুরের ভারত-বিজয়—উপমহাদেশীয় ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে, ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের সাথে সাথে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল আর মাঝের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে সেই সাম্রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস পরবর্তী আড়াই শ' বছর অবধি প্রলম্বিত হয়েছিল। এই সময়-কালের মধ্যে উপমহাদেশের ইতিহাসে মোগল রাজবংশ থেকে এক এক জগৎপ্লাবী ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।

একথা ঠিক যে, বাবুর তাঁর বিজিত স্বপ্নের হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করে যেতে পারেননি। এই অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূনকে মনোনীত করে যান, কিন্তু দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনা হুমায়ূনের নিত্যসাথী হওয়ায় সেই অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করার আগেই হুমায়ূনের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর তিনি হয়ে যান শরণার্থী সম্রাট আর হিন্দুস্তানের পথে পথে তাঁকে অবলম্বনহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইরানের শাহের কাছে গিয়ে আশ্রয় ও সাহায্য নিতে হয়। সেও এক দীর্ঘ, প্রলম্বিত ও বিড়ম্বিত ইতিহাস। তা সত্ত্বেও শাহের সাহায্যে তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান জয় করে মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিল্লির সিংহাসনে পুনরায় আসীন হন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় হতে না হতেই আর অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করার আগেই তাঁকে নিতান্ত অকালে-অসময়ে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়।

সাম্রাজ্যহারা হুমায়ূনের পনেরো বছরের নির্বাসনকালে উপমহাদেশের ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—তা হল শেরশাহের নেতৃত্বে সূর বংশের উত্থান। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহান সম্রাট মাত্র পাঁচ বছরের সময়কালে রাজ্যশাসনকর্মে যে অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিচয় দিলেন জগতের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ। ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস শেরশাহ সূরীকে কোনো দিনও ভুলতে পারবে না। কিন্তু ইতিহাসের মতি-গতি বোঝা বড় দায়, অথবা বলা যেতে পারে বিধাতার মতি-গতি। বোধহয়, বাবুর ও তাঁর বংশের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতা একটু বেশি ছিল। তা না হলে, সূর বংশের ধ্বংসাবশেষের ওপর তিনি মোগল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন কেন?

বাবুরের ন্যায়ই হুমায়ূনকেও সাম্রাজ্য সুব্যবস্থিত করার আগে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হল। তাঁর নাবালক পুত্র আকবর হলেন তাঁর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এইভাবে মোগল সাম্রাজ্য আড়াই শ' বছর প্রলম্বিত হল।

জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুরের পুত্রসন্তানদের মধ্যে, দিল্লির সিংহাসন পুনরাধিকার করা পর্যন্ত, একমাত্র হুমায়ূনই জীবিত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই তৈমুর তথা বাবুর-বংশের ধারা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। সে এক দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস।

হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের সময় পর্যন্ত বাবুরের পুত্র-সন্তানদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন মাত্র চারজন। এই চারজনের মধ্যে হুমায়ূন ছিলেন সবার বড়। তারপর পর্যায়ক্রমে আসেন কামরান, আসকারি ও হিন্দাল। এঁরা কেউই পরস্পর সহোদর ভাই ছিলেন না। হুমায়ূন ছিলেন এক মায়ের, কামরান ও আসকারি অন্য মায়ের এবং হিন্দাল আরেক মায়ের সন্তান। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ও 'হুমায়ূননামা'র রচয়িতা গুলবদন বেগমের সহোদর ভাই। যাই হোক, হুমায়ূনের ভাইয়েরা হুমায়ূনের সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক হতে দেন নি। এঁদের মধ্যে হুমায়ূনকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছেন কামরান ও আসকারি—দুই সহোদর ভাই। হিন্দাল অপেক্ষাকৃত কম। এমন কী, তিনি শেষ পর্যায়ের দিকে এসে হুমায়ূনের সাথে একাকার হয়ে যান এবং হুমায়ূনের পক্ষে লড়তে লড়তে তিনি শহিদী-মৃত্যু বরণ করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, কামরানের আকস্মিক ও কাপুরুষোচিত আক্রমণই ছিল হিন্দালের মৃত্যুর মূল কারণ। হিন্দালের মৃত্যুর সাথে সাথে এক সম্ভাবনাময় জীবনের ইতি ঘটে। বিভিন্ন রণাঙ্গণে হিন্দাল অসাধারণ সামরিক যোগ্যতায় পরিচয় দিয়েছিলেন। হিন্দালের প্রতি বাবুরের খুব দুর্বলতা ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি বারবার হিন্দালের খবর জানতে চাচ্ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে হুমায়ূন খুব শোকাহত হয়েছিলেন। তাঁর সহোদরা গুলবদন বেগম 'হুমায়ূননামা'য় তাঁর মৃত্যুর খুব মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। যা পড়তে পড়তে পাঠক অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। এ গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা অনুবাদ করতে করতে আমি নিজেও আপ্লুত হয়েছি।

কামরানের চরিত্রে ধৃষ্টতার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। স্বভাবগতভাবে উদার না হলে সে যতই উদার হওয়ার চেষ্টা করুক, তা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট হবেই। কামরানের অবস্থাও তাই। প্রকৃতপক্ষে, বিশাল হিন্দুস্তান শাসনের জন্য যে যোগ্যতা থাকা দরকার, তার কোনোটাই তাঁর ছিল না। ভাইয়ে ভাইয়ে অযথা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত না করে বরং প্রাদেশিক শাসক হিসেবে থাকলেই তিনি ভাল করতেন। তা না করে তিনি অযথা অশান্তি করলেন, বাবুরের নিজ হাতে গড়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করলেন, হুমায়ূন ও মোগল পরিবারের দুর্ভাগ্যের কারণ হলেন, সর্বোপরি, নিজেই নিজের পতন ডেকে আনলেন। ঠিক একইভাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসকারিরও পতন হল। তাঁর কাছ থেকেও হুমায়ূনের প্রতি আনুগত্যের কোনো আশা ছিল না। ফলে, তাঁকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হল।

এ প্রসঙ্গে হুমায়ূনের সৌভাগ্য-সূর্য উদয়ের পেছনে যে ব্যক্তিটির সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, তাঁর উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। তিনি হলেন বৈরাম খাঁ। ইতিহাসে এমন যোগ্য, বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ এবং নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু বড় দুর্লভ। একথা ঠিক যে, বৈরাম খাঁর মতো বন্ধু ও সহযোগী না পেলে হুমায়ূনের পক্ষে মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হত না। কেননা, হুমায়ূন বেশ কয়েকবার রাজকার্য ত্যাগ করে ত্যাগী ফকিরের জীবন অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর বৈরাম খাঁ তা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন মহিলার অবদানও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিহাসে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে মাতৃস্থানীয়াদের বাদ দিলে সবার আগে হুমায়ূনের পত্নী ও আকবরের মাতা হামিদাবানু বেগমের নাম করতে হয়। ইরানে শাহের দরবারে, তাঁর বোনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে হুমায়ূনের জন্য শাহের সামরিক সাহায্যের স্বীকৃতি একটি বিরাট ঘটনা।

এতসব মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের পর হুমায়ূনের পক্ষে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল—যার ধারা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। যা ভারত-ইতিহাসে এক সোনালী যুগের উত্থান ঘটিয়েছিল।

ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতিতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদির ন্যায় ইতিহাসও আমার অন্যতম গবেষণা, অধ্যয়ন ও মনোযোগের বিষয়। বিশেষ করে, বিশ্ব ইসলামী ইতিহাস ও উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস। এসব অধ্যয়নও অনুবাদকর্ম করতে গিয়ে আমি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি যে, ইতিহাসের কোন মহাজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বাংলাভাষায় নেই। যেটি নেই, সেইটির বিষয়েই আমি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠি। এই মনোযোগ ও আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমি শেরশাহ সূরী নামক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করি বেশ কয়েক বছর আগেই এবং তা যথারীতি ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়।

শেরশাহ সূরীর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ূন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বাংলায় হয়নি জেনেই আমি তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করি এই মর্মে যে, তাঁর সম্পর্কে সর্বশেষ গবেষণাকর্মটি হাতে পেলে আমি তার বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করব। এই অনুসন্ধানের বশবর্তী হয়ে ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে আমি দিল্লি থেকে ড. হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তবের লেখা হিন্দি বই 'মুগল সম্রাট হুমায়ূন' নামক এই বইটি কিনি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের পর এটি আমি বাংলায় অনুবাদ করতে মনস্থ করি। দুর্ভাগ্যবশত, হাওড়া স্টেশনে এই বইসহ আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে যায়। মনে মনে খুবই ভেঙে পড়ি এবং পুনরায় দিল্লি গিয়ে বইটি সংগ্রহের চেষ্টায় থাকি। তারপর ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে আজমীর শরীফ থেকে দিল্লিতে ফিরে এসে— এই বইটি যদিও দুষ্প্রাপ্য,— তবুও অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। এই বইটি ২০০০ সালে বাংলা বাজারেরই এক প্রকাশককে প্রকাশ করার কথা বললে তিনি রাজি হয়ে যান ; কিন্তু তাঁর সকালে এক কথা, আর বিকেলে আরেক কথা বলার অভ্যাসের সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমি তাঁকে সাফ জানিয়ে দিই যে, তাঁর জন্য এক কলম লেখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘটনার দীর্ঘ তিন বছর পর 'ঐতিহ্য'-এর কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি তাঁকে গ্রন্থটি প্রকাশ করার কথা বললে তিনি সানন্দে রাজি হয়ে যান আর সাথে সাথে আমি এর বঙ্গানুবাদ শুরু করি এবং কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এর অনুবাদকর্ম শেষ হয়।

এই বই অনুবাদ করতে করতে এক মজার এবং স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তা হল, গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩-এ এক দীর্ঘ ভ্রমণে হুমায়ূন এবং শেরশাহের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান আমি সফর করি। যেসব স্থানের নাম এ গ্রন্থে এসেছে। তারপর, তাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল বিহারের সাসারামে শেরশাহের সমাধি এবং দিল্লিতে হুমায়ূনের মকবরা দর্শন করেছি। সেই সাথে মোগলদের অমর কীর্তিরাজিও।

আমি যতদূর জানি, বাংলায় মোগল সম্রাট হুমায়ূনের ওপর সর্বাধুনিক কোনো গবেষণাকর্ম হয়নি এবং এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ বই বাংলা ভাষায় নেই এবং আমি নিশ্চিত যে, এই বইটির প্রথম বঙ্গানুবাদ আমিই করেছি। বইটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষাদাতাসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে উপযোগী হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

এখানে কয়েকটি বিষয়ের ওপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি, তা হল, বাবুরের নাম এবং কয়েক স্থানের নামের বানান। বাংলা বইগুলোতে প্রায়শ 'বাবর' লিখতে দেখা যায়। কিন্তু আমি এখানে 'বাবুর' লিখেছি। এ ক্ষেত্রে আমি বহুভাষাবিদ-পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলীর বানানকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ, বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলীই একমাত্র চুগতাই তুর্কি ভাষা জানতেন এবং তিনি তাঁর 'বাবুরনামা' বিষয়ক আলোচনায় 'বাবুর' বানানই লিখেছেন। তাছাড়া ইংরেজি বইগুলোতে 'Babur' লেখা হয়েছে। আমি সেদিকেও খেয়াল রেখেছি। তাছাড়া বিদেশী শব্দের বানানগুলোতে আমি আধুনিক বাংলা-বানান রীতি অনুসরণ করেছি।

ধন্যবাদ 'ঐতিহ্য'-এর কর্ণধার আরিফুর রহমান নাইম সাহেবকে। তিনি এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে জাতির একটি মহত খেদমতে অংশ নিলেন।

ঢাকা, বাংলাবাজার

৩০-০১-২০০৫

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক জীবন — ১৯-৪৮

বাবুর 'পাদশাহ' — ২২
হুমায়ূনের বাল্যকাল — ২৩
শিক্ষা — ২৫
শাসন তথা সামরিক শিক্ষা — ২৬
ভারত আক্রমণ — ২৭
পানিপথের যুদ্ধে — ৩০
আগ্রায় — ৩০
পূর্বাঞ্চলে অভিযান — ৩২
খানুয়ার যুদ্ধ — ৩৪
দিল্লির রাজকোষ লুণ্ঠন — ৩৪
বাদাখশানে — ৩৫
হুমায়ূনের আগ্রা আগমন — ৩৮
হুমায়ূনের অনুপস্থিতিতে বাদাখশান — ৪০
বাদাখশান থেকে ভারতে ফেরার সমস্যা — ৪০
হুমায়ূনের অসুস্থতা — ৪২
বাবুর কেন নিজের জীবন দান করলেন ? — ৪৪
উত্তরাধিকারী — ৪৪
কালিঞ্জর আক্রমণ — ৪৫
বাবুরের মৃত্যু — ৪৫
বাবুরের মৃত্যুর কারণ — ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

খলীফার ষড়যন্ত্র — ৪৯-৬৬

বাবুরের মৃত্যুর সময় হুমায়ূন কোথায় ছিলেন ? — ৪৯
ষড়যন্ত্র — ৫০
ষড়যন্ত্রের প্রণেতা খলীফা — ৫০
হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দ্বী মাহদী খ্বাজা — ৫১
খলীফার সিদ্ধান্তের কারণ — ৫৫
বাবুরের ইচ্ছা — ৫৭
ষড়যন্ত্র শুরুর পটভূমিকা — ৬০
ষড়যন্ত্রের শুরু ও শেষ — ৬২
আবুল ফজল এ ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেছেন — ৬৪
হুমায়ূনের শাসনকালে মাহদী খ্বাজা ও খলীফা — ৬৪
ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ — ৬৫

তৃতীয় অধ্যায়

হুমায়ূনের সমস্যাবলী — ৬৭-১০০

হুমায়ূনের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী — ৬৭
মোগল সাম্রাজ্য — ৬৭
শাসন ব্যবস্থা — ৬৮
হুমায়ূনের ভাইয়েরা — ৭০
বাবুরের আত্মীয়-স্বজন — ৭২
হুমায়ূনের বাহ্যিক সমস্যাবলী — ৭৪
উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা — ৭৪
১. গুজরাত — ৭৪
সাম্রাজ্য বিস্তার — ৭৯
২. আফগান — ৮১
ফরিদের প্রারম্ভিক জীবন — ৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আফগানদের অবস্থা ৯১
৩. বাংলা ৯২
৪. সিন্ধু ও মুলতান ৯৪
৫. মালব ৯৪
৬. খানদেশ ৯৫
৭. কাশ্মীর ৯৬
৮. রাজপুতানা ৯৭
এ সমস্ত পরিস্থিতিতে কেমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

প্রারম্ভিক ঘটনাবলী ১০১-১২৪
সিংহাসনারোহণ ১০১
রাজ্য বণ্টন ১০২
কামরান ও রাজ্য বণ্টন ১০২
কামরানের ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা ১০৪
সাম্রাজ্য বিভাজনের সমালোচনা ১০৬
সাম্রাজ্য বিভাজনের সমর্থন ১০৬
আসকারি ও হিন্দাল ১০৮
কালিঞ্জর বিজয় ১০৮
আফগানদের সাথে প্রথম সংঘর্ষ ১১০
শের খাঁ ও দাদরা ১১১
দাদরার যুদ্ধের পরিণাম ১১৪
চুনার দুর্গে আক্রমণ ১১৫
সন্ধির শর্তাবলী ১১৬
আনন্দোৎসব ১১৭
গোয়ালিয়র যাত্রা ১১৮
মাহম বেগমের মৃত্যু ১১৯
দীন পনাহ ১২০
উৎসব ও দাওয়াত ১২১
মুহম্মদ জামান মির্জার বিদ্রোহ ১২৩
প্রথম বিদ্রোহ ১২৩
দ্বিতীয় বিদ্রোহ ১২৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাহাদুর শাহ ও মোগল সম্রাট ১২৫-১৪২
বাহাদুর শাহের রায়সীন বিজয় ১২৫
বাহাদুর শাহের প্রথম চিতোর অবরোধ ১২৭
বাহাদুর শাহের দরবারে মোগল সাম্রাজ্যের শরণার্থীবর্গ ১৩০
আফগান শরণার্থী ১৩০
মোগল শরণার্থী ১৩২
হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের কূটনৈতিক সম্বন্ধ ১৩৩
বাহাদুর শাহের মহাপরিকল্পনা ১৩৪
বাহাদুর শাহের পরিকল্পনার অসফলতা ১৩৫
হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের পত্র-ব্যবহার ১৩৭
প্রথম পত্র ১৩৮
দ্বিতীয় পত্র ১৩৮
তৃতীয় পত্র ১৩৯
চতুর্থ পত্র ১৪০
কূটনৈতিক পত্রাবলীর গুরুত্ব ১৪১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুজরাত অভিযান : জয় ও পরাজয় ১৪৩-১৯০
বাহাদুর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ ১৪৩
সারঙ্গপুর ও উজ্জৈনে হুমায়ূন ১৪৪
চিতোর পতন ১৪৬
মন্দসৌর ১৪৬
বাহাদুর শাহের পলায়নের কারণ ১৪৯
বাহাদুর শাহের সৈন্যদের পলায়ন ১৫০
মাণ্ডু ১৫২
মাণ্ডুর গণহত্যা ১৫৫
মাণ্ডু হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা ১৫৬
চম্পানীর ১৫৬
গাওয়ার ও কোলী জাতির আক্রমণ ১৫৯
কম্বে লুট ১৬০
চম্পানীর দুর্গ বিজয় ১৬০
কিছু মোগল সৈনিকের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা ১৬২
চম্পানীর বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ১৬৩
ইমাদুল মুলকের পরাজয় ১৬৫
গুজরাতের শাসন ব্যবস্থা ১৬৭
হুমায়ূনের অনুপস্থিতির ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের অবস্থা ১৬৮
গুজরাত থেকে মাণ্ডু ১৬৯
গুজরাতে মুক্তি আন্দোলন ১৭০
মোগলদের অবস্থা ১৭১
আসকারির দাওয়াত ১৭২
বাহাদুর শাহের সাথে সংঘর্ষ ১৭৩
হুমায়ূনের আগ্রা প্রত্যাবর্তন ১৭৫
তরদী বেগের ব্যবহারের সমীক্ষা ১৭৬
গুজরাত থেকে মোগলদের পলায়নের কারণ ১৭৮
বাহাদুর শাহের মৃত্যু ১৮০
বাহাদুর শাহের চরিত্র ও তাঁর পরাজয়ের কারণ ১৮২
বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর গুজরাত ১৮৪
হুমায়ূনের গুজরাত অভিযানের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য ১৮৬
১. কান্দাহারে ইরানী আক্রমণ ১৮৬
২. মির্জাদের বিদ্রোহ ১৮৭
৩. শের খাঁর উত্থান ১৮৭

সপ্তম অধ্যায়

শের খাঁর সাথে সংঘর্ষ ১৯১-২৪২
হুমায়ূনের আগ্রায় বিরতির কারণ ১৯২
শের খাঁর গতিবিধি ১৯৪
বাংলা অভিযান ১৯৫
মুহম্মদ জামান মির্জার আত্মসমর্পণ ১৯৬
চুনার অবরোধ ১৯৬
চুনার অধিকার ১৯৮
শের খাঁর রোহতাস দুর্গ অধিকার ২০০
বেনারস-বিজয় ও শের খাঁর সাথে সন্ধিবার্তা ২০২
হুমায়ূনের বাংলায় প্রবেশ ২০৫
হুমায়ূনের বাংলা নিবাস ২০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের কারণ ২১১
বাংলা অভিযানের ফলাফল ২১৪
বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তন ২১৪
চৌসার যুদ্ধ ২১৭
চৌসার যুদ্ধের ফলাফল ২২৪
চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয়ের কারণ ২২৫
চৌসা থেকে আগ্রা ২২৬
আগ্রায় ২২৭
নিজাম ভিশতি ২২৭
বিচার-বিবেচনা ২২৮
চৌসার যুদ্ধের পর শের খাঁর গতিবিধি ২৩২
হুমায়ূনের আগ্রা থেকে প্রস্থান ২৩৪
কনৌজের যুদ্ধ ২৩৫
কনৌজের যুদ্ধ থেকে পলায়ন ২৪০
কনৌজের যুদ্ধের ফলাফল ২৪০
হুমায়ূনের পরাজয়ের কারণ ২৪১

অষ্টম অধ্যায়

নির্বাসন—পঞ্জাব ও সিন্ধুতে ২৪৩-২৮৮
আগ্রা থেকে লাহোর ২৪৩
লাহোরে ঐক্য-প্রচেষ্টা ২৪৫
শেরশাহের সাথে সন্ধি-বার্তা ২৪৭
লাহোর থেকে বিদায় ২৫১
উছ্-এ ২৫৪
সিন্ধুতে ২৫৪
হামিদা বানুর সাথে বিবাহ ২৫৮
হিন্দালের পলায়ন ২৬১
আবুল বকার মৃত্যু ২৬২
সেহওয়ান আক্রমণ ২৬৩
মালদেব ও হুমায়ূন ২৬৬
মালদেবের নিমন্ত্রণ ২৬৭
হুমায়ূনের যোধপুর যাত্রা ২৬৮
শেরশাহ ও মালদেব ২৭০
যোধপুর থেকে হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তন ২৭২
মালদেব কী বিশ্বাসঘাতক ছিলেন ? ২৭৪
অমরকোটে ২৭৮
আকবরের জন্মতিথি ২৭৯
জুন-এ ২৮১
কাবুল ও বাদাখশানের অবস্থা ২৮১
সিন্ধুতে শেষ দিন ২৮২
বৈরাম খাঁর আগমন ২৮৩
শাহ হুসেনের সাথে অন্তিম সংঘর্ষ ২৮৪
সিন্ধু থেকে বিদায় ২৮৫
সিন্ধু থেকে ইরান ২৮৬

নবম অধ্যায়

ইরান যাত্রা ও ভাইদের সাথে সংঘর্ষ ২৯৮-৩৪৮
হিরাতে ২৯১
হিরাত থেকে কজবীন ২৯১
শাহ তহমাস্প-এর সাথে সাক্ষাৎ ২৯৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

শাহের সাথে মতভেদ ২৯৪
মতভেদের কারণ ২৯৫
দুই শাসকের মধ্যে বোঝাপড়া ২৯৭
শাহ হতে বিদায় ২৯৮
হুমায়ূন কী শিয়া মত গ্রহণ করেছিলেন ? ২৯৯
ইরান নিবাসের সময় হুমায়ূনের বিশিষ্ট সহযোগী ৩০১
ইরান থেকে বিদায় ৩০১
কান্দাহার বিজয় ৩০৩
কান্দাহার দুর্গ ৩০৪
বৈরাম খাঁর কাবুল যাত্রা ৩০৪
কান্দাহার অধিকার ৩০৬
হুমায়ূন কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ? ৩০৭
হুমায়ূনের ইরান নিবাসের গুরুত্ব ও পরিণাম ৩১০
প্রথম কাবুল বিজয় ৩১১
বাদাখশান বিজয় ৩১৪
ইয়াদগার নাসিরের পতন ৩১৫
বাদাখশান অভিযান ৩১৫
কামরানের পুনরায় কাবুল অধিকার ৩১৭
হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার কাবুল অধিকার ৩১৭
কামরানের পলায়ন ও হুমায়ূনের সাথে সংঘর্ষ ৩২১
সন্ধি ও মিলন ৩২৪
একতার প্রভাব ৩২৭
বল্‌খ্‌ অভিযান ৩২৮
বাদাখশান থেকে প্রত্যাবর্তন ৩৩০
কামরানের বিদ্রোহ ৩৩০
কিবচাকের যুদ্ধ ৩৩২
কামরানের তৃতীয় বার কাবুল অধিকার ৩৩৩
পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য শপথ গ্রহণ ৩৩৪
হুমায়ূনের তৃতীয়বার কাবুল অধিকার ৩৩৫
আসকারির নির্বাসন ৩৩৭
হিন্দালের মৃত্যু ৩৩৮
ইসলাম শাহের দরবারে কামরান ৩৪০
কামরানের পতন ৩৪৩
কামরান চরিত্রের সিংহাবলোকন ৩৪৫
কাশ্মীর বিজয়ের চিন্তা ও কাবুল প্রত্যাবর্তন ৩৪৭

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় রাজত্ব ও মৃত্যু ৩৪৯-৩৭৬
হুমায়ূনের প্রতি শেরশাহের নীতি ৩৪৯
হুমায়ূন ও ইসলাম শাহ ৩৫১
সূর সাম্রাজ্যের পতন ৩৫২
১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ৩৫৪
ভারতীয় অভিযান ৩৫৫
হুমায়ূনের কাবুল থেকে প্রস্থান ৩৫৮
মাছিওয়াড়ার যুদ্ধ ৩৬১
মাছিওয়াড়া যুদ্ধের পরিণাম ৩৬৩
সেরহিন্দের যুদ্ধ ৩৬৩
আফগানদের পরাজয়ের কারণ ৩৬৬
দিল্লি অধিকার ৩৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় রাজত্ব ৩৬৭
নিযুক্তি এবং জায়গীর বিতরণ ৩৬৮
হিসার অধিকার ৩৬৮
কম্বর দীওয়ানার মৃত্যুদণ্ড ৩৬৯
গাজী খাঁর হত্যা ৩৭০
মির্জা সুলেমান কর্তৃক অন্দরাব অধিকার ৩৭১
সিকান্দার সূর ও পঞ্জাব সমস্যা ৩৭১
হুমায়ূনের মৃত্যু ৩৭৩

একাদশ অধ্যায়

সিংহাবলোকন ৩৭৭-৪১২
সাম্রাজ্য ও শাসন ৩৭৭
সম্রাট ৩৭৭
সাম্রাজ্য ৩৭৯
সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিভাজন ৩৭৯
উজির ৩৮০
রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার ৩৮১
দরাবারের নয়া নিয়ম ও উৎসব ৩৮১
আবিষ্কার ও নতুন পরিকল্পনাদি ৩৮২
আমীর ও রাজকর্মচারীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ ৩৮২
বারো শ্রেণীর বাণ ৩৮৪
শাসনকার্যের চারটি বিভাগ ৩৮৫
সাত মজলিসের আয়োজন ৩৮৫
নাকাড়া বাজানোর নিয়ম ৩৮৬
ন্যায়ের তবলা (তবল-এ-আদিল) ৩৮৬
আনন্দ মঙ্গলের কালীন (বিসাতে নিশাত) ৩৮৬
কাচের বিশেষ প্রকারের শোষক ৩৮৭
তাজে ইজ্জত ৩৮৭
বিশেষ কোট বা প্রত্যেক দিনের জন্য বিশেষ রঙের বস্ত্র ৩৮৮
নৌকা সজ্জা ৩৮৮
বিচিত্র তাঁবু ৩৮৯
হুমায়ূন সম্পর্কিত স্মারক ৩৯০
হুমায়ূনের মকবরা ৩৯২
মোগল চিত্রকলা ও হুমায়ূন ৩৯৪
বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য প্রীতি ৩৯৬
হুমায়ূনের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ৪০০
সামরিক যোগ্যতা ৪০২
হুমায়ূনের পত্নীগণ ৪০৪
ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব ৪০৫
চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ৪০৭
ইতিহাসে স্থান ৪০৯

দ্বাদশ অধ্যায়

সমকালের প্রধান সহায়ক গ্রন্থাবলী ৪১৩-৪২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রধান সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা ৪২৫-৪৩২
(ক) সমকালীন গ্রন্থাবলী ৪২৫
মূল গ্রন্থ ৪২৫
মূল গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ৪২৫
আধুনিক গ্রন্থাবলী ৪২৬
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নিবন্ধবলী ৪৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক জীবন

নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ূন মির্জা ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ মঙ্গলবার রাতে কাবুল দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন।[১] সেই সময়ে তাঁর পিতা জহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুর কাবুল প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। হুমায়ূনের দেহে এশিয়ার দুই প্রধান বিজেতা—চেঙ্গিজ ও তৈমুরের রক্ত প্রবাহিত ছিল। বাবুরের পিতা উমর শেখ মির্জা তৈমুরের চতুর্থ অধস্তন এবং তাঁর মা কুতলুক নিগার চেঙ্গিজ খাঁর ত্রয়োদশ অধস্তন ছিলেন। এইভাবে হুমায়ূন পিতার দিক থেকে তৈমুরের চতুর্থ অধস্তন এবং মাতার দিক দিয়ে চেঙ্গিজের পঞ্চদশতম পুরুষ ছিলেন।[২]

---

১. দি মেমোয়ারস অব বাবুর (বাবুরনামা)-এর ইংরেজি অনুবাদক মিসেস এ.এস বেভারিজের ইংরেজি অনুবাদ পৃ.৩৪৪; আকবরনামা মূল ফারসি প্রথম খণ্ড পৃ. ১, মুসলিম বর্ষ গণনানুসারে চার জিলকাদ, ৯১৩ হিজরি। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, মওলানা মসনদী নামক কবি, 'সুলতান হুমায়ূন খাঁ, নামক অক্ষরগুলি থেকে এবং কাবুলের এক অনন্যসাধারণ কবি 'শাহ ফিরোজ কদর'-এর অক্ষরগুলি থেকে হুমায়ূনের জন্মতিথি বের করেন। আরবি অক্ষরের এই ক্রম যাতে প্রতিটি অক্ষরের মূল্যমান এক হাজার পর্যন্ত নির্ধারিত,একে আবজাদ বলা হয়। আবজাদের ভিত্তিতে উপরোক্ত অক্ষরগুলির মান হয় ৯১৩।

২. আমীর তাইমুর (তুর্কি)
↓
মির্জা মিরান শাহ
↓
সুলতান মুহম্মদ মির্জা
↓
সুলতান আবু সঈদ মির্জা
↓
আহমদ মির্জা (সমরখন্দ ও বুখারা) | মাহমুদ মির্জা (বলখ ও বাদাখশান) | উলুগ বেগ মির্জা (কাবুল ও গজনী) | উমর শেখ মির্জা (চতুর্থ পুরুষ) (ফারগানা)

চেঙ্গিজ খাঁ (মঙ্গোল)
↓
ইউনূস খাঁ (দ্বাদশ পুরুষ)
↓
কুতলুক নিগার (ত্রয়োদশ পুরুষ)

উমর শেখ মির্জা
↓
জহীরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুর
↓
হুমায়ূন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের মাতা মাহম বেগমের প্রারম্ভিক জীবন ও বংশপরিচয় বিষয়ে আমাদের বেশি কিছু জানা নেই।[১] সমকালীন ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তিনি সুলতান হুসেন মির্জা (বাইকার) তথা খুরাসানের প্রসিদ্ধ সাধক শেখ আবু নসর আহমদ জাম[২]-এর বংশজাত ছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ও শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। বাবুর ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে হিরাটে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ধর্মমতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁরা দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন। বাবুরের একাধিক পত্নী[৩] ছিলেন কিন্তু মাহম ছিলেন তাঁর প্রধান মহিষী এবং তাঁকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

---

১. গুলবদন বেগম মাহমের জন্য আকা শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এটি একটি তুর্কি শব্দ এবং এটি বয়োবৃদ্ধ মহিলাদের জন্য প্রযুক্ত হত। আকা শব্দের অর্থ প্রভু, মালিক, কর্তা, অধ্যক্ষ বা পরিচালক (গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ.২৫৬-৫৮)। মিসেস বেভারিজ লিখেছেন, মাহমের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন (বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৪৪ টিপ্পনী)। ডক্টর ইশ্বরী প্রসাদের মতে, তিনি মোগল ছিলেন না (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন,পৃ. ১)। বাবুরের ট্রান্স অক্সিয়ানা অভিযানের সময় মাহম তাঁর সঙ্গে ছিলেন (৯১৯-২০ হি.)। উজবেকদের কাছে পরাজিত হয়ে বাবুর যে সময়ে ৯১৮ হিজরি (এপ্রিল মে ১৫১২) তে হিসারে অবস্থান করছিলেন। তখনও মাহম তাঁর সাথে ছিলেন (বাবুরনামা, বেভারিজ, ১ পৃ. ৩৫৮; হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ৯১)।

২. আবু নসর আহমদ জাম 'জিন্দাপীর' ইরানের প্রসিদ্ধ সুফীসাধক ছিলেন। তিনি ১০৪৯ (৪৪১হি.) খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২২বছর বয়সে তিনি সাধক জীবন অবলম্বন করেন। তিনি আঠার বছর যাবত বনে জঙ্গলে পাহাড়ি পর্বতে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। তারপর তিনি বিয়ে করেন। তিনি ৩৯ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক হন। তাঁর মৃত্যুকালে (ফেব্রুয়ারি ১১৪২ -৫৩৬ হিজরি) তাঁর তিন কন্যা ও চৌদ্দ পুত্র বেঁচে ছিলেন। এঁদের রচনাবলীর মধ্যে রিসালা এ সমরকান্দি, বাহারুল হকিকত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, ষাট হাজার লোক তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবরের মা হামিদাবানু বেগমও এই বংশের সন্তান ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৭; উইল এবং কীন, দি ওরিয়েন্টাল বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারি পৃ.২৭)।
ইরান ও তার নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তাইমুর স্বয়ং তার মাজার শরিফ জিয়ারত করেছিলেন। হুমায়ূনের সাধক জিন্দাপীরের সমাধি দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের নবম অধ্যায় দেখুন।

৩. বাবুরনামা তথা গুলবদন বেগমের হুমায়ূননামা থেকে আমরা বাবুরের নয় পত্নীর নাম জানতে পারি :

১. **আয়েশা সুলতানা বেগম**—ইনি বাবুরের চাচা সুলতান আহমদ মির্জার কন্যা ছিলেন। বাবুরের পাঁচ বছর বয়সে এঁর সাথে বাগদান সম্পন্ন হয় কিন্তু ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে খোজন্দে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন কিন্তু একমাসের সময়ে সে মারা যায়। (গুলবদন, হুমায়ূননামা বেভারিজ, টিপ্পনী পৃ. ২০৯-১০)।

২. **জয়নব সুলতান বেগম**—ইনি সুলতান মাহমুদ মির্জার কন্যা ছিলেন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে এঁর বিয়ে হয়। দুর্ভাগ্যবশত দু'বছর পরেই এঁর মৃত্যু হয়ে যায়। (বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ.৪৮)।

৩. **মাসুমা সুলতানা বেগম**—ইনি সুলতান আহমদ মির্জার কন্যা ছিলেন। এঁর মায়ের নাম ছিল হাবিবা সুলতান বেগম আর্গুন। ইনি বাবুরের প্রথম পত্নী আয়েশা সুলতানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় ধুমধামের সাথে হুমায়ূনের জন্মোৎসব পালন করা হল। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "তার (হুমায়ূন) পাঁচ ছ'দিন বয়স হলে আমি চারবাগ

সৎবোন ছিলেন। এ ছিল একটি প্রেম-বিবাহ, যা ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল। দু'বছর পরে পুত্র -জন্মের সময়ে এর মৃত্যু হয়ে যায়। তাঁর নামেই কন্যার নাম রাখা হয় (মাসুমা সুলতানা বেগম)। (গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ.৯০ ও ২৬৩) পরে এই কন্যার বিয়ে হয় মুহম্মদ জামান মির্জার সাথে।

৪. **মাহম বেগম**—এর উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। মাহম বেগম পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন—বারবুল মির্জা, মিহির জাহাঁ, এশান দৌলত বেগম, ফারুক মির্জা ও হুমায়ূন মির্জা। প্রথম চার সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন।

৫. **গুলরুখ বেগম**—এর বংশ পরিচয় আমাদের জানা নেই। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের সাথে এঁর বিয়ে হয়। এঁর পাঁচ পুত্র-সন্তানের মধ্যে দু'জন কামরান ও আসকারি হুমায়ূনের রাজত্বকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ বনে যান (বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ২৭৪.৩৮৮ ; তারিখে রশীদী, পৃ. ১৮৩, ২৪৮, ২৬৪.২৬৫, ২৮০, ৩০৮, ৩২৬ ; গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ .২৩৩.২৩৪)।

৬. **দিলদার আগাচাহ**—ইনি বাবুরের দ্বিতীয় পত্নী জয়নব বেগমের বোন ছিলেন। এঁর সাথে বাবুরের বিয়ে সম্ভবত ১৫০৯ অথবা এর কিছু পরে হয়েছিল। এঁর পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। গুলরুখ, গুলরংগ, গুলচেহরা, হিন্দাল, গুলবদন ও আলওয়ার। এঁদের মধ্যে, দু'জন—হিন্দোল মির্জা (১৫১৮-৫১ খ্রি.) ও গুলবদন বেগম ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। (গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ.২২৫-২২৬ ; জওহর স্টুয়ার্ট পৃ.৩০-৩১ ; আর্সকিন; ২, পৃ.১৬৪,২২০,৩০২)।

৭. **মুবারিকা বিবি**—ইনি শাহ মনসুর ইউসুফ জাইয়ের কন্যা ছিলেন। বাবুর কেহরাসে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি এঁকে বিয়ে করেন। এ বিয়ে ইউসুফ জাইকে আপন পক্ষে টানার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। এঁর কোনো সন্তান ছিল না। সম্ভবত, বাবুরের উপপত্নীরা এঁকে এমন কোনো ঔষধ খাইয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে এঁর কোনো সন্তান জন্মায় নি। (গুলবদন, হুমায়ূননামা বেভারিজ, পৃ. ৯১-৯২,২৬৬ ; আকবরনামা, অনু. ১ পৃ. ৩১৫ ; এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ, এপ্রিল ১৯০১ এইচ.বেভারিজ, অ্যান আফগান লিজেন্ড— (তারীখে রহমতখানীর অনুবাদ)।

৮. **গুলনার আগাচাহ ও ৯. নারগুল আগাচাহ**—সম্ভবত, এঁরা দাসী ছিলেন, শাহ তাহমাস্প যাদের বাবুরকে উপহার স্বরূপ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঠিয়েছিলেন। প্রথম দিকে এঁরা দাসী ছিলেন কিন্তু পরে এঁরা রাজভবনের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। গুলবদন বেগম তাঁর স্মৃতিকথায় বেশ কয়েকটি স্থানে উৎসবাদি এবং পারিবারিক পরামর্শ সভায় এঁদের অংশগ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। গুলনার হিন্দালের বিবাহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং গুলবদন বেগমের সাথে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ-এ গিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম দিকে বাবুর এ দু'জনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। (গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ২৩২, আকবরনামা, অ. অনু ৩, পৃ-১৪৫)।

এই নয় পত্নী ছাড়াও 'তারীখে শাহরুখ'-এর লেখক নিয়াজ মুহম্মদ খুকন্ডি সায়ীদা আফাক নামক এক দসম পত্নীর নামও উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত, বাবুরের আরো কয়েকজন পত্নী ও দাসী ছিলেন।

গুলবদন বাবুরের ১৯ সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ১৮ জনের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। হুমায়ূনের কেবল তিন সৎ-ভাই ও চার সৎ-বোন জীবিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌছালাম, সেখানে তার জন্মোৎসব পালন করা হল। সকলেই ছোট বড় তহবিল উপহার দিল ; রৌপ্য-মুদ্রার এতটা স্তূপ জমে উঠল যে, এমন স্তূপ আর কখনো দেখা যায় নি। এ ছিল অত্যন্ত সুন্দর একটি উৎসব।"[১]

বাবুর 'পাদশাহ'

হুমায়ূনের জন্মের সময়ে বাবুরের বয়স ছিল ২৬ বছরের মতো। তাঁর প্রারম্ভিক জীবন অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। কাবুল অধিকার করার পর তাঁর অনাশ্রিত জীবনের অবসান হয়েছিল এবং তিনি স্থিতিশীল জীবনের কথা অনুভব করছিলেন। হুমায়ূনের জন্মের কিছুদিন পূর্বেই তিনি দু'বার ভারতের পশ্চিম-উত্তর সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর জীবন এক নতুন দিগন্তের প্রতি অগ্রসর হয়েছিল।

এতকাল পর্যন্ত বাবুরের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের নামের সাথে 'মির্জা' লিখে এসেছিলেন। হুমায়ূনের জন্মবর্ষে তিনি 'পাদশাহ' উপাধি ধারণ করলেন। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "সে সময়ে তাইমুরের উত্তরাধিকারীদের, তা তাঁরা রাজত্ব করুন আর না-ই করুন, লোকে মির্জা বলত, কিন্তু এবার আমি আদেশ দিলাম যে, লোকে আমাকে 'পাদশাহ' বলে অভিহিত করুক।"[২]

হুমায়ূনের জন্ম ও বাবুরের 'পাদশাহ' উপাধি ধারণের ঘটনা একই বছরে কয়েক দিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এ দুই ঘটনার মধ্যে কী কোন সম্পর্ক আছে? বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগম হুমায়ূনের জন্মের কথা উল্লেখ করার পরই প্রথম লিখছেন : "ঐ বছরেই হযরত ফিরদাউস মকানী (বাবুর) তাঁর আমীর উমরাহ ও অন্য সমস্ত লোককে আদেশ দিলেন যে, এবার থেকে তাঁকে যেন 'পাদশাহ' বলে অভিহিত করা হয়। অন্যথায় হুমায়ূন বাদশাহর জন্মের আগে তাঁকে মির্জা বাবুর বলেই অভিহিত করা হত। হুমায়ূন বাদশাহের জন্মের বছরে তিনি নিজেকে পাদশাহ বলে অভিহিত করেন।"[৩] এই বর্ণনার ভিত্তিতে ড. ব্যানার্জি লিখেছেন : "হুমায়ূনের জন্মোপলক্ষে পালিত উৎসবের সময়ে বাবুর মির্জার স্থানে বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন।"[৪] এর

---

১. বাবুরনামা বেভারিজ. পৃ, ৩৪৪।

২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৪৪।

৩. গুলবদন বেগম হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ৯০ ; ফারসি পৃ. ৯ গুলবদনের ভাষা এই রকম : ওয়া দরহমাঁ সাল হযরতে ফিরদাউস মকানী খুদা মা ফরমুদন্দ বা উমরা ওয়া সায়রুন্নাস কি মরা বাবুর বাদশাহ গোয়েদ। ওয়া ইল্লা আওয়ায়েল কবল আজ তাওয়াল্লুদে হযরত হুমায়ূন বাদশাহ মির্জা বাবুর মৌসূম ওয়া ময়সুম বূদন্দ বন্ধি হমা বাদশাহ জাহাদারা বা মির্জা মী গুফতন্দ ওয়া দর সালে তাওয়াল্লুদে এশাঁ খুদা রা বাবুর বাদশাহ গোয়ানীদন্দ।

৪. ব্যানার্জি (হুমায়ূন ১. পৃ. ২) লিখেছেন, "The occasion was marked by rejoicing admidst which he assumed the higher title of Padshah in preference to that of Mirza so long used by him."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীতে মিসেস বেভারিজ এ দুই ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করেন না।[১] তিনি বাবুরের আত্মকথার ওপর ভিত্তি করেই আপন মত ব্যক্ত করেছেন। দুই মতের মধ্যে মিসেস বেভারিজের মতই সঠিক বলে প্রতীত হয়। কেননা, বাবুর তাঁর আত্মকথায় প্রথমেই 'পাদশাহ' উপাধি ধারণ করার কথা বর্ণনা করেছেন এবং তার পরে তিনি লিখেছেন, ঐ বছরের শেষে হুমায়ূনের জন্ম হয়।[২] এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূনের জন্মের পূর্বেই বাবুর পাদশাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন। বাবুর ও গুলবদন বেগমের বর্ণনার মধ্যে বাবুর নিশ্চিত রূপেই অধিকতর বিশ্বস্ত। গুলবদন বেগম সে সময়ে জন্মগ্রহণই করেন নি। এর অতিরিক্ত অন্য কোনো সমকালীন ঐতিহাসিকের রচনায় ড. ব্যানার্জির মতের সমর্থন মেলে না।

বাবুরের 'পাদশাহ' উপাধি ধারণের বিশেষ কিছু কারণ ছিল। তাইমুরের বংশধরদের মধ্যে সে সময়ে বাবুর ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। খাকানরা মোগল বাদশাহ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। বুগরা খাঁকে ইতিহাসে বাদশাহ গাজী বলে অভিহিত করা হত। খাকানদের এই উপাধি ধারণ করে বাবুর নিজেকে চুগতাই, মির্জা ও মোগলদের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি বলে ঘোষণা করতে চাচ্ছিলেন। এইভাবে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাবুর এ উপাধি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণ করেছিলেন, তা পুত্র-জন্মের কারণে আনন্দ প্রকাশের নিমিত্তে ছিল না।

পুত্র-জন্মের কারণে বাবুর অবশ্যই সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তা আনন্দোৎসবের বিষয় অবশ্যই ছিল, তবে একথা বলা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় যে, পুত্র-জন্ম "বাবুরের বংশ ও তাঁর শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে নিরন্তরতা প্রদান করেছিল।"[৩] সে সময়ে বাবুরের বয়স বেশি ছিল না। তাঁর সন্তান জন্মের ধারাও অব্যাহত ছিল। যদিও তারা জীবিত ছিল না। সে জন্য পুত্র-সন্তান না জন্মানোর দুঃখও তাঁর ছিল না। এই নবজাত শিশুটি বেঁচে থাকবে কিনা—সন্দেহ শুধু এতটুকুই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে পুত্র-জন্ম থেকে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকার দুশ্চিন্তা নিশ্চয় থাকতে পারে না। মোগল শাসন তখন সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে নি যে, যার ফলে নতুন শিশু জন্ম থেকে সে ধারা অব্যাহত রাখার আশা জন্মাবে। উপরোক্ত উক্তির প্রথমাংশে কিছুটা সততা থাকতে পারে, কিন্তু অন্য অংশটিতে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

হুমায়ূনের বাল্যকাল

হুমায়ূনের জন্ম তথা বাল্যকালে মধ্য এশিয়া এক যুগান্তকারী অবস্থা অতিক্রম করছিল। ঐ বছরই বাবুরের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে কাবুলের ভূতপূর্ব

১. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৪৪, ফু. নো. ২।
২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৪৪।
৩. ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ২ "The birth of a son ensured the continuity of his line and the principles of his Grovernment."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসকের পুত্র আবদুর রাজ্জাককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র রচনা করা হল। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কাবুলে ফিরে আসার পর বাবুর এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন কিন্তু সে দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন না। একদিন তিনি চারবাগে বসেছিলেন। সেই সময়ে অকস্মাৎ প্রায় তিন হাজার সৈনিক যাদের মধ্যে ভাড়াটে মোগল সৈনিকও ছিল, তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। সে সময়ে বাবুরের কাছে মাত্র পাঁচ শ' বিশ্বস্ত সৈনিক ছিল। আক্রমণ এমনই অকস্মাৎ ছিল যে, হয় তিনি নিহত হতেন নতুবা বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হতেন। বাবুর প্রথমে পালাতে চাইলেন কিন্তু তার পরপরই মনকে সুদৃঢ় করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হল এবং আবদুর রাজ্জাককে বন্দি করা হল। বাবুর চাইলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন কিন্তু অনুগ্রহ করে তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। আবদুর রাজ্জাক কিছুদিন পরে পুনরায় বিদ্রোহ করলেন, কিন্তু এবার তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল।[১]

মধ্য এশিয়ায় শায়বানী খাঁ তাইমুর ও চেঙ্গিজের বংশধরদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্যগুলি অধিকার করে নিয়েছিলেন। শক্তিমদমত্ত শায়বানী ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে এবার ইরানের শাহের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অবতীর্ণ হলেন। উজবেক ও ইরানীদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারওয়ার যুদ্ধে শায়বানী খাঁ নিহত হলেন এবং তাঁর বিশাল বাহিনী শোচনীয় রূপে পরাজিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।[২] শায়বানী খাঁর পতনের সাথে সাথেই মধ্য এশিয়ায় ব্যাপক অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ল। তাইমুর বংশীয়রা তাদের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হলেন। বাবুরেরও ডাক এল। তিনি তাঁর ভাই মির্জা নাসিরের হাতে কাবুলের শাসনভার তুলে দিয়ে তাঁর দুই পুত্র (হুমায়ূন ও কামরান)-কে সাথে নিয়ে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে কুন্দুজ গিয়ে পৌছালেন। এখানেই শাহ ইসমাইল, তাঁর বিধবা বোন খানজাদা বেগমকে, শায়বানী খাঁর সাথে যাঁর বিয়ে হয়েছিল, পাঠিয়ে দিলেন। শাহ বাবুরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যদি শিয়া মত গ্রহণ ও প্রচারে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে তিনি সমরখন্দ প্রত্যর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন। বাবুর তা মেনে নিলেন এবং সমরখন্দের ওপর তাঁর তৃতীয় ও শেষবারের মতো অধিকার কায়েম হল[৩] কিন্তু তিনি অধিককাল পর্যন্ত তা অধিকার করে রাখতে পারলেন না। আট মাস পরেই ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি উবাইদুল্লাহ খাঁ উজবেক কর্তৃক গজ্‌দওয়ানের যুদ্ধে

---

১. তারীখে রশীদী, এলিয়াস ও রাস, পৃ. ২০৪ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ২৯-৩০ ; রুশব্রুক উইলিয়ামস, অ্যান এমপায়ার বিলডার অব সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি, পৃ. ৯৬-৯৭।

২. তারীখে রশীদী এ. ও রা. পু. ২৩৭; আর্সকিন, ১. পৃ. ২৯৮-৩০০ ; আহসানাত তাওয়ারীখ। সং. সেডন পৃ. ৫৭ ও ১১৯ ; উইলিয়ামস পৃ. ৯৭-১০১।

৩. উইলিয়ামস, পৃ. ১০১-১০৩ ; রজব ৯১৭ হিজরি, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৫১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত হলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে কিছুদিন হিসার ও কুন্দুজে কাটানোর পর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে বাবুরকে পুনরায় কাবুলে ফিরে আসতে হল।[১] এই সময়কালের মধ্যে হুমায়ূন কোথায় ছিলেন তা নিশ্চিতরূপে বলা বেশ কঠিন ব্যাপার। সম্ভবত, নিরাপত্তার জন্য কামরানের সাথে তাঁকে কাবুলে পাঠানো হয়েছিল।[২]

শিক্ষা

হুমায়ূনের প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি স্বয়ং কোনো আত্মকথা লেখেন নি এবং তাঁর পিতার আত্মজীবনীতেও এ বিষয়ে উল্লেখ নেই। সমকালীন ঐতিহাসিকরাও নীরব। এ কারণে তাঁর শিক্ষা কবে আরম্ভ হয়েছিল[৩] এবং তার উন্নতিও কেমন ছিল ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানা যায় না। আমরা তাঁর দুই শিক্ষক—মওলানা মসীহুদ্দীন রুহুল্লাহ[৪] এবং মাওলানা ইলিয়াসের[৫] উল্লেখমাত্র পাই। হুমায়ূন বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষার কবি ও জ্যোতিষ তথা নক্ষত্রশাস্ত্রবিশারদ ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেজন্য আমরা অনুমান করতে পারি যে, তিনি প্রারম্ভিক শিক্ষা উত্তম-রূপে লাভ করেছিলেন।

বাবুরের আত্মজীবনীতেও এরকম তিনটি কথা উল্লেখ আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাবুর হুমায়ূনের শিক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মিলাওয়াত অধিকার করে তাঁর বিশাল পুস্তকালয়টি অধিকার করে নেন। ঐ পুস্তকালয়ের কিছু পুস্তক তিনি হুমায়ূনকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেন।[৬] ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বাবুর হুমায়ূনকে নিজের কিছু রচনা

---

১. আহসানাত তাওয়ারীখ ১. পৃ. ১২৭-১৩৬; তারীখে রশীদী, এ. এবং রা. পৃ. ২৪৬-৪৭ এবং ২৬০-৬৮, উইলিয়ামস, পৃ. ১০৩-১০৯।

২. ঈশ্বরীপ্রসাদ, লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব হুমায়ূন,পৃ. ৪।

৩. লা, প্রমোশন অব লার্নিং ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং মহমেডান রুল, পৃ. ১২৮। চার বছর চার মাস বয়সে হুমায়ূনের শিক্ষার হাতেখড়ি হয় এবং তাঁকে শিক্ষকের কাছে অর্পণ করা হয়।

৪. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, ড. বেণী প্রসাদ (অন. অনু.) পৃ. ২৪ ; আবুল ফজল এর নাম কেবল রুহুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন, আকবরনামা ১, পৃ. ৩৫৭।

৫. গনী, এ হিস্ট্রি অব এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচর অ্যাট দি মোগল কোর্ট, ২. পৃ. ৫৩।

৬. সাত ও আট জানুয়ারি ১৫২৬ সালে বাবুর লিখেছেন : "ঐ টিলার উপর দু' রাত কাটানোর পর আমি দুর্গ নিরীক্ষণ করলাম। আমি গাজী খাঁর পুস্তকালয়ে প্রবেশ করলাম। সেখানে অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পেলাম। তার মধ্যেকার কিছু গ্রন্থ আমি হুমায়ূন ও কামরানকে পাঠিয়ে দিলাম। সেগুলির মধ্যেকার কিছু ছিল অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়ের ওপরে লেখা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ, কিন্তু তেমন গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, যেমনটি প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। আমি ঐ রাতটি কেল্লায় কাটিয়েছিলাম। পরদিন সকালেই আমি আমার শিবিরে চলে আসি।" বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠিয়ে দেন।[১] ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুমায়ূন বাবুরকে একটি পত্র লেখেন, তার উত্তরে বাবুর হুমায়ূনের পত্রের আলোচনা করেন এবং তাঁকে শুদ্ধভাবে লেখার পরামর্শ দেন।[২]

শাসন তথা সামরিক শিক্ষা

বাবুর হুমায়ূনকে সেনা প্রশিক্ষণ ও তার সাথে সম্পর্কিত শারীরিক কসরত ও শক্তি সঞ্চয়েও অভিজ্ঞ করে তোলার প্রয়াস চালান। বাবুরের জীবন এমনই ছিল যে, তাঁকে নিরন্তর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যুদ্ধ পরিচালনা, শাসনকার্য তথা শিকার কার্যে যাওয়া আসা করতে হত। হুমায়ূনও তাঁর সাথে যেতেন। সেখানে তিনি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার ও পরিচালনা কার্যে শিক্ষা লাভ করতেন। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ নবেম্বরে বিদ্রোহ দমনের পরে ভ্রমণের সময়ে হুমায়ূন এক হাঁসপাখিকে লক্ষ্য করে অব্যর্থ নিশানা ভেদ করেন।[৩]

কয়েক মাস পরে ১২ বছর বয়সে, আমরা এমন একটি উদাহরণ পাই, যা থেকে হুমায়ূনের পিতা থেকে পৃথক হয়ে আলস্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনের ইচ্ছার কথা জানা যায়। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি 'লামগান' যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবুর লিখেছেন : "সোমবার আমরা লামগান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমার আশা ছিল যে, হুমায়ূন আমাদের সাথে যাবে কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, সে বিশ্রাম চায় তখন কুরা দররা থেকে তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়া হল।"[৪]

মধ্যযুগে বাল্য-বয়সেই রাজকুমারদের শাসন-সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হত। হুমায়ূনকেও এই ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের চাচা সুলতান মাহমুদ মির্জার পুত্র মির্জা খাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। তাঁর পুত্র সুলেমান নাবালক ছিলেন। মির্জা খাঁ বদাখশানের শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রকে কাবুলে নিয়ে আসা হল এবং বাবুরের পুত্রদের সাথে তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হল। বাদাখশানের অধিবাসীরা সুলেমানের অপ্রাপ্তবয়স্কতার কালে বাবুরকে সেখানকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রার্থনা জানাল। এর পরিণাম স্বরূপ,

---

১. "মুল্লা বেহেশতির মাধ্যমে হিন্দালকে একটি জড়োয়া পেটির সাথে লাগানো কটার, একটি সোনার কলমদান, মোতির কাজ করা একটি চৌকি, একটি জোব্বা, একটি পেটি এবং বাবরি লিপিতে লেখা বিভিন্ন পত্র এবং বাবরি লিপিতে লেখা কবিতা পাঠাই। হিন্দুস্তানে আমি যে অনুবাদ ও যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছিলাম সেগুলি আমি হুমায়ূনের কাছে পাঠাই। হিন্দাল এবং খাজা কলাঁকেও কিছু অনুবাদ এবং কবিতা পাঠানো হয়। কামরানের কাছেও বাবরি লিপিতে লেখা কিছু নমুনা মির্জা বেগ তাবাইয়ের মাধ্যমে পাঠানো হয়।" বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৪২।

২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৪২-২৮। এ পত্র পরবর্তীতে টিপ্পনী স. ৬৯ এ উদ্ধৃত হয়েছে।

৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪১৭।

৪. ঐ, পৃ. ৪২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুর হুমায়ূনকে বাদাখশানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।[১] মাতা ও পিতা হুমায়ূনকে নতুন পদে আসীন করার জন্য তাঁকে সাথে নিয়ে বাদাখশনে চলে গেলেন এবং তাঁকে সেখানকার শাসনভার অর্পণ করে কাবুলে ফিরে এলেন।[২]

১৫২৩ থেকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হুমায়ূন প্রশাসক পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ভারত আক্রমণের সময়ে (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৫২৫) তিনি ভারতে এলেন। খানুয়া (কানওয়া)-র যুদ্ধের পর পুনরায় তাঁকে বাদাখশান পাঠান হল (১৫২৭)। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে এলেন। প্রকৃতপক্ষে বাদাখশানের শাসনকার্য তাঁর পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধিদের হাতে ছিল। উজবেকরা বাদাখশানে বারবারই কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। বাবুর বাদাখশানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এজন্য তিনি তার ওপর সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এইভাবে হুমায়ূন বাদাখশানের শাসনকাজে বরাবরই বাবুরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করতে লাগলেন।[৩]

ভারত আক্রমণ

বাবুর ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। চতুর্থ আক্রমণের পর তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আত্মনির্ভরশীল হয়েই আক্রমণ করতে হবে। তিনি সেনা সংগঠন করে হুমায়ূনকেও ডেকেছিলেন। ভারত অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে তিনি বাদাখশানের শাসন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করলেন। তিনি হুমায়ূনকে এই বলে

---

১. মিসেস বেভারিজ গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামার ইংরেজি অনুবাদে (পৃ. ৯২-৯৩) এ মত প্রকাশ করেন যে "হুমায়ূনকে নিযুক্ত করতে সংকোচের প্রধান কারণ ছিল তাঁর অল্প বয়স। মিসেস বেভারিজের এ মত সত্য বলে প্রমাণ হয় না, কেননা, মধ্যযুগে হুমায়ূনের চেয়েও কম বয়সী রাজপুত্রকে শাসনকাজে নিয়োজিত করা হত। হিন্দাল ১১ বা ১২ বছর বয়সে বাদাখশানের এবং কামরান ১৫ বছর বয়সে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে হুমায়ূনের বয়স ছিল প্রায় ১৩ বছর। বাবুরের দ্বিধা-সংকোচের কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, বাদাখশানের ওপর সুলতানের দাবি হুমায়ূনের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু বাদাখশান থেকে এক নিমন্ত্রণপত্র আসে, যাতে লেখা ছিল : মির্জা খাঁ মৃত্যুবরণ করেছেন। মির্জা সুলেমান এখনও বালক। উজবেকরা নিকটেই। সুতরাং চিন্তা করুন যাতে বাদাখশান কখনোই শত্রুদের হাতে চলে না যায়।" (হুমায়ুননামা, গুলবদন, বেভারিজ, পৃ. ৯২) এই পত্র পাওয়ার পরই বাবুর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে হুমায়ূনকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

২. মাহমের সাথে সাথে বাবুরের বাদাখশান যাত্রা শুধুমাত্র পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত ছিল না। বাবুর সেখানে পৌছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা করতেও তাঁর সুবিধা হল। বাবুরের উপস্থিতির প্রভাব সেখানকার অধিবাসীদের ওপর পড়াও স্বাভাবিক ছিল। হুমায়ূনের কাছে তাঁর অধিকারে একটি বাহিনীও রাখা হল, যাতে বৈরাম খাঁও ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের অভিভাবক ও প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

৩. হুমায়ূনের বাদাখশান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমাদের কাছে নেই। নিশ্চিতভাবে কেবল এতটাই বলা যায় যে, এই সময়কালে সেখানে শান্তি বিরাজিত ছিল এবং বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তখন সংঘটিত হয় নি। (ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন.পৃ.৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশ পাঠালেন যে, তিনি যেন একটি বাহিনী নিয়ে নির্ধারিত সময়ে তাঁর সাহায্যের জন্য বাগেওয়াফায় এসে পৌছান। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, তিনি হুমায়ূনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন, কেননা তিনি খুবই ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর বাবুর কাবুল থেকে প্রস্থান করলেন। তাঁর আশা ছিল যে, হুমায়ূন সঠিক সময়ে অবশ্যই এখানে পৌছাবেন,কিন্তু তিনি সেদিন এসে পৌছালেন না। ফলে, বাবুরকেও অপেক্ষা করতে হল। হুমায়ূন যখন বাবুরের কাছে এসে মিলিত হলেন তখন বাবুর তাঁর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং এই অলসতার জন্য তাঁকে খুব ভর্ৎসনা করলেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "শনিবার (২৫ নভেম্বর ১৫২৫) আমরা বাগেওয়াফায় শিবির স্থাপন করলাম। কিছুদিন যাবত আমরা হুমায়ূন ও তার সৈন্যদের প্রতীক্ষায় বাগেওয়াফায় অবস্থান করলাম।... হুমায়ূন তাঁর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসে না পৌছানোয় আমি ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর ভাষায় একখানি পত্র লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রবিবার ১৭ সফর (৩ ডিসেম্বর) সকালে হুমায়ূন এসে পৌছাল। তার এই বিলম্বের কারণে আমি তাকে খুবই ভর্ৎসনা করলাম।"[১]

বাবুরের আদেশমতো হুমায়ূন সময়মতো কেন এসে পৌছান নি ? এই বিলম্বের কারণ হিসেবে কিছু পণ্ডিত তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। এর বিপরীতে কেউ কেউ তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন। হুমায়ূনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, সময় খুব কম ছিল। তাঁর কাছে বাবুরের আদেশ পৌছেছিল জিলহিজ্জা মাসে আর তাঁর পৌছানোর কথা ছিল মুহররম মাসে। সর্বসাকুল্যে তাঁর হাতে সময় ছিল মাত্র এক মাস। এই সময়ের মধ্যে সেনা সংগঠিত করে সেই স্থানে সময়মতো পৌছানো সম্ভব ছিল না। সেনা সংগঠনে অনেক সময় লাগে, আর বাবুর যদিও মুহররম মাসে বাগেওয়াফায় পৌছানোর আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ৯ সফর (২৫ নভেম্বর) তারিখে সেখানে পৌছাতে পেরেছিলেন, আর হুমায়ূন ৩ ডিসেম্বরে। এইভাবে বাবুর হুমায়ূনের পৌছানোর মাত্র এক সপ্তাহ আগে পৌছাতে পেরেছিলেন। তাঁর (হুমায়ূনের) বাদাখশানের সৈনিকদের এই অভিযান প্রস্তুত করতে এবং তাদের বোঝাতে সেখানে সময় লেগে থাকবে, কেননা, ঐ সমস্ত লোকেরা অনিশ্চিত ও অজানা কোনো স্থানে দীর্ঘসময়ের জন্য যেতে প্রস্তুত ছিল না।"[২]

১. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৪৭

২. বাবুরের বাগেওয়াফা থেকে প্রস্থান করতে এক মাস বিলম্ব করতে হয়। কিছু হস্তলিখিত গ্রন্থে হুমায়ূনের একটি টিপ্পনী পাওয়া যায় : "আমাদের প্রস্থানের দিন নির্ধারিত হয়েছিল আশুরা (১০ মুহররম)-র পরে। আমরা ১০ সফরে পৌছাই। বিলম্ব করাটা আবশ্যক ছিল। বাবুরের মারফত খবর পাওয়ার জন্য। উত্তরে নিবেদন করা হল যে, বাদাখশানে সৈন্য সংগঠনে বিলম্ব হয়েছে। যদি এ দাস তাঁর পিতার অনুগ্রহের ওপর ভরসা করে আরো বেশি বিলম্ব করতেন তাহলে দাসের পিতা খুব দুঃখ পেতেন।" বাবুরনামা, বেভারিজ, ৩৪৭, টিপ্পনী ৩।

ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "সম্ভবত এই অভিযান হুমায়ূনের মনমতো ছিল না। বাবুরের এই অভিযানের এই সাফল্যের আশাও ছিল না। অথবা স্বাধীনভাবে দেশ চালানোর পর এমন ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করার রুচি ও মানসিকতা তাঁর ছিল না বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। যখন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গ্রহণের আনন্দ লাভ সত্ত্বেও অবচেতন মনে তিনি বালকই ছিলেন।[১]

যদি হুমায়ূনের পরবর্তীকালের চরিত্রের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আগে থেকেই তাঁর মধ্যে আংশিকরূপে অলসতা ও দায়িত্বহীনতার আভাস ছিল। কিছুদিন পরেই তিনি আগ্রার রাজকোষ লুট করেন এবং পরবর্তীকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবসরে (যেমন বাংলা ও গুজরাত অভিযানকালে) তাঁর আলস্যদোষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে যদি সময় কম থেকে থাকত অথবা সৈন্য সংগঠনে ও তাদের যোগাযোগের কারণে সময় লেগে যেত তাহলে তিনি তাঁর উত্তরে বাবুরের কাছে নিজের সাফাই গাইতে পারতেন আর বাবুর তাঁর আত্মকথায় সে কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। বাবুর হুমায়ূনের পৌছানোর মাত্র এক সপ্তাহ আগে কেন পৌছাতে পেরেছিলেন, এর উত্তরে স্পষ্টভাষায় একথা বলা যায় যে, হুমায়ূনের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর সঠিক ধারণা ছিল। এজন্য তিনিও ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যাতে হুমায়ূনের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়ে যায়।

ভারত আক্রমণে হুমায়ূনেরও বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি হিসার ফিরোজার শিকদার হামিদ খাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানলেন। হুমায়ূনের সাহায্যের জন্য খ্বাজা কলাঁ, হিন্দু বেগ, সুলতান মুহম্মদ প্রমুখ উমরাও উপস্থিত ছিলেন। হুমায়ূনের বাহিনী দেখে আফগানরা পালিয়ে গেল। সৈন্যরা হিসার ফিরোজা অধিকার করে নিল।[২] হুমায়ূন প্রায় একশ' যুদ্ধবন্দি ও সাত-আটটি হাতি লাভ করলেন। উপহার নিয়ে তিনি বাবুরের সামনে উপস্থিত হলেন। বাবুরের আদেশে সমস্ত যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করা হল। এর ফলে লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বাবুর হুমায়ূনের এই জয়লাভে খুবই খুশি হলেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "এটি ছিল হুমায়ূনের প্রথম যুদ্ধাভিযান। ভবিষ্যতের সাফল্যের ছিল শুভ সূচনা।"[৩] প্রসন্ন হয়ে বাবুর হুমায়ূনকে এক কোটি টাকা[৪] ও হিসার ফিরোজার জায়গীর পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করলেন যার বার্ষিক আমদানি ছিল এক কোটি।[৫]

AMARBOI.COM

---

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১০।

২. হুমায়ূনের সাথে প্রেরিত এই আমির ছিলেন বাবুরের প্রধান অমাত্যদের অন্যতম। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূনের এ নেতৃত্ব ছিল কেবল নামমাত্র। ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ১৪।

৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৬৬।

৪. এ টাকা রুপোর না তামার ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়। আর্সকিনের মতে, তার মূল্য ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সমান। আর্সকিন, পৃ. ৩৪৫।

৫. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে বাবুরের সৈন্যদল শাহাবাদে পৌঁছাল। এখানে হুমায়ূন প্রথম বার অস্ত্র দিয়ে দাড়ি বানালেন। চুগতাই তুর্কি সমাজে এ আসরটি খুবই ধুমধামের সাথে পালন করা হত। কিন্তু এ সময়ে যুদ্ধের সময়কালে তা সম্ভব ছিল না। এ কারণে ঐ উৎসব খুব সাধারণভাবে পালন করা হল। ঐ সময়েই আফগানদের পানিপথের প্রান্তরে অগ্রসর হওয়ার খবর পাওয়া গেল।

পানিপথের যুদ্ধে

পানিপথের যুদ্ধে হুমায়ূন অভ্যন্তরীণ ব্যূহের ডান দিকের (Right inner wing) সেনাপতি ছিলেন। তাঁর সাথে খ্বাজা কলাঁ ও হিন্দু বেগের মতো অভিজ্ঞ সেনাপতিরাও ছিলেন। যুদ্ধে প্রথম আক্রমণ এই ব্যূহের (wing) ওপরেই হল, এতে হুমায়ূন অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিলেন।[১] যুদ্ধের পরে বাবুরের তাঁর ওপর আরো বেশি দায়িত্ব অর্পণ করাটা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।[২]

আগ্রায়

পানিপথের যুদ্ধের পর হুমায়ূনকে ঐ দিন নিহত সুলতান ইব্রাহীম লোদীর রাজধানী ও তাঁর কোষাগার অধিকার করে নেয়ার জন্য আদেশ পাঠানো হল।[৩] আগ্রা দুর্গে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও বহু মূল্যবান রত্নাদি সংরক্ষিত ছিল। হুমায়ূন যে সময়ে সেখানে পৌঁছালেন, সে সময়ে আগ্রায় বহু সংখ্যক আফগান, ভারতীয় সৈনিক ও তাদের পরিবার-পরিজন কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এতে ইব্রাহীম লোদী ও গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমাদিত্যের[৪] পরিবারও ছিল। এখানে হুমায়ূনের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল তিনটি :

২. উইলিয়ামস, পৃ. ১৩১-১৩৭।

৩. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৬।

৪. বাবুরনামা, বেভারিজ, ৪৭৫।

৫. ড. ব্যানার্জি তাঁর বাদশাহ হুমায়ূন নামক গ্রন্থে লিখেছেন, হুমায়ূন গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমকে পরাজিত করলেন এবং রাজা রণাঙ্গনে মারা পড়লেন। ড. ব্যানার্জির এ অভিমত সত্য নয়। বাবুর তাঁর আত্মকথায় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ইব্রাহীমের পরাজয়ের সময়ে পানিপথের যুদ্ধে গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতও মারা গিয়েছিলেন এবং আগ্রায় বিক্রমজিতের সন্তান ও পরিবারের লোকজন ছিলে। তিনি পরে লিখেছেন-বিক্রমজিতের সন্তান এবং পরিজনেরা ইব্রাহীমের পরাজয়ের সময়ে আগ্রায় ছিলেন। হুমায়ূন আগ্রায় পৌঁছালে তাঁরা পালানোর চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু হুমায়ূন পথ রক্ষার জন্য বাহিনী নিযুক্ত করার কারণে তাদের পলায়ন সম্ভব হল না। হুমায়ূন স্বয়ং তাদের পালাতে দিলেন না। তাঁরা হুমায়ূনকে স্বেচ্ছায় প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন ও বহুমূল্য বস্তুসামগ্রী প্রদান করলেন যাতে সুপ্রসিদ্ধ হীরাটিও ছিল যা সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজি এনেছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই হীরাটির মূল্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষের আড়াই দিনে পানভোজনের খরচের সমান। এর ওজন ছিল প্রায় আট মিসকাল। বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৭৭ ; ফিরিশতা, ব্রিগস ২, পৃ. ৪৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. দুর্গে অবস্থানরত লোকদের বিশ্বাস সৃষ্টি করা, যাতে তারা তাদের ধন-সম্পদ বাইরে না পাঠায় এবং মোগলদের সহযোগিতা করে।

২. দুর্গে লুক্কায়িত আফগান আমীররা ধন-সম্পদ লুট করে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল, তাদের প্রতি সতর্ক সৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল।

৩. মোগল সৈন্যরাও বিজয়ের উল্লাসে সম্পদ লুট করতে চাচ্ছিল। এদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন ছিল।

হুমায়ূন আগ্রা অবরোধ করলেন। তিনি প্রত্যেকটি পথের মুখে সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন যাতে দুর্গ থেকে কেউ বেরিয়ে না যেতে পারে। এই নিরাপত্তা রক্ষীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাহারায় নিয়োজিত রইল। বিক্রমাদিত্যের পরিবার পরিজন আগ্রা থেকে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল। যে সময়ে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, সে সময়ে হুমায়ূনের পথ-রক্ষীরা তাদের আটক করল। হুমায়ূনের আদেশে তাদের লুট করা হল না। হুমায়ূনের সদ্ব্যবহারের কারণে বিমুগ্ধ ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে তারা তাঁকে খুশি করার জন্য প্রচুর পরিমাণ বহুমূল্য রত্ন উপহার দিল। এগুলোর মধ্যে কোহিনূরও ছিল।[১]

পানিপথের যুদ্ধের দু'সপ্তাহ পর ১০ মে বাবুর আগ্রায় সন্নিকটে এসে পৌঁছালেন। সেখানে হুমায়ূন তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কোহিনূর মণি অর্পণ করলেন, যা তিনি পালিশ করে আরো সুন্দর করে বানিয়ে নিয়েছিলেন। বাবুর সেটি হুমায়ূনকে ফিরিয়ে দিলেন। বাবুর তাঁর আত্মকথায় এই হীরে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন : "প্রসিদ্ধি আছে যে, এর মূল্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষের দু'দিন পানাহারের ব্যয়ের সমান। তা প্রায় আট মিসকাল ওজনের সমপরিমাণ ছিল।"[২]

বাবুর আগ্রার নিকট পৌঁছাতেই আগ্রায় দুর্গরক্ষক দুর্গ সমর্পণ করলেন। দু'দিন পর বাবুর দুর্গ অধিকার করে তাতে প্রবেশ করলেন। পরদিন ইব্রাহীম লোদীর রাজকোষ বণ্টন করা হল। পাঁচ সম্রাটের ধন বাবুরের হস্তগত হল, কিন্তু তিনি সবই বিতরণ করে দিলেন। এই বণ্টনকৃত সম্পদের বেশিটাই পেলেন হুমায়ূন। তাঁকে সত্তর লক্ষ (দাম) দেয়া হল। এর অতিরিক্ত আরো একটি রাজকোষ ধরে তাঁকে দেয়া হল। যার সহায় সম্পদের কোনো লেখা-জোখা ছিল না।[৩] এর দু' মাস পর (১২ জুলাই, ১৫২৬) ঈদ উৎসবের সময়ে হুমায়ূনকে একটি চারকব, এক পেটি তলোয়ার এবং সোনার জীন সমেত একটি তিপুচাক ঘোড়া প্রদান করা হল। এর অতিরিক্ত তাঁকে হিসার-ফিরোজা ও সম্ভলও জায়গির রূপে প্রদান করা হল।[৪] সিপাহি ও সেনাপতিদেরও বাবুর পুরস্কৃত করলেন। এই ঘটনার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল আর সিংহাসনারূঢ় হওয়ার পর হুমায়ূনকে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হল।

---

১ বাবুরনামা. বেভারিজ, পৃ. ৪৭৭।

২. বাবুরনামা ভারতীয় মাপের সাড়ে তিন তোলা।

৩. আগ্রা কোষের বিবরণ ও বাবুরের দানের জন্য দেখুন— বাবুরনামা, বেভারিজ পৃ. ৫২২-২৩, ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৪৮-৪৯।

৪. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বাঞ্চলে অভিযান

পানিপথের বিজয়ের পর আফগানরা বিহার ও বাংলা অভিমুখে চলে গিয়েছিল। জৌনপুরেও মোগলদের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রারম্ভে মোগলরা সুলতান মুহম্মদ নুহানীকে জৌনপুর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেটি অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তারা বেশিদিন যাবত নিজেদের অধিকারে রাখতে সমর্থ হল না। মুহম্মদ নুহানী জৌনপুর পুনরাধিকার করে মোগল গভর্নর ফিরোজ খাঁকে ওখান থেকে বহিষ্কার করলেন এবং নাসির খাঁ নুহানী ও মারুফ ফরমাউলির সৈন্যাপত্যে কনৌজ অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন।[১] অন্যদিকে রানা সাঙ্গা (সংগ্রাম সিংহ) ও বাবুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে দু'দিক থেকেই যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল।

যুদ্ধ সমিতির বৈঠক হল এবং সিদ্ধান্ত হল যে সর্বপ্রথমে আফগানদের পরাজিত করতে হবে, কেননা, তারাই সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। বাবুর স্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হুমায়ূন সব শেষে বললেন : "বাদশাহ স্বয়ং কেন যাবেন, এ কাজ আমি করব।"[২] তাঁর এ নিবেদন স্বীকার করা হল। তাঁকে সহায়তার জন্য সুলতান জুনায়েদ বরলাস, মেহেদি খ্বাজা প্রমুখ দলপতিকে সসৈন্যে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়া হল। এভাবে হুমায়ূন আফগানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলেন। এ ছিল তাঁর প্রথম নেতৃত্ব।

হুমায়ূন সৈন্য সুগঠিত করে আফগানদের প্রতি অগ্রসর হলেন। যারা কনৌজ ও জাজমউ অধিকার করে জাজমাউ[৩] এর নিকট চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। জলেসর[৪] নামক স্থানে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট মুহম্মদ সুলতান মির্জা ও মেহেদী খ্বাজা হুমায়ূনের সাথে মিলিত হলেন। এখান থেকে এঁরা শত্রুদের প্রতি অগ্রসর হলেন। মোগল বাহিনী পৌছানো মাত্রই আফগান বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেল এবং তারা রণে ভঙ্গ দিল। মরহুম সুলতান ইব্রাহীম লোদীর আমীর ফতেহ্ খাঁ ফরওয়ানী জাজমউ[৫] আত্মসমর্পণ করলেন। হুমায়ূন তাঁকে বাবুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওখান থেকে গঙ্গা নদী পেরিয়ে হুমায়ূন জৌনপুর আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিলেন।[৬] ওখান থেকে হুমায়ূন গাজীপুর অভিমুখে অগ্রসর হলেন, যেখানে আফগান সেনাপতি নাসির খা লোহানী শিবির

AMARBOI.COM

১. বাবুরনামা, পৃ. ৪৩০।
২. বাবুরনামা, পৃ. ৫৩১।
৩. কানপুরের নিকট, তার পূর্বে গঙ্গানদীর তটে।
৪. এটাওয়া জেলায়।
৫. রায়বেরিলী জেলার জাজমাউ একটি তহসিল। (ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার ২, পৃ. ১২৭, আর্সকিন ও মিসেস বেভারিজ (বাবুরনামা, পৃ. ৫৩৪, টিপ্পনী ২)-এর মতে বেরিলীর নিকট গঙ্গানদীর দক্ষিণ পূর্ব-তট।
৬. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৪৪, আকবরনামা, ১. পৃ. ১০৫, তাকাকাতে আকবরী পৃ. ৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। এখানেও আফগানরা যুদ্ধ না করে ঘাঘরা নদী পেরিয়ে পিছু হটে গেল। হুমায়ূন একটি দলকে তাদের ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সৈন্যদের একটি দল খরীফ[১] ও বিহার লুট করল।

হুমায়ূন জুনায়েদ বরলাস ও খ্বাজা শাহ মীর হুসেনকে জৌনপুরের সংযুক্ত শাসক নিযুক্ত করলেন এবং ফিরোজ সারঙ্গখানী, কাজী আবদুল জব্বার খাঁকে তাদের সহযোগিতার জন্য রেখে দিলেন।[২] এছাড়া শেখ বায়াজীদকে অবোধে নিযুক্ত করা হল। এ সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর হুমায়ূন দোয়াব অতিক্রম করে কালকী গিয়ে পৌঁছালেন। কালপী ছিল আলম খাঁর অধীন। এটিকে তাঁর অধীনস্ত করে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে ৬ জানুয়ারি হুমায়ূন আগ্রায় বাবুরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।[৩]

পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানে হুমায়ূন সাফল্য লাভ করেন। এই অঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাবুরকে বিশ্রাম দেন। যদিও আফগানদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে তিনি সফল হননি। তা সত্ত্বেও তাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়ে তাদের ঐ প্রদেশগুলো থেকে বিতাড়িত করেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল।[৪]

ঐ সময়ে রানা সাঙ্গা সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হুমায়ূনের বাহিনীতে বাদাখশানের লোক সংখ্যা ছিল বেশি। তারা সবাই দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। হুমায়ূনও ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, হুমায়ূন যুদ্ধে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বয়স খুব কম ছিল। তাঁর পূর্ণ শারীরিক সক্ষমতা ছিল না। ভারতের উষ্ণ জলবায়ু তার জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। তাছাড়া তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ ছিল বাদাখশানের লোক। এই সমস্ত কারণে হুমায়ূন অন্যান্য সৈনিকদের ন্যায় অনিচ্ছার সাথে রানা সাঙ্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।[৫] কারণ যাই হোক না কেন, এই সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিতে বিরক্ত হওয়াটা হুমায়ূনের চরিত্রের দুর্বলতারই দ্যোতক। তাঁর যোগ্যতার এও প্রমাণ ছিল যে, তিনি এই পরিস্থিতিতে নিজেও উৎসাহ প্রকাশ করতেন এবং অন্যদেরও যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতেন।

আগ্রায় কিছুদিন অবস্থানের পর হুমায়ূন বাবুরের সাথে যোগ দিয়ে রাণা সাঙ্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাবুর লিখেছেন, পথিমধ্যে সভা বসত এবং হুমায়ূন তাতে কখনো কখনো শরাব পানও করত।[৬]

---

১. ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ইউনাইটেড প্রোভিন্সেজ ৩০. পৃ. ৪৪, বাবুরনামা, বেভারিজ পৃ. ৫৪৪।

২. আকবরনামা, ১ পৃ. ১০৫, তারিখে জৌনপুর, বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৪৪.

৩. আকবরনামা, ১. পৃ. ১০৬।

৪. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৮।

৫. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৯।

৬. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৪৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানুয়ার যুদ্ধ

ফতেহপুর সিকরি থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে খানুয়ার প্রান্তরে রাণা সাঙ্গার সাথে বাবুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ূন ডান ব্যূহের (Right wing) সেনাপতি ছিলেন। রাণা সাঙ্গা পরাজিত হলেন এবং তাঁর বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।[১]

দিল্লির রাজকোষ লুণ্ঠন

রাজপুত বাহিনীর পরাজয়ের পর মোগল বাহিনী আলোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হল এবং সেখানকার দুর্গ অধিকার করে বাবুর এই দুর্গের সম্পূর্ণ কোষ হুমায়ূনকে পারিতোষিক রূপে প্রদান করলেন। ইতিমধ্যে বাদাখশানে মির্জা খাঁর মৃত্যুজনিত পরিস্থিতির কারণে হুমায়ূনকে বাদাখশানে যাওয়ার আদেশ প্রদান করা হল। হুমায়ূন বাদাখশানের প্রশাসক ছিলেন। সেজন্য আশা করা গিয়েছিল যে, তিনি পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিলে তাঁর পিতার কাছ থেকে আদেশ পেয়ে এবং পারিতোষিক রূপে প্রাপ্ত ধনসম্পদ, বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে হুমায়ূন বাদাখশানের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে তিনি দিল্লি অতিক্রম করলেন। সেখানকার কিছু গৃহে, যেখানে রাজকোষ সংরক্ষিত ছিল, সেগুলি ভেঙে ফেললেন এবং সেখানকার সঞ্চিত ধনরাশি অধিকার করে নিলেন। বাবুর হুমায়ূনের এই ব্যবহারে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে অত্যন্ত কড়া একটি পত্র লিখলেন।[২]

হুমায়ূন কেন এই কাজ করলেন? এ কথা বলা খুবই কঠিন। একথা স্পষ্ট যে, সম্পদ তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাবুর তাঁকে এত পরিমাণ সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সম্পদ কম হওয়ায় কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন : "এমনও মনে হয় যে, হুমায়ূন বাবুরের আরো অনেক সেনাপতির মতোই ভারত অভিযানকে কেবল একটি লুটের অভিযান বলে মনে করতেন এবং তাঁরও আশা ছিল যে, অনতিবিলম্বে এ শেষ হয়ে যাবে।।"[৩]

এ মত অনেকাংশেই সত্য, তা সত্ত্বেও রাজ্যের উত্তরাধিকারীর দ্বারা রাজকীয় সম্পত্তির এমন লুট হওয়াটা সঙ্গত বলে প্রতীত হয় না। নিশ্চয়ই এ থেকে হুমায়ূনের বুদ্ধিমত্তার অভাব প্রকট হয়ে পড়ে। সম্ভবত, তিনি তাঁর লোভী বিদেশী

---

১. এই যুদ্ধের বর্ণনার জন্য দেখুন, বাবুরনামা, বেভারিজ. পৃ. ৫৭০-৭৪ ; উইলিয়ামস পৃ. ১৪৬-৫৬ ; শর্মা, মেবার অ্যান্ড দি মুগল এম্পায়ার্স, ৩৩-৪০ ; সরকার, মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৫৬-৬১।

২. "ইতিমধ্যে খবর পেলাম যে, হুমায়ূন দিল্লি পৌছে সেখানকার বহু রাজকোষ উন্মোচন করল এবং আমার বিনানুমতিতে তার কিছুটা সে অধিকার করে নিল। তার কাছে এটা আমি আশাও করিনি, এতে আমি খুবই দুঃখ পেলাম। আমি তাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য কঠোর ভাষায় একটি পত্র লিখে পাঠালাম।" বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৮৩।

৩. ঈশ্বরী প্রসাদ ,হুমায়ূন পৃ. ২০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। এ থেকে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

বাদাখশানে

দিল্লির রাজকোষ লুণ্ঠনের পর হুমায়ূন বাদাখশান চলে গেলেন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৫২৭)। এখানে তিনি প্রায় দু'বছর অবস্থান (১৫২৭-২৯খ্রি.) অবস্থান করেন।[২] এ সময়ে তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। ড. ব্যানার্জি লিখেছেন, এই সময়ে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে রাজকার্য পরিচালনার প্রয়াস চালান, কিন্তু অল্পকালমাত্র অবস্থান করার দরুন তাতে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।[৩] ড.ঈশ্বরী প্রসাদও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করে লেখেন যে, বাদাখশানে তাঁর চরিত্র ও ব্যবহারে শক্তি ও উৎসাহের ঘাটতি ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে প্রজাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, যার ফলে সেখানে তিনি বিশেষ কোন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন নি।[৪]

বাদাখশানে পৌঁছে হুমায়ূন দেখেন, সেখানকার পুরাতন সমস্যা তাঁর এবং বাবুরের অনুপস্থিতিতে আরো জটিল হয়ে পড়েছিল। উজবেকরা তখনো শক্তিশালী ছিল। ঐ সময়ে বুখারায় উবাইদুল্লাহ খাঁ, সমরকন্দে কুচুম সুলতান ও আবু সঈদ হিসারে হামজা সুলতানের পুত্র ও বলখে কীতীন কারা সুলতান ক্ষমতাসীন ছিলেন।[৫] খুরাসান উজবেক ও ইরানের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হয়ে বিরাজ করছিল। ইরানের সুলতান শাহ তাহমাস্প তখনো বালক ছিলেন। এজন্য উজবেকরা উবাইদুল্লাহ খাঁর যোগ্য নেতৃত্বে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে উবাইদুল্লাহ খাঁ মারওয়া, মাশহাদ, আস্তারাবাদ ও তাঁর অধীনস্ত স্থানগুলি অধিকার করে নেন।[৬] ইরানের শাহ এর বিরুদ্ধে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। উবাইদুল্লাহও শক্তি কেন্দ্রীভূত

১. হুমায়ূনের এই উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপের জন্য মোগল আমীরদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই কাজে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। বাবুরের মৃত্যুর পর হুমায়ূনের স্থানে মেহেদী খাজাকে স্থলাভিষিক্ত করার চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে কার্যকর ছিল, যা সম্ভবত হুমায়ূনের এই সমস্ত কার্যকলাপেরই পরিণামস্বরূপ ছিল।
এখানে আরো একটি প্রশ্ন বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তা হল এই সময় বাবুর ও হুমায়ূনের পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন ছিল ? দুটি সরকার বিরোধী ঘটনা সামনে এসে যায়। একদিকে বাবুর হুমায়ূনকে পারিতোষিক দিয়ে প্রসন্ন করতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে হুমায়ূন বাবুর থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছেন। খানুয়ার যুদ্ধের পর তিনি পালিয়ে বাদাখশানে চলে যেতে চাচ্ছিলেন। ওখান থেকে পালিয়ে তিনি ভারতে এসে পুনরায় আর সেখানে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন না। এ থেকে কী এটাই প্রতীত হয় না যে, পিতা পুত্রের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না ?
২. হুমায়ূনের আগ্রায় ফিরে আসার বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায় দেওয়া হয়েছে।
৩. ব্যানার্জি, হুমায়ূন. ১. পৃ. ৮।
৪. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ.২১।
৫. আহসানাত তাওয়ারিখ, ১. পৃ. ১৯০।
৬. ঐ, পৃ. ২০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। জাম এর যুদ্ধে (২৬ সেপ্টেম্বর ১৫২৮) শাহ তাহমাস্প উজবেকদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলেন। অনেক কষ্টে উবাইদুল্লাহ খাঁ ও তাঁর অল্প কয়েকজন সাথী পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন।[১] যে সময়ে উজবেকরাও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে সময়ে হুমায়ূন তাঁর কাছে হারানো অংশগুলো পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর সৈন্যদের তিনভাগে ভাগ করলেন।[২] শাহ কুলির নেতৃত্বে হিসার আক্রমণের জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করা হল। অন্য দিকে তারসুন মুহম্মদ সুলতানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী তিরমিজ ও কবাদিয়ান অভিমুখে অগ্রসর হল আর তৃতীয় বাহিনী হুমায়ূনের নেতৃত্বে সমরকন্দ আক্রমণে উদ্যত হচ্ছিল। শাহ কুলি হিসারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তারসুন মুহম্মদ সুলতানের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। হুমায়ূন স্থানীয় নেতাদের সহায়তায় চল্লিশ হাজার সৈন্য একত্রিত করলেন এবং হিসার ও কবাদিয়ান অধিকার করে নিলেন। (জানুয়ারি ১৫২৯)। এ দুটি স্থান আমু দরিয়ার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ভারতের কোনো মোগল বাদশাহর আধিপত্য এর উত্তরে আর কখনোই বিস্তৃত হয়নি।[৩] ইতিমধ্যে উজবেকদের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের ফলে মোগলদের আক্রমণ স্থগিত করে দিতে হল। এ অভিযান অধিক ফলপ্রসূ হয়নি।[৪] ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে উভয় দলই রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এ কারণে আক্রমণের গতি মন্থর হয়ে পড়তে লাগল।

বাদাখশানে পৌছানোর পর ইয়াদগার বেগম তগাইয়ের কন্যা বেগা বেগমের সাথে হুমায়ূনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে বেগা বেগম এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন। হুমায়ূন তাঁর নাম রাখলেন আল-আমান। এ খবর পেয়ে বাবুর হুমায়ূনকে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রে বাবুর সর্বপ্রথম তাঁর পুত্রকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু নবজাতক পুত্রের হুমায়ূনের দেয়া নামটি বাবুরের মনঃপূত হল না। তিনি লিখেছেন আল-আমান শব্দের অর্থ হল 'রক্ষা' কিন্তু সাধারণ লোকে একে আল-আমান কিংবা আল আমাঁ বলে থাকে। তুর্কি ভাষায় যার অর্থ হয় 'লুটেরা'। এ ধরনের নাম চয়ন করার জন্য বাবুর হুমায়ূনকে এই পত্রের মাধ্যমে ভর্ৎসনা করলেন। এ পত্র না পৌছানোর প্রতিও ইঙ্গিত দেয়। হুমায়ূন তাঁর পত্রে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, তিনি একাকী থাকতে চান। বাবুর তাঁকে বোঝালেন যে, তাঁর এ ধরনের ইচ্ছা ঠিক নয়, কেননা, "একান্তবাস বাদশাহীর জন্য বড়ই দোষের কথা।" অবশেষে বাবুর উজবেকদের বিরুদ্ধে অভিযানের এক বড় পরিকল্পনাও নিশ্চিত করলেন। এই পত্রে বাবুর তাঁকে তাঁর ভাইদের প্রতি সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেন এবং হুমায়ূন ও কামরানের মধ্যে অঞ্চল বিভাজন ছয় ও পাঁচ অনুপাতে

---

১. ঐ পৃ.২০৩-১৫। বাবুর লিখেছেন (বাবুরনামা, বেভারিজ.পৃ ৬৩৬) যে, উবাইদুল্লাহ মারা যান, কিন্তু আহসানাত তাওয়ারিখ (প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৮)-এর মতে তিনি বেঁচে যান।

২. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২২।

৩. "This was probably the northernmost point ever reached by a Mughal prince of India." ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১. পৃ. ৮।

৪. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন. পৃ. ২২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিত করলেন। এইভাবে এই পত্রে পিতার পুত্রবাৎসল্য হুমায়ূনের চরিত্র ও বাদাখশান অংশে তার আগ্রহের কথা জানতে পারা যায়।[১]

---

১. বাবুরের পত্র হুমায়ূনকে সম্বোধন করে—
হুমায়ূন, যা দেখার জন্য আমি গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, শুভকামনার পর তার প্রতি আমার প্রথম কথাটি হল এই প্রকার :
ঐ দিকের এবং এই দিকের সংঘটিত ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ, যা গীনা ও বীয়ান শেখ মারফত পাঠানো পত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, তা সোমবার ১০ রবিউল আউআল (২২ নভেম্বর, ১৫২৮) আমার হস্তগত হয়েছে।

ছন্দ

আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে, তোমার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তোমার জন্য সেই পুত্র আর আমার জন্য সে গভীর আনন্দের বিষয়। মহান আল্লাহ তোমার এবং আমার জন্য যেন সর্বদাই এমন সুসংবাদ প্রেরণ করেন। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায় ! হে ইহ-পরলোকের প্রভু !
তুমি লিখেছ যে, তুমি তার নাম রেখেছ আল আমান। আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যশালী করুন। তুমি স্বয়ং আল আমান লিখেছ, কিন্তু তুমি এই বিষয়ে কেন মনোযোগ দাওনি যে, অধিকাংশ লোকই আলআমাঁ অথবা আলআমান উচ্চারণ করে। এছাড়া নামের ক্ষেত্রে আল এর প্রয়োগ অতি বিরল।
মঙ্গলবার, ১১ (২৩ নভেম্বর) তারিখে এই গুজব কানে আসে যে, বলখবাসীরা আমন্ত্রিত হয়েছিল আর কুরবানকে বলখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
কামরান ও কাবুলের বেগদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তোমার সাথে সাক্ষাত করে। তাদের পৌঁছানোর পর তুমি হিসার, সমরকন্দ, হেরী অথবা যে দিকে ভাগ্য তোমার সহায় হয় আক্রমণ চালিয়ে দাও। এমনও হতে পারে যে,আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছ আর বিভিন্ন স্থান তুমি অধিকার করে নাও, যার পরিণামে বন্ধুরা আনন্দিত হওয়ার এবং শত্রুরা শোকোত্তাপ করার অবসর লাভ করুক। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, এখন তুমি লোকদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছ এবং তরবারি চালানোর যোগ্য হয়ে উঠেছ, আর যে কার্জ ও যোগ্যতা প্রদর্শনের অবসর তুমি পেয়েছ তাকে উপেক্ষা করো না। বাদশাহদের জন্য একান্তবাসের আলস্য জীবন কখনোই উচিত সঙ্গত নয়।

পদ্য

সে ভুবন জয় করে যে অতিশীঘ্র অগ্রসর হয়, পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিকে রাজ্য সহায়তা দেয়না।
বিয়ের জন্য সমস্ত কাজ বাধাগ্রস্ত হয়, কেবল বাদশাহীর কাজ নয়।
যদি আল্লাহর কৃপায় বলখ ও হিসার রাজ্যের বিজয় সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে তুমি তোমার লোকদের হিসারে নিযুক্ত করে দাও আর কামরানের লোকদের বলখে। যদি সমরকন্দও বিজয় হয়ে যায় তাহলে তুমি তাকে তোমার রাজধানী বানিয়ে নাও। আল্লাহ চাইলে আমি হিসারকে খালসার অন্তর্ভুক্ত করে নেব। কামরান যদি মনে করে যে, বলখ তার জন্য কিয়ৎ পরিমাণ, তাহলে সে খবর তুমি আমায় জানিয়ে দেবে। আল্লাহ চাইলে তাকে আমি অন্য রাজ্য থেকে তার অভাব পুরো করে দেব।
যেমন তুমি জান যে, সর্বক্ষেত্রেই এই নিয়ম আছে যে, তোমার অধীনে যদি ছয় ভাগ থাকে তাহলে কামরানের অধীনে পাঁচ। এ নিয়ম স্থায়ী রূপে চলে আসছে। তুমি এর কোনো পরিবর্তন করো না।
নিজের ছোট ভাইদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। বড়দের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। আমার আশা তুমি যথাসম্ভব তার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখবে। যে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান হয়েছে, সে তোমার প্রতি উপযুক্ত নিষ্ঠা এবং সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ঈশ্বরী প্রসাদ এই পত্র থেকে অনুমান করেন, এ সময়ে হুমায়ূন খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে তিনি প্রায়শই অসুস্থ থাকতেন। তাঁর অনুমান যে, হুমায়ূন এ সময়ে আফিম-আসক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী চার পাঁচ বছরে আফিম তাঁকে পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আরো কালাত্মক রূপ ধারণ করে। পণ্ডিত লেখকের মতে, হুমায়ূন তাঁর একাকীত্বকে (বিশেষত ভারতীয় অভিযানগুলোর পরে যে একাকীত্ব তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল) দূর করার জন্য আফিম খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।[১]

একাকীত্বের জন্য হুমায়ূন আফিম খাওয়া শুরু করেছিলেন, কথাটি অধিক সত্য বলে প্রতীত হয় না। বাস্তবে এ ছিল হুমায়ূনের কতিপয় বন্ধুর দান। মির্জা হায়দারের মতে, কিছু দুশ্চরিত্র বন্ধুর কারণে হুমায়ূনের মধ্যে কিছু কু-অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, যার অন্যতম ছিল আফিম।[২]

হুমায়ূনের আগ্রা আগমন

উপরোক্ত অভিযানের পর হুমায়ূন প্রায় আট মাস বাদাখশানে অবস্থান করেন (৯৩৫ হিজরির সফর থেকে শাওয়াল পর্যন্ত)। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন হিন্দালের গুরু মীর ফখর আলীর হাতে শাসনকার্য অর্পণ করে হুমায়ূন আগ্রা রওনা হলেন। পরদিন (৭ জুন ১৫২৯ খ্রি.) তিনি কাবুলে পৌছালেন। কাবুলে আসকারি, হিন্দাল ও কামরানের সাথে (যিনি ঐ দিনই কাবুল পৌছেছিলেন) তাঁর সাক্ষাত হল। তিন ভাইয়ের মধ্যে পরামর্শ হল। এর পরিণাম স্বরূপ কাবুল ও কান্দাহারের শাসনভার কামরানের হাতে ও বাদাখশানের শাসনভার হিন্দালের হাতে অর্পণ করে হুমায়ূন আগ্রা রওনা হলেন। জুনের শেষে ও জুলাইয়ের প্রারম্ভে (২৭ জুন-৬ জুলাই ১৫২৯ খ্রি.) হুমায়ূন আগ্রা পৌছালেন। ইতিমধ্যে হুমায়ূনের মাতা মাহম আগ্রা পৌছান। কাবুল থেকে আগ্রা

তোমার পক্ষ থেকে অতি অল্পই মাত্র খবর পাই। বিগত দু'তিন বছর যাবত তোমার ওখান থেকে কেউ আসে নি যাকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে তোমার কাছ থেকে এক বছরেরও বেশি সময় পরে ফিরে এসেছে। এটা কী ঠিক হল ?

তুমি তোমার পত্রে বারবার 'একান্তবাস' 'একান্তবাস' করে অস্থির হয়ে উঠছ। একান্তবাস বাদশাদের জন্য বড়ই দোষের কথা। আমার আদেশানুসারে তুমি একাধিক পত্র আমাকে লিখেছ কিন্তু তাতে তুমি পুনরায় চোখ বোলাও নি কেন ? তুমি যদি সেটি আরেকবার পড়তে তাহলে তাতে এতসব ভুলক্রটি থাকত না। ...যদিও তোমার পত্র কাঠিন্য ছাড়াই পড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু এ বড়ই ভ্রমাত্মক।... তোমায় অক্ষরবিন্যাস যদিও ততটা খারাপ নয় কিন্তু খুব বেশি শুদ্ধও নয়।... তোমার পত্র অস্পষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ তা জটিল। ভবিষ্যতে তুমি এতটা জটিল করে লিখবে না এবং সরল ও স্পষ্ট শব্দের প্রয়োগ করবে। এর ফলে তোমার এবং তোমার পত্র পাঠকারীদের কষ্ট কম হবে। এবার তুমি একটি মহান কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্থানোদ্যত হয়েছে। যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ মতো কাজ করবে। (বাবুরনামা , বেভারিজ, পৃ. ৬২৪-২৭)

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ২২।
২. তারীখে রশীদী, এ. এবং রাস, পৃ. ৪৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌছাতে তার মায়ের পাঁচ মাসেরও বেশি সময় লাগে।[১] যে সময়ে মাহম আগ্রা পৌছান সে সময়ে বাবুর ও হুমায়ূন নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা করছিলেন।[২] তাঁর আগমনে দু'জনেই প্রসন্ন হলেন। বাবুর লিখেছেন, এই অবসরে হুমায়ূন ও মাহম উপহার প্রস্তুত করেন।[৩]

কিছুদিন পর বাবুর হুমায়ূনকে পুনরায় বাদাখশান যাওয়ার কথা বললে তিনি অত দূর যেতে আর প্রস্তুত হলেন না। এরপর, বাবুর প্রধানমন্ত্রী খ্বাজা নিজাম উদ্দীন খলীফাকে বাদাখশান যেতে বললে তিনিও যেতে অস্বীকার করলেন।[৪] উপায়ান্তর না দেখে বাবুর বাদাখশান রাজ্যটি ওয়াইস মির্জার পুত্র সুলেমান মির্জাকে দিয়ে দিলেন, যদিও বাবুর খুতবা ও মুদ্রার অধিকার নিজের নামে রাখলেন।[৫] এই প্রান্তে সুলেমান মির্জার পৈত্রিক অধিকারও ছিল। এইভাবে বাবুর বাদাখশানের সমস্যার সমাধান করলেন।

---

১. মাহম বেগম ২১ জানুয়ারি ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে কাবুল থেকে রওনা হন এবং ২৬ জুন ১৫২৯ আগ্রায় পৌছন (বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৮৬-৮৭)।

২. আকবরনামা খণ্ড ১, পৃ. ১১৪-১৫, বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ, ৬৮৭।

৩. আকবরনামা খণ্ড ১, পৃ. ১১৪-১৫, বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ, ৬৮৭। উইলিয়ামস, অ্যান এমপায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৭২-১৭৩। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য : (১) হুমায়ূনের আগমনে বাবুর আশ্চর্য হলেন। (২) মাহম কাবুল থেকে ধীরে ধীরে আসছিলেন। তাঁর বিপরীতে হুমায়ূন কাবুল থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁদের কেন সাক্ষাত হল না? মাহমের আগ্রা যাওয়ার ব্যাপারটি কী হুমায়ূনের অজানা ছিল? অথবা মাহম জেনে বুঝে বাবুরের কাছে বসেছিলেন। যাতে বাবুর অসন্তুষ্ট হলে তিনি তাঁকে মাফ করিয়ে দিতে পারবেন। (৩) হুমায়ূনের পৌছনোর আনন্দে বাবুর দাওয়াত দেন, হয় এ এক সৌজন্যমূলক দাওয়াত ছিল নতুবা জনগণ যাতে বোঝে যে, বাবুর তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

৪. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ খলীফার অস্বীকার করার দুটি কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমত, বার্ধক্যের দরুন তিনি অবসরকালীন জীবনে পৌছে গিয়েছিলেন। বাদাখশানের মতো কঠিন প্রান্তের শাসনের শারীরিক মানসিক যোগ্যতা তাঁর আর ছিল না। দ্বিতীয়, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি বাবুরের কাছে থাকতে চাচ্ছিলেন। রাশব্রুক উইলিয়ামসের মতে, খলীফা মেহেদী খ্বাজাকে ক্ষমতায় বসাতে চাচ্ছিলেন, এ কারণে তিনি ভারত ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন না। (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৬, উইলিয়ামস পৃ. ১৭৩-৭৪)।

৫. তারিখে রশীদী, পৃ. ২০৩ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৫ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, খণ্ড ১, পৃ. ১২। সুলেমান মির্জার অধিকার নিম্নলিখিত বংশবৃক্ষ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় :

শাহ সুলতান মুহম্মদ—(বাদাখশানের শাহ)
শাহ বেগম : ইউনুস খাঁ (মঙ্গোল)
↓

কুতলুগ নিগার খানম : উমর শেখ মির্জা	আহমদ খাঁ	সুলতান নিগাঢ় খানম : সুলতান মাহমুদ মির্জা
↓	↓	↓
বাবুর	সঈদ খাঁ (কাশগড়ের)	ওয়াইস মির্জা
		↓
		সুলেমান মির্জা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদাখশান সুলেমানকে দিয়ে বাবুর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমীরদের বিরোধে এত দূর থেকে বাদাখশানের ওপর অধিকার কায়েম রাখা সুকঠিন ছিল। সুলেমান মির্জা রাজ্য পেলেন কিন্তু তাঁর মুদ্রা ও খুতবার অধিকার না থাকায় বাবুর সোখানকার নিয়মতান্ত্রিক শাসক হয়ে রইলেন।

হুমায়ূনের অনুপস্থিতিতে বাদাখশান

মির্জা হিন্দাল ৯৩৫ হিজরির জিলহিজ্জা (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৫২৯ খ্রি.)-মাসে বাদাখশান পৌঁছালেন। ইতিমধ্যে ফখর আলীর শাসনে বাদাখশানের আমীরদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সিংহাসনের অন্য এক উত্তরাধিকারী কাশগড়ের সুলতান সঈদকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে সুলতান সঈদ বাদাখশানে আক্রমণ চালালেন, কিন্তু তাঁর পৌঁছানোর বারো দিন আগেই মির্জা হিন্দাল সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিন মাস যাবৎ 'কিলা-এ-জাফর' অবরোধের পর সাফল্যের আশা না দেখে তিনি ফিরে গেলেন।

বাদাখশানের আমীরদের অসন্তুষ্টির কয়েকটা কারণ ছিল। মীর ফখর আলী এক সাধারণ মোগল আমীর ছিলেন। বাদাখশানের আমীরদের যুক্তি ছিল যে, এই স্থানটি তাদের যোগ্য নেতা সুলতান সঈদের পাওয়া উচিত ছিল, যিনি কিছুদিন পূর্বে বাবুরের পক্ষে উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মোগলদের সীমানা বাড়িয়ে ছিলেন। এছাড়া আগ্রা থেকে শাসিত হওয়াটা সম্ভব, তিনি নিজের জন্য মর্যাদা হানিকর বলে মনে করছিলেন। বাদাখশানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মির্জা সুলেমান এতদিনে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁদের যুক্তি ছিল বাদাখশানের শাসনভার এখন তাঁর হাতেই অর্পণ করা উচিত। এমনও মনে হয় যে, মীর ফখর আলীর যোগ্যতারও অভাব ছিল। এই সমস্ত কারণে বাদাখশানের আমীররা কাশগড়ের সুলতান সঈদ খাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[১]

বাদাখশান থেকে ভারতে ফেরার সমস্যা

হুমায়ূনের বাদাখশান থেকে প্রত্যাবর্তনের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হায়দার মির্জা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, বাবুর হুমায়ূনকে বাদাখশান

---

১. সঈদ খাঁর পত্রে এইপ্রকার নিবেদন করা হয়েছিল :
হুমায়ূন মির্জা হিন্দুস্তানে চলে গিয়েছেন এবং এই প্রদেশের ভার ফখর আলীর হাতে ন্যস্ত করে গিয়েছেন, যিনি উজবেকদের মোকাবিলায় অসমর্থ। অতএব, তিনি বাদাখশানে শান্তি স্থাপন করতে পারবেন না। যদি (অমুক তারিখের মধ্যে) খান এসে যান তাহলে বড় ভাল হয়, অন্যথায় উজবেকরা আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। যদি উজবেকরা খানের পৌঁছানোর আগেই আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয় তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। আমরা আপনার সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। সম্ভবত, আপনার দ্বারা আমরা মুক্তি পেতে পারি। এছাড়া শাহ বেগমের সম্বন্ধের দিক থেকে, যিনি আপনার নানী হন, বাদাখশান আপনারই। আপনি ছাড়া এর হকদার আর অন্য কেউ নেই (তারীখে রশীদী, পৃ. ৩৮৮ - ৮৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এ জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন যে, যদি তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে সে সময়ে যেন তাঁর এক পুত্র তথা উত্তরাধিকারী তাঁর কাছে থাকতে পারেন।[১] হায়দার মির্জা ঐ সময়ে বাদাখশানে ছিলেন। তাঁর অন্য আত্মীয়স্বজন সুলতান ওয়াইস মির্জা, সুলেমান মির্জাও বাবুরের নিকটাত্মীয় ছিলেন। এই কারণে অবস্থা অনুধাবনে তাঁর অনেক সুবিধা হয়েছিল। হায়দার মির্জা তাঁর এই মতের সমর্থন তারীখে খানদানে তৈমুরিয়া, তারীখে আলফী ও ফিরিশতাও করেছেন।[২] এর বিপরীতে আবুল ফজল লিখেছেন, হুমায়ূন বাবুরের "সম্মানিত গোষ্ঠীর আগ্রহে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।"[৩] কাবুলে কামরানের জিজ্ঞাসার জবাবে হুমায়ূন বলেন, বাবুরের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা আমাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকবরনামা লেখার সময়ে আবুল ফজলের কাছে তারীখে রশীদীও ছিল। এবং তিনি লিখেছেন, "মির্জা হায়দার তারীখে রশীদীতে লিখেছেন যে, ৯৩৫ হিজরিতে (১৫২৮ - ২৯ খ্রি.) জহাঁ বানী গেতী সিতানীর (বাবুর) আহ্বানে হুমায়ূন হিন্দুস্তান অভিমুখে রওনা হলেন এবং ফখর আলীকে বাদাখশানে নিযুক্ত করে দিলেন।'[৪]

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে আর্সকিন ও মিসেস বেভারিজ হায়দার মির্জার বর্ণনা অস্বীকার করেছেন।[৫] তাঁদের মতে, বাবুরের ন্যায় বিচক্ষণ শাসক কখনোই সীমান্ত রাজ্যের প্রশাসককে সরিয়ে তাকে বিপদে ফেলার মতো হঠকারিতা করতে পারেন না। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, পিতার সাথে সাক্ষাৎ ছাড়াও আগ্রায় বাবুরের দরবারে আনন্দ-বিনোদনের ইচ্ছাও হুমায়ূনের ছিল। উজবেকদের সাথে যুদ্ধ করে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন।[৬] ড. ব্যানার্জির মতে, হুমায়ূন তাঁর পত্রে বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। বাবুর তাঁকে এই ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দিতে চাচ্ছিলেন। এই কারণে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।[৭]

হায়দার মির্জা ও আবুল ফজলের ধারণা গভীর মনোযোগের সাথে অনুধাবন করলেন এমনটি প্রতীত হয় যে, দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্কের যে শৃঙ্খলা ছিল,

---

১. তারীখে রশীদি, পৃ. ৩৮৩ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২. পৃ. ৬৩।

২. খানদানে তৈমুরিয়ার মতে- "ব হজরতে জন্নত অশিয়ানী হুমায়ূঁ মির্জা দরী সাল অজ বদখশাঁ ব হিন্দুস্তাঁ তলব ফরমুদন্দ ব হিন্দাল মির্জা ব হুকুমতে বদখশাঁ ফরিস্তাদন্দ" অর্থাৎ, "বাবুর এই বছরে হুমায়ূন মির্জাকে বাদাখশান থেকে হিন্দুস্তানে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং হিন্দাল মির্জাকে বাদাখশানের শাসক রূপে পাঠিয়েছেন।" তারীখে আলফীর মতে— "পাদশাহ বাবুর জন্নত আশিয়ানী হুমায়ূঁ মির্জা ব দরী সাল ব হিন্দুস্তাঁ তলব ফরমুদন্দ ব হিন্দাল মির্জা ব হুকুমতে বদাখশাঁ ফরিস্তাদন্দ।"

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৫।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৫।

৫. ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ১০।

৬. ঈশ্বরী প্রাসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৩।

৭. ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কয়েকটি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে যা জানা যায় তা হল, কামরান হয়রান হয়ে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে হুমায়ূন উত্তর দেন যে, বাদশাহের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ কথা বিশেষ অর্থবহ। বাবুরনামা পাঠ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূন অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আর বাবুর তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এ চিন্তাধারা ঠিক নয়। তা সত্ত্বেও হুমায়ূনের মধ্যে মানসিক নৈরাশ্য আরো বেড়ে চলেছিল। এও প্রতীত হয় যে, বাবুর তাঁকে বোঝানোর জন্য বাদাখশান থেকে ডেকে পাঠিয়ে থাকবেন, এ খবর কামরানের জানা ছিল না। এ জন্য তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। হুমায়ূন কামরানের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চান নি। এ কারণে তিনি বলেন যে, তিনি সম্রাটের দর্শন প্রত্যাশী। হুমায়ূন এত দ্রুত গতিতে পৌছান যে, তা দেখে বাবুর আশ্চর্য হয়ে যান। হুমায়ূন যে যাত্রা এক মাসে সম্পন্ন করেন সেই যাত্রাই সম্পন্ন করতে মাহম পাঁচ মাস লাগিয়েছিলেন। বাবুর হুমায়ূনকে স্থায়ী রূপে ডেকে নিতে চাননি, এ কথা স্পষ্টরূপে এখানেই প্রতীত হয় যে, তাঁর আগমনের অনতিকাল মধ্যেই বাবুর তাঁকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন।[১] তিনি যদি তাঁকে স্থায়ী রূপেই ডেকে নেবেন, তাহলে তাঁকে দ্রুত ফিরে যাওয়ার জন্য কেন বলবেন ? এর জবাবে হুমায়ূনের অস্বীকৃতি একথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, তিনি বাদাখশানে খুবই ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য সেখানে ফিরতে আর ইচ্ছুক ছিলেন না। হুমায়ূনের এই দৃঢ় অনিচ্ছা দেখে বাবুর তাঁকে জোর করেন নি।

হুমায়ূনের অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বাদাখশানের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা আমরা আগেই দিয়েছি। মিসেস বেভারিজ ও আর্সকিনের মতে, বাদাখশানের ব্যবস্থা না করেই হুমায়ূন ফিরে আসেন। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, হুমায়ূন বাদাখশানকে বিপদে ফেলেন নি এবং হিন্দালকে সেখানে পাঠিয়ে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন।[২]

হুমায়ূনের অসুস্থতা

বাবুরের কাছে তিন মাস থাকার পর হুমায়ূন সম্ভল চলে গেলেন। সেখানে তিনি ছ'মাস থাকলেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হতে চলল। অবশেষে চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তাঁকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ল। প্রথমে তাঁকে দিল্লি নিয়ে আসা হল তারপর সেখান থেকে নৌকায় করে নদীপথে তাঁকে আগ্রায় পাঠানো হল। মাহম বেগম সে সময়ে ধৌলপুরে তাঁর স্বামীর সাথে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি মওলানা মুহম্মদ ফরগালীর (গারী) পত্র মারফত হুমায়ূনের অসুস্থতা

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৫।
২. ঐ পৃ. ১১৪, ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ভীতিজনক অবস্থায় কথা জানতে পারলেন।[১] এ খবর পেয়ে মাহম খুব ভেঙে পড়লেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লি রওনা হয়ে গেলেন। মথুরায় হুমায়ূনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। হুমায়ূনের অবস্থা তিনি যতটা খারাপ শুনেছিলেন, স্বচক্ষে তিনি তার চেয়েও খারাপ দেখলেন। আগ্রায় পৌঁছানোর পর তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল।[২]

গুলবদন বেগম যখন হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি অচৈতন্যাবস্থায় ছিলেন। তিনি লিখেছেন, রাজকুমার কখনো বা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কথা বলছিলেন, আর কখনো বা বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন। এই বর্ণনা থেকে এমনও প্রতীত হয় যে, সম্ভবত, এ স্বল্প বিরামী জ্বর ছিল। আগ্রায় হুমায়ূনের চিকিৎসা হল প্রধান-প্রধান হাকিমদের দ্বারা[৩] কিন্তু হুমায়ূনের রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ তাঁরা দেখলেন না। এই সময়ে মীর আবু বকা নামক একজন বিখ্যাত ওলি প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে পরামর্শ দিলেন যে, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি দান করে দিলে রাজকুমার রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।[৪] বাবুর এর জবাবে বললেন, তিনি স্বয়ং তাঁর পুত্রের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু এবং তিনি হুমায়ূনের জন্য নিজের জীবন দান করার কথা ঘোষণা দিলেন। একথা শুনে আমীর ও উপস্থিত জনেরা বড়ই আশ্চর্যন্বিত হলেন। তাঁরা বাবুরকে বোঝালেন, স্বয়ং নিজের জীবন না দিয়ে বরং বহুমূল্য রত্ন কোহিনূর হীরাটি দান করে দেয়া হোক, তার মূল্য বাবদ অর্থ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হোক। কিন্তু বাবুর নিজের জীবন দানের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। বাবুর হযরত আলীর (রাঃ) নামে প্রার্থনা করলেন এবং হুমায়ূনের শয্যার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে পরম করুণাময়ের উদ্দেশে দু'হাত তুলে আকুলিত চিত্তে নিবেদন করলেন : "হে আল্লাহ ! প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ যদি মঞ্জুর হয় তাহলে আমি আমার জীবন ও আয়ু হুমায়ূনকে দান করে দিচ্ছি।" গুলবদন বেগম লিখেছেন, বাবুর ঐদিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন আর হুমায়ূন কিছুটা স্বস্তি পেলেন। বাবুর দ্বিতীয় দিন থেকে রোজা রাখতে শুরু করলেন, যাতে তাঁর জীবন দান সফল হয়।[৫] হুমায়ূন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন আর কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে গেলেন।

পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের পর হুমায়ূন তাঁর আপন জায়গায় ফিরে গেলেন। হুমায়ূনের প্রস্থানের সময়ে বাবুরের অবস্থা তত খারাপ ছিল না। যদি এমনটি হত তাহলে হুমায়ূন তাঁকে ছেড়ে যেতেন না।

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৪, আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৬।
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৪, আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৬।
৩. এই হাকিমদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর খলীফাও ছিলেন, যিনি খুব বড় হাকিম ছিলেন, আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৯।
৪. তারীখে রশীদী, এ এবং রাস, পৃ. ৪৭৮ : আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৬; পুত্রবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৫।
৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুর কেন নিজের জীবন দান করলেন ?

বাবুর, মাহম ও হুমায়ূনকে বড়ই ভালবাসতেন। হুমায়ূনের অসুস্থতা, হাকিমদের নিরাশা ও মাহমের উদ্বিগ্নতা বাবুরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। যদি তাঁর মানসিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য ভাল থাকত তাহলে বাবুর এত শীঘ্র নিজের জীবন দানের কথা চিন্তা করতেন না। কিন্তু এই সময়কালে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না এবং তাঁর মানসিক অবস্থাও ঠিক ছিল না। এরকম অবসন্ন অবস্থায় রাজ্য ত্যাগের বাসনাও তাঁর মনে এসে গিয়েছিল।[১] তাঁর জীবনদান কেবল তাঁর সন্তান-বাৎসল্যের কারণে নয় ; বরং তাঁর মানসিক অবস্থার কারণেও ছিল।

গুলবদন বেগমের এ বর্ণনা মনোযোগের সাথে পাঠ করলে এমনও প্রতীত হয় যে, বাবুর হুমায়ূনের রুগ্নাবস্থার প্রতি ততটা মনোযোগী না হওয়ার জন্য মাহম খুব দুঃখিত ছিলেন। হুমায়ূন মাহমের একমাত্র পুত্র ছিলেন, তাঁর অন্য সন্তানেরা মারা গিয়েছিলেন। মাহমের এই কথা—"আপনি আমার পুত্রের চিন্তা করছেন না, আপনি তো বাদশাহ্, আপনার আর কীসের চিন্তা, আপনার তো অন্য পুত্রেরাও আছে,"[২]—একথার দ্যোতক। সম্ভবত, বাবুর এ কথায় লজ্জা পেয়ে জীবন দান করে থাকবেন, যাতে দুখিনী মাহম সন্তোষ লাভ করেন।[৩]

AMARBOI.COM

উত্তরাধিকারী

হুমায়ূন সুস্থ হয়ে উঠতেই বাবুর তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। আহমদ ইয়াদগার এইভাবে এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন :

"এক শীতের রাতে বাদশাহ এক পেয়ালা পানীয় পান করে কোনো এক কর্ম ব্যাপদেশে হুমায়ূনকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন উপস্থিত হলেন তখন গেতী সতানী (বাবুর) নেশায় ঢলে পড়লেন এবং বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। শাহজাদা ঐভাবে হাত ধরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্ধেক রাত্রে গেতী সিতানী জেগে উঠে তাঁকে ঐভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন এসেছ ? শাহজাদা নিবেদন করলেন, যে সময় আপনি আমাকে ডেকেছিলেন। বাদশাহর স্মরণে এল এবং বড়ই প্রসন্ন হলেন। তারপর তাঁকে বললেন, যদি আল্লাহ্ তোমাকে রাজসিংহাসন ও মুকুট দান করেন তাহলে তুমি কখনোই তোমার ভাইদের হত্যা করবে না এবং সর্বদাই তুমি তাদের ক্ষমা করে দেবে। তারপর বাদশাহ তাঁকে 'অলি অহদ' খিতাবে ভূষিত করলেন এবং খুশি করে বিদায়

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৮।

২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৪, তথা ফারসি পৃ. ২১।

৩. জার্নাল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯২৬, পৃ. ২৮৫-৯৮; স্টাডিজ ইন মেডিভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, প্রো. শ্রীরাম শার্মার প্রবন্ধ 'দি হিস্ট্রি অব বাবুরস ডেথ'; পৃ. ১৫৮-৬৩ ; গুলবদন বেগম হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ১০৪-১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। এই কারণেই মির্জা কামরান, মির্জা আসকারি ও মির্জা হিন্দাল শত প্রকারের ধৃষ্টতা ও বারংবার যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বাদশাহ (হুমায়ূন) জয়ের পরেও তাঁদের ধৃষ্টতার প্রতি মনোযোগ দেন নি এবং তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের প্রতি বারংবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁদের অপকর্মের কোনো প্রকারের বদলা তিনি নিতেন না।"[১]

কালিঞ্জর আক্রমণ

এই সময়ে খবর এল যে, কালিঞ্জরের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তিনি কালপীর উপর আক্রমণ চালিয়ে দিয়েছেন। হুমায়ূন কালিঞ্জর আক্রমণ করে সেখানে শান্তি স্থাপন করে পুনরায় সম্ভলে ফিরে গেলেন।[২]

বাবুরের মৃত্যু

বাবুরের রোগ-পীড়া ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর অবস্থার বড়ই অবনতি হল। মার্চ-এপ্রিল ১৫৩০-এ (রজব ৯৩৬ হিঃ) বাবুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর (শওয়াল) জুন-জুলাই পর্যন্ত শয্যায় পড়ে রইলেন। অবস্থার আরো অবনতি হওয়ায় তিনি তাঁর পুত্র হুমায়ূনকে ডেকে পাঠালেন। হুমায়ূন এসে দেখলেন তাঁর পিতার অবস্থা খুবই খারাপ। এতে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন এবং দাস-দাসীদের বললেন, এই কয়দিনে তাঁর এই অবস্থা হল কেন ? হাকিম ও বৈদ্যদের ডেকে বললেন, আমি তো তাঁকে সুস্থ দেখে গিয়েছিলাম, দেখতে দেখতে তাঁর এমন অবস্থা কেন হল ?[৩]

রোগাবস্থায় বাবুর প্রায়শ জিজ্ঞাসা করতেন, হিন্দাল কোথায় ? সে কবে আসবে ? হিন্দাল কত বড় হয়েছে ? এই রোগাবস্থায় বাবুর তাঁর দুই কন্যাকে বিয়ে দেন— গুলরঙ্গ বেগমকে ইসান তাইমুর সুলতানের সাথে এবং গুলচেহরা বেগমকে বিয়ে দেন তুখতা বুগা সুলতানের সাথে।[৪]

নিজের অন্তিম সময় দেখে বাবুর আমীরদের কাছে ডাকলেন, যাদের মধ্যে খ্বাজা খলীফা, তরদী বেগ, হিন্দু বেগ ও কম্বরে আলী বেগ প্রমুখ ছিলেন। তাঁদের

১. আহমদ ইয়াদগার , তারীখে শাহী ; উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার পৃ. ১৭৪।
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৫ ; আকবরনামা ১, পৃ. ১১৭। কালিঞ্জরে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তা এই প্রকার :
"মুহম্মদ হুমায়ূঁ পাদশাহ গাজী ওয়া তারীখে সলখ রজবুল মুরজ্জব ৯৩৬" হি. অর্থাৎ, মুহম্মদ হুমায়ূন বাদশাহ গাজী, ৯৩৬ হিজরি সনের রজব মাসের শেষ তারিখ।
এতে হুমায়ূন তাঁর পিতার জীবৎকালেই নিজেকে বাদশাহ গাজী বলে সম্বোধন করেছেন। জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৮৪৮, পৃ. ১৮৬।
৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৫।
৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৬-১০৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিতিতে হুমায়ূনকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন এবং বললেন, "বহু বছর ধরে আমি এই ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, হুমায়ূন মির্জাকে বাদশাহী প্রদান করে আমি স্বাধীনভাবে জরশ আফাঙ্গ-এ একান্তবাস গ্রহণ করি। আল্লাহর কৃপায় তাই-ই হল, কিন্তু সুস্থাবস্থায় করতে পারলে কতই না ভাল হত। এখন আমি রোগশয্যায়। অনন্তর, আমি অসিয়ত করছি, হুমায়ূন আমার উত্তরাধিকারী হবে আর আপনারা তাঁর সহযোগিতা করতে পিছপা হবেন না এবং সর্বক্ষণই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। এক হৃদয় ও এক মনে আপনারা তার পক্ষে থাকবেন এবং আমার আশা যে, আল্লাহ হুমায়ূনকে এমন সুবুদ্ধি দেবেন যে, তিনি সর্বদাই মানুষের সাথে সদ্‌ব্যবহার করবেন।[১] এই পর্যন্ত বলার পর বাবুর হুমায়ূনের দিকে ঘুরলেন এবং তাঁর উদ্দেশে এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, "তোমাকে তোমার ভাইদের এবং তোমার আত্মীয় পরিজনদের ও সমস্ত মানুষকে আল্লাহতে সঁপে দিচ্ছি, আর এদের তোমার উপর সোপর্দ করছি।"[২]

এই ঘটনার তিন দিন পর, ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর, সোমবার বাবুর ইন্তেকাল করলেন।[৩]

বাবুরের মৃত্যু গোপন রাখা হল যাতে বিদ্রোহ না হয়। ইতিমধ্যে অরেশ্ খাঁ নামক এক ভারতীয় আমীর পরামর্শ দিলেন বাবুরের মৃত্যুর কথা গোপন করার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং তিনি বললেন, যখনই বাদশাহর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে তখনই লোকেরা সাধারণত লুটপাটে নেমে পড়ে। তিনি পরামর্শ দিলেন, এক ব্যক্তিকে লাল কাপড় পরিয়ে হাতির পিঠে বসিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হোক যে, বাবুর বাদশাহ দরবেশ হয়ে গিয়েছেন এবং রাজ্যভার হুমায়ূনকে দিয়ে গিয়েছেন। হুমায়ূন আদেশ দিলেন তাই হোক। এতে প্রজারা সন্তোষ লাভ করল।[৪]

AMARBOI.COM

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ. ২৪, বেভারিজ, পৃ. ১০৮-১০৯।
অলহাল ইঁ তশাবীশ মরা জবুঁ করদা ওসীয়ত মী কুনম কি হমাঁ ঈশা হুমায়ূন রা বজায় মন দানন্দ ব দর, দৌলতখ্বাহীয়ে উ তকসীর ন কুনন্দ ওয়া বউ মোআফিক ওয়া যকজেহত বাশন্দ্ অজ্ হক্ সুভানাহু উম্মীদওয়ারম কি হুমায়ূঁ হম ব মর্দুম খুব পেশ খ্বাহদ আমদ দীগর হুমায়ূঁ তুরাব বিরাদরানে তুরা ওয়া হমাঁ খেশাঁ ওয়াঁ মুর্দমেঁ। খুদরা ওয়া তুরা বখুদা মী সিপারম ওয়া ঈহাঁরা বতো মী সিপারম।
অজী সুখনা হাজরাঁ ওয়া নাজরাঁ রা গিরিয়া ওয়া জারী দস্ত দাদ ওয়া খুদ হম চশমানে মুবারক পুর আব গরদী দন্দ।

২. গুলবদন বেগম হুমায়ূননামা পৃ. ১০৮-১০৯। আবুল ফজল ও বাবুর কর্তৃক হুমায়ূনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নকে সমর্থন করেছেন। (আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭৬-৭)

৩. গুলবদন বেগম, নিজামুদ্দীন ও ফিরিশতা বাবুরের মৃত্যু তারিখ ৫ জমাদুল আউয়াল বলে উল্লেখ করেছেন (২৫ ডিসেম্বর)। আবুল ফজল ৬ জমাদুল আউয়াল (২৬ ডিসেম্বর) লিখেছেন। এই প্রশ্ন বিবেচনার জন্য দেখুন, হোদীওয়ালা হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ ইন মোগল নুমিসমেটিস পৃ. ২৬৯-৬৩।

৪. গুলবদন বেগম হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর চারদিন পর হুমায়ূন সিংহাসনে বসলেন। বাবুরকে আগ্রার চারবাগে দাফন করা হল। শেরশাহের আমলে বাবুরের আফগান রানী বিবি মুবারিকা তাঁর লাশ কাবুলে নিয়ে যান, সেখানে তাঁকে পুনরায় দাফন করা হয়। এ যুগে ঐ স্থানটিকে শাহে কাবুল নামে অভিহিত করা হয়। জাহাঙ্গীর ওতে একটি শিলালিপি অঙ্কিত করে দেন এবং শাহজাহান সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন।[১]

বাবুরের মৃত্যুর কারণ

বাবুরের মৃত্যু কী তাঁর প্রাণ দানের কারণে হয়েছিল না কি হুমায়ূনের সুস্থ হয়ে ওঠা ও তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সংযোগমাত্র ছিল ?

মধ্যযুগে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, প্রার্থনা তথা কোনো ধার্মিক মহাপুরুষের মধ্যস্থতায় রোগ নিরাময় হতে পারে এবং এক ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে আরেক ব্যক্তি প্রাণ লাভ করতে পারে। বাবুর তাঁর প্রাণ এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অর্পণ করেছিলেন। জীবনের বিনিময়ে জীবনই বদলানো গেলে তো বাবুরেরও ঐ রোগই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। হুমায়ূন জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন আর বাবুর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। গুলবদন বেগম লিখেছেন, "বৈদ্যরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, তাঁর এই পেটের পীড়ার কারণ ছিল ইব্রাহীমের মায়ের দেওয়া বিষের পরিণাম। এই সময়ে বাদশাহের পেটের পীড়া বেড়ে গিয়েছিল এবং হুমায়ূন পিতার এই অবস্থা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। হাকিমদের ডেকে তিনি বলতে লাগলেন, "তাঁকে দেখুন আর ভালর চেয়েও ভাল ওষুধ দিন"। হাকিমরা একত্রিত হয়ে একযোগে বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ওষুধ কাজ করছে না। আমাদের আশা যে, আল্লাহ তাঁর কোনো গুপ্ত কোষ থেকে কোনো ওষুধ দেবেন।

এই সময়ে নাড়ি দেখে হাকিমরা বললেন যে, "এ বিষের চিহ্ন, যা সুলতান ইব্রাহীম লোদীর মা দিয়েছিলেন।"[২]

হুমায়ূনের স্বাস্থ্যলাভ ও বাবুরের রোগাক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যুর মধ্যে সময়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হুমায়ূন বাবুরের প্রাণ অর্পণের কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বাবুরের পীড়া দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল এবং তা শেষ হতে প্রায় দশ মাস লেগে গিয়েছিল। আবুল ফজলের মতে, বাবুরের মৃত্যু হয়েছিল তাঁর জীবনদানের কারণেই।[৩] আধুনিক ফরাসি লেখক গ্রেনার্ড গুলবদন বেগমের উপরোক্ত কথনের উপর ভিত্তি করে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হুমায়ূন বাবুরকে

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৫।
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৪।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৬-১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন।[১] গুলবদনের কথনের ভিত্তিতে এই মত প্রকাশ করাটা একেবারেই ধৃষ্টতা। ইব্রাহীমের মায়ের দেওয়া বিষ খুবই শক্তিশালী ছিল আর বাবুর সৌভাগ্যবশত তা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। গুলবদন বিষ দেওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে, তার অর্থ অন্য কোনো বিষ থেকে নয়।[২]

বাস্তবিকই বাবুরের মৃত্যু ও হুমায়ূনের সুস্থ হওয়ার ঘটনা সংযোগমাত্র। বাবুর আজীবন শরাব পান করে এসেছেন। বেশি করে নেশা ধরানোর জন্য ভাং, ধুতরা ইত্যাদি বস্তুও তাতে মেশানো হত। এ অবস্থায় তাঁর পেটের পীড়া হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ইব্রাহীমের মায়ের দেওয়া বিষও তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে থাকতে পারে। এ ছাড়া বাবুরের সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে অত্যন্ত কঠোর কঠিন সংগ্রাম ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে। কঠিন পরিশ্রম, অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন ও অনিয়মিত জীবনচর্যা তাঁর স্বাস্থ্যকে ভেঙে দিয়েছিল। কাবুল, মধ্য এশিয়া ও ভারতের আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। সম্ভবত, এ সবও বাবুরের শক্তি ক্ষয়ের জন্য দায়ী ছিল। ইতিমধ্যে, তাঁর প্রিয় পুত্র আলোয়ারের মৃত্যু হয়ে যায়, যার ফলে, বাবুরের শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল। এসকল পরিস্থিতিতে, সম্ভবত, বাবুর যে সময়ে জীবন দান করেছিলেন এবং তার পরে যখন হুমায়ূন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন, তখন বাবুরের মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠতে থাকে যে, আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। শারীরিক ভাবে দুর্বল অবস্থায় মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই দৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যু অন্ধ বিশ্বাসের মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাবের কারণে ঘটেছে। তাঁর জীবনদান ও তাঁর মৃত্যুর ঘটনা কেবল সংযোগমাত্র ছিল।

AMARBOI.COM

৩. গ্রেনার্ড, বাবুর ফার্স্ট অব দি মুগলস, পৃ. ২৩২। ইব্রাহীমের মায়ের দেওয়া বিষের বর্ণনার জন্য দেখুন, বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৪১-৪৩।

৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়
খলীফার ষড়যন্ত্র

বাবুরের মৃত্যু হল ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ এ, কিন্তু হুমায়ূন সিংহাসনে বসলেন তার চারদিন পরে, অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর। সাধারণত শাসকের মৃত্যুর অনতিকালমধ্যেই উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হত, যদিও রাজমুকুটের সমারোহ তার কিছুদিন পরে হত।[১] বাবুরের মৃত্যু ও হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার দূরত্বের দুটি কারণ থাকতে পারে। হুমায়ূন এর মধ্যে অনুপস্থিত থেকে থাকতে পারেন, বাবুরের মৃত্যুর খবর গুপ্ত রাখার কারণে, অথবা ইতিমধ্যে হুমায়ূনের স্থানে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকতে পারে।

বাবুরের মৃত্যুর সময় হুমায়ূন কোথায় ছিলেন ?

গুলবদন বেগম লিখেছেন, বাবুরের অবস্থার ক্রমাবনতি দেখে হুমায়ূনকে কালিঞ্জর থেকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি অনতিবিলম্বেই এসে গেলেন এবং বরাবর এই কথা বলতে লাগলেন বাবুরের এ অবস্থা কীভাবে হল ! আমিতো তাঁকে ভাল অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ এ কী হল ?"[২] আবুল ফজলের বর্ণনা থেকেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূন বাবুরের মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন।[৩] এর বিপরীতে নিজামউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, হুমায়ূন বাবুরের মৃত্যুর পর সম্ভল এলেন এবং সিংহাসনে বসলেন।[৪] বাবুরের মৃত্যুর পর, তাঁর মৃত্যুকে গোপন করা এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সে স্থলে জনতাকে দেখানোর ফলে এই

---

১. শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইসলাম শাহ আগে পৌছানোর কারণে সিংহাসন লাভে সফল হয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে আদিল শাহ পরে পৌছানোর কারণে রাজ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০৫। ফিরিশতার বর্ণনানুসারে, বাবুর অসুস্থাবস্থায় কালিঞ্জয় দুর্গ অবরোধ করে হুমায়ূনকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ব্রিগস, ২ পৃ. ৬৪।

৩. আকবরনামা, ১পৃ. ১১৮, ১২১।

৪. দে. তবাকতে আকবরী, ২,পৃ. ৪৪। একথা রৌজাতে আত্ তাহীরীর লেখক তাহির মুহম্মদও সমর্থন করেছেন। বাঙ্কিপুর পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে লিপিবদ্ধ মতকে ড. রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী স্বীকার করেন। (ত্রিপাঠী, রাইজ এন্ড ফল অব দি মুগল এম্পায়ার, পৃ. ৫৪।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহ উৎপন্ন হয়, যা থেকে নিজামউদ্দীনের কথা সমর্থন লাভ করে। কিন্তু গুলবদন বেগম ও আবুল ফজলের বর্ণনা এতটা স্পষ্ট যে, তাঁদের কথা অস্বীকার করা যায় না। এ থেকে প্রতীত হয় যে, হুমায়ূন সে সময় আগ্রায় উপস্থিত ছিলেন।

ষড়যন্ত্র

বাবুরের প্রধানমন্ত্রী খলীফা হুমায়ূনের স্থলে মাহদী খ্বাজাকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন। এ ছিল খলীফার উর্বর মস্তিষ্কজাত পরিকল্পনা, দরবারের অন্য আমীররা সম্ভবত এ খবর মোটেও জানতেন না। পারিভাষিকভাবে, একে ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে কিন্তু বাস্তবে এ খলীফার পরিকল্পনারই একটি চর্চা মাত্র ছিল।[১] তা সত্ত্বেও বৈধানিক দৃষ্টিতে এবং মোগল সাম্রাজ্যের স্থিরতার দৃষ্টিতে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রের প্রণেতা স্বয়ং বাবুরের প্রধানমন্ত্রী, যিনি বাবুরের সাথে ৩৫ বছর সময় অতিবাহিত করেছিলেন ; এর ফলে এর গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

এই ষড়যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ আমরা নিজামউদ্দীন আহমদের বর্ণনায় পাই, যাঁর পিতার বুদ্ধিমত্তার কারণে এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও এর বর্ণনা কেবল নিজামউদ্দীন আহমদই দিয়েছেন এবং এর নিরিখে হয়তো একথাও বলা যেতে পারত যে, তিনি তাঁর পিতার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু, এর সমর্থন আবুল ফজলের আকবরনামা, সৌলাতনে অফাগেনাঁ (অথবা তারীখে শাহী) ও হুমায়ূননামাতেও পাওয়া যায়। এই সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পরে ষড়যন্ত্রের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

AMARBOI.COM

ষড়যন্ত্রের প্রণেতা খলীফা

এই ষড়যন্ত্রের প্রণেতা ছিলেন বাবুরের প্রধানমন্ত্রী সুলতান সৈয়দ হাকীম খ্বাজা নিজামউদ্দীন আলী মুহম্মদ খলীফা। তিনি তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতা, শাসন, সেবা ও যুদ্ধকলায় নৈপুণ্যের কারণে বাবুরের মনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।[২] উকিল, আমীর, সুলতান ও খলীফা এই চারটি পদ ও তিনি পারিবারিক উপাধি সৈয়দ, খ্বাজা ও বরলাস তুর্ক এই তিনটি উপাধি লাভ করেছিলেন, যা তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদার প্রতীক ছিল। এছাড়া কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে

---

১. "It is technically correct to call the attempt of the Khalifah a conspiracy but in reality it was in the nature of what Mrs. Bevaridge calls a rumour of a plan of super cession of Khalifan." (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ.২৪)।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই জুনাইদ বরলাস বাবুরের ছোট বোন শহর বানুর সাথে এবং তাঁর কন্যা গুলবর্গ বেগম সিন্ধুর শাসক শাহ্ হুসাইন আরগুনের সাথে বিবাহিত ছিলেন। তাঁর পুত্র মোহীব আলীর বিয়ে শাহ্ হুসাইনের সৎ-কন্যা নাহীদের সাথে হয়েছিল।[১] পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের পরে মাহম ও গুলবদন বেগম কাবুল থেকে ভারতে আসেন। খলীফাকে দাঁড়িয়ে গুলবদনকে স্বাগত জানাতে হয়। খলীফা ৬,০০০ শাহরুখী ও ৫টি ঘোড়া এবং তাঁর স্ত্রী ৩,০০০ শাহরুখী ও তিনটি ঘোড়া গুলবদনকে উপহার দিলেন এবং তাঁকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।[২] বাবুরের ভারত-অভিযানগুলিতেও খলীফা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং পারিতোষিক রূপে তিনি ধন ও উপাধি দুই-ই লাভ করেন। খানুয়ার যুদ্ধের পরে তাঁকে 'মুকররবুল হযরত আল-সুলতানী এত্‌মাদুদ্দৌলা আল-খাকানী, (অর্থাৎ সুলতানের প্রধান মিত্র ও তাঁর সাম্রাজ্যের স্তম্ভ) খিতাবে ভূষিত করা হয়। বাবুরনামার অধ্যয়ন থেকে একথা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে, তিনি বাবুরের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে যান। আহমদ ইয়াদগার লিখেছেন, তাঁর আদেশ ছিল বাদশাহের আদেশের ন্যায়।[৩] এইভাবে খলীফা বাবুরের দরবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমীর এবং রাজ্যের আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দ্বী মাহদী খ্বাজা

বাবুরের পরে খলীফা সৈয়দ মাহদী খ্বাজাকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন।[৪] মাহদী খ্বাজা, খ্বাজা মুসার পুত্র ছিলেন। খন্দমীরের মতে, তিনি সৈয়দ ছিলেন এবং তিরমিজের ধার্মিক বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ৯১৬ হিজরি (১৫১০-১১ খ্রি.) সনে বাবুরের দীওয়ান বেগী ছিলেন এবং তিনি ১০,০০০ সৈন্যসহ বাবুরের পক্ষে

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৭ ; আইন-ই-আকবরী, অংশবিশেষ অনুবাদ, ব্লখম্যান, পৃ. ৪৬৩-৬৪।

২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১০১-১০২।

৩. আহমদ ইয়াদগার তারীখে শাহী, পৃ. ১৩০।

৪. মিসেস বেভারিজ ও ড. ব্যানার্জি (গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২৯৮-৯৯ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ২০) তাঁর নাম সৈয়দ মুহম্মদ মাহদী খ্বাজা লিখেছেন। গুলবদন বেগম ও বাবুর দু'জনই তাঁকে মাহদী খ্বাজা নামেই উল্লেখ করেছেন। শেখ জাইন মাহদী খ্বাজা লিখেছেন। এ থেকে তাঁর নাম মাহদী খ্বাজা বলেই প্রতীত হয়। মাহদী খ্বাজাকে আবুল মালীর কবরের পাশে দাফন করা হয়, যিনি তিরমিজী ছিলেন। এজন্য মিসেস বেভারিজ লিখেছেন মাহদী খ্বাজাও তিরমিজী ছিলেন। ড. ব্যানার্জির অনুমান তিনি মাহমের সাথেও সম্পর্কিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুখারার উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।[১] এই অভিযানের পর তিনি কাবুলে ফিরে আসেন। এখানে তিন বছর পরে, বাবুরের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তাঁর বোন খানজাদা বেগমের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[২] এ সময়ে এঁর তেমন একটা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বাবুরের সাথে ভারতীয় অভিযানগুলিতে অংশ নিয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বামে এবং হুমায়ূন ডান ব্যূহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাহদী খ্বাজার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সত্তর লাখ পরিমাণ অর্থ ভাতাসহ বিয়ানা ও ইটাওয়ার জায়গীরও তাঁকে আগেই দেওয়া হয়েছিল।[৩]

মাহদী খ্বাজার ভাইপো খ্বাজা রহীমদাদ গোয়ালিয়র দুর্গের গভর্নর ছিলেন। তিনি বাবুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজসিক ফরমান মানতে অস্বীকার করলেন। গোয়ালিয়রের এক স্থানীয় রাজপুত্র জমিদারের হাতে দুর্গের ভার তুলে দিয়ে রহীমদাদ মালবের সুলতান মুহম্মদ খিলজির কাছে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন।[৪] এই উপলক্ষে মাহদী খ্বাজা ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা আসেন। খলীফা ও মুহম্মদ গাউসের সহায়তায় রহীমদাদের জীবন তো রক্ষা পেয়ে গেল কিন্তু কিছুকাল পরে ৭ সেপ্টেম্বর ১৫২৯ এ তাঁকে তাঁর স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল এবং আবুল ফতেহ শেখ গুরানকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করা হল।[৫] এই বিদ্রোহে মাহদী খ্বাজার কতদূর পর্যন্ত হাত ছিল তা বলা সুকঠিন, কিন্তু এর পরিণামে বাবুর ও মাহদী খ্বাজার মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে গেল। মাহদী খ্বাজা ও খলীফা পরস্পরের অন্তরঙ্গ স্পর্শে এসে গেলেন। এরই মধ্যে মাহদী খ্বাজা তাঁর মধ্যে কিছু গুণ দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং দু'জনে আরো নিকট এসে গেলেন। এমন এক ব্যক্তির, যার স্বপ্নেও রাজত্ব পাওয়ার আশা ছিল না, তেমন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে খলীফা সম্পূর্ণ শক্তি নিজের হাতে রাখতে চাচ্ছিলেন।

AMARBOI.COM

---

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, পৃ. ২০।

২. ঐ সময়ে খানজাদা বেগমের বয়স প্রায় চল্লিশ বছর ছিল। মাহদী খ্বাজারও তাই। বাবুর তাঁর আত্মকথায় এ বিয়ের উল্লেখ করেন নি, যদিও তিনি এই বছরই লিখেছেন যে, মাহদী খ্বাজা, মুহম্মদ জামান মির্জাকে কাবুল থেকে আসতে নিষেধ না করে ঠিক করেন নি। বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৬৪।

৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ ৫৩০। মাহদী খ্বাজা হুমায়ূনকে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে সমস্থান দেওয়ার কারণে ড. ব্যানার্জি মত পোষণ করেন যে, তাঁদের উভয়ের প্রতি বাবুরের সমান দৃষ্টি ছিল (ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১, পৃ. ২০)। এ মত ঠিক বলে প্রতীত হয় না, কেননা, পানিপথের আগে হুমায়ূনকে হিসার ফিরোজা দেওয়া হয়েছিল এবং পরে তাঁকে সম্ভলও দেওয়া হয়েছিল। মাহদীর আর কিছু লাভ হল না । ঈদের সময়ও হুমায়ূনকে 'চারকব' (এক প্রকারের খিলআত) ছাড়াও একটি তরবারির পেটি ও সোনার জীনসহ একটি তীবুচাক ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়েছিল। মাহদী খ্বাজাকে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে সমস্থান দেওয়াটা তাঁর আত্মীয় হওয়া ছাড়াও যুদ্ধে যোগ্যতা প্রদর্শনের কারণেও ছিল। দু'য়ের সম-স্থানের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।

৪. তারীখে গোয়ালিয়রী ; বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ ৬৮৮-৮৯।

৫. বাবুরনামা.বেভারিজ পৃ. ৬৮৯-৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহদী খ্বাজা ও বাবুরের সম্পর্ক ছিল বেশ পুরাতন। বংশ, সেবা, সম্পর্ক এবং যোগ্যতার দৃষ্টিতে মাহদী খ্বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বড় ভগ্নিপতি হওয়ার সুবাদে বাবুরের উপর তাঁর প্রভাব মাহমের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।[১]

ড. ব্যানার্জির মতে, মাহদী খ্বাজার নির্বাচন ভালই ছিল। বংশ,সেবা,যোগ্যতা ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি মোগল সিংহাসনে বসার যোগ্যতা রাখতেন। ধার্মিক পথের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার সুবাদে তিনি ইরানের শাহ ইসমাইল এবং শাহ তহমাস্পের ন্যায় সাফল্য লাভ করতে পারতেন এবং উদারচেতা বাবুরের সাথে তাঁর এতদিনকার সম্পর্ক একটি জাগ্রত মোগল শাসনব্যবস্থায় প্রগতির গ্যারান্টি ছিল।[২] বিজ্ঞ লেখকের এ মতের সাথে একমত হওয়া খুবই কঠিন। বাবুরের পরিবারকে ছেড়ে অন্য ব্যক্তিদের নির্বাচনের এ ধারণা ভয়ংকর পরিণাম ডেকে আনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত ছিল না। এর পরিণামে গৃহযুদ্ধ তো হতই, সেই সাথে মাহদী খ্বাজা হুমায়ূনের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই অধিক যোগ্য ছিলেন না। বাবুরের পুত্র হওয়ার সুবাদে যে সদ্‌ভাবনা হুমায়ূনের পক্ষে লাভ করা সম্ভব ছিল, তা কখনোই খ্বাজা মাহদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রখ্যাত মোগল শাসনের শুভারম্ভ হওয়ার আগে এরকম হঠকারি সিদ্ধান্তের বিকাশের প্রশ্নই ছিল না।

মিসেস বেভারিজের মতে, খলীফার প্রকৃত প্রার্থী আসলে মাহদী খ্বাজা নন ; বরং মুহম্মদ জামান মির্জা ছিলেন।[৩] ইনি ছিলেন তাইমুর বংশীয় এবং বড় জামাতা। বাবুরের চার পুত্রের পর ইনি ছিলেন সবচেয়ে প্রধান এবং যুবা পুরুষ (তখন এঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর)। এঁর স্ত্রী মাসুমা সুলতানা বেগম মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়েই তাইমুর বংশীয়া ছিলেন এবং এইভাবে তিনি তুর্কি আমীরদের মধ্যে বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি। মিসেস বেভারিজের মতে, ঘাঘরা অভিযানের পর (এপ্রিল ১৫২৯ খ্রি.) তাঁকে রাজত্ব প্রদান করা হয়।[৪] মিসেস বেভারিজের

---

১. ব্যানার্জি হুমায়ূন ১.পৃ.২১। বাবুরনামার শেষাংশে মাহদী খ্বাজার নাম প্রায়শই বাবুরের প্রধান আমীরদের সাথে এসেছে। এ থেকে একথা স্পষ্ট যে, সে সময়ে তিনি উচ্চ স্তরীয় আমীরদের মধ্যে গণ্য হতেন। বাবুরের আত্মকথায় মাহদী খ্বাজার নাম প্রথম আসে ১৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২১।

৩. Epigraphica Indo-Muslimica 1915-16 ; গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২৯৮-৩০১ ; বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৭০৪-৭০৮। "If Mahdi or any other competent man had ruled in Delhi by whatever tenure, this would not necessarily have ruined Humayun, or have taken from him the lands most coveted by Babur. All Babur's plans and orders were such as to keep Humayun beyond the Hindukush, and to take him across the Oxus." গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, অনুবাদকের ভূমিকা, পৃ. ২৬-২৭ ; তবকাতে আকবরীর ইংরেজি অনুবাদক মি. দে-ও মিসেস বেভারিজের মত সমর্থন করেন। (দে. তবকাতে আকবরী, ২, পৃ. ৪১-৪২)।

৪. বাবুরনামা, পৃ. ৭০৪-৭০৮। বাবুরনামার বর্ণনাসুরে তাঁকে একটি রাজকীয় শিরোপা, তলোয়ারের খাপ, একটি তীপুচাক ঘোড়া ও একটি ছত্র দেওয়া হয়। এ থেকে কেবল একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতানুসারে, বাবুর তাঁর জামাইকে ভারতের শাসক নিযুক্ত করে স্বয়ং কাবুল বা এর উত্তর প্রান্তের প্রদেশে চলে যেতে চাচ্ছিলেন। এই আশঙ্কায় মাহম বেগম হুমায়ূনকে আগ্রায় ডেকে পাঠান। পরবর্তী ঘটনাবলী এত দ্রুত সংঘটিত হয়েছিল যে, বাবুর তাঁর জামাতাকে আর নিযুক্ত করতে পারেন নি। মিসেস বেভারিজ নিজামউদ্দীন আহমদের কথনকে সত্য বলে মানেন না, কারণ, এই ঘটনার ৬০ বছর পরে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঘটনার ২০ বছর পর নিজামউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। বিদূষী লেখিকার মতে, বাবুরের অন্য পুত্রেরা ছিলেন এবং খ্বাজা তাইমুর বংশীয় ছিলেন না। খলীফার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁকে নির্বাচন করতে পারেন না। মাহদী খ্বাজার বয়স তখন প্রায় ৫৫ বছর ছিল। নিজামউদ্দীন তাঁকে অথবা খলীফার প্রার্থীকে জামাই এবং যুবক বলে অভিহিত করেছেন।[১] কিন্তু খ্বাজাকে যুবক বলা যায় না এবং তিনি জামাতাও ছিলেন না।

মিসেস বেভারিজের মত মেনে নেওয়া কঠিন, কেননা, তা স্বকপোলকল্পিত। কোনো সমকালীন ঐতিহাসিকই এ সম্বন্ধে জামান মির্জার নাম উল্লেখ করেন নি। দামাদ শব্দের অর্থ এখানে আধুনিক রীতি বা আধুনিক ভারত-উপমহাদেশে প্রচলিত অর্থে নয় ; বরং সমকালীন অর্থে গ্রহণ করা উচিত, যেখানে দামাদ শব্দটি, ভগ্নিপতি (বোনাই) এবং শ্বশুর অর্থেও প্রযুক্ত হত।[২] গুলবদন বেগম তাঁকে 'য়াজনা' (ভগ্নিপতি) বলে অভিহিত করেছেন এবং হাবীব আস-সীয়ার গ্রন্থের লেখক খন্দমীর লিখেছেন, তিনি বাবুরের বড় বোন খানজাদা বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। দু'জনেই তাঁকে মাহদী খ্বাজা নামে উল্লেখ করেছেন।[৩] যুবক অর্থটি এখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অর্থে গ্রহণ করা উচিত, বয়সের অর্থে নয়।

যদি তাইমুর-বংশীয় কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচন করতেই হত তাহলে তো বাবুরের পুত্ররা ছাড়াও মুহম্মদ সুলতান মির্জা, তাঁর পুত্র এবং অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ছিলেন। নিজামউদ্দীন আহমদ এমন একজন লেখক যাঁর বর্ণনায় সাধারণত সন্দেহ করা যেতে পারে না। এছাড়া আবুল ফজলও তাঁকে সমর্থন করেছেন। তাহলে একথা

প্রধান পদের কথা অনুমান করা যায়, কিন্তু তাঁকে একটি পদ দেওয়া হয়েছে একথা সত্য নয়। ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২৩।

১. নিজামউদ্দীনের বাক্যটি এই প্রকার (তবকাতে আকবরী পৃ. ২৮) : "চুঁ মাহদী খ্বাজা, দামাদে হযরত ফিরদাউস-মকানী জওয়ানে সখী ওয়া বাজিল বুদ, ওয়া বা আমীর-খলীফা রাবতায়ে মুহব্বত দাশ্‌ত্।"

২. বাহারে আজম নামক শব্দকোষে দামাদ শব্দের অর্থ এই প্রকার : "কন্যার সামনে ভারতে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার সাথে কন্যার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু উত্তম শৈলীর লেখকদের রচনায় এই শব্দটি ঐভাবে প্রযুক্ত হয় না।" ফরহেংগেনাও-এ এই শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, 'কন্যার স্বামী', স্টেইনগেইস থেকে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে "A son-in-law, a father-in-law, a husband as the king's sister; nearaklly; a wooer, a lover"

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ. ২৮, বেভারিজ, প. ১২৬, খন্দমীর হাবীব উস সীয়ার ; ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১, পৃ. ২২-২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব যে, এই লেখকেরা মুহম্মদ জামান মির্জার স্থলে মাহদী খ্বাজার নাম দিয়েছেন ? মুহম্মদ জামান হুমায়ূনের সময়ে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তিনি উচ্চস্তরীয় মোগল আমীরদের অন্যতম ছিলেন। এজন্য সেখানে ওলটপালটের কোনো সম্ভাবনাই প্রতীত হয় না। তাছাড়া নিজামউদ্দীন আহমদের পিতা এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি কীভাবে জামান মির্জা ও মাহদী খ্বাজার মধ্যে গড়বড় করে দিতে পারতেন ? যদি একথা বলা হয় যে, বাবুর জামান মির্জাকে কোথাও বসাতে চাচ্ছিলেন তাহলে তো আগেই তাঁর পুত্রদের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। বাদাখশানকে সুলতান মির্জাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর হিন্দালকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। যদি ভারতের অংশকেও অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হত তাহলে বাবুরের নিজের পুত্রদের জন্য অবশিষ্ট কী থাকত ? তা সত্ত্বেও যদি সুলতান মির্জাকে কোথাও বসাতেই হত তাহলে খ্বাজাকেও তার পদ অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হয়ে পড়ত। এছাড়া, নিজামউদ্দীন আহমদ ও আবুল ফজল এই ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে গিয়ে 'সালতানাত' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।[১] এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সমস্যা একটি রাজ্যের গভর্নরের সাথে নয় ; বরং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। উপরোক্ত বিষয় হতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খলীফার প্রার্থী মাহদী খ্বাজা ছিলেন, মুহম্মদ জামান মির্জা নন।[২]

AMARBOI.COM

খলীফার সিদ্ধান্তের কারণ

খলীফা, যিনি তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ বাবুরের সেবায় অতিবাহিত করেছিলেন, তিনি কেন এবং কীভাবে হুমায়ূনের প্রতি নারাজ হয়ে গেলেন ?— একথা বলা মোটেও সহজ নয়, কেননা, সমকালীন ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেন নি। তিনি যদি হুমায়ূনের প্রতি নারাজ হতেনও তবুও কিছু কথা বোধগম্য হত, কিন্তু তিনি পুরো পরিবারের প্রতিই নারাজ ছিলেন এবং হুমায়ূনের সাথে সাথে বাবুরের আর সকল পুত্রকেও ত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, এর পিছনে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ থেকে থাকবে।

নিজামউদ্দীন আহমদ ও আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, খলীফা হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর বেশিদিন তখনো অতিবাহিত হয় নি। ড. ব্যানার্জির অনুমান, সম্ভবত, খলীফার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, হুমায়ূন ক্ষমতাসীন হলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিতে

১. দে, তবকাতে আকবরী, ২, পৃ. ৪২; আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৭।

২. মুহম্মদ জামান মির্জা ও মুহম্মদ সুলতান মির্জা হুমায়ূনের আমলে কয়েকবার বিদ্রোহ করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। মাহদী খ্বাজা হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের পর কখনোই বিদ্রোহ করেননি। তাহলে তিনি কী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না? হতে পারে যে, খলিফা তাঁকে এই কারণেই নির্বাচিত করে থাকবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তিনি মনে করেছিলেন তিনি ভালই করেছেন।[১] হুমায়ূন কর্তৃক দিল্লির রাজকোষ লুটের কারণেও তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এ জন্য হুমায়ূনকে তিনি ক্ষমা করেন নি। বেভারিজের অনুমান, কোনো পরামর্শ ছাড়াই হুমায়ূনের বাদাখশান ত্যাগকে তিনি ভাল চোখে দেখেন নি। নেশাসক্ত হওয়ার কারণে কাউকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করাটা ন্যায়সঙ্গত প্রতীত হয় না, বিশেষত, যখন আমরা দেখি যে, বাবুর স্বয়ং নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। অতএব, সম্রাটের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু খলীফাও নেশাদ্রব্য প্রয়োগ করে থাকবেন। সম্ভবত, শিয়া রানী মাহমের প্রভাবের জন্য তিনি অশঙ্ক ছিলেন। এও হতে পারে যে, ইরানী তুরানী ও শিয়া-সুন্নীর যুদ্ধ যা পরে মোগল আমীরদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় তা ঐ সময়েও থেকে থাকতে পারে, এবং খলীফাও অন্যান্য তুর্কি আমীরদের মধ্যে এই শঙ্কাও থাকতে পারে যে, হুমায়ূন সিংহাসনে বসলে মাহম ও তার প্রভাবে শিয়া মতাবলম্বী ও ইরানীদের প্রভাব বেড়ে যাবে।

হুমায়ূনকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার এও একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু সে স্থলে তো কামরান, আসকারি ও হিন্দালের মধ্যেকার কাউকে সিংহসনে বসানো যেতে পারত। খলীফা কেন বাবুরের পুত্রদের অস্বীকার করেছিলেন ? আর তা ছাড়া, বাবুরের পুত্রদের অতিরিক্ত অন্য কাউকে নির্বাচন করতে চাইলে, আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, যেমন, জামান মির্জা, খিজির খ্বাজা খাঁ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা সদ্বংশজাত ছিলেন। এঁদের মধ্যেকার কাউকে কেন নির্বাচন করা হল না ? ড. ব্যানার্জির এ মত সত্য বলে প্রতীত হয় যে, তাঁর এ ভাবনা ছিল ব্যক্তিগত।[২] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ তাঁর মস্ত বড় ভুল ছিল। তিনি বাবুরের ইচ্ছা, তাঁর বংশের মঙ্গল ইত্যাদির কথাও ভুলে গেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে, তার ফলে বাবুরের বংশের মধ্যে বড় বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হল। ড. ব্যানার্জির এই মত স্বীকার করা কঠিন যে, খলীফা সাম্রাজ্যের কল্যাণকে সামনে রেখে হুমায়ূনকে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছিলেন।[৩] আবুল ফজলের এই মন্তব্য 'তিনি এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (আলমে বশরিয়াত) অবলম্বন করেন',—এ কথা সর্বাংশে সত্য।[৪]

---

১. ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৯) লিখেছেন, পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে অধিক পারিতোষিক পাওয়ার কারণেও খলীফা তাঁর প্রতি হিংসার মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ প্রমাণিত হয় না। হুমায়ূন ছিলেন বাবুরের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই দৃষ্টিতে তাঁর অধিক পারিতোষিক লাভ করাটা ন্যায়সঙ্গত ছিল। যে সময়ে হুমায়ূন পারিতোষিক লাভ করেন, সে সময়ে হুমায়ূন একটি রাজকোষও লুট করেন নি। এই দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২০।

৩. "The Khalifah must have satisfied his political conscience that in rejecting Humayun he was furthuring the interests of the state." ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৯)।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুরের ইচ্ছা

এই ষড়যন্ত্রের অর্থাৎ হুমায়ূনের স্থলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে কী বাবুরের সমর্থন ছিল ? খলীফা ও বাবুরের সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ ছিল যে, এ থেকে সন্দেহ জাগে যে, তিনি বাবুরের ইচ্ছা জানা ব্যতীত এমনটি কখনোই করেন নি। এরই উপর ভিত্তি করে মিসেস বেভারিজ এই মত উপস্থিত করেছেন যে, হুমায়ূনকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে বাবুরেরও সায় ছিল। তাঁর মতে, ভিন্ন ভিন্ন কড়িকে জুড়ে দেওয়া থেকে এটাই প্রতীত হয় যে, বাবুরও অন্য কোনো ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন এবং তারপর কাবুল ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন।[১] প্রো. রাশব্রুক উইলিয়ামসও এই মত সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, খলীফা ও বাবুরের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, তা থেকে এও মনে হয় যে, হুমায়ূনের অনেক কাজ, বিশেষত, দিল্লির রাজকোষ লুণ্ঠনের কারণে বাবুর এতটাই দুঃখিত ছিলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে খলীফাকে প্রোৎসাহিত করে থাকতে পারেন।[২]

ঘটনা ও পরিস্থিতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ মত স্বীকার করা যায় না। বাবুরনামা, গুলবদন বেগমের হুমায়ূননামা ও অনান্য সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাবুর তাঁর পরে হুমায়ূনকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। বাবুরনামার অধ্যয়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাবুর হুমায়ূনের কার্যকলাপে আকছারই অসন্তুষ্ট থাকতেন। দিল্লির রাজকোষ লুণ্ঠনের পর তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই করা যায় না যে, তিনি তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকেই বঞ্চিত করতে চাচ্ছিলেন। ভারতীয় অভিযানগুলিতে বাবুর হুমায়ূনকে বারবার পারিতোষিক দিয়েছেন, বাদাখশান থেকে ফেরার পর তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং বাবুর বারবার এই চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি হুমায়ূনকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চান। হুমায়ূননামায় গুলবদন বেগম লিখেছেন যে, মাহমের কাবুল থেকে ফেরার পরদিন বাবুর জর আফসাঁ-র বাগানে বেড়াতে যান। সেখানে একটি ওজুখানা (নামাজ

---

১. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৭০৫-৭০৬, অনুবাদক-লেখিকার মতে, (১) বাবুরের সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাবুল, দিল্লি নয় ; (২) তাইমুর বংশীয়দের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভাজনের ঐতিহ্য ছিল ; (৩) কয়েক বছর যাবত বাবুর কাবুলে ফিরতে চাচ্ছিলেন ; (৪) নিজের উত্তরাধিকার নির্ধারণের অধিকার বাবুরের ছিল ও বাবুর মুহম্মদ জামান মির্জাকে কোথায় বসাতে চাচ্ছিলেন, তিনি শেষে স্বীকার করেছেন যে, হুমায়ূনের অসুস্থতার পর বাবুর এ চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন।

২. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ার আগে যেখানে হাত-মুখ ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করা হয়) ছিল। তা দেখে বাবুর বললেন, "আমার হৃদয় সালতানাত ও বাদশাহীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি জর আফশাঁর বাগিচায় একান্তবাস গ্রহণ করতে চাই। আমার সেবার জন্য তাহির আফতাবচীই যথেষ্ট। আমি হুমায়ূনকে বাদশাহী প্রদান করছি।" একথা শুনে আকা (মাহম বেগম) ও অন্যান্য পুত্র-কন্যারা কান্নাকাটি শুরু করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ আপনাকে বছরের পর বছর ধরে মসনদে আসীন রাখুন এবং অগণিত রাজকর্মচারীকে আপনার রক্ষাধীনে রাখুন এবং সমস্ত পুত্র আপনার চরণে বার্ধক্যে উপনীত হোক।"[১]

হুমায়ূনের অসুস্থাবস্থায় তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর মা মাহম চিন্তিত তো ছিলেনই, বাবুরও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মাহম বাবুরকে বলেন, তিনি এ জন্যই দুঃখিত যে, হুমায়ূন তাঁর একমাত্র পুত্র, কিন্তু বাবুরের আরো পুত্র তো আছেই। বাবুর উত্তর দিলেন, "মাহম, যদিও আমার আরো অনেক পুত্র আছে, কিন্তু আমি তোমার হুমায়ূনের মতো আর কাউকে প্রিয় বলে মনে করি না, কারণ আমি সালতানাত এবং বাদশাহী তথা সমৃদ্ধ সংসার, দুনিয়ার অদ্বিতীয়, নিজের যুগের বিচিত্রব্যক্তি, প্রতাপী, সফল এবং প্রিয় পুত্র হুমায়ূনের জন্য চাই অন্য লোকেদের জন্য নয়।"[২]

আহমদ ইয়াদগারও হুমায়ূনকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করাকে সমর্থন করেছেন।[৩] মৃত্যুর পূর্বে তো তিনি তাঁর প্রধান আমীরদের সামনে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।[৪] হুমায়ূনের ভারতে বসবাসের সময়কার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে গুলবদন বেগম লিখেছেন, হুমায়ূন ভাইদের পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের জন্য কামরানকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে খানজাদা বেগমকে

AMARBOI.COM

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ.২০ ; বেভারিজ, পৃ.১০৩। গুলবদন বেগমের ভাষা এই রকম;
"ব দর বাগে মজকুর ওজুখানা বূদ আঁরা কি দীদন্দ ফরমূদ দিলে মন অজ সালতানাত ব বাদশাহী গিরেফতা দরবাগে জর অফশাঁ ব গোশা বনশীনম ব অজ বূরায় খিদমতকারী তাহির আফতাবচী বমন বিসিয়ার অস্ত ব বাদশাহী রাব হুমায়ূঁ বদেহম দরী অস্না হযরত আকাম ব হমা ফরজন্দা গিরয়া ব বেতাকতী করদা গুফতন্দ কি খুদায়তালা সুমা রাদর মসনদে বাদশাহী সালহায় বিসিয়ার ব করনহায় বেশুমার দর অমানে খুদ নিগাহ দারদ ব হমা ফরজান্দাঁ দর কদমে সুমা ব কমালে পীরী বরসন্দ।"

২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, ফা. পৃ. ২১ ; বেভারিজ, পৃ. ১০৪।
মাহম অগরচে ফরজন্দানে দীগর দারেম আম্মাঁ হেচ ফরজান্দে বরাবর হুমায়ূঁ দোস্তনমী দারম অজ বরায় আঁ কি সালতানাত ব বাদশাহী ওয়া দুনিয়ায়েঁ রোশন অজ বরায় য়গানয়ে জহাঁ বা নাদিরয়ে দৌরাঁ কামগার বরখুরদার ফরজান্দ দিল্ বন্দী, হুমায়ূঁ মী খাহম ন বরায় দীগরাঁ।

৩. আহমদ ইয়াদগারের বর্ণনার জন্য দেখুন এই পুস্তকের ৩১ পৃ.।

৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ. ২৪, আকবরনামা ১, পৃ. ১১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দাহারে পাঠালেন। কামরান ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তাঁর নামে খুতবা পড়া হোক। হিন্দাল এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, "বাবুর তাঁর জীবৎকালে হুমায়ূন বাদশাহকে স্বয়ং বাদশাহী প্রদান করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম। এতদিন যাবত তাঁর নামে খুতবা পড়ানো হয়ে আসছে। এখন খুতবার পরিবর্তন করা উচিত নয়।" এ কথার প্রমাণ অন্যান্য মহিলাদের সাক্ষ্যেও হল এবং সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, বাবুর হুমায়ূনকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন।[১] এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোগল দরবারে একথা সর্বজনবিদিত ছিল যে, বাবুর হুমায়ূনকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।

বাবুরের জীবনের অন্তিম কালে হুমায়ূন কালিঞ্জর আক্রমণ করেছিলেন। কালিঞ্জরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে ৯৩৬ হিজরি সন (ফেব্রুয়ারি - মার্চ ১৫৩০ খ্রি.) লিপিবদ্ধ আছে এবং এতে হুমায়ূনকে বাদশাহ গাজী বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২] সাধারণত, উত্তরাধিকারীদের সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে কিছু উপাধি ধারণ করার আদেশ দিতেন। এ থেকেও হুমায়ূনের উত্তরাধীকারী মনোনীত হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়। নফাইসুল মআসীর এর লেখক আলাউদ্দৌলা বিন ইয়াহিয়া কাজবিনী লিখেছেন, "হুমায়ূন তাঁর পিতার অসিয়ত অনুসারে সালতানাতের রাজসিংহাসন এবং বাদশাহ গাজীর স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।"[৩] আবুল ফজল স্পষ্ট ভাষার লিখেছেন যে, বাবুর খ্বাজা খলীফা, কম্বর আলী বেগ, তরদী বেগ, হিন্দু বেগ ও অন্যান্য আমীরদের সামনে তাঁকে রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত শিক্ষা দেন এবং বলেন, "আমার শিক্ষার সারাংশ হল, নিজের ভাইদের হত্যার, তা তারা যা-ই করুক না কেন, সে বিচার না করা।"[৪] এই বর্ণনা থেকে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বাবুর তাঁর পরে হুমায়ূনকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। এর অতিরিক্ত আবুল ফজল ও নিজামউদ্দীন এই সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্ক জানার জন্য শ্রেষ্ঠ সাধনগুলি পেয়েছিলেন। এঁরা দু'জনেই এই ষড়যন্ত্রকে বাবুরের অসুস্থতাকালীন সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়ে যায় যে, এই ষড়যন্ত্রের শুরু বাবুরের ইচ্ছায় হয় নি ; বরং তাঁর শক্তিহীনতার অবস্থায় হয়েছিল।

বাবুর ভারতের শাসনব্যবস্থা অন্য কারো হাতে তুলে দিয়ে সপরিবারে কাবুলে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন একথাও সত্য নয়। বাবুরের দৃষ্টিতে কাবুল ও তার নিকটস্থ ভূ-ভাগের গুরুত্ব থেকে থাকতে পারে, কিন্তু ভারতে আসার পরে তিনি

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ. ২৪, আকবরনামা ১, পৃ. ৬২।

২. জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪৮ পৃ. ১৮৬।

৩. রিজভি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ৪৫৯।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা তাঁর পরিবার এখান থেকে চলে যান নি। তাঁর সমস্ত প্রধান আমীর এখানেই ছিলেন। মাহমুদ গজনী তথা মুহম্মদ ঘুরীর ন্যায় তিনি যদি কাবুলকে কেন্দ্র বানাতে চাইতেন তাহলে এতদিন ভারতে তিনি কখনোই থাকতেন না এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ভারতে আনতেন না। হুমায়ূনের বাদাখশান থেকে ফিরে আসার পর এবং খলীফাও যেতে অস্বীকার করার পর তিনি সুলেমান মির্জাকে কেন বাদাখশান দিয়ে দিলেন ? যদি কাবুলকে স্থায়ী কেন্দ্র বানানোর ইচ্ছা তাঁর থাকত তাহলে তিনি কখনোই এ ব্যবস্থা করতেন না।

সম্পূর্ণ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটাই প্রতীত হয় যে, হুমায়ূনের কিছু কাজে বাবুর খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং কয়েকবার তা নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। খলীফা তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন এবং এ বিষয়টি তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। সম্ভবত, বাবুর হুমায়ূনের প্রতি হতাশার ভাবও প্রকাশ করেছিলেন। খলীফা এ থেকে এ অনুমানও করে থাকতে পারেন যে, বাবুর হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং এর ফলে, হুমায়ূনকে বঞ্চিত করার উৎসাহ লাভ করেন। এতে নিশ্চিত হয়েই তিনি প্রার্থী নির্বাচনে নেমে পড়েন এবং এতে মাহদী খ্বাজাও একজন ছিলেন। এই রকমই, খলীফার চিন্তাধারা ভ্রান্ত কারণ ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এ চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন।[১] বাবুরের দ্বারা তো মাহদী খ্বাজাকে সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা, বাবুরনামা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন।[২]

AMARBOI.COM

ষড়যন্ত্র শুরুর পটভূমিকা

আর্সকিনের মতে, এ ষড়যন্ত্র বাবুরের মৃত্যুর সময়কার।[৩] প্রফেসর রাশব্রুক উইলিয়ামস আর্সকিনের সাথে একমত নন। তাঁর মতে, যে সময় মাহম কাবুল থেকে আগ্রা আসছিলেন (সন ১৫২৯ খ্রি.) সে সময়ে তিনি মাহদী খ্বাজার জায়গীর ইটাওয়া হয়ে আসেন। এখানেই তিনি এই ষড়যন্ত্রের খবর পান। তিনি অনতিবিলম্বেই তা হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলে, তিনি কালবিলম্ব না করেই কাবুল থেকে রওনা হয়ে যান। এই রকমই, পণ্ডিত লেখকের বর্ণনানুসারে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মেই এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৪]

১. "There is no reason to think but Babur had any knowledge of the intrigue" (ত্রিপাঠী, সাম অ্যাসপেকটস, পৃ. ১২৪)।

২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৮৮ - ৮৯।

৩. আর্সকিন, ১, পৃ. ৫১৪।

৪. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৭১-৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে প্রফেসর উইলিয়ামের মত স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাবুরনামা অনুসারে, বাবুর ২২-২৩ জুন, ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ইটাওয়ায় ছিলেন এবং ২৪ জুন তিনি আগ্রায় পৌছান। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি বাবুরের পরে, অর্থাৎ, ২৩ জুনের পরে ইটাওয়ায় পৌছে থাকবেন। হুমায়ূন ৭ জুলাই ১৫২৯-এ আগ্রায় পৌছান। এই রকমই, তিনি মাহমের কাছে তের-চৌদ্দ দিনের অধিক সময় ছিলেন না (২৪ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত)। এত কম সময়ে ইটাওয়া থেকে বাদাখশানে খবর পাঠানো এবং সেখান থেকে ডেকে পাঠানো অসম্ভব ছিল। এছাড়া হুমায়ূন ৭ জুন কাবুলে ছিলেন। এইভাবে তিনি মাহমের ইটাওয়া পৌছানোর আগেই বাদাখশান থেকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, প্রফেসর রাসব্রুক ইউলিয়ামসের এই মত, মাহম এই ষড়যন্ত্রের খবর ইটাওয়ায় জানতে পেরেছিলেন, অসম্ভব প্রতীত হয়।[১]

হুমায়ূন বাদাখশান থেকে ফেরার কিছুদিন পর সম্ভল চলে যান। যদি তিনি কোনোক্রমে ষড়যন্ত্রের আভাস পেতেন তাহলে সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে দরবার ছেড়ে কখনোই সম্ভল যেতেন না। এছাড়া অন্য একটা প্রশ্নও বিচরণীয়। যদি ষড়যন্ত্র বাদাখশান থেকে ফেরার আগেই হয়ে থাকে তাহলে এতদিন পর্যন্ত কীভাবে গোপন থাকল ? বাবুর তাঁর জীবনদান হুমায়ূনের জন্য করেছিলেন, আর এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে একথা জানা সম্ভব হয় যে, খলীফা সম্রাটের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছিলেন। যদি খলীফা হুমায়ূনকে সিংহাসন বঞ্চিত করার চিন্তা ১৫২৯-এ করে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বাবুরকে তাঁর জীবনদান করা থেকে বিরত রাখার প্রয়াস চালাতেন।

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই ষড়যন্ত্রের চিন্তা বাবুরের রোগশয্যা গ্রহণের সময় শুরু হয়েছিলে। বাবুর কয়েক মাস যাবত অসুস্থ থাকেন এবং প্রায় ৬ মাস রোগশয্যায় পড়ে থাকেন। এই সময়কালে বাবুরের পুত্রেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। হিন্দাল বাবুরের মৃত্যুর পর আগ্রায় পৌছান।[২] আসকারী কামরানের সাথে কাবুলে অবস্থান করছিলেন। এই সময় মীর খলীফার শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি মোগল সম্রাটের নামে ফরমান জারি করতেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, তিনি এমন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসাবেন যাতে সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকতে পারে। এই-ভাবে, এই ষড়যন্ত্র বাবুরের অসুস্থাবস্থায় রচনা করা হয়েছিল।

---

৩. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ তথা অন্য ঐতিহাসিকদের মত হল, দু'সপ্তাহের মধ্যে হুমায়ূনকে বাদাখশানে জানানো এবং তাঁকে ডেকে পাঠানো অসম্ভব ব্যাপার ছিল (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৩-৩৪)। কিন্তু ইটাওয়া থেকে খবর পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না, কেননা, হুমায়ূন সে সময়ে কাবুল থেকে ভারতের পথে ছিলেন।

৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষড়যন্ত্রের শুরু ও শেষ

এই ষড়যন্ত্র বহু ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃতও ছিল না। নিজামউদ্দীন আহমদই এই ঘটনা জানার সবচেয়ে বড় সাধন। যদিও এর সমর্থন আবুল ফজল ও অন্যান্য লেখকদের থেকেও পাওয়া যায়।

নিজামউদ্দীন আহমদের বর্ণনা এই প্রকার :[১]

"হযরত ফিরদাউস মকানী যখন আগ্রায় ইন্তেকাল করেন তখন ঐ দিনে এই ইতিহাস লেখকের পিতা মুহম্মদ মুকীম হরবী তাঁর সেবকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং দীওয়ান-এ বিউতাতের সেবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। কেননা, আমীর নিজামউদ্দীন আলী খলীফা, যাঁর উপর শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল, ভাগ্যবান শাহজাদা মুহম্মদ হুমায়ূন মির্জার সাথে কোনো কারণে, যা জগৎ সংসারে নিরন্তর ঘটে চলেছে, ভয়ভীত ছিলেন, অতএব, তিনি তাঁর বাদশাহ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যেখানে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে ছিলেন না, সেখানে কনিষ্ঠ পুত্রদের পক্ষে কীভাবে থাকতে পারতেন ? কেননা, হযরত ফিরদাউস মকানীর দামাদ মাহদী খ্বাজা দানী, উদারচেতা এবং যুবক ছিলেন এবং আমীর খলীফার সাথে তাঁর বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। অতএব আমীর খলীফা তাঁকে বাদশাহ মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকদের মধ্যে একথা ছড়িয়েও পড়ল। তারা মাহদী খ্বাজাকে অভিবাদন জানাতে যেতে থাকল। তিনিও তা বুঝে নিয়ে লোকদের সাথে বাদশাহের ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন।

সংযোগবশত, মীর খলীফা, মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তিনি একটি খরগাহ্‌তে (বড় তাঁবু) অবস্থান করছিলেন। মীর খলীফা, বর্তমান গ্রন্থের লেখকের পিতা মুহম্মদ মুকীম এবং মাহদী খ্বাজা ছাড়া ঐ তাঁবুতে আর কেউ ছিলেন না। মীর খলীফা কিছুক্ষণ বসতে না বসতেই হযরত ফিরদাউস মকানী (বাবুর) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মীর খলীফা যখন মাহদী খ্বাজার তাঁবু থেকে বেরুতে উদ্যত হলেন তখন মাহেদী খ্বাজা তাঁকে তাঁবুর দরজা পর্যন্ত পৌছে দিতে গেলেন এবং দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। বর্তমান লেখকের পিতা তাঁর সম্মানের কারণে তাঁর পিছু পিছু রইলেন। মাহদী খ্বাজা কমবেশি পাগলামির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি লেখকের পিতার উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মীর খলীফাকে বিদায় দেওয়ার পর দাড়িতে হাত ফেরাতে ফেরাতে বলতে লাগলেন, আল্লাহ চাহেতো, আমি সবার আগে তোর চামড়া ছাড়াবো। একথা বলার পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল লেখকের পিতার উপর। তিনি তাঁর কান ধরে বললেন, ওরে তাজিক ! লাল জিহ্বা সবুজ মাথাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়।[২]

---

১. তবকাতে আকবরী পৃ. ২৮-২৯ এবং দে কৃত ইংরেজি অনুবাদ, ২. পৃ. ৪৬ - ৪৪।

২. নিজামউদ্দীনের বাক্যটি এই প্রকার :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার পিতা বিদায় হয়ে বাইরে এলেন এবং অতি শীঘ্রই মীর খলীফার কাছে পৌছে গিয়ে বললেন, আপনি মুহম্মদ হুমায়ূন মির্জা এবং তাঁর ভাইদের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিরা থাকতেও নেমকহালালী ত্যাগ করে এটাই চাচ্ছিলেন যে, রাজত্ব অন্য বংশের হাতে চলে যাক। এর পরিণাম এছাড়া আর কিছু নেই। একথা বলে তিনি মাহদী খ্বাজার কথা বলে দিলেন। মীর খলীফা তৎক্ষণাৎ মুহম্মদ হুমায়ূন মির্জাকে অতি শীঘ্র ডেকে নিয়ে আসার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিলেন। নিরাপত্তা কর্মীদের পাঠিয়ে তিনি মাহদী খ্বাজাকে খবর পাঠালেন যে, "হযরত বাদশাহের আদেশ যে, তুমি অনতিবিলম্বেই নিজের বাড়ি চলে যাও।" ঐ সময়ে মাহদী খ্বাজার জন্য দস্তরখানে পানাহারের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তা কর্মীরা তৎক্ষণাৎ জবরদস্তি করে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

"তারপর মীর খলীফা আদেশ দিলেন ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে দেওয়া হোক যে, কেউ যেন মাহদী খ্বাজার বাড়িতে না যায় এবং তাকে অভিবাদন না জানায়, আর সে যেন দরবারেও উপস্থিত না হয়।"

নিজামউদ্দীনের বর্ণনা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. বাবুরের জীবনের অন্তিম সময়ে খলীফা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল।
২. তিনি হুমায়ূনকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁকে ভয় করতেন এবং সন্দেহের চোখে দেখতেন।
৩. তিনি বাবুরের কনিষ্ঠ পুত্রদেরও সিংহাসনে বসানোর পক্ষপাতী ছিলেন না।
৪. নিজের শক্তিকে স্থায়ী করার জন্য খলীফা এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন।
৫. ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মাহদী খ্বাজাকে নির্বাচন করা হয়েছিল।
৬. এ ষড়যন্ত্র খলীফাই শুরু করেছিলেন।
৭. মাহদী খ্বাজাকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেও তিনি খলীফার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত নিচ বলে মনে করতেন।
৮. নিজামউদ্দীন এই ষড়যন্ত্রের তথ্য, তাঁর পিতার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন, যিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কৃতিত্বও তাঁরই।

AMARBOI.COM

"জুবান সুর্খ সরসব্জ মী দীহদ বাদ।"
এ কথাটি নখশবীর তূতীনামার একটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যা, সংস্কৃতের শুক সপ্ততি (অর্থাৎ, তোতার সত্তরটি কাহিনী) নির্ভর। এখানে এর অর্থ হল মুকীম হারবী একথা কাউকে বললে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না।
হোদীওয়ালা, স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, ১, পৃ. ৫০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল ফজল এ ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেছেন

"যখন হযরত গেতী সিতানী ফিরদাউস মকানী (বাবুর) অত্যধিক রুগ্ন হয়ে পড়েন তখন মীর খলীফা মানুষের মানবীয় স্বভাবের[1] জন্য যেখানে বানীর (হুমায়ূন) প্রতি আশঙ্কিত হওয়ার কারণে অদূরদর্শিতাবশত মাহদী খ্বাজাকে সিংহাসনারূঢ় করতে চাচ্ছিলেন তখন খ্বাজা মাহদীও মূর্খতা, দুরাকাঙ্ক্ষা ও অজ্ঞানতার বশে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত হয়ে ভিড় জমিয়ে তুলতেন। অনন্তর, দূরদর্শিতা ও শুভবুদ্ধির যখন উদয় হল তখন মীর খলীফা সঠিক পথে ফিরে এলেন এবং তিনি এ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলেন এবং খ্বাজাকে দরবারে আসতে নিষেধ করে দিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, কেউ যেন তাঁর বাড়িতে না যায়। এই ভাবে, আল্লাহর কৃপায় সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল এবং সত্য তার আপন কেন্দ্রে পৌছে গেল।"[2]

তারীখে শাহীর লেখক আহমদ ইয়াদগারও নিজামউদ্দীনের বর্ণনা সমর্থন করেছেন।[3]

এই সমস্ত সমকালীন লেখকদের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, এ ষড়যন্ত্র বাবুরের রুগ্নাবস্থায় শুরু হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল, যদিও তা হুমায়ূনের রাজত্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের শাসনকালে মাহদী খ্বাজা ও খলীফা

হুমায়ূনের সিংহাসনারূঢ় হবার পর শাসন ও রাজকার্য থেকে খলীফাকে অব্যাহতি দেওয়া হল। হুমায়ূনের শাসনকালে তাঁর নাম লুপ্ত হয়ে গেল। সমকালীন গ্রন্থাবলীতে, এরপরে সামান্য ক্ষেত্রেই মাত্র তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বোন সুলতানমের সাথে হিন্দালের বিয়ে হয়।[4] এই বিয়েতে খলীফা অমূল্য উপহার দেন। খলীফার পুত্র মুহিব আলী খাঁ ও খালিগ বেগ রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত থাকেন।[5] খলীফার ছোট ভাই জুনায়েদ বরলাস বাবুরের আমলে জৌনপুর ও অন্যান্য স্থানের গভর্নর ছিলেন এবং হুমায়ূনের রাজত্বকালে

১. আকবরনামা, (পৃ. ১১৭) এখানে 'আলমে বশরিয়ত' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।
২. আকবরনামা, (পৃ. ১১৭) এখানে আলমে বশরিয়ত, শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।
৩. তারীখে শাহী, পৃ. ১৩০ - ১৩৫। কবিতায়, হুমায়ূননামা অনুসারে, খলীফা ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। এ প্রশ্ন থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, কাবুলের কিছু লোক হুমায়ূনকে রাজত্ব ও তুর্কি আমীরদের নেতৃত্ব দানের যোগ্য বলে মনে করতেন না। ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৯ - ৩০।
৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১২৬ - ১২৭।
৫. ব্লকম্যান, আঈনে আকবরী, পৃ. ৪৬৩ - ৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমৃত্যু হুমায়ূনের পক্ষে যুদ্ধ করেন।[১] এইভাবে, একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খলীফার পরিবারের কোনো ক্ষতি করা হয় নি, এমনকী তাঁকে কোনো দণ্ডও দেওয়া হয় নি, তবে তাঁর শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে সিদ্ধ হয় যে, তিনি হুমায়ূনের সিংহাসনে বসতে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করেছিলেন। তিনি কতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এও বলা বেশ কঠিন। তিনি বয়সে বাবুরের চেয়ে বড় ছিলেন। অনুমিত হয় যে, হুমায়ূনের শেরশাহের সাথে পরাজয় ও সাম্রাজ্য হারোনোর সময়ে (১৫৪০ খ্রি.) তিনি ইন্তিকাল করেন।

মাহদী খ্বাজার বিষয়েও আমরা আর বেশিকিছু জানতে পারি না। তারীখে ইব্রাহীমী হতে জানা যায় যে, তাঁকে কালপীর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।[২] এ থেকে স্পষ্ট যে, হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। গুলবদন বেগমও হিন্দালের বিয়ের বর্ণনাকালে তাঁর উল্লেখ করেছেন।[৩] মনে হয়, এর কিছুদিন পরেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। সম্ভবত, খানজাদা বেগমের কোনো পুত্র ছিল না কিন্তু তাঁর পত্নীর জাফর খ্বাজা নামক এক পুত্র ছিল। মাহদী খ্বাজা আমীর খসরুর কবরে একটি প্রাচীর বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্বেত পাথরের একটি ফলকে তার শিলালিপি অঙ্কিত করিয়ে দিয়েছিলেন।[৪]

ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ

এই ষড়যন্ত্র, যেমনটি ড. ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, ব্যর্থ হয়নি বরং উবে গেল।[৫] বাস্তবে এ ষড়যন্ত্রের ধরন দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা একটা মত কিংবা পরিকল্পনার মতোই ছিল এবং এ পরিকল্পনা কার্যকর করতে কোনো প্রয়াস চালানো হয় নি। খলীফা তাঁর প্রার্থীর মনোবাসনা জেনে ফেলার পর তৎক্ষণাৎ তাঁর সংস্পর্শ ত্যাগ করেন।

বাস্তবে, খলীফার প্রার্থী যোগ্য ছিলেন না। নিজামউদ্দীনের বর্ণনা থেকে এমনও মনে হয় যে,তাঁর মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না এবং তাঁর মধ্যে কিছু পাগলামির লক্ষণও ছিল।[৬] আহমদ ইয়াদগারও একথা সমর্থন করেন।[৭] এতে কোনো সন্দেহ

---

১. আর্সকিন, খণ্ড ২, পৃ. ১১০, ১২২, ১২৩, ১৩১, ১৩৩, ১৩৯ ; গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, খলীফা, পৃ. ২৬, পাদটীকা।
২. তারীখে ইব্রাহীম, রিজভী, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৪।
৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূনামা, পৃ. ২৬।
৪. মির্জা, লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অব আমীর খসরু, পৃ. ১৩৮।
৫. "The plot did not fail but fizzled out." ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৬।
৬. নিজামউদ্দীনের বাক্যটি এই রকম : বশায়বয়ে, জুনু মনসূব বৃদ।" হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৫০৫।
৭. তারীখে শাহী, পৃ. ১৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই যে, তিনি না ছিলেন উচ্চকাঙ্ক্ষী আর না ছিল তাঁর কোনো ব্যক্তিত্ব। নইলে, খলীফার পিছু হটে যাওয়ার পরও তিনি রাজ্য লাভের জন্য কোনো না কোনো প্রচেষ্টা অবশ্যই চালাতেন। এমন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াসই ভুল ছিল।

মাহদী খ্বাজা ও হুমায়ূনের মধ্যে হুমায়ূনই অধিক যোগ্য ছিলেন।[১] হুমায়ূনের চারিত্রিক দোষ, যা পরে প্রখর হয়ে ওঠে এবং ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা তখনো পর্যন্ত প্রকট হয় নি। মাহদী খ্বাজা এমন মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে, তাঁকে হুমায়ূনের চেয়ে অধিক উপযুক্ত বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বংশগত দিক দিয়েও হুমায়ূনের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। হুমায়ূনের মাতা মাহম বেগম বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন এবং রাজকার্যে তাঁর সহায়তাও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

খলীফার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল বাবুরের সমস্ত পুত্রকে ছেড়ে মাহদী খ্বাজার পক্ষ অবলম্বন করা। মোগল বংশের সাম্রাজ্য পুত্রদের মধ্য বণ্টন করে দেওয়ার ঐতিহ্যও ছিল। বাবুরের আমীর তাঁর বংশের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁর স্থলে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করলে গৃহযুদ্ধ নিশ্চিত ছিল। হুমায়ূনের সমস্ত ভাই এ পরিস্থিতিতে তাঁকে সহযোগিতা করতেন।

খলীফার ধ্যান-ধারণা ছিল অত্যন্ত গর্হিত। তিনি হুমায়ূনকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে বাবুরের বংশের রাজত্ব শেষ করে দিতে চাচ্ছিলেন। এইভাবে, বাবুরের সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ব্যর্থ হয়ে যেত এবং বাবুরের বংশ নির্বংশ হয়ে যেত। খলীফার সিদ্ধান্ত মোগল সাম্রাজ্য ও বাবুরের বংশের জন্য ছিল মৃত্যুঘণ্টা।

AMARBOI.COM

১. কিছু পণ্ডিত মাহদী খ্বাজা ও হুমায়ূনের মধ্যে খ্বাজাকে অধিক উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রো. রাশব্রুক উইলিয়ামস লিখেছেন; "Khalifah may have been convinced that Mahdi khwajah would make a better emperor than Humayun. Indeed Humayun's conduct and bearing must have caused grave anxiety to all who had the welfare of the kingdom at heart." (ইউলিয়ামস অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৭১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়
হুমায়ূনের সমস্যাবলী

বাবুর তাঁর নিজহাতে গড়া সাম্রাজ্য তাঁর জীবৎকালে সুস্থিত করে যেতে পারেন নি, আর তাঁর শত্রুদেরও পূর্ণরূপে নির্মূল করে যেতে পারেন নি। এছাড়া তাঁর মৃত্যুর পরে আরো কিছু সমস্যাও সামনে এসে গিয়েছিল। এই রকমই খলীফার ষড়যন্ত্র সম্রাট হুমায়ূনের ভবিষ্যতের কাঠিন্যের সূচনা ছিল। তাঁর কাঠিন্যগুলো আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি :

১। অভ্যন্তরীণ সমস্যা,
২। বাহ্যিক সমস্যা।

হুমায়ূনের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী

মোগল সাম্রাজ্য

বাবুরের মৃত্যুর সময়ে মোগল সাম্রাজ্য অক্সাস নদী থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পশ্চিম সিন্ধু, কাবুল, গজনী ও কান্দাহারের উপর বাবুরের পূর্ণ আধিপত্য ছিল কিন্তু হিন্দুকুশ পার্বত্যাঞ্চলের গোত্রগুলোর লোকেরা তাঁর নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেছিল। সিন্ধু নদী, কাবুল, গজনী ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী জালালাবাদ, পেশোয়ার, কোহদমন, সোয়ও ও বাজৌর বাবুরের অধিকারে ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ সিন্ধুতে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হতো।[১] এর পূর্বে পঞ্জাব, মুলতান ও সতলজ এবং বিহারের মধ্যবর্তী অংশও (দিল্লি, সিরসা, হাঁসি ইত্যাদি) তাঁর অধিকারে ছিল। এইভাবে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মালব, রাজপুতানা, বিয়ানা, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র ও চান্দেরি তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করত। দক্ষিণ বিহারের পার্বত্যাঞ্চলও পূর্ণত তাঁর অধিকারে ছিল না। এই এলাকাটির উপর আফগান ও হিঁদু দলপতিদের রাজত্ব ছিল।[২] এইভাবে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মালব তথা

১. বাবুরনামা বেভারিজ, পৃ. ৫২৬ - ২৭। বাবুরের মুলতান অভিযানের জন্য দেখুন, আর্সকিন, ১. পৃ. ৩৯৮। অবোহর, সিরসা, হাঁসি ও হিসার বাবুরের সাম্রাজ্যাধীন ছিল কিন্তু গণেশগড়, হনুমানগড় ও জিতপুরা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২৯।
২. শরণ, প্রোভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগলস, পৃ. ৪৬ - ৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুন্দেলখণ্ড, পূর্বে বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিমে অক্সাস পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা যমুনার মধ্যভাগ মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

বাবুর তাঁর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাজন করেন নি। অতএব, লোদী সুলতানদের আমলেরই বিভাজনের উপর রাজ্যশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। সাম্রাজ্য দুইভাবে শাসিত হত : এমন সরকার, যা পূর্ণরূপে শাসনাধীন ছিল এবং সেই সমস্ত রাজ্য যা স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের অধীন ছিল, যাঁরা অধীনতা স্বীকার করেছিলেনই কিন্তু তাঁরা অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাও ভোগ করতেন, এ ধরনের রাজ্যগুলো মোগল সম্রাটকে নির্ধারিত কর পরিশোধ করত। এই রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রফল মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় ১/৫ এর সমান ছিল।[১] বাবুর পানিপথ এবং খানুয়ার যুদ্ধের পর অধিকৃত ভূ-ভাগ তাঁর উমরাহদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। এই উমরাহগণ ঐ অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। সেখানকার রাজস্ব উসুল করতেন এবং সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত থাকত। এঁরা ঐ স্থানগুলোর স্থায়ী মালিক হতেন না এবং এঁদের স্থানান্তরও করা হত।[২]

শাসন ব্যবস্থা : মোগল সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে বিশাল ছিল কিন্তু তার প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ছিল অপূর্ণ। বাবুর স্বয়ং তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, যোগ্য ব্যক্তিদের দূরবর্তী পরগনাগুলোতে পাঠিয়ে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অবসর তিনি পাননি। এছাড়া বাবুরের শাসকীয় যোগ্যতাও ছিল না। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাবুর এই সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু এর শাসন-শৃঙ্খলা ছিল ঢিলা।[৩] প্রান্তীয় কেন্দ্রগুলোতে গভর্নর তথা দিওয়ান এবং এর নিচের অংশ কোতওয়াল এবং শিকদার ছিলেন রাজ্যের প্রধান প্রশাসক। এই প্রশাসকরা জায়গিরদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করতেন। সুদূর সাম্রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাবুর এজন্য নতুন কোনো প্রয়াস চালান নি। এর পরিণামে শাসন কেবল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল।[৪] জনসাধারণের উপর মোগল সাম্রাজের

AMARBOI.COM

১. বাবুরনাম, বেভারিজ পৃ. ৫২০-২১। বাবুর লিখেছেন, ভীরা থেকে বিহার পর্যন্ত যে প্রদেশ তাঁর অধীনে ছিল তার রাজস্ব ছিল বাহান্ন কোটি, যার মধ্যেকার আট বা ন'কোটি ঐ সমস্ত রায় এবং রাজাদের পরগনাগুলো থেকে পাওয়া যেত, যারা অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং স্থায়ী রূপে যাদের পরগনা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

২. শরণ প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগলস, পৃ. ৪৮।

৩. "The kingdom had been hastily acqired and its provinces loosely knit." (ব্যানার্জি. ১. পৃ. ৩০)।

৪. "The Scheme of Government was still saifi (by the sword) not qalami (by the per)" (কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ.২১)।
"The administrative system was inefficient." ব্যানার্জি হুমায়ূন পৃ. ৩০)।
Had Babur been as successful in administration as he was in Fighting the troubles of Humayun's reign would never have occurred. As it was he bequeathed to his son a monarchy which could be held together only by continuance of war conditions

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না।[১] মোগল সাম্রাজ্য মূল সমাজের নিম্নতর স্তরে পৌছাতে পারে নি। জনসাধারণ মোগলদের বিদেশী বলে মনে করত। যার ফলে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ছিল এবং এর ফলে তারা কখনো বা বিদ্রোহও করতে পারত। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লগ্নের পাঁচটি বছরে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। জনসাধারণের মধ্যে আফগানদের মিত্রদের সংখ্য নিতান্ত কম ছিল না।

রাজকোষ : মোগল সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। বাবুর পানিপথের পরে ধন সম্পদের অপব্যয় করেছিলেন। হুমায়ূন, কামরান, আসকারি ও অন্যান্য আমীরদের পুরস্কৃত করা ছাড়াও ইরাক, কাশগড়, খোরাসান ও সমরকন্দের আত্মীয় পরিজনদের উপহার পাঠানো হয়েছিল এবং কাবুল ও বরসক উপত্যকার (বাদাখশানে) প্রতিটি নর-নারী, দাস দাসী এবং প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের একটি করে শাহরুখি পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।[২] এই দানপ্রিয়তায় কারণে তাঁকে কলন্দর বলা হত।[৩] এই অপব্যয়ের পরিণাম দু'বছরের মধ্যেই প্রকট হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, অক্টোবর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ তক সিকান্দার ও ইব্রাহিম লোদীর কোষ শেষ হতে চলেছিল এবং তাঁকে তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপর ত্রিশ শতাংশ কর বসাতে হয়।[৪] এই রকমই, হুমায়ূন যখন সিংহসনে বসেন তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং রাজকোষ শূন্য ছিল। রুশব্রুক উইলিয়ামসের একথা সত্য যে, হুমায়ূনের সমস্যাবলীর পেছনে আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দায়ী ছিল।[৫]

সেনা : বাবুর সারাটি জীবন ধরে যুদ্ধ ও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে এমন লোক যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন, যাঁরা তাঁর সাথে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের সাথে বাবুরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। বাবুরের সৈন্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ছিল, যেমন চুগতাই, মোগল, ইরানী, তুরানী, আফগানও ভারতীয়। নানা জাতির, নানা বর্ণের নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের এই লোকদের এক সূত্রে বাঁধার দায়িত্ব ছিল বাবুরের। তাঁর মৃত্যুর পর এদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেনা-সংগঠন ছিল

---

which in times of peace was weak, structurless and invertebrate" (উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার পৃ.১৬২),

১. ড. ব্যানার্জির মতে (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ, ৩১) জনসাধারণ মোগলদের আগমনে এজন্য প্রসন্ন ছিল যে, মোগল সংস্কৃতি লোদী সংস্কৃতির চেয়ে অধিক অভিনন্দনযোগ্য ছিল, এ প্রতীত হয় না, কেননা, মোগল সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তা বাবুর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এমন পরিস্থিতিতে তাদের এ কল্পনা একেবারেই ভুল। এবং তারা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এইভাবে হুমায়ূনের সামনে শাসন সংক্রান্ত সমস্যা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ ৫২২-২৩।

৩. অযোধ্যার বাবরি মসজিদের শিলালিপি।

৪. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ.১৬২।

৫. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ.১৬২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

গোত্রপতি-নির্ভর এবং তাদের নেতৃত্বও ঐ গোত্র বা জাতি-গোষ্ঠীগুলোর লোকেদের উপর নির্ভর ছিল। ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে সৈন্যদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য অসম্ভব ছিল। হিংসা-বিদ্বেষের পরিণামে সঙ্কটকালীন সময়ে রাজ্যগুলোর অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারত। এদের মধ্যে এরকম অসংখ্য দলপতি ছিলেন যাঁরা বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছিলেন এবং যাঁদের যোগ্যতার উপর হুমায়ূনের খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। এই আমীরদের মধ্যে খ্বাজা খলীফা ও খ্বাজা কলাঁর ন্যায় এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যাঁরা বাবুরের সাথে অনেক পরিস্থিতিতে তাঁর সুখ-দুঃখেরও ভাগী হয়েছিলেন। এছাড়া আরো কিছু লোকও ছিলেন যাঁরা রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। এমন কিছু লোকও ছিলেন যাঁরা বাবুরের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন এবং বাবুরের ভারতীয় অভিযানগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন।

হুমায়ূনের কী এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোকেদের এক সূত্রে বাঁধার মতো যোগ্যতা ছিল ? হুমায়ূন বাবুরের প্রধান এবং প্রসিদ্ধ যুদ্ধগুলোতে অবশ্যই অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এমন নিপুণ যুদ্ধকলা প্রদর্শন করতে পারেন নি যা তাঁকে বাবুরের সমকক্ষতায় দাঁড় করাতে পারত। এই বিশ্বাসের আবশ্যকতা এই কারণেই বেড়ে গিয়েছিল, কেননা, মোগল সাম্রাজ্য তখন সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং ভারতে তখনো মোগলদের বিদেশী বলে মনে করা হত।[১]

হুমায়ূনের ভাইয়েরা

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে হুমায়ূন তাঁর ভাইদের সহযোগিতা পেতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ভাইদের সহযোগিতা তিনি পেলেন না। হুমায়ূনের তিনটি ভাই ছিলেন—কামরান, আসকারি ও হিন্দাল। কামরান বাবুরের পত্নী গুলরুখ বেগচিকের পুত্র ছিলেন। তিনি ১৫১৪ ও আসকারি ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবুরের অন্য এক পত্নী দিলদার আগাচাহের গর্ভে হিন্দাল জন্মগ্রহণ করেন ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে। এই রকমই, বাবুরের মৃত্যুর সময়ে হুমায়ূনের বয়স ছিল ২৩, কামরানের ১৭, আসকারির ১৫ এবং হিন্দালের ১২ বছর।

বাবুরের আত্মকথা তথা সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, বাবুর তাঁর পুত্রদের শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। কামরান ১৫ বছর বয়সে কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং হিন্দাল ১১-১২ বছর বয়সে বাদাখশানের গভর্নর হন। ভারতে যেমন হুমায়ূন পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তেমনই আসকারি ১৩ বছর বয়সে ঘাঘরার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে কামরানের বয়স যখন আট বছর ছিল তখন বাবুর তাঁকে ইসলামী আইন বিষয়ে তাঁর শিক্ষার জন্য একখানি কবিতা লিখেছিলেন (দর্

১. আমীরদের প্রসঙ্গে এও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এঁরাও হুমায়ূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁরা হয় হুমায়ূনের নিকটাত্মীয় ছিলেন নতুবা তার ভাইয়েরা ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিক্‌য়ে মুবাইয়ান)।[১] জানুয়ারি ১৫২৬ -এ যখন তিনি গাজী খাঁর গ্রন্থাগার থেকে হুমায়ূনকে বই পাঠান তখন তিনি কামরানের জন্যও কিছু বই পাঠান।[২] জানুয়ারি ১৫২৯-এ বাবুর তাঁর ভারতে লেখা কবিতাবলীর সংগ্রহ হুমায়ূন ও কামরান দু'জনকেই পাঠান এবং হিন্দালকে, যাঁর বয়স তখন মাত্র ১০-১১ বছর ছিল, তাঁকে তিনি বাবরি লিপির অক্ষর পাঠিয়ে দেন।[৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বাবুর তাঁর চার পুত্রকে সুখী ও সম্পন্ন দেখতে চাইতেন। এজন্য তাঁদের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। শিক্ষা ব্যতীত সাম্রাজ্যের বিষয়ে বাবুরের কী ইচ্ছা ছিল তা বলা বেশ কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এতটুকু নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, পাঁচ বছর যাবত শাসন করার পরিণামে কামরানের সম্পর্ক কাবুল ও কান্দাহারের সাথে গভীর হয়ে গিয়েছিল এবং এমতাবস্থায় হুমায়ূনের পক্ষে এই রাজ্যগুলো আপন অধিকারে রাখা মোটেও সহজ ছিল না।

এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে বাবুর নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন যে, হুমায়ূন ও কামরানের মধ্যে রাজ্য বণ্টন ছয় ও পাঁচ অনুপাতে হবে। এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না, কেননা, বাবুরের চাচা ও পিতার মধ্যে এই অনুপাতে বাঁটোয়ারা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় চাচা সুলতান আহমদ মির্জা সমরকন্দ ও তার নিকটবর্তী ক্ষেত্রটি লাভ করেছিলেন। এই অংশটি তাঁর সমস্ত ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেজো চাচা সুলতান মাহমুদ মির্জার অংশ তাঁর চেয়ে কম ছিল। তাঁর ছোট চাচা ডলুম মির্জা এর চেয়েও কম ভাগ পেয়েছিলেন। এই রকমই বাবুরও, তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিশেষত কামরানের অনুপাত নিশ্চিত করে হুমায়ূনের হাতে একটি বড় রাজ্য-সীমা তুলে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে যে, বাবুর কেবল হুমায়ূন ও কামরানের অনুপাত কেন নিশ্চিত করেছিলেন ? তাঁর অন্য দুই ছোট পুত্রের জন্য কোন অনুপাত নিশ্চিত করেন নি কেন ? এ কামরানের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে ছিল, না-কি বাবুর মনে করতেন যে, কামরান উচ্চাকাঙ্ক্ষী ; না কি এ অনুপাত নিশ্চিত না করলে সে সমস্যা সৃষ্টি করবে তা বলা কঠিন।

মৃত্যুর পূর্বে বাবুর হুমায়ূনকে উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর ভাইদের সাথে এমন কোনো আচরণ না করেন যাতে তারা দুঃখ-কষ্ট পায়।[৪] এইভাবে বাবুর হুমায়ূনকে তাঁর ভাইদের প্রতি আচরণের নীতিও নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসে যায়। নতুন পরিস্থিতিতে হুমায়ূনের প্রতি তাঁর ভাইদের মনোভাব জানা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। কামরানের অনুপাত নিশ্চিত করে বাবুর তাঁকে প্রোৎসাহিত করার অবসর তো দিয়েছিলেনই, সেই

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, পৃ. ৫১-৫২।
২. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৬০।
৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৬২।
৪. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে অন্য পুত্রদের বিদ্বেষ ভাবও জন্মে দিয়েছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে ভাইদের সাম্রাজ্য বিভাজনের দাবির জন্য হুমায়ূনের প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন ছিল। সবচেয়ে কঠিন সমস্যার এই কারণে উদ্ভব হয়েছিল যে, প্রত্যেক ভাইয়ের সমর্থক এমন কিছু আমীর ছিলেন যাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাইদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখতেন।

বাবুরের আত্মীয়-স্বজন

হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার সময়ে মধ্য এশিয়ায় কিছু প্রধান বংশের লোকজন বাবুরের সেনা-বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের কয়েক জনের সাথে বাবুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর এদের মধ্যে সংশয়, ভয় ও আশা জাগাটা স্বাভাবিক ছিল। নতুন শাসকের আগমনের পর এঁরা তাঁর কাছ থেকে পদোন্নতি, ভাল জায়গীর ইত্যাদি লাভ করতে চাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যেকার অধিকাংশ লোক এমন ছিলেন যাঁরা মধ্য এশিয়ায় তাঁদের পূর্বজদের ভূমি অধিকারে রাখতে ব্যর্থ হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং এখানে তাঁরা বাবুরের কাছে পদ ও সম্মান লাভ করেছিলেন।[১]

এই সময়ে মোগল দরবারে দুটি বংশের বংশধররা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিলেন। ইউনুস খাঁর বংশের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইসান তাইমুর, তুখতাবুগা সুলতান ও খিজির খ্বাজা খাঁ প্রমুখ ছিলেন।[২] বাবুর তাঁর তিন কন্যার বিয়ে এঁদের সাথে দিয়েছিলেন। এছাড়া ওয়ালি খুব মির্জাও ছিলেন, যাঁকে মোগল সুলতান বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু এঁর সম্পর্কে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় বংশের আমীরদের মধ্যে খুরাসানের মির্জা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে মুহম্মদ জামান মির্জা ও মুহম্মদ সুলতান মির্জা প্রমুখ ছিলেন। মুহম্মদ জামান মির্জা

---

১. তারীখে খানদানে তিমুরিয়া, তারীখে আলাবী।

২. ইউনুস খাঁ
↓
আহমদ খাঁ (ইলাচা খাঁ)
↓
- আয়মন খ্বাজা খাঁ → খিজির খাঁ (গুলবদন বেগমের সাথে বিবাহিত)
- ইসান তিমুর সুলতান (গুলরঙ্গ বেগমের সাথে বিবাহিত)
- তুখতাবুগা সুলতান খাঁ (গুলচেহরা বেগমের সাথে বিবাহিত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুরাসানের সুলতান হুসেন বাইকরার পৌত্র ছিলেন।[১] এঁর পিতামহের মৃত্যুর (৫ মে ১৫০৬ খ্রি.) পর উজবেকেরা খুরাসান অধিকার করে নেয়। মুহম্মদ জামান মির্জা পালিয়ে কাবুলে বাবুরের কাছে এসে আশ্রয় নেন। এখানে বাবুর তাঁর কন্যা মাসুমা বেগমের সাথে তাঁর বিয়ে দেন।[২] ঐ বছরেই তাঁকে বলখের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। মার্চ-এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে কাস্কানকরার সুলতান সেখান থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেন।[৪] মুহম্মদ জামান মির্জা সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে আগ্রায় বাবুরের সাথে মিলিত হন। খানুয়ার যুদ্ধে এবং এর পূর্বে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মোগল সৈন্যদের পক্ষে অংশ নেন। বাবুর প্রসন্ন হয়ে এঁকে (১৩ এপ্রিল ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে) সরোপা (মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত বস্ত্র), একটি তরবারি, একটি পেটি, একটি তীপুচাক[৩] ঘোড়া ও একটি ছত্র প্রদান করেন এবং জৌনপুরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।[৪] এরপর বাবুরের অসুস্থতা ও তাঁর মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত মুহম্মদ জামান মির্জা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আর পাওয়া যায় না।

মুহম্মদ সুলতান মির্জাও তাইমুর বংশীয় ছিলেন এবং মুহম্মদ জামান মির্জার চাচাত ভাই ছিলেন। খুরাসান ও মধ্য এশিয়া থেকে ইনিও মুহম্মদ জামান মির্জার সাথে পালিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। উচ্চবংশীয় হওয়ার কারণে ইনিও ক্ষমতা লাভের জন্য সদা উৎসুক ও উতলা থাকতেন। বাবুর তাঁর দুই জামাইকেই আদর করতেন এবং সর্বদাই সুখী রাখতে চাইতেন। রাজবংশীয় হওয়ার কারণে দুই মির্জারই রাজসিক লোভ কখনোই শেষ হয়নি। বাবুরের সদ্ব্যবহারের জন্য আমীরদের মধ্যেও এঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এঁরাও বংশাভিজাত্য ও বাবুরের

AMARBOI.COM

---

১. অমার তাইমুর
↓
উমর শেখ
↓
বাইকরা
↓
গিয়াস উদ্দীন মনসূর
↓
- বাইকরা মির্জা
  ↓
  সুলতান ওয়াইস মির্জা
  ↓
  মুহম্মদ সুলতান মির্জা
- সুলতান হুসেন মির্জা
  ↓
  বদীউজ্জামান মির্জা
  ↓
  - মুহম্মদ জামান মির্জা
  - মুহম্মদ মুনীম মির্জা

২. আহসানত তাওয়ারীখ ১, পৃ. ১৬৭

৩. আহসানত তাওয়ারীখ ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮ বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৫৬।

৪. বাবুরনামা পৃ. ৬৬২-৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের কারণে নিজেদের সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার বলে মনে করতেন। মির্জাদের তাঁদের পূর্ব পুরুষদের দেশে কোনো ঠাঁই ছিল না। এইভাবে ভারতে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনা এঁদের মধ্যে সর্বদাই বিরাজিত ছিল। বাবুরের দয়া ও মাহাত্ম্য এইভাবে হুমায়ূনের রাজ্যে এদের বিদ্রোহের বীজ বপন করে দিয়েছিল।

মীর মুহম্মদ মাহদী খ্বাজা ও প্রধানমন্ত্রী খলীফার বর্ণনা আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। এই সমস্ত আমীর ছাড়াও আরো বহু উচ্চকুলোদ্ভূত ও যোগ্য আমীর এই সময়ে মোগল সৈন্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন।

হুমায়ূনের বাহ্যিক সমস্যাবলী

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছাড়াও হুমায়ূনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক সমস্যাও ছিল। অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বাহ্যিক সমস্যা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারত। মোগল সাম্রাজ্যের সমীপবর্তী এলাকাগুলোতে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ছিল :

১। গুজরাত
২। বিহারে আফগান
৩। বাংলা
৪। সিন্ধু ও মুলতান
৫। মালব
৬। খানদেশ
৭। কাশ্মীর
৮। রাজপুতানা

AMARBOI.COM

১। গুজরাত

গুজরাত মধ্যযুগের ইতিহাসে তার ভৌগোলিক অবস্থান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্য সুপ্রসিদ্ধি অর্জন করে। মোতির কাজ, চিত্রকলা এবং বিভিন্ন প্রকারের সুতো, রেশমি কাপড়, তরবারি, কাটারি ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এ রাজ্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এখান থেকে বহু প্রকারের সামগ্রী বিদেশে রফতানি হত, যা থেকে প্রচুর আয় হত। এখানকার উর্বর ভূমি, বিশেষত তুলো চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আবুল ফজল তাঁর আঈন-ই আকবরীতে একে একটি বাগিচার সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপাদিত হত।[১]

১. আঈন-ই-আকবরী ২. পৃ. ২৪৬-২৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌরাণিক যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকায় মৃত্যু হওয়ার কারণে গুজরাত প্রাচীন কাল থেকেই হিঁদুধর্মের প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য হত। প্রাচীন কালে এখানে বেশ কিছু রাজবংশের উত্থান পতন হয়। মধ্যযুগের ইতিহাসে মুহম্মদ ঘুরী গুজরাতের শাসকের দ্বারা পরাজিত হন।[১] ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দীনের সেনাপতি উলুগ খাঁ ও নুসরত খাঁ গুজরাত অধিকার করে একে দিল্লির সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।[২] তুগলক সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময়ে দিল্লির সালতানাত কর্তৃক নিযুক্ত গুজরাতের শেষ গভর্নর জাফর খাঁ, যিনি ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন হয়ে যান। ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুলতান মুজাফফর শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং গুজরাতে এক নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন যা মুজরাফফরশাহী বংশ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়।

এই বংশে সুলতান মাহমুদ বেগরা শাসক রূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন (১৪৫৮ - ১৫১১ খ্রি.)। তাঁর মৃত্যুর পর ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় মুজাফফর শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি একজন প্রতাপশালী এবং যোগ্য শাসক ছিলেন। ইনি ইদর, মালব ও চিতোরের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর আট পুত্র ছিলেন, যাঁদের মধ্যে সিকান্দার ছিলেন সবার বড়। ইনি তাঁর পুত্রদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক জায়গীর দেন। বাহাদুরকে কজ (আহমদাবাদ থেকে ১৮ মাইল), কোহ (মাহমুদাবাদ থেকে ২০ মাইল) ও নবতা (বতেহ এর কাছে) দেওয়া হয়।[৩] বাহাদুর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এছাড়া বাহাদুরের তাঁর বড় ভাই সিকান্দারের দিক থেকেও ভয় ছিল, কেননা, তিনি বাহাদুরের পতন ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এজন্য বাহাদুর ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি চলে যান। পথে তিনি চিতোরে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে রাণা সাঙ্গা ও তাঁর মাতা তাঁকে স্বাগত জানান।[৪] সেখান থেকে তিনি মেওয়াতে আসেন। হাসান খাঁ মেওয়াতী গুজরাত আক্রমণের জন্য তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু বাহাদুর তা নিতে অস্বীকার করে উত্তর দেন নিজের পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। এখান থেকে বাহাদুর ইব্রাহীমের দরবারে যান।

---

১. হবীবুল্লা, ফাউন্ডেশন অব দি মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৪২ - ৪৩।
২. লাল, হিস্ট্রি অব দি খলজীজ, পৃ. ৮২ - ৮৬।
৩. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৪৬।
৪. রানার ভাইপো বাহাদুরকে আপন গৃহে আমন্ত্রিত করেন। সেখানে তিনি এক নর্তকীর রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। রাজপুত কুমার তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি কী জানেন, আমি একে কোথা থেকে এনেছি ? এ আহমদনগর (হিম্মতনগর)-এর কাজীর কন্যা। রাণা যখন তাঁর নগর লুণ্ঠন করেন তখন আমি কাজীকে তাঁরই বাড়িতে হত্যা করে এই মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, যাতে অন্য কোনো রাজপুত তাকে না নিয়ে যেতে পারে। একথা শুনে বাহাদুর এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি এই রাজপুতকে এখানেই হত্যা করেন। উপস্থিত রাজপুতেরা বাহাদুরকে শাস্তি দিতে চাইলে, অনেক কষ্টে রাণার মায়ের মধ্যস্থতায় তিনি রক্ষা পান। কাম্মিসারিয়ট, পৃ. ২৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় উত্তর ভারতে খুবই গোলমাল চলছিল। বাবুরের ভারত আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। দিল্লির সুলতান ইব্রাহীম বাহাদুরকে স্বাগত জানালেন কিন্তু বাবুরের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এতটা ব্যস্ত ছিলেন যে, বাহাদুরের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারলেন না। আফগান আমীরদের মধ্যে বাহাদুর খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং তাঁকে দিল্লির সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রও করা হয়।[১] এর ফলে ইব্রাহীম লোদী বাহাদুরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। এতে বাহাদুর শাহের কোনো দোষ ছিল না এবং তিনি তাদের উৎসাহিতও করেন নি। বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, যে সময়ে তিনি পানিপথের কাছে অবস্থান করছিলেন, সে সময়ে বাহাদুর তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। বাবুর খুবই মিষ্টি ভাষায় তার উত্তর দিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাবুর অভিযোগ করেন যে, বাহাদুর শাহ তাঁর কাছে আসেন নি এবং পরে গুজরাতে চলে গিয়েছিলেন।[২]

এটা স্পষ্ট যে, বাহাদুর শাহ পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি এবং তিনি দূর থেকেই পানিপথের যুদ্ধ দেখেছিলেন।[৩] এই যুদ্ধ তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ভবিষ্যতে বাহাদুর শাহের পরাজয়ের একটি বড় কারণ ছিল পানিপথের যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মনে গভীরভাবে গেঁথে যাওয়া। পানিপথের যুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এক সময়ে বলেছিলেন : এ ছিল কাচ ও পাথরের যুদ্ধ, যাতে কাচের ভেঙে যাওয়াটা অনিবার্য ছিল, তা সে পাথর কাচে মারা হোক কিংবা কাচ পাথরে মারা হোক, অর্থাৎ আফগানদের (কাচ) পরাজয় মোগলদের (পাথর) মোকাবিলায় নিশ্চিত ছিল।[৪] আফগানদের মধ্যে বাহাদুর শাহ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য জৌনপুরের আমীর তাঁর কাছে এসে তাঁকে জৌনপুরের সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জৌনপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গুজরাতের অবস্থার পরিবর্তনের সংবাদ পান।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর পিতা মুজাফফর শাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমীররা উত্তরাধিকার সমস্যার মুখোমুখি হলেন। কিছু আমীর মুজাফফর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকান্দারকে, কিছু আমীর তাঁর

---

১. বেলে, গুজরাত, পৃ. ২৭৮; তবকাতে আকবরী, (দে, খন্ড ৩, পৃ. ৩২১)-র মতে, "কেননা, আফগান আমীররা সুলতান ইব্রাহীমকে খুবই ঘৃণা করতেন, এজন্য তাঁরা তাঁকে হত্যা করে সুলতান বাহাদুরকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন।"
"There seems, however, no. reason is think that Bahadur was privy to this plot". (কাম্মিসারিয়ট, পৃ. ২৮১)।

২. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩, পৃ. ৩২১ - ৩২২। বাবুর লিখেছেন ; "He had sent beautiful letters to me while I was near Panipat. I had replied my royal letter's of favour and kindness summoning him to me. He had thought of coming, but changing his mind, drew off from Ibrahim's army towards Gujarat." (বাবুরনামা, বেভারিজ পৃ. ৫৩৪)।

৩. মীর আবু তুয়াব আলী, তারীখে গুজরাত, পৃ. ২ - ৩; কাম্মিস্সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ২৮১।

৪. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাট, পৃ. ২২৯; ব্যানার্জী, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৭৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুরকে এবং কিছু আমীর তাঁর তৃতীয় পুত্র লতীফ খাঁকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন। সিকান্দার তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, ঐ দিনই সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু তিনি কিছুদিনমাত্র সিংহাসনে থাকতে পারলেন।[১] তাঁর মূর্খতার জন্য আমীররা পেরেশান ছিলেন। তিনি জুতো বা আখ বেঁধে তাতে কোনো আমীরের নাম দিয়ে নিজের তরবারি দিয়ে কেটে ফেলতেন আর ভাবতেন এইভাবে তিনি তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন।[২]

তাঁর মূর্খতার কারণে ইমাদুল মুলক ২৬ মে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে, নিদ্রিতাবস্থায়, চম্পানীরে তাঁকে হত্যা করেন।[৩] সিকান্দারের মৃত্যুর পর ইমাদুল মুলক খুশকদম তাঁর ছ'বছর বয়সী পুত্র নাসির খাঁকে দ্বিতীয় মাহমুদ নামে সিংহাসনে বসালেন,[৪] যদিও বাস্তবিক রূপে শাসন ক্ষমতা ইমাদুল মুলকের হাতেই রইল। তিনি পদ ও পারিতোষিক দিয়ে আমীরদের নিজের বশে রাখার প্রয়াস চালালেন। শুরু থেকেই ইমাদুল মুলকের নীতির সাথে কোনো আমীর সহমত ছিলেন না। বিশেষত, গুজরাতের তিন প্রধান আমীর খুদাবন্দ খাঁ মসনদ আলী যিনি দ্বিতীয় মুজাফফর শাহের আমলে উজীর ছিলেন ; তাজ খাঁ নরপালী, ধুনধুকায় যাঁর জায়গীর ছিল ; তথা মুজাফফর খাঁর জামাতা (সিকান্দার খাঁর বোনের স্বামী)[৫] এবং সিন্ধুর যুবরাজ মজলিসে সামী ফাত খাঁ বালুচ তাঁর কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমীরদের বিরোধ প্রশমনের জন্য ইমাদুল মুলক নিকটবর্তী শাসকদের কাছ থেকে সহায়তা লাভের প্রয়াস চালালেন। তিনি বরহান নিজামশাহের কাছে হীরে জহরত ও ধন-সম্পদ পাঠিয়ে তাঁকে নন্দুরবর আক্রমণের জন্য প্রোৎসাহিত করলেন। আহমদনগরের শাসক তো ধন-সম্পদ গ্রহণ করলেন কিন্তু তিনি আর কিছু করলেন না। খুশকদম পোলের রাজা উদর সিংহের কাছেও চম্পানীর আক্রমণের জন্য আর্জি জানালেন। তিনি বাবুরের কাছেও সাহায্যের জন্য পত্র লিখলেন এবং এ আর্জিও জানালেন যে, বাবুর যদি সিন্ধু নদীর পথ ধরে দিউতে সৈন্য প্রেরণ করেন তাহলে তিনি তাঁকে এক কোটি টাকা দেবেন এবং গুজরাত তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে। ফিরিশতার মতে, এ আর্জি বাবুরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছায় নি, কেননা, ডুঙ্গরপুরের রাজা তাঁকে মাঝপথেই রুখে দেন।[৬] মন্ত্রীর এই কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয়বাদীরা বড়ই নিরাশ হলেন এবং

---

১. কাম্মিস্‌সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩১০ - ৩১১। সিকান্দার ৫ এপ্রিল ১৫২৬ এ সিংহাসনে বসেন এবং ২৬ মে ১৫২৬ এ তাঁকে হত্যা করা হয়। ড. ব্যানার্জি, (হুমায়ূন, ১, পৃ. ৭৮) লেখেন যে, তিনি পাঁচ দিন মাত্র শাসক থাকেন এবং ১২ এপ্রিল তাঁকে হত্যা করা হয়।

২. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাট, পৃ. ১৩৩।

৩. ফিরিশতা ব্রিগস, ৪, পৃ. ৯৮ - ১০০ ; বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩০৭ - ৩০৮ ; কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩১১। মিরাতে সিকান্দরীর লেখক লেখেন যে, সিকান্দারের মৃত্যুর পর গুজরাতে যেন শান্তিও শেষ হয়ে গেল।

৪. কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩১২।

৫. ঐ, পৃ. ৩১৩; বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩১২।

৬. কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩১১। ফিরিশতা, ফ্লিপ্স, ৪, পৃ. ১০১ - ১০২ ; বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩১৮ - ১৯ ; মিরআতে সিকান্দরী, পৃ. ২০৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কর্মকাণ্ডকে গুজরাত-বিরোধী বলে মনে করলেন। গুজরাতের কিছু রাষ্ট্রীয়বাদী চেতনার আমীর পরামর্শ করে পায়বন্দ খাঁকে বাহাদুর শাহের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে গুজরাতের সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। পায়বন্দ খাঁ পানিপথে[১] বাহাদুর শাহের সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে গুজরাতে চলে যাওয়ার জন্য আর্জি জানালেন। বাহাদুরের সামনে একটি কঠিন সমস্যা ছিল। তাঁর চোখের সামনে দুটি রাজ্য নৃত্য করছিল। জৌনপুরের আমীরদের সাথে তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা তাঁকে গুজরাত যাওয়ার জন্য অস্থির করে তুলল এবং পরিস্থিতি বুঝিয়ে তিনি তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গুজরাত অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

চিতোরে বাহাদুরের সাথে তাঁর দুই ভাই চাঁদ খাঁ ও ইব্রাহীম খাঁর সাক্ষাৎ হল। চাঁদ খাঁ ভয়ে সিসৌদিয়া দরবারে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পরে তিনি পালিয়ে মাণ্ডুতে আশ্রয় নিলেন। অন্য ভাই ইব্রাহীম খাঁ বাহাদুরের সাথে গুজরাতে রওনা হয়ে গেলেন। চিতোরে বাহাদুর সিকান্দারের হত্যার খবর পান। তিনি সিকান্দারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন, যদিও মনে মনে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এই মর্মে যে, তাঁর একটি বাধা সরে গেছে। বাহাদুর যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন ততই তাঁর সৈন্যসংখ্যা বেড়ে চলেছিল এবং আমীরদের সহযোগিতাও এসে যাচ্ছিল। তাঁর শত্রুরা তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। ইমাদুল মুলক বাহাদুরের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। তিনি বিনা প্রতিরোধে পাটন পৌঁছালেন এবং ৬ জুলাই ১৫২৬-এ নিজেকে গুজরাতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। ১১ জুলাই আহমদাবাদে দরবার বসান হল, যেখানে বহুসংখ্যক আমীর উপস্থিত ছিলেন। ঐ মাসেই তিনি চম্পানীর অধিকার করে নিলেন। ইমাদুল মুলককে গ্রেফতার করা হল এবং সিকান্দারকে হত্যার দায়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। ২৬ জুলাই দুই সহযোগীর সাথে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হল।[২] ১৪ আগস্ট ১৫২৬ এ চম্পানীর এ বাহাদুরের পুনরায় রাজ্যাভিষেক হল।

বাহাদুর একে একে তাঁর ভাইদের হত্যা করলেন, কেবল চাঁদ খাঁ যিনি মাণ্ডুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বেঁচে রইলেন, কেননা, মালবের শাসক দ্বিতীয় সুলতান মাহমুদ চাঁদ খাঁকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন।

বাহাদুর শাহ প্রায় এগার বছর শাসন করেন (জুলাই ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। তা সত্ত্বেও তাঁকে গুজরাতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হয়।[৩] সিংহাসনে বসার সময়ে তিনি তাঁর যোগ্যতা,

---

১. মহাভারতের যুগে একে ব্যঘ্রপথ বলা হত। এ যুগে যমুনা নদীর বাম তটে মিরাট জেলায়, দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছোট্ট একটা লোকালয়মাত্র। কাম্বিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩১৪, টিপ্পনী।

২. বেলে, গুজরাত, পৃ. ১৩১ - ১৩৩; কাম্বিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩১৭।

৩. "The entire country of Gujarat which had been left in darkneess by setting of the sun of Government. began again to flourish on the rising of this sun of the Kingdom Bahadur shas" (বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বুখারী সৈয়দদের প্রধান হযরত শাহ শেখের[১] দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। বাহাদুর শাহ এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাসনকার্যের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করেছেন। সিংহাসনে বসার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। কিন্তু নিজের যোগ্যতার বলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র গুজরাতের চিত্রই বদলে দিয়েছিলেন। .

সৈন্য সংগঠন : সর্বপ্রথম তিনি সেনা সংগঠন করেন। তিনি তাঁর তোপখানাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। দুই তুর্কি বিশেষজ্ঞ আমীর মুস্তাফা (যিনি পরে রুমী খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন) এবং খ্বাজা সফর (সালমানী) এর সহায়তায় তিনি তাঁর তোপখানাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রায় ১০,০০০ বিদেশী সৈনিক ছিল।[২] নিজ রাজ্যের হিঁদুদের প্রতিও তাঁর ব্যবহার খুব ভাল ছিল। তিনি হিঁদুদের পুরস্কৃত করেন এবং উচ্চ ও বিশ্বাসযোগ্য স্থানে নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কোল ও ভীল উপজাতির লোকেদের সাথেও ভাল ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর দরবার হলের নাম রাখেন 'শৃঙ্গার মণ্ডপ' এবং তিনি তাঁর হাতিদেরও সংস্কৃতে নামকরণ করেন। তিনি তাঁর উদার নীতি ও সুশাসনের জন্য অত্যধিক সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার : গুজরাতের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। বাহমনী সাম্রাজ্যের পতনের পর তার পাঁচটি রাজ্য ও খানদেশের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলত। মালব ও রাজপুতানা রাজ্যও গুজরাতের প্রতিবেশী ছিল। গুজরাত উপকূলে পর্তুগিজদের প্রভুত্বও বেড়ে চলেছিল। বাহাদুর শাহ তাঁর শক্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এই রাজ্যগুলোর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসক ও বিজেতাদের অন্যতম বলে পরিগণিত হন।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে খানদেশ[৩] ও বারার এর শাসকদের সম্মিলিত (প্রায় এক লক্ষ) সৈন্যদের নিয়ে বাহাদুর শাহ দৌলতাবাদ আক্রমণ করলেন। কিন্তু দুর্গের শক্তি ও নিজের সৈন্যদের প্রয়োজনীয় রসদের অভাবের কারণে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আহমদনগর দুর্গ অধিকার করে নিলেন। আহমদনগরের

---

১. শেখের পুরো নাম ছিল সৈয়দ জালালউদ্দীন শাহ শেখ জিয়ূ। এর জন্মসন ৮৫৩ হি. (১৪৪৯ - ৫৯ খ্রি.) এবং মৃত্যু সন ৯৩১ হি. (১৫২৪ খ্রি.)। শেখ কর্তৃক বাহাদুর শাহের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন, মিরআতে সিকান্দারী, পৃ. ১৮৮ - ৯১।

২. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৪৮।

৩. খানদেশের শাসক মুহম্মদ শাহ ফারুকী, বাহাদুর শাহের বোনের পুত্র ছিলেন।

মুজফ্ফর শাহ (১৫১১-২৬ খ্রি.)
↓
সিকান্দার খাঁ | বাহাদুর খাঁ | লতীফ খাঁ | চাঁদ খাঁ | নাসির খাঁ | কন্যা (খানদেশের আদিল খাঁর সাথে বিবাহিত)
↓
মুহম্মদ দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদগুলোতে তাঁর নামে খুতবা পড়ানো হবে শর্তে তিনি সন্ধি করে নিলেন এবং ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের বসন্তে গুজরাতে ফিরে এলেন।[১] ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে বরহান নিজাম শাহ ৭,০০০ ব্যক্তির সাথে বাহাদুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বাহাদুর তাঁকে নিজামুল মুল্‌ক্‌ উপাধি দেন। এরফলে তাঁর মান-প্রতিষ্ঠা আরো বেড়ে যায়।[২]

১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ মালবকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। মালব তার নিকটস্থ রাজ্যগুলোকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। চিতোরের রাজা রতন সিংহ বাহাদুরের দরবারে মালবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তার শাসক তাঁর পুত্র ও মন্ত্রী সারজা খাঁকে চিতোরের দক্ষিণের জেলাগুলোকে বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। রায়সেনের রাজপুত সেনাপতি সিলহদী তাঁর পুত্র ভূপতরায়কে বাহাদুর শাহের দরবারে মালব রক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। মাণ্ডুর অসন্তুষ্ট মুসলমান দলপতিরাও বাহাদুর শাহের দরবারে এলেন। বাহাদুর শাহের মালবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, সেখানকার শাসক তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন নি। এছাড়া মালবের সুলতান মাহমুদ খিলজি বাহাদুর শাহের ভাই চাঁদ খাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। চাঁদ খাঁ বাহাদুর শাহকে গুজরাত থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসতে চাচ্ছিলেন।[৩]

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাহাদুর শাহ মালব আক্রমণ করলেন এবং মার্চ ১৫৩১ এ মাণ্ডু অধিকার করে নিলেন। মালবের শাসক মাহমুদ মারা গেলেন এবং মালব বাহাদুর শাহের অধিকারে এসে গেল (২৮ মার্চ ১৫৩১ খ্রি.)। মালব বিজয় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। আর্সকিনের মতে গুজরাতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমা ও মেবারের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পরস্পর সংলগ্ন ছিল। এরপর মেবার ও গুজরাত পরস্পরের শত্রু হয়ে গেল।[৪] বাহাদুর শাহ রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও শরণ দিলেন। জুন-জুলাই ১৫২৯ (শাওয়াল ৯৩৫)-এ সিন্ধুর পদচ্যুত শাসক জাম ফিরোজ তাঁর

কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (খণ্ড ১, পৃ. ৭১১) এ উল্লেখ সঠিক নয় যে, মুহম্মদ নাসির খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ দুই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এ মন্তব্য, চাঁদ খাঁ নাসির খাঁর ছোট ছিলেন, একথা ঐতিহাসিকদের দ্বারা সমর্থিত নয়। ব্যানার্জি, হুমায়ুন ১, টিপ্পনী।

১. বেলে, গুজরাত, পৃ. ২৪০ - ৪৬ ; অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, ১, পৃ. ১৫০ - ১৪৪ ; কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩২১ - ২২।
২. ফিরিশতা, ব্রিগস, ৪, পৃ. ১১৬ ; বেলে গুজরাত পৃ. ৩৫৮ ; কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩২২।
৩. ফিরিশতা লিখেছেন, রজাউল মুলক নামক গুজরাতী আমীর বাহাদুরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বাবুরের দরবারে চলে যান। সেখানে বাহাদুর শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে চাঁদ খাঁকে ক্ষমতায় বসানোর নিরন্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। রজাউল মুলক মাণ্ডুতেও আসা-যাওয়া করতেন এবং চাঁদ খাঁর সাথে কথাবার্তা বলে আগ্রা ফিরে যেতেন। নিজাউদ্দীন আহমদ ও অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাতের লেখকও একথা সমর্থন করেন। অ্যারাবিক হিস্ট্রির মতে, রজাউল মুলক, হুমায়ুনের আমলেও এই প্রচেষ্টা জারি রাখেন এবং চাঁদ খাঁর নামে হুমায়ূনের পত্র বয়ে আনেন। (আরাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ১৮৬, ১৯৬, ফিরিশতা, ব্রিগ্‌স, ৪ পৃ. ২৬৫, তবকাতে আকবরী ফা, পৃ. ৪০৪ - ৪০৫)
৪. আর্সকিন ২ পৃ. ৩৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।[১] এই সময়ে রাণা সাঙ্গার ভাইপো নরসিংহ দেব তাঁর সাথে বহু সংখ্যাক সঙ্গী সাথী নিয়ে তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন। আলাউদ্দীন আলম খাঁ লোদী (বাহলুল লোদীর পুত্র) ও তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। বাবুরের দরবারের আরো কয়েকজন আমীর (ফতেহ খাঁ, কুতুব খাঁ, উমর খাঁ লোদী প্রমুখ)ও তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন।[২]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোগল সাম্রাজ্যের উপর গুজরাতের দিক থেকেও যে কোনো সময়ে বিপদ উপস্থিত হতে পারত। মালব বিজয়ের পর মোগল সীমা গুজরাতের সন্নিকটে পৌছে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক ছিলেন। তিন-চার বছরের মধ্যেই তিনি কুশল শাসক ও বীর যোদ্ধার গুণ প্রদর্শন করেছিলেন। গুজরাত অর্থনৈতিক দিক থেকেও মজবুত ছিল। তাঁর সৈন্যরা নতুন নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। মালব বিজয় ও বাহাদুর শাহের সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি গুজরাত সাম্রাজ্যকে মোগল সাম্রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূনের গুজরাতের দিক থেকে ভয়ের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।[৩]

২. আফগান

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আফগানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও আফগানরা পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে নি। অধিকাংশ আফগান পালিয়ে বিহার ও বাংলায় চলে গিয়েছিল। ১৫ বছর যাবত তাদের শক্তি ও সংগঠন এই দুটি রাজ্যে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং শেরশাহ এই কেন্দ্র থেকেই আফগানদের সংগঠিত করে আফগান শক্তিকে পুনরায় সুসংহত করলেন।

ইব্রাহীম লোদীর আমলে দরিয়া খাঁ নুহানী বিহারের গভর্নর ছিলেন। তখন তিনি কোনো উপাধি ধারণ করেন নি। বস্তুত তিনি একজন স্বাধীন শাসকের মতো নিজের রাজ্যে শাসন পরিচালনা করতেন। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহার খাঁ বিহারের গভর্নর হন।[৪] পানিপথে ইব্রাহীম খাঁর মৃত্যুর পর যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং আফগানদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়, তার পরিণাম স্বরূপ তিনি মুহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং খুতবা পাঠ করান। এইরূপে তিনি একজন স্বাধীন শাসকরূপে

১. বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত পৃ. ৩৪৩ ; ফিরিশতা, ২ পৃ. ৩২০।
২. ফিরিশতা, ব্রিগ্‌স, ৪, পৃ. ১১২।
৩. Elated by a sense of his power and invincibility, he appeared to have aspired to the Empire as Hindustan, and rashly measured his strength with the rising power as the Mughals under Humayun" (কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩০)।
৪. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রকাশ করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর ইব্রাহীম লোদীর ভাই সুলতান মাহমুদ লোদী এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁদের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। হাসান খাঁ মেওয়াতি ও রাণা সাঙ্গা তাঁকে ইব্রাহীমের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেন এবং একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠন করে তাঁরা খানুরায় বাবুরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। খানুয়ার পরাজয় রাজপুতদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। রাণা সাঙ্গার বলেই মাহমুদ লোদী দিল্লির সিংহাসন লাভের আশা করতেন। খানুয়ার পর তিনি মেবারে আশ্রয় নেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাণা সাঙ্গার মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে রাজপুতদের সাহায্যের আশাও ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। খানুয়ার যুদ্ধের পর আফগান উমরা বীবন ও বায়েজিদ আফগানদের সংগঠিত করে মোগলদের অবধ থেকে তাড়িয়ে দেন এবং লখনউ অধিকার করে নেন। বাবুরের সৈন্যদের আগমনের ফলে তারা পিছু হটে গিয়ে বাংলা অভিমুখে চলে যান। এই সময়েই আমরা আফগানদের মধ্যে ফরিদ নামক এক যুবকের চরমোৎকর্ষের উল্লেখ পাই, যিনি পরবর্তীকালে শেরশাহ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

ফরিদের প্রারম্ভিক জীবন

শের খাঁর পিতামহ ইব্রাহীম খাঁ সূর পেশোয়ারের নিকট রোহের পার্বত্যাঞ্চলে[১] থেকে ঘোড়ার ব্যবসা করতেন। বাহলুল লোদীর আমলে ইব্রাহীম সূর ও তাঁর পুত্র হাসান পাঞ্জাবে এসে বজওয়াড়া-য় (হোশিয়ারপুর জেলায়) বসতি গড়ে তোলেন। প্রারম্ভিক জীবনে তিনি মহাবত খাঁ সূর ও দাউদ খাঁ শাহখাইলের অধীনে থাকেন। কিছুদিন পর ইব্রাহীম খাঁ মহাবতকে ত্যাগ করে হিসার ফিরোজার জায়গীরদার জামাল খাঁ, সারঙ্গ খাঁ এবং হাসান উমর খাঁ সরওয়ানীর অধীনে চাকরি নেন। জামাল খাঁ ইব্রাহীম খাঁকে চল্লিশটি ঘোড়া রাখার জন্য নারনোলে পরগনার কিছু গ্রাম জায়গীর রূপে দেন। তিনি উন্নতি করে ৫০০ ঘোড়সওয়ারের অধিকারী এবং হিসারের জায়গীরদার বনে যান।

ইব্রাহীম খাঁর মৃত্যুর পর হাসান জামাল খাঁর অধীনে চলে যান। সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে জামাল খাঁকে জৌনপুরে পাঠানো হয়। তাঁর সাথে হাসান খাঁও যান। জামাল খাঁকে সাসারাম, খাওয়াসপুর ও টান্ডার জায়গীর দেওয়া হয় এবং এখানে তিনি স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন।

ফরিদ ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে হিসার ফিরোজা, মতান্তরে নারনোলে জন্মগ্রহণ করেন।[২] হাসানের চার পত্নী ও আট পুত্র ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে ফরিদ ও

১. আফগানী ভাষায় একে শরগরী ও মুলতানী ভাষায় একে রোহরী বলে।

২. ড. কানুনগোর মতে, শেরশাহের জন্ম ১৪৮৬ খ্রি. এবং পরমাত্মা শরণের মতে, তাঁর জন্মসন ১৪৭২ খ্রি.। সমকালীন ঐতিহাসিকেরা শেরশাহের জন্মতিথির উল্লেখ করেন নি। এ কারণে তাঁর জন্মসন নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। দেখুন, কানুনগো, শেরশাহ পৃ. ৩ ; পরমাত্মা শরণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজাম এক আফগান পত্নীর গর্ভে এবং সুলেমান ও মাহমুদ সবচেয়ে ছোট পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এর অন্য চার ভাইয়ের নাম ছিল আলী, ইউসুফ, খুররম ও শাদী খাঁ। হাসান তাঁর ছোট পত্নীকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এজন্য ফরিদের উপর তাঁর সেই স্নেহ ভালবাসা ছিল না, যা জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর থাকা উচিত ছিল। ফরিদ খাঁ এতে দুঃখ পেয়ে নিজের পিতার জায়গীর ছেড়ে জৌনপুরে চলে যান, যে স্থানটি সে যুগে জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য 'পূর্ব প্রাচ্যের শিরাজ' নামে পরিচিত ছিল।[১] এখানে ফরিদ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং ফারসি ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানও পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'মৌলবী' উপাধি লাভ করেন।[২] তিনি তাঁর ব্যবহার ও যোগ্যতার বলে অচিরেই সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি সমকালীন সাধক-তাপস ও পণ্ডিতদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং শাসন-সম্পর্কিত জ্ঞানও পর্যাপ্তরূপে লাভ করলেন।[৩] ইতিমধ্যে হাসান খাঁ জৌনপুরে এলে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা ফরিদের ন্যায় অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন পুত্রকে উপেক্ষা ও অবহেলা করার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তাঁদের কথায় হাসান খাঁ ফরিদকে সাসারামের জায়গীরের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করলেন।

জায়গীরের ব্যবস্থাপক রূপে ফরিদ যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা তাঁর ভবিষ্যত জীবনের জন্য পরম উপকারী বলে সিদ্ধ হল। এখানে তিনি কিছু তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন। ফরিদ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর জায়গীরের সমৃদ্ধি ও বৈভব বৃদ্ধিতে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করবেন।[৪] তিনি জায়গীরের সম্পূর্ণ সমস্যা পর্যালোচনা করলেন এবং প্রতিটি সমস্যা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান করলেন।

নতুন জায়গীরদার রূপে ফরিদ ন্যায়ের ভিত্তিতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর প্রজারা যে কোনো সময়েই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত। তিনি বলতেন, কৃষকরাই সম্পদের মূল স্রোত।[৫] এজন্য তাদের সংস্কার, সুখ ও মঙ্গলের মধ্যেই

ডেট অ্যান্ড প্লেস অব শেরশাহজ বার্থ—বিহার অ্যান্ড ওড়িষা রিসার্চ সোসাইটি জার্নাল, মার্চ, ১৯৩৪ খ্রি.। নারনোল আগ্রাতে অবস্থিত।

১. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩ পৃ. ২৫৯।

২. ড. কানুনগো আব্বাস খাঁ সরওয়ানীর উল্লেখের ভিত্তিতে লিখেছেন, ফরিদ সিকান্দারনামা, গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ সহ ফারসির অনেক বিখ্যাত বই মুখস্থ করে নেন।
হোদীওয়ালা এ কথা স্বীকার করেন নি। প্রথমত, এ গ্রন্থ ৩০,০০০ পংক্তিতে লেখা, তা মুখস্থ করাটা এক রকম অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, ফিরিশতা ও নিজামউদ্দীন যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা থেকে একথাও মনে হয় যে, তিনি পরীক্ষাও পাস করেন নি, আর এগুলি মুখস্থও করেন নি। হোদীওয়ালা স্টাডিজ অব ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, ১, পৃ. ৪৪৬; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩১১। এছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, তাঁর সাহিত্যিক রুচি এত প্রখর হলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু বইপত্র রচনা করতেন।

৩. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার, পৃ. ১১৬।

৪. আব্বাস খাঁ, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩১২।

৫. আব্বাস খাঁ তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩১৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গীরের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ফরিদ সৈনিক, মুকদ্দম, প্যাটোয়ারী ও কৃষকদের আহ্বান করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কাউকেই কৃষকদের উপর অত্যাচার করতে দেবেন না, যে এমনটি করবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।[১] তিনি জমি পরিমাপ করালেন এবং সে অনুযায়ী তার কর নির্দিষ্ট করে দিলেন। কৃষকদের পাট্টা লিখে দেওয়া হল যা থেকে এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, কাকে কী পরিমাণ কর দিতে হবে। সেই সাথে তাদের কবুলিয়াতও (স্বীকৃতি) লিখিয়ে নেওয়া হল।

কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কৃষকদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে ফরিদ বিদ্রোহী জমিদারদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি তাঁর পিতার কর্মচারীদের দু'শ' অশ্বারোহী বন্দোবস্ত করার আদেশ দিলেন। ছোট একটি বাহিনী প্রস্তুত করে এবং সৈন্যদের উৎসাহিত করে তাদের সহায়তায় তিনি মুকদ্দম ও জমিদারদের পরাজিত করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।[২] ফরিদ বেগার ও অনেক কর সমাপ্ত ঘোষণা করলেন। প্রত্যেক গ্রামে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য একজন করে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হল। ফরিদের সুব্যবস্থাপনার কারণে প্রায় এক হাজার কৃষক বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর জায়গীরে এসে বসতি স্থাপন করল।[৩]

ফরিদের জায়গীর ব্যবস্থাপনাকে সমস্ত লেখকই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। আব্বাস খাঁ লিখেছেন, অল্প কিছুকালের মধ্যেই ফরিদের জায়গীরের বাসিন্দারা সুখী হয়ে গেল এবং তিনি একজন বিচক্ষণ শাসক রূপে গণ্য হতে লাগলেন।[৪]

ড. ব্যানার্জির মতে, ফরিদ তাঁর আধুনিক গ্রামীণ বিকাশ পরিচালনার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাঁর এই ব্যবস্থার কারণেই তিনি প্লেটো কথিত দার্শনিক সম্রাটের পর্যায়ে উন্নীত হন।[৫] ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, শেরশাহের অসাধারণ শাসকীয় যোগ্যতার ছাপ পড়েছে তাঁর পরগনা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার উপর।[৬] তাঁর কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফরিদ জায়গীরের আধুনিক ব্যবস্থা থেকে একথাই প্রমাণ করে দেন তিনি একজন জন্মজাত শাসন-যোগ্যতার অধিকারী। এ অনুভবতা তাঁর জন্য উপযোগী বলে সিদ্ধ হল এবং উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি কিছু কালের মধ্যে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা তার বলেই সম্ভব হয়েছিল।

---

১. কানুনগো, শেরশাহী, পৃ. ১৭-১৮; ও ইলিয়ট, ডাসন, ৪, পৃ. ৩১২-৩১৩।

২. ফরিদের জায়গীর ব্যবস্থাপনার জন্য দেখুন, কানুনগো.শেরশাহ.পৃ.১৫-২৫; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩১৪; হোদীওয়ালা ১. পৃ. ৪৪৭।

৩. দৌলত-এ শেরশাহী.ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন.পৃ.১০০-১০১) দ্বারা উদ্ধৃত।

৪. তারিখ এ শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, .৪, পৃ.৩১৭।

৫. ব্যানার্জী হুমায়ূন, ১. পৃ. ১৮৩-৮৫।

৬. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৯৮-৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদের জায়গীর ব্যবস্থা ও তার যশ বৃদ্ধি থেকে তাঁর সৎ-মা এই ভেবে আশঙ্কিত হলেন যে, না জানি কবে তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও সুলেমানের হাত থেকে জায়গীর হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফরিদকে সেখানে জায়গীর থেকে হটানোর জন্য তিনি মিয়া হাসানকে বাধ্য করলেন এবং ফরিদকে জায়গীর থেকে হটিয়ে দিলেন।

ফরিদ তাঁর জায়গীর থেকে আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন (১৫১৯ খ্রি.)। পথিমধ্যে, কানপুরে শেখ ইসমাঈল সূর ও ইব্রাহীম নামক দু'জন আফগানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল।[১] যারা ভবিষ্যতে তাঁর উৎকর্ষের প্রধান সহায়ক বলে গণ্য হন। আগ্রায় ফরিদ দৌলত খাঁ নামক এক প্রধান উমরার সহায়তায় ইব্রাহীম লোদীর কাছ থেকে তাঁর পিতার জায়গীর লাভের প্রয়াস চালালেন, কিন্তু ইব্রাহীম এই কথা বলে অপারগতাও আপত্তি প্রকাশ করলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতা করে, সে মন্দ ব্যক্তি, সে জন্য এই বিরোধে তিনি হস্তক্ষেপ করলেন না। ফরিদ হতাশ হলেন কিন্তু তাঁর আশ্রয়দাতা দৌলত খাঁর সাথেই রয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে, মিয়া হাসানের মৃত্যু হয়ে গেল। সাসারামের জায়গীরে সে সময়ে ফরিদের ভাই নিজাম, যাঁকে জায়গীরের উপর নজর রাখার জন্য ফরিদ রেখে গিয়েছিলেন, এবার তাঁর সৎ-ভাই (সুলেমান ও আহমদ)-দের সাথে জায়গীরের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। সুলেমান জায়গীর অধিকার করে নিজেকে তার বাস্তবিক উত্তরাধিকারী বলে দাবি করলেন। নিজাম এই বলে তার বিরোধিতা করলেন যে, সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়ার কারণে তিনি এ দাবি করতে পারেন না। কিন্তু একথা সুলেমানের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার পর ফরিদ সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ার সুবাদে, দৌলত খাঁর সহায়তায়, ইব্রাহীম লোদীর কাছ থেকে এই দুই পরগনার জায়গীরদারির ফরমান লাভ করে আপন জায়গীরে ফিরে এলেন।

ফরমান নিয়ে ফরিদের জায়গীরে ফেরার ফলে এবং সেখানকার প্রজা সাধারণের ফরিদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে সুলেমান সেখান থেকে পালিয়ে চৌধ[২] এর জায়গীরদার মুহম্মদ খাঁ সূরের ওখানে আশ্রয় নিলেন। মুহম্মদ খাঁ ও মিয়া হাসানের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। মুহম্মদ খাঁ পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে মিয়া হাসানের জায়গীর অধিকার করার চিন্তা করলেন। তিনি ফরিদের কাছে তাঁর উকিল মারফৎ জানিয়ে দিলেন, এই দ্বন্দ্বের ফয়সালা তিনি করবেন এবং যে তাঁর সিদ্ধান্ত

১. কানুনগোর (শেরশাহ, পৃ. ২৮) মতে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল হাবিব খাঁ কক্কর। ঈশ্বরী প্রসাদ দ্বিতীয় ব্যক্তিটির নাম লিখেছেন ইব্রাহীম।

২. এটি ছিল বিহারের রোহতাস জেলার একটি পরগনা। সাসারাম থেকে এটি প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। আঈন-ই আকবরীতে এক চাকুণ্ড বা জৌন্দ বলা হয়েছে। (আঈন-ই-আকবরী, ২. পৃ. ১৬৮)। চাকুণ্ড শব্দটি সম্ভবত দুর্গের চামুণ্ডা নাম থেকে গৃহীত হয়েছে। (হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৪৪৭)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানতে অস্বীকার করবে তার প্রতি তিনি কঠোর আচরণ করবেন। ফরিদ মুহম্মদ খাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর সৎ-ভাইদের অধিক হতেও অধিকতর ভূমি জায়গীর হিসেবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি পরগনার শাসনকে বিভাজিত হতে দেবেন না। মুহম্মদ খাঁ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সৈন্যবল প্রয়োগ করে তিনি ফরিদের কাছ থেকে সুলেমানের অধিকার নিশ্চিত করবেন। এ খবর জানতে পেরে ফরিদ চিন্তিত হলেন এবং কোনো শক্তিশালী ব্যক্তির সহায়তা লাভের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়ে তিনি পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীর মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন। ফরিদ দেখলেন বিহারের শাসনকর্তা সুলতান মুহম্মদ খাঁ (বাহার খাঁ) ব্যতীত আর কেউ তাঁকে সাহায্য করতে সমর্থ হবেন না। সুলতান মুহম্মদ খাঁ[১] এই সময়ে স্বাধীন শাসক রূপে বিহার শাসন করতেন। ফরিদ সুলতান মুহম্মদের কাছে চাকরি নিলেন। আপন যোগ্যতার বলে অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁর মন জয় করে নিলেন এবং তাঁর ডান হাত বনে গেলেন।[২] এই সময়ে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে একটি শের (বাঘ কিংবা সিংহ) মারেন, তাঁর এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সুলতান মুহম্মদ তাঁকে শের খাঁ উপাধি দেন।[৩] সুলতান মুহম্মদ তাঁকে তাঁর রাজ্যের উকিল এবং আপন পুত্রের জন্য শিক্ষক (আতালিক) নিযুক্ত করলেন।[৪]

শের খাঁর এই উৎকর্ষের ফলে সুলতান মুহম্মদের অন্য আমীরদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা সুলতান মুহম্মদের কাছে অভিযোগ জানালেন। সে সময়ে শের খাঁ তাঁর নিজের জায়গীরে চলে গিয়েছিলেন। যার ফলে এই বিরোধিতার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মুহম্মদ শের খাঁ দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত ও প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি সুলেমানের পক্ষ নিয়ে শেরশাহের প্রতি আক্রমণে অসমর্থ হলেন।

চৌধের জায়গীরদার মুহম্মদ খাঁ প্রারম্ভেই জায়গীরকে ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন। শের খাঁ এতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং তিনি বললেন যে, এখানে রোহ (আফগানিস্তান)-এর আইন চলবে না। এছাড়া তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে এ যুক্তিও দেন যে, তিনি ফরমান দ্বারা জায়গীর লাভ করেছেন, এখন তা আর কারোরই পাওয়ার অধিকার নেই।[৫] মুহম্মদ খাঁ এতে সাফল্যের আশা না দেখে তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে গায়ের জোরে তাঁর পাওনা অধিকার করে নিলেন।

---

১. সুলতান মুহম্মদ উপাধি ধারণ করার আগে তাঁর আসল নাম কী ছিল, সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। আব্বাস বাহার খাঁ, আর্সকিন বিহার খাঁ এবং কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ৪, এ বাহাদুর খাঁ লেখা হয়েছে।

২. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ৩১, আব্বাস খাঁ, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন ৪, পৃ. ৩২৫।

৩. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩২৫।

৪. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩২৫ ও ৩৩৬।

৫. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১০৬ ; ইলিয়ট ও ডাসন ৪, পৃ. ৩২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু লোক শের খাঁকে সুলতান মুহম্মদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য পরামর্শ দেন। শের খাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তিনি মুহম্মদ খাঁ সূরের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হয়ে বরং সমঝোতা করানোর চেষ্টা করবেন। শের খাঁ সমঝোতা বা সন্ধি করতে চাচ্ছিলেন না ; বরং তিনি একটি শক্তিশালী যুদ্ধ চাচ্ছিলেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শের খাঁ পূর্ব প্রান্তের মোগল গভর্নর জুনায়েদ বরলাসের সেবায় উপস্থিত হলেন। মোগল সৈন্যদের সহায়তায়[১] শের খাঁ নিজের জায়গীর অধিকার করে নিলেন এবং মুহম্মদ খাঁর জায়গীর তাঁর হাতে এসে গেল। মুহম্মদ খাঁ ও সুলেমান পালিয়ে রোহতাসে এসে আশ্রয় নিলেন। শের খাঁ মুহম্মদ খাঁর জায়গীর তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত করলেন। এ থেকে তাঁর গভীর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শের খাঁর বিদেশী সৈন্যদের সহায়তা নেওয়ার জন্য আফগানরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। শের খাঁ মোগল সৈনিকদের পারিতোষিক দিয়ে অনতিবিলম্বেই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং আফগানদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ-কলহ দূর করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন।[২]

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁ জুনায়েদ বরলাসের সাথে আগ্রা গেলেন। সেখানে জুনায়েদ বরলাস তাঁর ভাই প্রধানমন্ত্রী মীর খলীফার কাছে তাঁর প্রশংসা করলেন। শের খাঁ প্রায় ১৫ দিন যাবত মোগলদের কাছে অবস্থান করেন এবং চান্দেরি দুর্গ আক্রমণের সময়ে তিনি মোগলদের সাথে থাকেন।[৩] এখানে তিনি মোগলদের শাসন প্রণালী অত্যন্ত নিকট থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এতে তিনি মোটেও সন্তুষ্ট হন নি এবং এতে তাঁর মনে এতটা আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে যে, মোগলরা আফগানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তার মত ছিল যে, মোগলদের বিজয় তাদের যোগ্যতার কারণে নয় ; বরং আফগানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই হয়েছিল। তিনি বলতেন, আমি মোগলদের মধ্যে অবস্থান করে তাদের যুদ্ধ-রীতি দেখে নিয়েছি। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরে দৃঢ় এবং সুব্যবস্থিত থাকতে পারে না। তাদের বাদশাহ উৎকৃষ্ট বংশ এবং উচ্চ পর্যায়ের লোক হওয়ার কারণে নিজে শাসন ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেন না। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা তাঁর আমীর এবং উচ্চ পদাধিকারীদের হাতে সপে দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি ও আচরণের উপর নির্ভরশীল থাকেন। সৈনিক, প্রজা এবং বিদ্রোহী জমিদারদের সমস্যার সমাধান হয় ঘুষের মাধ্যমে। বিরোধী এবং হিতৈষী প্রত্যেকের রয়েছে পর্যাপ্ত সম্পদ, তারা সেই সম্পদের দ্বারা নিজেদের ইচ্ছামতো আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধি করেন। যার সম্পদ নেই সে শত শত বার অস্ত্র চালালে অথবা গভীর নিষ্ঠা দেখালেও সে কোনো সাফল্যের

১. ড. কানুনগো, আব্বাস ও অন্যান্য সমকালীন ঐতিহাসিকদের শের খাঁ কর্তৃক মোগলদের সহায়তা লাভের তত্ত্ব স্বীকার করেন না এবং একে অসম্ভব বলে মনে করেন। কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ৪২-৪৩।
২. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ১০৮।
৩. ইলিয়ট ও ডাসন , ৪, পৃ. ৩৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ দেখতে পাবে না। শের খাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা হাসত কিন্তু তিনি বারবার বলতেন "যদি সৌভাগ্য ও প্রতাপ আমার সহায় হয় তাহলে আমি অনতিবিলম্বেই মোগলদের হিঁদুস্তান থেকে তাড়িয়ে দেব।"[১]

ইতিমধ্যে তিনি আগ্রা থেকে একদিন অকস্মাৎ চলে এলেন।[২] নিজের জায়গীরে ফিরে আসার পর বিনানুমতিতে তাঁর দরবার থেকে চলে আসার কারণে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁর কাছে উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে খুশি করলেন। তিনি লিখেছেন, মুহম্মদ খাঁ সূর ও সুলেমানের ভয়ে জায়গীরে ফিরে আসাটা তাঁর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। তিনি নিজেকে মোগলদের সেবক বলে অভিহিত করলেন এবং প্রভুভক্তির বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলেন।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে শের খাঁ মোগলদের সেবা ত্যাগ করলেন এবং পুনরায় বিহারে গিয়ে মুহম্মদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেলেন।[৩] সুলতান মুহম্মদ তাঁকে পুনরায় তাঁর পুত্র জালালের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে সুলতান

---

১. আব্বাস খাঁ, তারীখে শেরশাহী ; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৩০-৩১।

২. শের খাঁর আগ্রা থেকে পালিয়ে আসার বিষয়ে আব্বাস খাঁ লিখেছেন যে, একদিন আহারের সময়ে শের খাঁ বাবুরের সাথে উপস্থিত ছিলেন। শের খাঁর সামনে মাহিচা পাত্র রাখা হল (মাহিচা কী ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা বেশ কঠিন। এর অর্থ মাছের মতো করে কাটা মাংস) তা খাওয়ার নিয়ম তাঁর জানা ছিল না। তিনি মাহিচাকে চাকু দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে খেয়ে ফেললেন। (এও উল্লেখ্য যে, তিনি হাত দিয়ে খেতে থাকলে হুমায়ূন তাঁকে দাওয়াত থেকে বের করে দেন, এতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন। হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৪৪৯)। বাবুর এ দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী খলীফাকে বললেন, "শের খাঁর বিষয়ে অসাবধান থাকা মোটেও উচিত নয়। কারণ, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী, তাঁর ললাটে অঙ্কিত রাজটীকা স্পষ্টই বিদ্যমান। আমি এর চেয়ে অনেক বড় বড় আফগান আমীর দেখেছি। কখনোই আমার মনে এ কথা উদয় হয় নি কিন্তু এঁকে দেখামাত্রই আমার মনে হয়েছে একে বন্দি করা উচিত, কেননা, তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রকাশ এবং শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন স্পষ্টই বিদ্যমান।" শের খাঁ খলীফাকে অত্যধিক উপঢৌকন দিয়েছিলেন, যার ফলে তিনি শের খাঁর প্রশংসা করেন। শের খাঁ খলীফা ও বাবুরের মনের অবস্থা টের পেয়ে অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁর সৈন্যদের ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। বাবুর যখন একথা জানতে পারলেন তখন খলীফাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "তুমি টালবাহানা না করলে আমি অবশ্যই তাঁকে বন্দি করতাম। তার দ্বারা কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।" ইলিয়ট ও ডাসন, তারিখে শেরশাহী, ৪, পৃ. ৩৩১। তাওয়ারীখে দৌলতে শেরশাহীর বর্ণনা এর চেয়ে ভিন্ন। তাঁর মতে, জুনায়েদ বরলাস শের খাঁকে বাবুরের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এক দাওয়াতে শের খাঁ অধিক মদিরা পান করেন এবং তাওয়ারীখে দৌলতশাহীর লেখককে বলেন যে, আল্লাহ চাইলে তাইমুর বংশীয়দের হিঁদুস্তান থেকে বের করে দিয়ে আফগান সাম্রাজ্য পুনরায় দৃঢ়তার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত করব। একথা বাবুরের কানে পৌছালে তিনি বড়ই রুষ্ট হলেন এবং শের খাঁর প্রতি কড়া নজর রাখার আদেশ দিলেন। শের খাঁ এই রাতেই সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

৩. ড. কানুনগো, নিজাম উদ্দীন, ফিরিশতা, আব্বাস প্রমুখ এ কথা স্বীকার করেন না যে, এখান থেকে শের খাঁ মুহম্মদ খাঁ-য়ের সেবায় চলে যান। তার মতে, তিনি মাহমুদ লোদীর সাথে গিয়ে মিলিত হন। (কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ৫৮-৫৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদের মৃত্যু হয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর পত্নী দুদু বিবি ও তাঁর নাবালক পুত্রের সংরক্ষক বনে গেলেন। তিনি শের খাঁকে নিজের ডেপুটি নিয়োগ করলেন।

বিহারের ডেপুটি হিসেবে শের খাঁ পূর্ণরূপে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিলেন। তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যোগ্য এবং অনুগত ব্যক্তিদের বিশেষত, সূর আফগানদের নিযুক্ত করলেন যাঁরা সর্বদাই তাঁর জন্য জীবন-মরণ পণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

আফগানরা মোগলদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শেষ করেন নি। মাহমুদ লোদী, বীবন ও বায়েজিদ একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। শের খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের সাথে অংশগ্রহণ করলেন কিন্তু এ অভিযান অমীমাংসিত রয়ে গেল এবং মোগল বাহিনী অগ্রসর হতেই এঁরা পিছুটান দিলেন।[১] অধিকাংশ আফগান আমীর বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ জালাল খাঁও বাবুরের সাথে মিলিত হলেন। বাবুর তাঁর পিতার জায়গীরের অধিকাংশ ভাগ তাঁকে এই শর্তে দিলেন যে, তিনি বছরে এক কোটি টনকা রাজকর দেবেন।[২] সুলতান মাহমুদ লোদীকে পালিয়ে বাংলার শাসনকর্তা নুসরত শাহের কাছে আশ্রয় নিতে হল।[৩]

জালাল খাঁর মোগলদের কাছ থেকে অধিকার লাভ করার পর দুদু বিবি শের খাঁকে পুনরায় ডেপুটি নিযুক্ত করলেন। এর কিছুদিন পরে দুদুও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এইভাবে, বিহারের শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে শের খাঁর উপরে এসে পড়ল।

---

১. বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "নিরন্তর খবর আসতে লাগল সুলতান মাহমুদ ১০,০০০ আফগানকে একত্রিত করেছেন। তিনি শের বায়েজিদ ও বীবনকে এক বিরাট বাহিনীসহ সরোয়ার অভিমুখে প্রেরণ করেছেন। তিনি স্বয়ং ফতেহ খাঁ সরওয়ানীর সাথে গঙ্গার কিনার ধরে চুনার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। শের খাঁ সূর যাঁকে আমি গত বছর আশ্রয় দান করে এবং অনেকগুলি পরগনা প্রদান করে এই প্রদেশে নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম, তিনি আফগানদের সাথে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা শের খাঁ ও কিছু আমীরকে নদী পার করিয়ে দিয়েছেন। সুলতান জালালউদ্দীনের লোকেরা বেনারস রক্ষা করতে না পেরে পালিয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, তিনি গুজব রটিয়ে দেন যে, তিনি বেনারস দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করে দিয়েছেন আর স্বয়ং নদীতট ধরে সুলতান মাহমুদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। (বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৫১-৫২ ; কানুনগো, শেরশাহ পৃ. ৬০-৬১)।

২. বাবুর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "১৬ মার্চ সোমবার (রমজান) দরিয়া খাঁর পৌত্র জালাল খাঁ, শেখ জামালী যাকে ডাকতে গিয়েছিলেন, বিশ্বস্ত আমীরদের সঙ্গে নিয়ে আমার সেবায় উপস্থিত হলেন। ইয়াহিয়া নুহানিও আসেন। ইনি এর আগে তাঁর ছোট ভাইকে পাঠিয়ে আজ্ঞানুবর্তিতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাকে প্রোৎসাহিত করার জন্য তার সেবা স্বীকার করে নিয়ে একটি ফরমান পাঠানো হয়েছিল। কেননা, ৭-৮ হাজার নুহানি আফগান এই আশা নিয়ে এসেছিল, অতএব, তাদের নিরাশ না করার দৃষ্টিতে বিহার থেকে এক কোটির খালসা বানিয়ে আমি ৫০ লক্ষ মাহমুদ নুহানিকে প্রদান করি। বিহারের অবশিষ্ট অংশটি উপরিউক্ত জালাল খাঁকে প্রদান করা হয়। তিনি এক কোটি পরিমাণ অর্থ রাজকর রূপে দিতে রাজি হলেন। মোল্লা গুলাম ইয়াসাবলকে এই রাজকর উসুল করার জন্য পাঠানো হয়। মাহমুদ জামান মির্জা জুনুপুর (জৌনপুর)-এর ওকালত লাভ করলেন।" (বাবুরনামা, বেভারিজ,পৃ.৬৭৬)

৩. স্টিউয়ার্ট, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ. ৭৪ ; কানুনগো, শেরশাহ পৃ. ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শের খাঁ অনুভব করলেন যে, বাংলার শাসক নুসরত শাহের সাথে তাঁর কোন না কোন সময়ে সংঘর্ষ হবেই। তিনি তাঁর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নুসরত শাহের ভগ্নিপতি হাজিপুরের গভর্নর মখদুমে আলমের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলেন। নুসরত শাহ আক্রমণ চালিয়ে মখদুমে আলমকে হত্যা করলেন। শের খাঁ একজন মহান বন্ধুকে হারালেন কিন্তু মখদুমে আলমের সমস্ত রাজকোষ তাঁর হস্তগত হল।[১] এ তাঁর ভবিষ্যতের উৎকর্ষের জন্য খুবই সহায়ক প্রতিপন্ন হল। এরপরেই বাংলার সাথে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এতে শের খাঁ বিজয় লাভ করলেন এবং এতে তাঁর মান-প্রতিষ্ঠা ও শক্তি উভয়ই বেড়ে গেল।[২]

শের খাঁ ছিলেন এক সাধারণ বংশের মানুষ। বিহারে অনেক উচ্চবংশীয় আফগান ছিলেন (যেমন লোদী, নুহানী, ফরমূলী ইত্যাদি), এঁরা সাধারণ বংশীয় লোকদের অধীনতা স্বীকার করাটাকে হীনতা বলে অনুভব করতেন। এই কারণে তাঁরা শের খাঁকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। তারা শের খাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন কিন্তু তাঁর সতর্কতার কারণে সে কাজে তাঁরা সফল হলেন না। শের খাঁ সন্ধি করার জন্য শক্তি বিভাজনের প্রস্তাব রাখলেন। তিনি নুহানিদের বললেন, হয় তাঁরা আক্রমণের কবল থেকে বাংলাকে রক্ষার দায়িত্ব নিন নতুবা অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা দেখভাল করুন। নুহানিরা এতে রাজি হলেন না এবং তাঁরা সেখান থেকে এই ভেবে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নুসরত শাহের কাছে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শের খাঁর বিরোধিতা করবেন। একথা ভেবে নুহানী ও অন্যান্য আমীর জালাল খাঁর সাথে নুসরত খাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। এই পলায়ন শের খাঁর মনে শক্তি সঞ্চয় ও সংগঠনের সু-অবসর দান করল।

শের খাঁ ঐ সময়ে চুনার দুর্গ অধিকার করে নিলেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল। সুলতান ইব্রাহীম লোদী তাজ খাঁ সারঙ্গখানিকে ঐ দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত করেছিলেন। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবুরের পূর্ব প্রান্তে অভিযানের সময়ে তাজ খাঁ মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে নেন। ২৩ মার্চ ১৫২৯ এ বাবুর চুনার দুর্গ নিরীক্ষণও করেন।[৩] ১৫২৯ এর জুনে তিনি জুনায়েদ বরলাসকে সেখানে তাঁর অধিপতি নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আনুষঙ্গিক কিছু সমস্যার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।[৪] তাজ খাঁর উপর তাঁর বুদ্ধিমতী পত্নী লাদমালিকার[৫] গভীর প্রভাব

১. ইলিয়ট ও ডাসন. ৪, পৃ. ৩৩৩-৩৪।
২. ব্যানার্জি, হুমায়ুন পৃ. ১৯০ ; আশীর্বাদী লাল শ্রীবাস্তব, শের শাহ অ্যান্ড হিজ সাকসেসার্স, পৃ. ১০-১১।
৩. বাবুরনামা, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ২৮২-৮৩।
৪. বাবুরনামা, বেভারিজ, ৬৮৩ ; রিজভি, বাবুর পৃ. ৩৩৪।
৫. আবুল ফজল এর নাম লিখেছেন 'লাদ মুলক' এবং তাঁকে চরিত্রে ও সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় বলে অভিহিত করেছেন। (আকবরনামা, পৃ. ১২৩)। আব্বাস তাঁর নাম 'লাদ মালকা' লিখেছেন। তাঁর কোনো পুত্র ছিল না। তাজ খাঁর অন্য পত্নীদের কয়েকজন পুত্র ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। একদিন লাদমালিকার সৎ-পুত্র তাঁকে আহত করে দেয়। তাজ খাঁ তাঁর পুত্রকে মারার জন্য তরবারি ওঠান, পুত্র পিতার উপর আক্রমণ চালালে তাতে তাঁর পিতা মারা গেলেন। শের খাঁ এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে লাদ মালিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং এতে তিনি সফল হলেন। এই বিবাহের ফলে পত্নীর চুনার দুর্গ ও তার কোষের অধিপতি হয়ে গেলেন তিনি।[১]

১৫২৯ এ মরহুম সুলতান ইব্রাহীম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদী খানুয়ার যুদ্ধের পরাজয় ও রাণা সাঙ্গার মৃত্যুর পর বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিহারে সুলতান মুহম্মদের মৃত্যু ও সেখানকার পরিস্থিতি তাঁর মনে আশার সঞ্চার করল। বিহারের কয়েকজন প্রধান উমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বিহারে এলেন। এখানে আজম হুমায়ূন ঈসা খাঁ, ইব্রাহীম খাঁ, মিয়াঁ বীবন জীওয়ানি, মিয়া বায়েজিদ ফর্মূলী ও অন্য আমীররা তাঁর সাথী হয়ে গেলেন। এইভাবে, আফগানদের যে নেতৃত্ব শের খাঁ লাভ করেছিলেন, রাজবংশীয় না হওয়ার কারণে তা মাহমুদ লোদীর হাতে চলে গেল। শের খাঁর বিবশ হয়ে সাসারামে তাঁর জায়গীর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।[২] মাহমুদ লোদী শের খাঁকে প্রসন্ন করার জন্য এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, এ কেবল সংকটকালীন ব্যবস্থা, যে-ই মাত্র জৌনপুর ও অন্যান্য জেলা আফগানদের অধিকারে চলে আসবে, তখনই শের খাঁকে বিহার দিয়ে দেয়া হবে। এই সময়ে বাবুরের মৃত্যু হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আফগানদের অবস্থা

হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের সময়ে আফগানদের প্রধান নেতা ছিলেন দু'জন—মাহমুদ লোদী ও শের খাঁ। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, শের খাঁ ইতিমধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। আপন যোগ্যতার বলে তিনি আফগানদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। চুনার দুর্গ অধিকৃত হয়ে যাওয়ার পর বিহারের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখা যেত। মাহমুদ লোদীর আগমনের পর তাঁর শক্তি অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং বড়ই সতর্কতার সাথে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। শের খাঁর মোকাবিলা করার যোগ্যতা মাহমুদ লোদীর ছিল না, যেমনটি তাঁর পূর্বচরিত্র ও কার্যাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

১. শের খাঁ ১৫০টি বহুমূল্য জওহরাত, সাত মণ মোতি, ১৫০ মণ সোনা এবং আরো অনেক মূল্যবান বস্তু লাভ করেন। (ইলিয়ট ও ডাসন ৪. পৃ. ৩৪৬।) ড. কানুনগো, আব্বাস খাঁ বর্ণিত চুনার দুর্গের বৃত্তান্ত স্বীকার করেন না। তাঁর বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, ড. কানুনগো, শের শাহ, পৃ. ৬৬-৭১।

২. শের খাঁ মাহমুদের বিরোধিতা কেন করলেন না? সম্ভবত, প্রধান আফগান আমীররা মাহমুদ লোদীর পক্ষে চলে গিয়েছিলেন। ইব্রাহীম লোদীর ভাই হওয়ার কারণে আফগানরা তাঁর বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রকমই, হুমায়ূন যে সময়ে সিংহাসনারোহণ করেন, সে সময়ে বিহারের আফগানরা সংগঠিত হচ্ছিল। লোদী বংশের ব্যক্তিরা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। শের খাঁ এর প্রতি অবশ্যই অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুমায়ূনের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে সে স্থলে আফগান সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করার সুদূর প্রসারী আকাঙ্ক্ষা তার মানশ্চক্ষে নেচে উঠছিল। আফগানদের এ সংগঠন কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের সময়ে বলা কঠিন ছিল। কিন্তু এতে একথা সন্দেহ করা যেতে পারে না যে, নতুন পরিস্থিতিতে যখন পানিপথের বিজেতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর পুত্র হুমায়ূন তখনও নওজওয়ান, অনভিজ্ঞ অনুভবহীন এক ব্যক্তি মাত্র ছিলেন—যাঁকে সিংহাসনে বসানোর বিষয়েও মোগল আমীরদের মধ্যে কমবেশি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল—আফগানরা পূর্ণরূপে লাভ ওঠানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। নিঃসন্দেহে, তাদের জন্য এ ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ।

৩. বাংলা

বাংলা প্রান্তটি দিল্লির সুলতানদের জন্য শুরু থেকেই একটি জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে রয়ে গিয়েছিল। দিল্লি থেকে দূরত্ব, যাতায়াত ব্যবস্থার কাঠিন্য, আর্থিক অসুবিধা ইত্যাদির কারণে বাংলার শাসকরা সর্বদাই দিল্লি থেকে স্বাধীন হওয়ার প্রয়াস চালাতেন।

মুহম্মদ ঘুরির উত্তর ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময়ে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করে তাকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সেই সময় থেকে শুরু করে মুহম্মদ বিন তুগলকের আমল পর্যন্ত বাংলা দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদিও এখানে দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ হয়। ফিরোজ তুগলকের আমলে বাংলা পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যায়।[১]

হুসেনশাহী বংশ থেকে বাংলার সোনালী যুগের সূচনা হয়। এই বংশের প্রথম শাসক সৈয়দ হুসেন, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নাম ধারণ করে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন। এঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম শাসকদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। তিনি অনেক সংস্কার কর্মের মাধ্যমে বাংলাকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস চালান। জৌনপুরের শেষ শর্কী সম্রাট হুসেন শাহ পালিয়ে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন। আলাউদ্দীন হুসেন তাঁকে আশ্রয় দেন। শর্কী সুলতান তাঁর মৃত্যুকাল (১৫০০ খ্রি.) পর্যন্ত এখানেই থাকেন। ২৫ বছর শাসন করার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নসীব খাঁ, নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ নামে সিংহাসনে বসেন।[২] নুসরত শাহ একজন যোগ্য সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি

১. দি হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল্, দি দেলহি সালতানাত, পৃ. ১৯৩, ২১৪।
২. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩, পৃ. ২৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন পরিচালনা ও শাসন উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি তিরহুত আক্রমণ করে তা অধিকার করে নেন এবং পর্তুগিজদেরও, যারা বাংলার তট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তাদের প্রতিহত করার প্রয়াস চালান। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের ভারত আক্রমণের সময়ে নুসরত শাহ বাংলার শাসক ছিলেন। বাবুর তাঁর আত্মকথায় ভারতে যে পাঁচজন প্রধান শাসকের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তাঁর নামেরও উল্লেখ রয়েছে।[১]

পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক আফগান নেতা পালিয়ে বিহারে চলে যান। এঁদের মধ্য থেকে বায়েজিদ, বীবন ও অন্য কয়েকজন আফগান বাংলায় আশ্রয় নেন। নুসরত শাহ তাঁদের জায়গীর দেন। তিনি স্বয়ং ইব্রাহীম লোদীর কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[২] যাতে প্রয়োজন পড়লে তিনি নিজেকে ইব্রাহীম লোদীর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করতে পারেন। বাবুরের আগে থেকে ভয় ছিল। এ কারণে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি মির্জা আসকারিকে পূর্ব প্রান্ত অভিমুখে প্রেরণ করেন।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নুসরত শাহের এক দূত আত্মসমর্পণের প্রার্থনা পত্র নিয়ে বাবুরের সাথে সাক্ষাত করেন।[৩] এ সমর্পণ ছিল নামমাত্র, কেননা, কয়েক সপ্তাহ পরেই বাবুর বিহার থেকে বিচ্ছৃঙ্খলার খবর পেলেন। বাবুর পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হলেন। বাংলার সৈন্যরা এই ভেবে আশঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, বাবুর সম্ভবত বাংলা আক্রমণ করতে চাচ্ছেন। গণ্ডক এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থলে দু'পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি হল। যুদ্ধের পর ১৫২৯ এর ৬ মে বাংলার সৈন্যরা পিছু হটে গেল। মুহম্মদ মারুফ যিনি বাংলার সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যিনি পুনরায় বাবুরের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।[৪]

বায়েজিদ ও বীবন বাবুরের অনুপস্থিতির সুযোগে লখনউ অধিকার করে নিয়ে সেখান থেকে চুনার ও জৌনপুর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এই সময়ে মোগল সৈন্যদের আক্রমণের খবর পেয়ে তারা পালিয়ে গেল। বাবুর এখান থেকে আগ্রা চলে গেলেন। তাঁর জীবৎকালে এরপর বাংলার সাথে তাঁর আর কোনো সংঘর্ষ হয় নি।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের মৃত্যুর সময়ে বাংলা সীমান্তে নামমাত্র শান্তি বিরাজ করছিল। নুসরাত শাহ জনপ্রিয় ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি কলা ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতাও করেন। তাঁর আমলে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়। যেগুলোর মধ্যে বড় সোনা মসজিদ খুবই প্রসিদ্ধ। ইব্রাহীম লোদীর কন্যাকে বিয়ে করে তিনি মোগল সম্রাটের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন।

---

১. বাবুরনামা, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ২৬০-৬১।
২. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩, পৃ. ২৭২।
৩. উইলিয়ামস অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৬৮, বাবুরনামা ; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪,পৃ. ২৮৪।
৪. উইলিয়ামস অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফগানদের বাংলার আশ্রয় নেওয়ার ফলেও সেখানে মোগলদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হতে পারত। বাংলার সন্নিকটস্থ বিহারের অংশে আফগানদের কেন্দ্র তো গড়ে উঠছিলই, বাংলার মোগলদের কোনো মিত্র না থাকাতে উভয় প্রান্ত মিলে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারত।

৪. সিন্ধু ও মুলতান

তুগলক বংশের পতনের পর সিন্ধুর জাম সেখানকার কিছু জেলা শাসন করতেন। ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে জাম নিজামউদ্দীন (জাম নন্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি ৬০ বছর যাবত শাসন করেন। তাঁর রাজত্বকালে সিন্ধুর নিচু অঞ্চলে আরগুন জাতির মোগলদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে বাবুর কর্তৃক কান্দাহার হতে বিতাড়িত হওয়ার পর শাহ বেগ আরগুন সিন্ধু জয় করে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাম ফিরোজকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। ফিরোজ বিতাড়িত হয়ে গুজরাতে আশ্রয় নেন। তিনি গুজরাতের বাহাদুর শাহের সাথে আপন কন্যার বিয়ে দেন।

১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে শাহ বেগ আরগুনের মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পুত্র শাহ হুসেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি এক বছরেরও অধিক কাল অবরুদ্ধ থাকার পর মুলতান অধিকার করে নেন। তিনি খাজা শামসুদ্দীনকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুলতানের সেনাপতি লঙ্গর খাঁ তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে মুলতান শাসন করতে থাকেন।[১] পরে তিনি কামরানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গুজরাতের উচ্চকাঙ্ক্ষী সুলতানের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য শাহ হুসেন বাবুরের নামে খুতবা পড়ে নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে নেন। বাবুরের প্রধানমন্ত্রী খলীফার কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর অবস্থান আরো দৃঢ় করে নেন।

এইভাবে সিন্ধু রাজ্যটি এক স্বাধীন রাজ্য রূপে তার প্রভাব মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত রেখেছিল, যদিও মুলতান পরে স্বাধীন হয়ে যায় এবং বাবুরের মৃত্যুর পর মোগল রাজপুত্র কামরানের জায়গীরের একটি অংশ বনে যায়।

৫. মালব

মধ্যযুগে মালবের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। গুজরাত ও মেবারের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মেবারের সাথে এর নিরন্ত সংঘর্ষ লেগে থাকত। ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ খাঁ মালবে খিলজি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[২] বাবুর যে সময়ে ভারত

---

১. সিন্ধুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্য দেখুন, কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩. পৃ. ৫০১ - ৫০৫। হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপুল, দি দেহলি সুলতান, পৃ. ২২১ - ৩০।

২. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩. পৃ. ৩৫৩ - ৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ করেন, সে সময়ে দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ মালবের শাসক ছিলেন (১৫১১-৩১ খ্রি.)। ইনি একজন যোগ্য সুলতান ছিলেন। তাঁর প্রসার নীতির পরিণাম স্বরূপ নিকটবর্তী শাসকদের সাথে তাঁর অনেক সংঘর্ষ হয়। তিনি বড় একটি বাহিনী নিয়ে গাগরৌন আক্রমণ করেন। গাগরৌনের দুর্গাধিপতি ছিলেন ক্ষেমকরণ, যিনি মেদিনী রাওয়ের প্রতিনিধি রূপে সেখানে শাসন করতেন। এই আক্রমণের খবর পেয়ে মেদিনী রাও রাণা সাঙ্গার সাহায্য নিলেন। এ দু'জনের সম্মিলিত শক্তি মালব আক্রমণ করল। মাহমুদ শোচনীয় রূপে পরাজিত ও বন্দি হলেন। রাণা তাঁর রাজমুকুট ও বহুমূল্য রত্ন তো নিয়ে নিলেনই, কিন্তু মালবকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে বরং মাহমুদকে মাণ্ডুর সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় মাহমুদের সাম্রাজ্য তখন তাঁর রাজধানী ও তার নিকটবর্তী অংশগুলোর মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। তাঁর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব জেলাগুলো পূরবিয়া রাজপুত ও সতবাস এবং তার দক্ষিণাংশটি সিকান্দার খাঁর অধীনে ছিল।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহের গুজরাতের সিংহাসনে বসার পর মাহমুদ বাহাদুরের ভাই চাঁদ খাঁকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেন। বাহাদুর শাহ তাতে অসন্তুষ্ট হন। রাজা সাঙ্গার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মাহমুদ চিতোরের উপরে আক্রমণ চালিয়েও রাণা সাঙ্গার উত্তরাধিকারীদের অসন্তুষ্ট করেছিলেন। রতন সিংহ মালব আক্রমণ করে সারঙ্গপুর ও উজ্জৈন অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে মালব গুজরাত ও রাজপুতানোর মধ্যে একটি সংঘর্ষস্থল হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

৬. খানদেশ

খানদেশ রাজ্যটি তাপ্তী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালিক রাজ।[১] ফিরোজ তুগলক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে থালনের ও কুরোণ্ডে জেলা, যা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল, দিয়ে দেন[২] এবং পরে তাঁকে সিপাহসালার উপাধিতে ভূষিত করেন। ফিরোজের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন হয়ে যান। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আমিরগড় দুর্গ অধিকার করেন এবং জৈনাবাদ ও বুরহানপুর নগর দুটির পত্তন করেন।

শুরু থেকেই গুজরাত, মালব ও আহমদনগরের সাথে খানদেশের সংঘর্ষ চলে আসছিল। নাসির খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিনার আদিল খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি এই বংশের শাসক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আদিল খাঁর কোনো পুত্র ছিল না। এজন্য তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত

১. ইনি নিজেকে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর বংশধর বলে অভিহিত করতেন। এজন্য এ বংশকে তিনি ফারুকী বলে পরিচয় দেন।
২. এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দেখুন কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩, পৃ. ২৯৪ ; শেরওয়ানী, দি বাহমানিজ অব দি ডেকান, পৃ. ১০৯, টীকা ৫৫, ফিরিশতা, ব্রিগ্‌স, ৪, পৃ. ২৮০ - ৩২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর[১] উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব বাধে। বাবুরের ভারত আক্রমণের সময়ে খানদেশের শাসক ছিলেন মীরান মুহম্মদ (প্রথম মুহম্মদ)।[২] এঁর মাতা গুজরাতের বাহাদুর শাহের ভগিনী ছিলেন।

দিল্লি থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণে উত্তরের রাজনীতির সাথে খানদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বাহাদুর শাহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে গুজরাতের উৎকর্ষ ও দিল্লির সংঘর্ষের সময়ে খানদেশ গুজরাতকে অধিক শক্তিশালী করে তুলতে পারত।

৭. কাশ্মীর

পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্যের অবস্থান। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ মীর কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করে সেখানে মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শাসক জয়নুল আবেদিন (১৪২০-৭০ খ্রি.) খুবই প্রসিদ্ধ সুলতান হন। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের জন্য তাঁকে 'কাশ্মীরের আকবর' বলে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের দ্বারা নষ্ট-ভ্রষ্ট মন্দিরগুলোকে পুনর্নির্মাণ করার আদেশ দেন এবং স্বভূমি ত্যাগী ব্রাহ্মণদের আপন ভূমিতে ফিরিয়ে আনেন।[৩]

জয়নুল আবেদিনের পর তাঁর পুত্র হায়দার শাহ ও পৌত্র হাসান পর্যায়ক্রমে কাশ্মীরের শাসকপদ লাভ করেন। ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে হাসানের মৃত্যুর পর তাঁর সপ্তম বর্ষীয় পুত্র মুহম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তিনবার ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তিনবারই ক্ষমতায় ফিরে আসেন। সবশেষে, চতুর্থবারের মতো সুলতান হওয়ার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ে চক ও মাকরী বংশীয় দলপতিদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।[৪] প্রারম্ভিক কালে তো এদের মধ্যে একতা ছিল কিন্তু ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

চক দলপতিরা মুহম্মদকে বিতাড়িত করে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র ইব্রাহীমকে সিংহাসনে বসান। ইব্রাহীম কাজী চককে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। পরাজিত আবদাল মাকরি বাবুরের সহায়তায় কাজী চককে পরাজিত করে তাঁকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেন (১৫২৯ খ্রি.)।

এরপর, নজুক শাহ সিংহাসনে বসেন, কিন্তু এক বছর পরেই তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়। মুহম্মদ চতুর্থ ও শেষ বারের মতো ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে

---

১. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (এ. পৃ. ৩৯৩) অনুসারে তাঁর মৃত্যু হয় ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে, হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপুল, দেলহি সালতানাত, পৃ. ১৭২, এর মতে, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে।

২. নিজামউদ্দীন আহমদ (দে, তবকাতে আকবরী, ৩, পৃ. ৩৪৪) তাঁকে আদিল খাঁ নামে উল্লেখ করেছেন, যা ভ্রান্ত।

৩. ফিরিশতা, ব্রিগস, পৃ. ৪৬৯।

৪. কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনীতে' এঁদের চকরেসা ও মারগেসা বলে উল্লেখ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেন। কাজী চক পুনরায় তাঁর স্ব-স্থান লাভের প্রয়াস চালান। কিন্তু তাঁকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় কাশ্মীরে ফিরে আসেন এবং কামরান প্রেরিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে কাশ্মীর রক্ষার জন্য আবদালের পক্ষাবলম্বন করেন। মোগলরা পরাজিত হয়ে পঞ্জাবে ফিরে যায়।[১]

৮. রাজপুতানা

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সাঙ্গার পরাজয় রাজপুতদের একতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মেবার সে সময়ে কর্ণৌতা ও বসবা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজমীর, রণথম্ভোর ও তার নিকটবর্তী এলাকাগুলো মেবারের অধীনস্ত ছিল। বুন্দি রাজ্যের হাড়া শাসকও মেবারের অধীনতা স্বীকার করতেন।

রাণা সাঙ্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজ (সন্ত মীরার স্বামী) তাঁর জীবৎকালেই মৃত্যুবরণ করেন। রাণা সাঙ্গা তাঁর সর্বপ্রিয় রানী কর্মাবতীর[২] প্রভাবে নিজ রাজ্য তাঁর জীবৎকালেই পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। রণথম্ভোর ও পঞ্চাশ-ষাট লাখের জায়গীর তিনি বিক্রম ও উদাকে দিয়ে দেন এবং অবশিষ্টটি রত্ন সিংহকে দিয়ে দেন। রানা সাঙ্গার এই ভুলের পরিণামে মেবারে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ শুরু হয় যার ফলে সিসৌদিয়া খুবই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রাণা সাঙ্গার পর রত্ন সিংহ মেবারের গদিতে বসেন। এই প্রশ্নে রত্ন সিংহ ও হাড়া রানী কর্মাবতীর সাথে বিরোধ বাধে।[৩] রানী বিক্রমজিৎকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য বাবুরের কাছে সাহায্য নিতে চাইলেন কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে বাবুর মেবারের পারিবারিক কলহের সুযোগ নিতে অসমর্থ হলেন।

মেবারের সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। রানী কর্মাবতীর চাচাত ভাই হাড়া সূরজ মল ও রত্ন সিংহের দ্বন্দ্বও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল। রত্ন সিংহ ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে মেবার অধিকার করলেন কিন্তু মেবারের হৃত গৌরব আর পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। বাহাদুর শাহের যশ ও শক্তি বেড়ে চলেছিল। ইতিমধ্যে কিছুদিন পরেই শিকার খেলতে খেলতে রত্ন সিংহ বুন্দির কাছে গিয়ে পৌছান। তাঁর আমন্ত্রণে সূরজমলও সেখানে গিয়ে পৌছান। মার্চ-এপ্রিল ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে পরস্পরে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে, হাড়া ও সিসৌদিয়াদের পরম্পরাগত শত্রুতার বীজ বপিত হয়।[৪]

রত্ন সিংহের পর তাঁর ছোট ভাই বিক্রমাজিৎ মেবারের সিংহাসনে বসেন (১৫৩১-৩৬)। রণথম্ভোরের বিবাদ এইভাবে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বিক্রমাজিতের

---

১. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩, পৃ. ২৮৭।
২. এ বুন্দি বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিল। একে হাদী করমেতীও বলা হয়। বাবুর একে পদমাবতী বলেছেন, যা ভ্রান্ত। বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬১২।
৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৬১২-১৩।
৪. রঘুবীর সিংহ, পূর্ব আধুনিক রাজস্থান, পৃ. ২৩-২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অযোগ্যতার কারণে দলপতিরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হল এবং মেবারের গৌরব সমাপ্তপ্রায় হয়ে গেল।

মেবারের দক্ষিণে ছিল বাগড় রাজ্য। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহ বাগড় আক্রমণ করেন। রাওল উদয় সিংহ তাঁর জীবৎকালে বাগড়ের পূর্বাংশটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জগমলকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এরফলে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বিরাজ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। খানুয়ার যুদ্ধে উদয় সিংহের মৃত্যুর পর পৃথ্বিরাজ সিংহাসনে বসেন এবং তিনি পূর্বাংশটিও অধিকার করে নেন। বাহাদুর শাহ পৃথ্বিরাজের কাছে তাঁর পিতার করে যাওয়া বণ্টনকে স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। এইভাবে পৃথ্বিরাজের ছোট ভাই জগমল বাসওয়াড়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।[১] এইভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে বাগড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।[২]

মেবারের পশ্চিমে অবস্থিত সিরোহী রাজ্যটি দেওড়া চৌহান শাসন করতেন। সিরোহীর নিকটস্থ জালৌর ও সাঞ্চৌরের উপর মালিক সিকান্দার খাঁর অধিকার ছিল। এই প্রদেশের উত্তরে মারওয়াড় রাজ্যটি রাও গাংগা শাসন করতেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত যোধপুর রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা রাওগাংগার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং যোধপুর ও সোজতই শুধুমাত্র তাঁর হাতে রয়ে গিয়েছিল। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাওগাংগার পুত্র মালদেব তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেই শাসনক্ষমতা অধিকার করে নেন।[৩]

মারওয়াড়ের উত্তরে জয়সলমীর ও পূর্বে বিকানির রাজ্য দুটি রাঠোরদের অধীনে ছিল। এখানকার শাসক ছিলেন জৈত সিংহ।[৪] বিকানির ও যোধপুর রাজ্য দুটির মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত নাগৌর পরগনাটি সরখেল খাঁ ও তাঁর পুত্র দৌলত খাঁ রাজত্ব করতেন। মারওয়াড়ের পূর্বে অবস্থিত আমের রাজ্যটি কছওয়াহা শাসনাধীনে ছিল এবং এখানকার শাসক ছিলেন হরিভক্ত পৃথ্বিরাজ। এই রাজ্যগুলো ছাড়াও রাজপুতনায় আরো কয়েকটি ছোটখাট রাজ্য ছিল যেগুলো নিকটবর্তী রাজ্যগুলোর অধীনতা স্বীকার করত।

রাজপুতানার উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সেখানে এমন কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁর নেতৃত্ব অধিকাংশ রাজপুত স্বীকার করে নিতে পারত। এই সময়ে গুজরাতের সিংহাসনে বসার পর বাহাদুর শাহ রাজপুতানার রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। তিনি বাগড়, মেবার ও অপরাপর রাজ্যগুলোর

---

১. গৌরশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, বাশওয়াড়া রাজ্য কা ইতিহাস, পৃ. ৬৪-৭০ ; ওঝা, ডুঙ্গর রাজ্য কা ইতিহাস, পৃ. ৮৪-৮৬।

২. রঘুবীর সিংহ, পূর্ব আধুনিক রাজস্থান, পৃ. ২৩।

৩. ওঝা, যৌধপুর রাজ্যকা ইতিহাস, ১. পৃ. ২৭০-৮৩ ; ওঝা, বিকানির রাজ্য কা ইতিহাস, ১, পৃ. ১৩২-৩৩।

৪. মুনশি দেবী প্রসাদ, রাও জৈতসীজী কা জীবন চরিত্র ; ওঝা, বিকানির রাজ্য কা ইতিহাস, ১, পৃ. ১২২-১৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৮www.amarboi.com ~

ঝগড়া-বিবাদে হস্তক্ষেপ করে লাভবান হতে চাচ্ছিলেন। মেবার অভ্যন্তরীণ বিবাদেও ফেঁসে গিয়েছিল। হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার কয়েক মাস পরেই যোধপুরের শাসক গাংগার পুত্র মালদেব কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। এইভাবে, রাজপুতানার দিক থেকে তো তাৎক্ষণিক বিপদাশঙ্কা ছিল না কিন্তু তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল।

এ সমস্ত পরিস্থিতিতে কেমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল

হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের সময় উপরোক্ত পরিস্থিতিতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর সামনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারের জটিল ও কঠিন সমস্যা বিরাজ করছিল। এমন পরিস্থিতিতে এমন সর্বগুণসম্পন্ন ও অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যিনি হবেন উচ্চস্তরের সৈনিক এবং বাহুবলে বলীয়ান এমন ব্যক্তি যিনি সমস্ত বিঘটনকারী শক্তিকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে পারেন ও যিনি সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন, যাঁর উপর বাবুরের উমরাহ, অন্য অভিজ্ঞ দলপতি ও সৈনিকদের নির্ভরশীল আশ্রয়স্থল হতে পারেন এবং যাঁর নেতৃত্বে তাঁরা যে কোনো সময়ে জীবনমরণপণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন। রাজকোষ শূন্য ছিল, এজন্য এক উচ্চস্তরের অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ তথা অর্থসামগ্রীর প্রয়োজন ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক উচ্চস্তরের কূটনীতিজ্ঞের প্রয়োজন ছিল, যিনি আফগানদের অত্যন্ত চতুরতার সাথে আপন পক্ষে টেনে নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেন। এমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যিনি বাহাদুর শাহের উৎকর্ষতাকে প্রতিহত করতে পারেন, রাজপুতদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারেন এবং সার্বিক দৃষ্টিতে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন।

বাবুর তাঁর বিজিত সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিকভাবে সুগঠিত করতে পারেন নি। মোগলরা তখনো পর্যন্ত বিদেশী বলে গণ্য হতেন। বাবুরের পুত্র ও অন্য আত্মীয়-স্বজন তখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। নতুন মোগল সম্রাটকে মেধাবী শাসক হওয়া উচিত ছিল যিনি আমীর ও জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারতেন।

ঐ সময়টি এমন এক ব্যক্তিকে চাচ্ছিল যিনি মোগল আমীর, দলপতি ও সম্রাটের আত্মীয়-স্বজনদের বিশ্বাসভাজন হতে পারেন। তাদের মধ্যে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন। এই রকমই অসংখ্য সমস্যা হুমায়ূন তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। হুমায়ূন কী এরকম সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার যোগ্যতা রাখতেন?

হুমায়ূনের চরিত্র আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু এই সন্দর্ভে আমাদের তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার কথাও স্মরণ রাখা উচিত। হুমায়ূন সহজ-সরল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ছিলেন, যাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন ও মেধাবী বলা যায় না। তিনি এক মহান পিতার পুত্র অবশ্যই ছিলেন। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়ে বাবুরের কঠিন জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। হুমায়ূন অত্যন্ত আদর-যত্নে বেড়ে উঠেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতি যা মানুষকে কঠোর বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে শেখায়, তার সাথে হুমায়ূনের পরিচয় ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূনের মধ্যে আমরা দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও পাই। সিংহাসনে আরোহণের পর তার কিছু স্পষ্ট উদাহরণও আমরা পাই, যেমন, বাবুরের পঞ্চম ভারত অভিযানে হুমায়ূনের তাঁর কাছে পৌঁছাতে বিলম্ব করা এবং দিল্লির রাজকোষ লুট করা। সামরিক যোগ্যতার দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতে আনন্দ লাভের গুণ ছিল না। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি পালাতে চাইতেন। আমরা তাঁকে আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলেও অভিহিত করতে পারি যিনি কঠোর এবং কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার সাহস পেতেন না। তাঁর মধ্যে সামরিক, প্রশাসনিক, বৈষয়িক বিত্তীয় গুণ ও দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। হুমায়ূন আফিম খাওয়ার কু-অভ্যাসও গড়ে তুলেছিলেন এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়াও তাঁর জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। তিনি একজন অলস ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি হওয়ার জন্য যে কোনো প্রকারের কঠিন পরিশ্রম থেকে বাঁচতে চাইতেন।

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে হুমায়ূন কতটা সফল হতেন, একথা বলা কঠিন। সংযোগবশত, যদি তিনি আকবরের পুত্র হোতেন তাহলে সম্ভবত তাঁকে ঐ সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে হত না যা তাঁকে করতে হয়েছিল আর সম্ভবত তিনি জাহাঙ্গীরের চেয়ে অধিক সিদ্ধ হতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়
প্রারম্ভিক ঘটনাবলী

সিংহাসনারোহণ

৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে[১] তেইশ বছর বয়সে হুমায়ূন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ দিন জামে মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ হল ও উৎসব করা হল। আগ্রার বাজার ও দোকানপাটও এই অবসরে সুন্দর করে সাজানো হল। দরবার বসল, যাতে ছোটবড় সমস্ত আমীর ও উপস্থিত লোকেরা নতুন সম্রাটের জন্য উপহার পেশ করল। দরবারের নিয়মানুসারে হুমায়ূন তাঁদের পুরাতন পদ, চাকরি, ভূমি ইত্যাদিতে পুনর্নিয়োজিত করলেন। ঐ দিন হুমায়ূন তাঁর নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ[২] করলেন এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা ও সহযোগিতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। প্রথম দিনেই তিনি দান রূপে জনতার মধ্যে স্বর্ণ বিতরণ করলেন।[৩] আর এইভাবে হুমায়ূন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিনটিই আনন্দ ও খুশির সাথে শুরু করলেন যেন বাবুরের মৃত্যুও তাঁর পরের উত্তরাধিকারীদের সমস্ত ঘটনা মানুষ বেমালুম ভুলে গেছে।

---

১. হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের তারিখ কয়েকটি তিথিপত্র (Chronograms) থেকে নিশ্চিত হয়। আবজাদ এর ভিত্তিতে সকলের জোড় হয় ৯৩৭ হিজরি। এই তিথিপত্র হল 'কশতীয়ে জর' ও 'খায়রুল মুলক' (বাদশাহদের মধ্যে সর্বোত্তম)। আকবরনামা, ১, পৃ. ১২১ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২ পৃ. ৪৪। হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের তিথি গণনায় পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. ব্যানার্জি ও হোদীওয়ালা একে ৩০ ডিসেম্বর বলে স্বীকার করেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ২৯ ডিসেম্বর লিখেছেন। এই প্রশ্নে বিতর্কের জন্য দেখুন হোদীওয়ালা, হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ ইন মোগল নিউমিসমেটিক্স, পৃ. ২৬২ - ২৬৩ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, লাইফ অ্যান্ড টাইমস, পৃ. ২৪, ব্যানার্জি, হুমায়ূন বাদশাহ, ১, পৃ. ২৮।

২. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১০।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২১-১২২। আবুল ফজল, 'কিশতি' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কিশতি শব্দের সাধারণ অর্থ নৌকা, তবে সমকোণী চতুর্ভূজাকৃতির থালাকেও 'কিশতি' বলে। আবুল ফজলের এই বাক্য—' আনন্দ ও উল্লাসের নৌকা আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে এক নৌকা সোনা ঐ দিনই বণ্টন করে দেওয়া হল'—এ থেকে স্পষ্ট হয় এখানে এর অর্থ থালা, নৌকা নয়। ড. ব্যানার্জির মতে, এক নৌকা সোনা বিতরণ করা হল (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২৮)। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, (হুমায়ূন, পৃ. ৪১) লিখেছেন, পুরো নৌকা ভর্তি সোনা জনতার মধ্যে বিতরণ করা হল। তবকাতে আকবরীর অনুবাদে মি. দে এর অনুবাদ করেছেন এরকম : 'সোনার কিশতিতে (Coffers) ভরে বণ্টন করা হল।' (তবকাতে আকবরী. দে, ২, পৃ. ৪৪ - ৪৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ে হিন্দাল, যাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা বাবুর আমৃত্যু পোষণ করেছিলেন, তিনি এসে পৌঁছালেন। হুমায়ূন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বাবুরের পরিত্যক্ত কোষ থেকে তাঁকে অনেক ধন দান করলেন।[১]

রাজ্য বণ্টন

উৎসবাদির পর নতুন সম্রাট তাঁর ভাইদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করে দিলেন। কামরানকে কাবুল-কান্দাহার, আসকারিকে হুমায়ূনের পুরাতন জায়গীর সম্ভল ও হিন্দালকে আলোয়ার (মেওয়াত)[২] জেলাটি দেওয়া হল। মির্জা সুলেমানকে বাদাখশান রাজ্যের শাসন কর্তার স্বীকৃতি দেওয়া হল। এছাড়া যাঁরা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে সেই পদ প্রদান করা হল, সেই সাথে তাঁদের জায়গীরও বাড়িয়ে দেওয়া হল।

কামরান ও রাজ্য বণ্টন

কামরান তাঁর প্রাপ্ত ভূ-ভাগ পেয়ে মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাবুরের মৃত্যুর পর তিনি কাবুলকে আসকারির দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে একটি বাহিনী নিয়ে ভারতে রওনা হলেন। পেশোয়ার ও আফগান অধিকার করে তিনি পঞ্জাবে প্রবেশ করলেন (১৫৩১ খ্রি.)। এখানে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর ভাইকে সম্বর্ধনা জানাতে এবং এক অনুগতে সেবক রূপে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যাচ্ছেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর উদ্দেশ্য সৎ ছিল না এবং তিনি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্য অংশও অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।[৩]

AMARBOI.COM

---

১. গুলবদন বেগমের মতে, হিন্দালকে অত্যধিক ধন দেওয়া হল। নিজামউদ্দীনের মতে, দুটি কোষ তাঁকে দেওয়া হল। দেখুন গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১০ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৪৪ - ৪৫ ; টিপ্পনী ইলিয়ট ও ডাসন, পৃ. ৪, ১৮৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৩ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৪৪-৪৫। আকবরনামায় হিন্দালের জায়গীর আলোয়ার লেখা হয়েছে। তবকাতে আকবরীতে মেওয়াত লেখা হয়েছে। দুয়েরই তাৎপর্য একই স্থান। তারীখে এলচিয়ে নিজামশাহের বর্ণনামতে, জৌনপুর মুহম্মদ জামান মির্জাকে দেওয়া হয়। এই লেখকই কামরানের সাম্রাজ্য লাভের বিষয়ে লিখেছেন যে, এই অংশটি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক হস্তগত হয়। রিজভি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১০।

৩. ফিরিশতা লিখেছেন : 'তাঁর ভাই কামরান মির্জা পঞ্জাব রাজ্যটি অধিকার করার মোহে কুশল সংবাদ জানার এবং সম্বর্ধনা জানানোর মিথ্যা অজুহাতে হিন্দ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। স্পষ্ট ভাষায় এই বাক্যটি এইভাবে লেখা হয়েছে :
'বিরাদর কামরান মির্জা তমা দর মুমলিকাতে পঞ্জাব করদা ক বহানয়ে পুরসিশ ওয়া মুবারকবাদ রওয়ানা হিন্দ্ গরদীদ।' (ফিরিশতা, পৃ. ১১৩)।
ফিরিশতা, ব্রিগস ২, পৃ. ৭১। এর সমর্থনে আবুল ফজল লিখেছেন যে, কামরান আসকারিকে কাবুল প্রদান করে এই আশায় প্রস্থান করলেন যে, সম্ভবত এতে তিনি লাভবান হতে পারবেন। (আকবরনামা, ১ পৃ. ১২৪-২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনও মনে হয় যে, হুমায়ূনের মনে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে অনেক সমস্যা ছিল, তিনি তাঁর ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কামরানের কাছে এক দূত পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, কান্দাহার ছাড়া তাঁকে পোশোয়ার ও লামগান অংশটিও দেওয়া হয়েছে। কামরানের কাছে তিনি আর্জি জানালেন যে, তিনি তাঁর আপন রাজ্য-সীমায় ফিরে যান। কামরান তা সত্ত্বেও এতে সন্তুষ্ট না হয়ে পঞ্জাবের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মুলতান অধিকার করে তিনি লাহোর অবরোধ করলেন। লাহোর এ সময়ে হুমায়ূনের অনুগত সেবক মীর ইউসুফের দায়িত্বে অর্পিত ছিল। কামরানের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না। অনন্যোপায় হয়ে এবার তিনি কূটনীতির আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত আধিকারিক করাচা বেগকে ইউনুস আলীর কাছে পাঠালেন। করাচা বেগ গুজব রটিয়ে দিলেন যে, তাঁর ও কামরানের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে, এখন তাঁর জীবন বিপন্ন। তিনি ইউনুস আলীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। এইভাবে করাচা বেগ তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। নগরে পৌঁছে তিনি ইউনুস আলীর সাথে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। তিনি একদিন অকস্মাৎ ইউনুস আলীকে গ্রেফতার করলেন এবং দুর্গ অধিকার করে কামরানের সৈন্যদের নগরমধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। এভাবে ধোঁকা দিয়ে কামরান লাহোর অধিকার করে নিলেন।[১]

কামরান ইউনুস আলীর সাথে দুর্ব্যবহার করলেন না। লাহোর অধিকার করার পর তাঁকে বন্দিশালা থেকে বের করে এনে তাঁকে লাহোরের গভর্নর পদ গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু ইউনুস আলী কামরানের নামে লাহোর শাসন করতে প্রস্তুত হলেন না। কামরান তাঁকে হুমায়ূনের কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কামরান তাঁর নিজের লোকেদের পঞ্জাব সরকারের পরগনাগুলোতে নিযুক্ত করলেন এবং সতলজ নদীর তীর পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করে নিলেন। তারপর, হুমায়ূনের কাছে দূত পাঠিয়ে তিনি এই অংশগুলো তাঁকে প্রদানের জন্য আর্জি জানালেন। অনন্যোপায় হয়ে হুমায়ূন এক ফরমান দ্বারা কামরানকে কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাব অংশটি দিয়ে দিলেন। কামরান এক কবিতার মাধ্যমে হুমায়ূনকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।[২] তাঁর কবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে অথবা তাঁর মনোভাব জানতে পেরে তাঁকে

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪।

২. এই গজলটির অর্থ হল : আল্লাহ করুন তোমার সৌন্দর্য দিনে দিনে বর্ধিত হোক। তোমার ভাগ্য মহান ও শুভ হোক, তোমার চলার পথের উত্থিত ধুলো আমার চোখের অশ্রু মোচন করে আলোর প্রকাশ দান করুক, লায়লার চলার পথে যে ধুলো উত্থিত হয়, তা মজনুর চোখে ঠাঁই পায় ; যে তোমার চারপাশে অনুগত ভৃত্যের মতো না ফেরে, সে এই ক্ষেত্র থেকে চলে যাক। হে কামরান, যতদিন এই জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন এর বাদশাহী হুমায়ূনের অধীনে থাকবে। আকবরনামা, ১ পৃ. ১২৫ - ১২৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি করার জন্য হুমায়ূন হিসার ফিরোজা জেলাটিও কামরানকে দিয়ে দিলেন। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আফগানদের উপর প্রথম বিজয়ের পর বাবুর হিসার ফিরোজা জেলাটি হুমায়ূনকে দিয়েছিলেন।

কামরানের ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা

মোগল আমলের এই পরিস্থিতিতে কামরানের এই ব্যবহার কতদূর পর্যন্ত সঙ্গত ছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। ড. ব্যানার্জি কামরানের এই ব্যবহার সমর্থন করেছেন।[১] ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে, হুমায়ূনের শাসন কালের প্রথম আটটি বছর (১৫৩৮ খ্রি.) কামরান-হুমায়ূনের সম্পর্ক ছিল ভাল। কামরান না দিল্লির সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন আর না একজন স্বাধীন রাজপুত্রের ন্যায় শাসন করতে চাচ্ছিলেন।[২] হুমায়ূন মুলতান, লাহোর ও সতলজ পর্যন্ত পূর্ব প্রান্তের জেলাগুলো ছাড়া হিসার ফিরোজা জেলাও কামরানকে দিয়ে দিয়েছিলেন, এটি মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের জায়গীর বলে বিবেচনা করা হত। সেই সময়কার মুদ্রাগুলোর (যেগুলোর মধ্যেকার আটটি ব্রিটিশ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে)-র একটিতে কামরানকে বাদশাহ এবং হুমায়ূনকে 'আসসুলতান আল-আজম' অর্থাৎ মহান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, হুমায়ূন মহান ছিলেন আর কামরান তাঁর চেয়ে ছোট ছিলেন। ড. ব্যানার্জি লিখেছেন, শাহ সুলতান ইত্যাদি উপাধি এ যুগে রাজকুমার ও আমীরদেরও দেওয়া হত।

ড. ব্যানার্জির মতে, আর্সকিনের এই মন্তব্য, 'কামরানের প্রাপ্ত অংশ পর্যাপ্ত ছিল'—এ ঠিক নয়। ব্যানার্জি লিখেছেন, কামরানের জায়গীর কম ছিল। তাতে আরো জায়গীর একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। মীর ইউনুস আলী কামরানের উড়নচণ্ডী স্বভাবের কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বাবুরের ইচ্ছা ও হুমায়ূনের মৌন সহমতির সাথে অপরিচিত ছিলেন। ড. ব্যানার্জি আবুল ফজলের এই মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে তিনি লিখেছেন যে, হুমায়ূন বাবুরের অসিয়ত অনুসারে কামরানের জায়গীর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ড. ব্যানার্জির এ মত সঠিক নয়। কামরানের ব্যবহার অনুচিত, উগ্র ও ধূর্ততায় পূর্ণ ছিল। তিনি জানতেন যে, হুমায়ূন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি অধিক হতেও অধিকতর পরিমাণে জায়গীর অধিকার করতে চাচ্ছিলেন। ড. ব্যানার্জি আবুল ফজলের মত পুরোপুরি উদ্ধৃত করেন নি। আবুল ফজলের বর্ণনা তথা 'ধূর্ততাপূর্বক', 'লোক দেখানো বিদ্যা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কামরানের মনোভাব

---

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৫৩ - ৫৬।

২. "Kamran desired neither to contest the throne of Delhi nor to actas as on independent prince." (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৫৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূর্ততায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তিনি এই পরিস্থিতির সুযোগে লাভবান হতে চাচ্ছিলেন।[১]

আবুল ফজল স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, "তিনি এই উদ্দেশ্যে হিঁদুস্তান অভিমুখে যাত্রা করলেন যে, সম্ভবত তিনি লাভবান হতে পারবেন।"[২] তাঁর কল্পনার বিষয়ে তিনি লিখেছেন—"নষ্টকারী কল্পনা থেকে বিনাশ ব্যতীত আর কী-ই বা আশা করা যেতে পারে?"[৩]

হুমায়ূন কামরানের ভূভাগ এই কারণে বাড়িয়ে দেন নি যে, তিনি তা উপযুক্ত মনে করেছিলেন; বরং এর কারণ ছিল তাঁর সামনে আর কোনো উপায় ছিল না। কামরান যেভাবে লাহোর অধিকার করেন এবং পঞ্জাব রাজ্যটি তার লোকদের দিয়ে শাসন করান, এসব ঘটনা তাঁর মনের ইচ্ছারই বাস্তব প্রতিপলন ছিল। হুমায়ূন কী এতটাই মূর্খ ছিলেন যে, তিনি এসব বুঝতে পারছিলেন না? তাঁর কবিতার প্রভাবে তিনি তাঁকে হিসার ফিরোজা দেননি; বরং তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন।

কামরানের ব্যবহার প্রত্যেক দৃষ্টিতেই নিন্দনীয়। তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের জন্য এক সাক্ষাৎ বিপদ রূপে উপস্থিত হলেন। হুমায়ূন যদি এ অবস্থায় সতর্কতা না দেখাতেন তাহলে এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারত। কামরানের ব্যবহার ছিল স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তাঁর ভবিষ্যতের কার্যাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম ও সদ্ভাবনার অভাব ছিল এবং তিনি হুমায়ূনের এই কঠিন পরিস্থিতির সুযোগে লাভবান হতে চাচ্ছিলেন।

কামরানের ব্যবহার নিন্দনীয় অবশ্যই ছিল কিন্তু তিনি না স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন আর না হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাচ্ছিলেন। এই

AMARBOI.COM

---

১. আবুল ফজল লিখেছেন : "মির্জা কামরান তাঁর লোকেদের পঞ্জাব সরকারের পরগনাগুলোতে নিয়োজিত করলেন এবং সতলজ নদী পর্যন্ত যা লুধিয়ানা নামে সুপ্রসিদ্ধ তার নিজের অধিকারভুক্ত করলেন। তাছাড়া তিনি ধূর্ততাপূর্বক বুদ্ধিমান রাজপুতদের (হযরত জহাঁবানীর সেবায়) পাঠিয়ে আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, এই মহাল তাঁকেই প্রদান করা হোক। হযরত জঁহাবানী তো এই কারণেই যে, তিনি ছিলেন মহাসাগরের মতো মহীয়ান ব্যক্তি, আর কিছুটা এই কারণে যে, হযরত গেতী সিতানী ফিরদাউস মকানীর শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, এই মহালকে তিনি তাঁর লোক দেখানো নিষ্ঠার কারণে তাঁকে প্রদান করলেন এবং কাবুল, কান্দাহার ও পঞ্জাব তাঁকে প্রদান সম্পর্কিত ফরমান জারি করলেন। মির্জা এই উদারতা দেখে, যা ছিল তাঁর জন্য আশাতীত, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং সম্মানিত দরবারে উপহার পাঠালেন। এছাড়া পত্র ব্যবহারের দ্বারও খুলে গেল এবং তাতে হযরত জঁহাবানীর প্রশংসায় পদ্য রচনা করে তাঁর সেবায় পাঠিয়ে দিলেন।" (আকবরনামা, পৃ. ১২৫)।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪-২৫। আবুল ফজলের বাক্যটি এরকম : 'কি শায়দ কারে তওয়ানদ পেশ বুর্দ।'

৩. ঐ, আবুল ফজলের কথাটি এই প্রকার :
'আন্দেশয়ে তবাহ রা জুজ তবাহী শুদন চে গুরেজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে তিনি না নিজের নামে খুতবা পড়ালেন আর না এমন কাজ করলেন যাতে তাঁর এ ধরনের ইচ্ছাও প্রকট হয়। তিনি যুদ্ধও করতে চাচ্ছিলেন না। কেবল শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা যতটা রাজ্য লাভ করা সম্ভব ছিল, তিনি ততটাই অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।

সাম্রাজ্য বিভাজনের সমালোচনা

সাম্রাজ্যকে নিজের ভাইদের মধ্যে বিভাজন বা বণ্টন করা, সাম্রাজ্য সংগঠনের দিক থেকে কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল, একথা বলা বেশ কঠিন। কিছু ঐতিহাসিক এই বিভাজনকে হুমায়ূনের প্রথম ভুল বলে অভিহিত করেন।[১] এঁদের মতে, সাম্রাজ্য বিভাজিত করে হুমায়ূন তাঁর শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন এবং পরে তাঁকে যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় তার জন্য তাঁর এই ভুল অনেক বেশি পরিমাণে দায়ী ছিল।

এই মতের পক্ষে বলা হয়েছে যে, কামরান হুমায়ূনের সাম্রাজ্য ও খাইবারের ওপারের ইসলামী রাজ্যগুলোর মধ্যে এক মধবর্তী রাজ্য স্থাপন করলেন। এরফলে হুমায়ূনের অন্য ইসলামী রাজ্যগুলোর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল ; কেননা, এ সম্পর্ক পঞ্জাব, কান্দাহার ও কাবুলের পথ ধরেই বজায় থাকতে পারত। তাছাড়া মোগল বাহিনীর সৈনিকরা এই পথ ধরেই যাতায়াত করত। এইভাবে, এই বিভাজন হুমায়ূনের সামরিক শক্তির মূল স্রোত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ভবিষ্যতে তাঁর সামরিক পরাজয়ের সূচনা এখান থেকেই হল।[২]

হিসার ফিরোজা দিয়ে দেওয়ার ফলে দিল্লি ও লাহোরের নতুন সেনা-সড়ক কামরানের অধিকারে এসে গেল। হুমায়ূন এমন অংশ লাভ করলেন যেখানে মোগল বিরোধী মনোভাব বিরাজ করত এবং এই এলাকার লোকেরা মোগলদের বিদেশী বলে মনে করত। এই অঞ্চলগুলো অধিকারে রাখা বেশ কঠিন ছিল। সাম্রাজ্যের যে অংশ কামরান লাভ করেছিলেন তা এই দৃষ্টিতে অধিক সুরক্ষিত ছিল। বিভাজনের ফলে, হুমায়ূনের সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রফলও অনেক কমে গিয়েছিল। হুমায়ূনের ভাইদের মধ্যে শুভবুদ্ধির অভাব ছিল। এই বিভাজন এমন ব্যক্তিদের হাতে এমন সুবিধা প্রদান করল, যার প্রয়োগ তাঁরা হুমায়ূনের বিরুদ্ধেই করলেন।

সাম্রাজ্য বিভাজনের সমর্থন

এই ঐতিহাসিকসহ অন্য ঐতিহাসিকেরা হুমায়ূনের সাম্রাজ্য বিভাজনকে সমর্থন করেছেন।[৩] তাঁদের মতে, পরিস্থিতি দৃষ্টান্তে সাম্রাজ্য বিভাজন ছাড়া হুমায়ূনের

---

১. শর্মা, মোগল এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া, ১, পৃ. ৮১।
২. ঈশ্বরদী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৪৬।
৩. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার পৃ. ৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। সাম্রাজ্য বিভাজনের পরম্পরাগত ঐতিহ্য তৈমুর বংশীয়দের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। বাবুরের পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা তাঁর চাচাদের মধ্যেও সাম্রাজ্য বিভাজন হয়েছিল। সম্ভবত, এই পরম্পরাকে স্মরণে রেখেই বাবুরও সাম্রাজ্য বিভাজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। হুমায়ূন যদি এই পরম্পরাকে উপেক্ষা করতেন তাহলে তাঁকে একটি নতুন নিয়মের প্রবর্তক বলে অভিহিত করা যেত। এইভাবে, হুমায়ূন সাম্রাজ্য বিভাজন করে তাঁর বংশের ধারাবাহিকতাকেই অনুসরণ করেন।

কামরান পাঁচ বছর যাবত কাবুলের শাসক ছিলেন। তিনি সেখানকার লোকেদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। এই দৃষ্টিতে হুমায়ূন এই অঞ্চলগুলোর জন্য এক রকমের পরদেশীই ছিলেন। আফগানরা হুমায়ূনকে তাদের সাম্রাজ্য অপহরণকারী বাবুরের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। এই দৃষ্টিতে, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করার ফলে, আফগানদের অধিকারে রাখাটা অনেক সহজ ছিল। আশঙ্কা কেবল এতটাই ছিল যে, আফগানদের যে শত্রুতা করার কথা ছিল, সেটি তারা এখন আর হুমায়ূনের বিরুদ্ধে করলেন না।

বাস্তবিকরূপে, হুমায়ূন কামরানকে এমন ভাগই দিয়েছিলেন যা তাঁর কাছে আগে থেকেই ছিল অথবা শক্তি প্রয়োগ করে তিনি তা অধিকার করে নিয়েছিলেন। যদি তিনি এর বৈধানিক স্বীকৃতি না দিতেন তাহলে কামরানের বিরুদ্ধে যে শক্তি প্রয়োগ তাঁকে করতে হত, তা তিনি করতে রাজি হতেন না। যদি হুমায়ূন সামান্য প্রতিক্রিয়াও দেখাতেন তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।

এইভাবে হুমায়ূন মোগল সাম্রাজ্যকে এমন এক বিষম পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেন যা মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে পারত।

এই অঞ্চলগুলো কামরানকে দিয়ে দেওয়ার ফলে হুমায়ূনের একটি লাভ অন্তত হয়েছিল যে, তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এবার মধ্য এশিয়া, ইরান, উজবেক, জাঠ, বেলুচি ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর সমস্যার দায়দায়িত্ব কামরানের উপর এসে পড়ল। হুমায়ূন এবার সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সাম্রাজ্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তার করার সুযোগ লাভ করলেন। পূর্ব-প্রান্তে আফগানদের উৎকর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাহাদুর শাহের সংগঠন প্রত্যক্ষ রূপে প্রমাণ করছিল যে, সবার আগে এই বহিঃশত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে।

বাবুর তাঁর আত্মকথায় কামরান ও হুমায়ূনের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভাজন ও তার অনুপাত[১] তো স্পষ্ট করে দেন কিন্তু আসকারি ও হিন্দালের বিষয়ে কিছুই লেখেন

১. হুমায়ূন বাবুর কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাত শুরুতেই কেন অবলম্বন করলেন না? সম্ভবত, তাঁর ভয় ছিল যে, এই বিভাজনের ফলে সাম্রাজ্য ছোট হয়ে পড়বে। এছাড়া তাঁর এ খেয়ালও ছিল যে, পুরো নিশ্চিত ভাগ কামরানকে দেওয়া হলে সে অনুপাতে আসকারি ও হিন্দালকেও দিতে হবে। এ কারণে তিনি এ বিষয়ে নীরবতা পালনকে অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। সম্ভবত, কামরানের উগ্রতা সম্পর্কে বাবুরের জানা ছিল এবং এ আশঙ্কাও ছিল যে, হুমায়ূনের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। এই কারণে তিনি যেখানে কামরানের অনুপাত নিশ্চিত করেছেন সেখানে অন্য ভাইদের প্রশ্নে হুমায়ূনকে কেবল সদ্ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের সময়ে হুমায়ূনের কোনো পুত্র ছিল না। এই দৃষ্টিতে ভাইয়েরাই তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কামরান ছিলেন সবার বড়, আর সম্ভবত হুমায়ূনের মধ্যে এ ভাবনাও এসে থাকবে যে, তাঁর পুত্র সন্তান না হওয়া পর্যন্ত কামরানই হবে তার উত্তরাধিকারী। হিসার ফিরোজার জায়গীর প্রদান থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আসকারি ও হিন্দাল

আসকারি ও হিন্দালকে হুমায়ূন দিল্লির নিকটস্থ মেওয়াত ও সম্ভলের জায়গীর সম্ভবত এই ভেবে দিয়েছিলেন যে, তিনি এঁদের উপর দৃষ্টি রাখতে পারবেন। কামরানের পঞ্জাব অধিকার করার ব্যাপারেই এই ভাইদের মধ্যে কোনো প্রভাব পড়ে নি, তাঁরা শান্ত থাকেন। সম্ভবত এঁরা আশা করেছিলেন যে, কামরানের জায়গীর বৃদ্ধি পেলে এঁরাও কিছু লাভ করবেন, কিন্তু এমনটি হল না। এর বিপরীতে আসকারির লোকসানই হল। কেননা, কামরান আসকারিকে কান্দাহার ও জমীনদাওর থেকে এই বলে হটিয়ে দিলেন যে, তিনি হাজার মানুষকে প্রতিহত করতে পারেন নি।[১] কিন্তু দু'ভাই সন্তুষ্ট হলেন না, আর যতদূর সম্ভব সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করার প্রয়াস চালিয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

কালিঞ্জর বিজয়

কালিঞ্জর[২] দুর্গটি বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। নির্মাণকৌশল ও অবস্থানের দৃষ্টিতে মধ্য যুগে একে একটি শক্তিশালী দুর্গ বলে গণ্য করা হত। ১০২২ খ্রিস্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ কালিঞ্জর আক্রমণ

করলেন। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। হুমায়ূন সিংহাসনে বসার পর প্রচুর পরিমাণে সম্পদ বিতরণ করলেন এবং আমীরদেরও ধন দান করেন। কিন্তু কামরান, আসকারি ও হিন্দালকে তিনি কিছুই দেন নি। হিন্দাল তো ইতিমধ্যে এসেই যান, এ কারণে তিনি কিছু পান, কিন্তু অন্য ভাইয়েরা কিছুই পান নি। সিংহাসনে বসার আট ন' মাস পর্যন্ত তিনি এই ভুল সংশোধন করেন নি।

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৬।

২. কালিঞ্জর তহসিল গিরবান জেলা বান্দা, উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। কালিঞ্জর দুর্গ থেকে ৩৫ মাইল দূরে নাগেদর এর প্রাচীন রাস্তার পাশে অবস্থিত। (ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বান্দা, ১৯০৯ খ্রি. পৃ. ২৩৪)। শিবের কালিঞ্জরের নামে এই দুর্গের নাম রাখা হয়। এই নাম মহাভারত, শিব পুরাণ ও টলেমির (Ptolemy) পুস্তকেও পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। ঐ সময়ে দুর্গে পাঁচ লাখ মানুষ, কুড়ি হাজার জানোয়ার ও পাঁচ শ' হাতি ছিল।[১] রাজপুত ও দিল্লির সুলতানদের মধ্যে এর জন্য বারবার সংঘর্ষ হতে থাকে। এটা কখনো রাজপুতদের অধিকারে আর কখনো বা তুর্কিদের অধিকারে থাকত। দিল্লির সুলতানরাও কয়েকবার কালিঞ্জর আক্রমণ করেছিলেন। এ থেকে এর গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে। এটি এমনই একটি স্থানে অবস্থিত ছিল যে, মালবের উপর বাহাদুর শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই দুর্গের গুরুত্ব মোগলদের কাছে বেড়ে গিয়েছিল।[২]

সিংহাসনে বসার পর হুমায়ূন ছ'মাস যাবত আগ্রায় অবস্থান করলেন। বর্ষা ঋতু শুরু হওয়ার পর ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে[৩] হুমায়ূন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করলেন। সম্ভবত, রাজকুমার হিসেবে হুমায়ূন কালিঞ্জর আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। কালিঞ্জরের প্রশাসক ছিলেন চান্দেল। রাজা প্রকাশ রুদ্র দুর্গ রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না।[৪] অবশেষে তিনি হুমায়ূনের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন এবং তিনি তাঁকে বারো মণ (৬৭২০ তোলা) সোনা দিলেন। আফগানদের বিদ্রোহের কারণে হুমায়ূন এই সমস্ত শর্ত স্বীকার করে নিলেন। সম্রাট হওয়ার পর কালিঞ্জর আক্রমণ ছিল হুমায়ূনের প্রথম অভিযান। কালিঞ্জর দুর্গ তার শক্তির জন্য ও চান্দেল তাঁর বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই বিজয়ের ফলে হুমায়ূনের মান প্রতিষ্ঠা অনেক বেড়ে গেল।

AMARBOI.COM

১. নাজিম, সুলতান মাহমুদ, পৃ. ১১৩।

২. ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, হুমায়ূনের কালিঞ্জর আক্রমণের কারণ বাস্তবিকরূপে গুজরাতের বাহাদুর শাহকে আক্রমণের পটভূমি ছিল, কেননা, কালিঞ্জর ছিল মালব আক্রমণ করার জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থান। গুজরাত বিজয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, এইভাবে হুমায়ূন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিলেন (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৪৯)।

ড. রামপ্রসাদ ত্রিপাঠীর মতে, কালিঞ্জরের শাসক কাল্পি অধিকার করতে (আগস্ট ১৫৩১ খ্রি.) চাইলে বাহাদুর শাহের কাছে মালবের চেয়ে কাল্পির গুরুত্ব বেড়ে যায়। রাণার ব্যবহারে হুমায়ূনের সন্দেহ হলে তিনি কালিঞ্জর আক্রমণ করলেন। (ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার, পৃ. ৬৮-৬৯)।

৩. কালিঞ্জর আক্রমণের তারিখ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবুল ফজল ও অধিকাংশ সমকালীন ঐতিহাসিক লিখেছেন, কালিঞ্জরের রাজা ৯৭৩ হি. (১৫৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে) আত্মসমর্পণ করেন। এর বিপরীতে তারীখে আলফীর লেখক তা দু'বছর পরের বলে উল্লেখ করেছেন। তারীখে আলফীর লেখক দুর্গ অবরোধ অল্প সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, এ অবরোধ দু'বছর যাবত ছিল না। এ কথা সামনে রেখেও আবুল ফজল প্রদত্ত তারিখটাই আমাদের কাছে সঠিক বলে মনে হয় (আকবরনামা পৃ. ১২৩ ; তারীখে আলফী, ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ৩৬)।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৩ - ২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফগানদের সাথে প্রথম সংঘর্ষ

কালিঞ্জর অবরোধের সময় হুমায়ূনের কাছে আফগানদের তৎপরতার খবর এলো। মাহমুদ লোদী, বিবন ও বায়েজিদদের নেতৃত্বে তারা বিহার থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে প্রবেশ করল। তারা জৌনপুরের মোগল গভর্নর জুনায়েদ বরলাসকে বিতাড়িত করে তা অধিকার করে নিল। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে এরা বারাবাংকি জেলার দাদরা[১] নামক স্থানে গিয়ে পৌছাল।

কালিঞ্জরা দুর্গ অধিকার করার পর হুমায়ূন তাদের প্রতি আগ্রসর হলেন।[২] গঙ্গা পার হয়ে গোমতী নদীর তটে অবস্থিত দাদরা নামক স্থানে আফগানদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করলেন।[৩] আফগান সৈন্যরা পালিয়ে গেল

---

১. সমকালীন ঐতিহাসেকরা যুদ্ধক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। ইলহাদাদ ফৈজী সেরহিন্দী একে দাদরা বলে উল্লেখ করেছেন। আব্বাসের মতে লখনউয়ের নিকটবর্তী (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৮৯), জওহরের মতে, গোমতী নদীর তটে অবস্থিত দওরা নামক স্থান (স্টুয়ার্টের ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ৩ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ১০, টিপ্পনী) আঈনে আকবরী অনুসারে (খণ্ড ২, ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১০০) দাদরা লখনউ সরকারের একটি মহাল ছিল। হোদীওয়ালার মতে, এটি জৌনপুর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত দেউনরু (Deunru) নামক গ্রাম (হোদীওয়ালায় ১, পৃ. ৪৫০)। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে (হুমায়ূন, পৃ. ৫০, টিপ্পনী, ১) জৌনপুর থেকে ৪৮ মাইল উত্তরে।
বর্তমানে এটি বারাবাংকি জেলার নবাবগঞ্জ তহসিলের একটি গ্রাম, যেটি বারাবাংকি জেলা থেকে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কানুনগো একে দৌরা বলে উল্লেখ করেছেন। হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে দাদরা ও দৌরা উভয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. কালিঞ্জরের যুদ্ধের পর হুমায়ূনের গতিবিধি সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এর কারণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ড. ত্রিপাঠীর মতে, হুমায়ূন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন। এখান থেকে তিনি চুনার আসেন (ফেব্রুয়ারি ১৫৩২ খ্রি.)। এখান থেকে কামরানের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগমনের খবর পেয়ে চুনার অধিকার না করে তিনি আগ্রা চলে যান। এখানে কামরানের সাথে সাম্রাজ্য বিভাজনের সমস্যা সমাধান করে পুনরায় আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দওরা নামক স্থানে তাদের পরাজিত করেন (অক্টোবর ১৫৩২ খ্রি.)। (ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার, পৃ. ৬৮-৭০ ও ১১৩)।
ড. ত্রিপাঠী আকবরনামার ভিত্তিতে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেছেন (আকবরনামা, পৃ. ১২৪)। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন, পৃ. ৪৯) এর মতে, কালিঞ্জর থেকে হুমায়ূন আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দওরার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, ১, পৃ. ৩৭) লিখেছেন যে, কালিঞ্জর থেকে হুমায়ূন সোজা চুনার গমন করেন। কিন্তু চুনারে কী হল, সে বিষয়ে তিনি নীরব। আফগানদের অবস্থার উপর আলোকপাত করার পর তিনি সোজা দাদরার যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কালিঞ্জর দুর্গ অধিকৃত হয় জুলাই-আগস্ট ১৫৩১ এ এবং দাদরার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৩২ এ।

২. দাদরার যুদ্ধের তারিখ বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। তারীখে আলফীতে প্রথম বর্ষে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। গুলবদন বেগমের মতে, হুমায়ূন বাবুরের মৃত্যুর ছ'মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তাদের দুই প্রধান নেতা শেখ বায়েজিদ ও ইব্রাহীম ইউসুফ খায়েল নিহত হলেন (জুলাই-আগস্ট ১৫৩০-৩১)।

শের খাঁ ও দাদরা

দাদরার যুদ্ধে কী শের খাঁ অংশগ্রহণ করেছিলেন ? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। আব্বাস খাঁ সেরওয়ানী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, শের খাঁ আফগানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মাহমুদ লোদীর বিহারে আসার পর তিনি নিজের জায়গীরে চলে গিয়েছিলেন। মাহমুদ লোদী তাঁর জায়গীরে গিয়ে তাঁকে এ যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁকে নিয়ে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শের খাঁ তো যুদ্ধে অবশ্যই অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত গোপনে হিন্দু বেগকে একটি পত্র মারফত যুদ্ধের সময়ে তাঁর সৈন্যদের সরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে শের খাঁ যথারীতি তাঁর সৈন্যদের ফিরিয়ে নেন এবং এইভাবে আফগানদের পরাজয়ের তিনি প্রধান কারণ বনে যান। নিজামউদ্দীন আহমদ, বদায়ূনী এবং ফিরিশতাও আব্বাসের এ মত সমর্থন করেছেন[১]।

ড. কানুনগো আব্বাসের সাথে একমত নন। তিনি লিখেছেন, শের খাঁর এই প্রশংসকই তাঁর চরিত্র ও সম্মানের সবচেয়ে বেশি হানি করেছেন। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত দলিলগুলো পেশ করেছেন।[২]

পর বিবন ও বায়েজিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১১-১২)। জওহরের মতে, হুমায়ূন কালিঞ্জর থেকে সোজা আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং এ ঘটনা তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই ঘটে (জওহরের তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত এর স্টুয়ার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ৩)। তিনি তাঁর তারিখ লিখেছেন ৯৩৮ হি.। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, কালিঞ্জর থেকে হুমায়ূন আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৪৭-৪৮ ও ১৫৮-১৫৯)। ফিরিশতার মতেও হুমায়ূন কালিঞ্জর থেকে আফগানদের উপর আক্রমণ চালান। (ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৭২)। আবুল ফজলের মতে, হুমায়ূন সিংহাসনে বসার পাঁচ ছ'মাস পরে কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। শের খাঁ সন্ধি করে নেন। এরপর, আফগানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে হুমায়ূন তাদের পরাজিত করেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৩-১২৪)। ড. ব্যানার্জির মতে, দাদরার যুদ্ধ ১৫৩২ এর আগস্টে, ড. কানুনগো ও ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, ১৫৩১ এর জুলাইয়ে ও ড. রামপ্রসাদ ত্রিপাঠীর ১৫৩২ এর নবেম্বর-ডিসেম্বরে সংঘটিত হয় (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৪২ ; কানুনগো, শের খাঁ, পৃ. ৭৪; ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার, পৃ. ১১৩)।

১. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৪৯; তবকাতে আকবরী, ২, পৃ. ১৫৯ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১১১ - ১১২ ; আর্সকিন, (২, পৃ. ১) তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছেন।

২. কানুনগো, শের খাঁ পৃ. ৭২ -৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. গুলবদন বেগম ও জওহর আফগানদের পরাজয়ের বর্ণনার সাথে শের খাঁর নামের উল্লেখ করেন নি।

২. নিজামউদ্দীন আহমদ, বদায়ূনী ও ফিরিশতা হুমায়ূনের রাজত্বকালে আফগানদের বিদ্রোহের উল্লেখ কালে শের শাহের কথা উল্লেখ করেন নি। যদিও এই লেখকরা শের খাঁর অধ্যায়ে এর উল্লেখ করেছেন।[১]

৩. সমস্ত সমকালীন ঐতিহাসিকই শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী আব্বাস খাঁ থেকে গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনার সমকালীন ঐতিহাসিক কেবল মাত্র আব্বাস। পরবর্তীকালের সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর থেকে নকল করেছেন।

৪. এলফিনস্টোন তো এ কথা অস্বীকারই করে দিয়েছেন।[২]

৫. জাতীয় পরাজয়েরর কারণ স্বরূপ প্রায়শই বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়।

৬. শের খাঁ আফগানদের মধ্যে গৌণ স্থান লাভের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, তাঁর সামরিক খ্যাতি বিবন বা বায়েজিদের সমকক্ষ ছিল না। এই কারণে গৌণ স্থান লাভের চেয়ে তিনি এই অভিযানে অংশ না নেওয়াই উচিত বলে বিবেচনা করেন।

৭. এই সময় পর্যন্ত শের খাঁর জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। এজন্য তিনি আত্মস্বার্থেরই দৃষ্টিতে মোগলদের সাথে বিরোধে জড়াতে চান নি। হয়তো মনে মনে তিনি লোদী ও ফরমূলী বংশীয়দের বিনাশ কামনা করতেন, কেননা, এঁদেরই কারণে তিনি নিজেকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তুলতে পারছিলেন না।

৮. চুনার রক্ষার জন্য তিনি তটস্থ নীতি অবম্বন করতে চাচ্ছিলেন।

সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ড. কানুনগোর এ মত স্বীকার করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। দাদরার যুদ্ধের সময়ে বিবন, বায়েজিদ ও মাহমুদ লোদীর সামনে শের খাঁর কোনো স্থান ছিল না। ড. কানুনগো একথা নিজেও স্বীকার করেন। তাছাড়া মাহমুদ লোদীর অধীনে যুদ্ধ করতে শের খাঁ কী ধরনের অপমান বোধ করেন ? গুলবদন বেগম ও জওহর মোগল বংশের সাথে একাত্ম হওয়ার কারণে, একথা লেখাটা হেয় বলে মনে করতেন যে, হুমায়ূনের বিজয় বীরত্বের কারণে নয় ; বরং শের খাঁর সহযোগিতায় (আফগানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়)। এ কারণে তাঁরা এর উল্লেখ করেন নি।

প্রত্যেকটি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাকে জাতীয় পরাজয় রূপে অস্বীকার করা অথবা কোনো ঘটনা কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কর্তৃক উল্লেখিত না হওয়ার

---

১. বদায়ূনী, র‍্যাংকিং, পৃ. ৪৫১ ; তবকাতে আকবরী, দে. ২, পৃ. ৪৭-৪৮ ও ১৫৯ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৭২ ও ১১১-১১২।

২. এলফিনস্টোন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে একথা বলা যে, সেটা ঘটে নি অথবা কোনো ঐতিহাসিকের ঐ ঘটনার বর্ণনাকে নকল বলে অস্বীকার করাটা একেবারেই অযৌক্তিক।[১]

নিজামউদ্দীন, ফিরিশতা ও বদায়ূনী হুমায়ূন ও শের খাঁর রাজত্বকালের পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন। হুমায়ূনের রাজত্বকালে এ ঘটনার বর্ণনা এজন্যই দেওয়া হয় নি। কেননা, তাঁরা একই ঘটনার বর্ণনা দুই স্থানেই দিতে চান নি। এছাড়া বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ শের খাঁর চরিত্র-বর্ণনার সাথে অধিক সম্পর্কিত ছিল। এরপরে, এই লেখকদের পক্ষে একই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলী কীভাবে অস্বীকার করা সম্ভব হতে পারে?

এই সংঘর্ষ আফগানদের এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল। লোদী বংশের উত্তরাধিকারীরা এর নেতৃত্বে ছিলেন। এতে সমস্ত প্রধান আফগান দলপতি উপস্থিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শের খাঁর পক্ষে এ থেকে পৃথক থাকা অসম্ভব ছিল। তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁদের সহযোগিতা না করলে তাঁদের সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হবেন। মোগলদের সাথে মেলামেশার বিষয়টি গোপন ছিল। তাঁর আশা ছিল যে, আফগানরা তা জানতে পারবে না।

আব্বাস শের খাঁর একজন প্রশংসক। তিনি শের খাঁর কিছু অনুচিত কাজকে সমর্থন করেছেন।[২] ড. কানুনগোর এই উক্তি 'শের শাহের সবচেয়ে বড় প্রশংসক (আব্বাস খাঁ) তাঁর মানহানি ঘটিয়েছেন'- সত্য নয়। তাঁর ইতিহাস লেখার সময়ে আব্বাস জানতেন যে, শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বাস্তবিক রূপে আফগানদের জন্য লাভজনকই ছিল, কেননা, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর শক্তি সংহত করে নিয়েছিলেন। এই কারণে তা গোপন না করে তার উল্লেখ করে তিনি তাঁর আদর্শ নায়কের দূরদর্শিতাই প্রমাণ করলেন।

ড. কানুনগোর মতের বিপক্ষে, ড. ব্যানার্জি, ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ও ড. রাম প্রসাদ ত্রিপাঠী আব্বাসের বিবরণ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাঁরা একথা মানেন যে, শের খাঁ দাদরার যুদ্ধে আফগানদের ধোঁকা দিয়েছিলেন।[৩]

বাস্তবিক রূপে শের খাঁ ছিলেন উভয় সংকটে। চুনারের উপর তাঁর অধিকার ছিল অধীনস্থ ব্যক্তির ন্যায়। শের খাঁ হিন্দু বেগের সাথে পত্রে চুনারের উপরে মোগলদের দাবি অস্বীকার করেন নি।[৪] সাসারাম ও খাওয়াসপুরের জায়গীরদার হিসেবে তিনি মাহমুদ লোদীর অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৪৫।
২. উদাহরণত, রায়সীনে রাজপুত ও পুরণমলের হত্যা ও রোহতাস বিজয়।
৩. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৪৪-৪৫; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৪৯-৫০ ; ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার পৃ. ৭০।
৪. তারীখে দাউদী, তারীখে সালাতীনে আফগানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এই পরিস্থিতিতে শের খাঁ তটস্থ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু জবরদস্তিভাবে তাঁকে মাহমুদ লোদীর সাথে যেতে হল। তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর এটা ঠিক হচ্ছে না, কেননা, মোগলরা বিজয়ী হলে তাঁকে চুনার ছেড়ে দিতে হবে। আফগানরা বিজয়ী হলেও তাঁর অবস্থার পরিবর্তনের কোনো আশা ছিল না, কেননা, আফগানদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল বিবন, বায়েজিদ ও মাহমুদ লোদীর পরে। এ কারণে তিনি মাহমুদ লোদীর সাথে অবশ্যই গেলেন কিন্তু সেই সাথে তিনি হিন্দু বেগের মাধ্যমে হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বাধ্য হয়ে মাহমুদ লোদির সাথে এসেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মোগলদের সাথেই আছেন।

দাদরার যুদ্ধে তটস্থ থাকা সত্ত্বেও সেখানে মোগলদের সাথে না মিলিত হয়ে তিনি সোজা তাঁর জায়গীরে চলে গেলেন। এইভাবে তিনি তটস্থ থাকার প্রয়াস চালালেন। যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে শের খাঁ নিশ্চিত ছিলেন না। আফগানরা বিজয়ী হলেও শের খাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা না দেওয়ার কারণে তারা তাকে ভর্ৎসনা করত কিন্তু তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলত না।

দাদরার যুদ্ধের পরিণাম

দাদরার যুদ্ধ আফগানদের জীবনে ও মোগলদের পূর্ব প্রান্তের সমস্যার মধ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। বায়েজিদ, ইব্রাহীম, ইউসুফ খায়েল প্রমুখ আমীরদের মৃত্যু আফগানদের শক্তি, যা পানিপথের যুদ্ধের পরে পুনরুত্থিত হচ্ছিল, তা ভেঙে দিল। এরফলে, পূর্ব প্রান্তে অধিকার কায়েম করতে মোগলদের সুবিধা হল। গঙ্গা ও ঘাঘরার মধ্যেকার ভূ-ভাগ মোগলদের অধিকারে এসে গেল এবং হুমায়ূন জুনাইদ বরলাসকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।[১] তিনি হিন্দু বেগকে শের খাঁর সাথে বার্তালাপ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।[২] মাহমুদ লোদী এই যুদ্ধের পর এতটা নিরাশ হলেন যে, তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার চিন্তাই ত্যাগ করলেন। তিনি পাটনায় সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জীবন কাটাতে লাগলেন এবং সেখানেই ৯৪৯ হিজরিতে (১৫৪২-৪৩ খ্রি.) তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।[৩] বহু সংখ্যক আফগান বিহার থেকে পালিয়ে গুজরাতের বাহাদুর শাহের কাছে চলে গেলেন। এবার আফগানদের নেতৃত্বের জন্য কেবল শের খাঁ-ই রয়ে গেলেন এবং স্বাধীনভাবে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার অবসর লাভ করলেন।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪।
২. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, পৃ. ৩৫০।
৩. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৫৯ - ৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুনার দুর্গে আক্রমণ

দাদরার যুদ্ধের পর হুমায়ূন আগ্রায় চলে গেলেন[১] এবং দাদরায় আফগানদের পরাজয়ের পর তাঁর তাদের পিছু ধাওয়া করা উচিত ছিল এবং তাদের শক্তি পূর্ণরূপে চূর্ণ করে দিয়ে তাদের অধিকৃত অংশগুলো অধিকার করে নেওয়া উচিত ছিল। এই ভুলের কারণে তাঁকে ভবিষ্যতে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। শের খাঁর কাছ থেকে চুনার দুর্গ অধিকার করার বিষয়ে শের খাঁর সাথে বার্তালাপ করার জন্য হিন্দু বেগকে নিয়োজিত করলেন।[২] হিন্দু বেগ বার্তালাপ শুরু করলেন। শের খাঁ চুনার দুর্গ সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দু বেগ, শের খাঁ-র এ অনমনীয় মনোভাব হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলেন। চুনার দুর্গের অবস্থান, গুরুত্ব ও শের খাঁর ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হয়ে হুমায়ূন চুনার অধিকার করার জন্য আগ্রা থেকে রওনা হলেন।[৩] তাঁর আগে তিনি অগ্রগামী দল রূপে কিছু আমীরকে পাঠালেন। তাঁরা আগে পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করার ব্যবস্থা করলেন।

হুমায়ূন প্রায় এক বছর আগ্রায় ছিলেন। ইতিমধ্যে, মনে হয় তিনি তাঁর দরবারের কিছু নতুন নিয়ম চালু করেন, খন্দমীর যার বর্ণনা কানুনে হুমায়ূন-এ দিয়েছেন।[৪]

চুনার দুর্গ বেনারস ও মির্জাপুরের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই দুর্গটি এক বিশাল পাহাড়ি চট্টানে অবস্থিত। একে মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলোর অন্যতম বলে গণ্য করা হত। প্রচলিত আছে যে, এটি খুবই পুরাতন দুর্গ এবং উজ্জৈন এর বিক্রমাদিতের ভাই ভর্তৃহরি সেখানে তাঁর আশ্রম বানিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইব্রাহীম লোদী এখানে তাঁর রাজকোষ রাখেন, যার ফলে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

হুমায়ূন প্রায় চার মাস (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ১৫৭৩ খ্রি.) চুনার দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। তাঁর সৈন্যরা পরিকল্পনা মাফিক দুর্গের অধিবাসীদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যাতে তারা সহজেই আত্মসমর্পণ করে। কখনো বা দিনে বা রাতে ছোট খাট আক্রমণও চলতে থাকে। শের খাঁ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খাঁকে দুর্গ রক্ষার

১. আব্বাস লিখেছেন, দাদরার পর হুমায়ূন হিন্দু বেগকে শের খাঁর কাছ থেকে চুনার দুর্গ লাভ করার জন্য পাঠালেন। শের খাঁ তাতে রাজি হলেন না। এরপর হুমায়ূন চুনার আক্রমণ করলেন। (তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪ পৃ. ৩৫০)। নিজামউদ্দীন, তবকাতে আকবরী, দে পৃ. ১৬০) স্পষ্টই লিখেছেন যে, আফগানদের সাথে যুদ্ধ করে হুমায়ূন আগ্রা চলে গেলেন।

২. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪ পৃ. ৩৫০।

৩. আব্বাস, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫০ ; তবকাতে আকবরী, দে ২, পৃ. ১৬০ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, ৭২।

৪. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ১৫ - ৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য নিয়োজিত করে স্বয়ং ভরকুন্দা[১] অভিমুখে চলে গিয়েছিলেন। জালাল খাঁ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দুর্গ রক্ষা করেন। দুর্গের বাইরে থাকায় শের খাঁর অনেক সুবিধা ছিল। তিনি দুর্গে অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু পাঠাতে থাকলেন। এই দুর্গ এতটা শক্তিশালী ছিল যে, প্রয়োজনীয় বস্তু পৌঁছাতে থাকলে শক্রদের পক্ষে এ দুর্গ অধিকার করা মোটেও সহজ ছিল না। এছাড়া বাইরে থেকে বিহার ও মোগলদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখারও সুবিধা ছিল। দুর্গের বাইরে অবস্থানের ফলে, দুর্গের পতন ঘটলেও তাঁর উপর আঁচ আসতে পারত না এবং তাঁর বন্দি হওয়ার কোনো ভয় ছিল না।

এই সময়ে খবর পাওয়া গেল বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করার পর এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেছেন। বাহাদুর শাহের দৃষ্টি মোগল সাম্রাজ্যের উপরেও ছিল। হুমায়ূন এরফলে চিন্তিত হলেন, কেননা, তাঁর অনুপস্থিতিতে যদি বাহাদুর শাহ দিল্লি, আগ্রা অথবা পঞ্জাব আক্রমণ করে বসতেন তাহলে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হত। এই পরিস্থিতিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুমায়ূন সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[২] শের খাঁ দুর্গে না থাকা সত্ত্বেও সেখানকার পরিস্থিতি তিনি অবগত ছিলেন। তিনি এ খবর পেলেন যে, হুমায়ূন চিন্তিত এবং তিনি অবরোধ তুলে নিতে চাচ্ছেন। শের খাঁও যুদ্ধ আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন না, কেননা, বাংলার শাসকের দ্বারা বিহার আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। এই কারণে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

সন্ধির শর্তাবলী

শের খাঁ হুমায়ূনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিলেন। তিনি তাঁর তৃতীয় পুত্র আবদুর রশীদ (যিনি কুতুব খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন)-এর নেতৃত্বে ৫০০ সৈনিকের এক আফগান বাহিনী মোগল সম্রাটের সেবায় পাঠিয়ে দিলেন। হুমায়ূন চাচ্ছিলেন, জালাল খাঁ এর নেতৃত্ব দিন, কিন্তু শের খাঁ এতে প্রস্তুত ছিলেন না। হুমায়ূন অবশেষে কুতুব খাঁকেই মেনে নিলেন।[৩] চুনার দুর্গ শের খাঁর অধীনেই রয়ে গেল এবং এজন্য তাঁর কর দেয়ার প্রয়োজন ছিল না।[৪]

১. ভরকুন্দা, নহরকুন্দা বা বরকুন্দা। ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫০ ; হোদীওয়ালা, ১ পৃ. ৪৫৩ ; আঈনে আকবরী ২, পৃ. ১৫৩।

২. নিজামউদ্দীন স্পষ্টই লিখেছেন, তিনি চুনার বিজয় এজন্যই ত্যাগ করলেন যে, বাহাদুর শাহের দিক থেকে শঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবকাতে আকবরী, (দ, ২, পৃ. ১৬০), আব্বাস খাঁও এই মত ব্যক্ত করেছেন (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫১)।

৩. আবদুর রশীদ হুমায়ূনের সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং হুমায়ূন যখন বাহাদুর শাহের উপর আক্রমণ হানেন তখন তিনি মালবে পৌঁছালে আবদুর রশীদ সেখান থেকে পালিয়ে যান (আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৩ - ২৪)। আব্বাস এঁর নাম কুতুব খাঁ লিখেছেন (ইলিয়ট ও ডাসন, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৫১)।

৪. আব্বাস খাঁ, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪ পৃ. ৩৫১ ; ডার্ন, হিস্ট্রি অব দি আফগানস, পৃ. ১০৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুনারের সন্ধি বাস্তবিক রূপে শের খাঁর জয় ও হুমায়ূনের পরাজয়ই ছিল। এই অবরোধের বাস্তবিক লাভ ছিল কেবল মাত্র পাঁচশ' আফগান সৈন্য, যা মোগলরা লাভ করেছিলেন। এ সৈনিকরা মোগল সাম্রাজ্যের জন্য কতটা শক্তিশালী প্রতিপন্ন হত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গিয়েছিল। শের খাঁ অধীনতা অবশ্যই স্বীকার করলেন কিন্তু এ ছিল তাঁর কূটনৈতিক চাল। চুনার তাঁর অধিকারও রয়ে গেল আবার করও দিতে হল না।

ড. ঈশ্বরী প্রসাদ হুমায়ূনের এই সন্ধির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, যদি হুমায়ূন শের খাঁকে পরাস্ত করতেন তাহলে তাঁর উৎকর্ষ সমূলে বিনাশ হয়ে যেত আর সম্ভবত, মোগলদেরও বিতাড়নের মুখোমুখি হতে হত না।[১] এতে সন্দেহ নেই যে, "এই বাণিজ্য থেকে শের খাঁ মনের মতো অবকাশ পেলেন এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য উৎসাহিত হলেন, সেই সাথে হুমায়ূন কিছুটা বদনামীও হলেন।"[২] বদনামীর অন্যতম প্রধান কারণ এও ছিল যে, মোগলরা অবশেষে সেই সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন, যা তাঁরা আগেই অস্বীকার করেছিলেন।

হুমায়ূনের ভুল স্বীকার করার আগে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিস্থিতি এমন ছিল যার ফলে বাধ্য হয়ে হুমায়ূনকে চুনার দুর্গের অবরোধ তুলে নিতে হয়। ঐ সময়ে বাহাদুর শাহের ভয় শের খাঁর ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল। সে সময়ে এ কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না যে, শের খাঁ হুমায়ূনকে সরিয়ে দিয়ে যে কোনো সময়ে দিল্লির সম্রাট হয়ে বসতে পারেন। এ কারণে চুনার বিষয়ে সন্ধি করে হুমায়ূন কোনো ভুল করেন নি। বাস্তবিক রূপে তিনি আফগানদের প্রধান দলপতিদের সহযোগিতা লাভ করেন।

হুমায়ূন একটি ভুল অবশ্যই করেছিলেন। যে সময়ে তিনি আগ্রা থেকে রওনা হন সে সময়েও বাহাদুর শাহের বিস্তার নীতির বিকাশ ঘটেছিল এবং তাঁর মোগল নীতিও অস্পষ্ট ছিল না। হুমায়ূনের স্বয়ং চুনার অভিযানের নেতৃত্বের স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে এর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। তিনি ঐ ব্যক্তির সাথে শক্তিশালী বাহিনীও পাঠাতে পারতেন। তারপর, সন্ধি করার আগে পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখলে সন্ধি না করে তাঁর অন্য কোনো ব্যক্তির উপর অভিযানের দায়িত্ব সপে দিয়ে সেখান থেকে আগ্রায় ফিরে যাওয়া উচিত ছিল।

আনন্দোৎসব

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে হুমায়ূন চুনার থেকে আগ্রায় ফিরে এলেন।[৩] তাঁর সকুশল প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাহম বেগমের আগ্রহে আনন্দোৎসব পালন করা

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৬১।
২. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার, পৃ. ৭২।
৩. গুলবদন, জওহর ও ফিরিশতার মতে, হুমায়ূন চুনার থেকে আগ্রা ফিরে আসেন। গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ১১৩ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, পৃ. ৭২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল। দরবার বসল, আলোকসজ্জা করা হল, দাওয়াত হল, বাজার এবং জনসাধারণের বাড়িঘরও সজ্জিত করা হল। হুমায়ূন তাঁর আমীরদের মধ্যে পারিতোষিক, ঘোড়া ও বস্ত্র বিতরণ করলেন।[১]

হুমায়ূনের এই উৎসবের কারণ কী ছিল ? তিনি কী এমন বিজয় লাভ করেছিলেন যে উপলক্ষে এ ধরনের উৎসব পালন করা যেত ? এমন পরিস্থিতিতে, যখন বাহাদুর শাহ মোগল সাম্রাজ্যের সামনে এক ভয়ঙ্কর সমস্যা রূপে উপস্থিত হচ্ছিলেন তখন কী এই আয়োজন উচিত ছিল ? ড. ব্যানার্জী লিখেছেন, হুমায়ূন এই উৎসবের দ্বারা বাহাদুর শাহ ও অন্যান্য সম্রাটদের প্রতাপ দেখাতে চাচ্ছিলেন।[২] এই মত স্বীকার করা বেশ কঠিন। বাস্তব সত্য হল, এই ধরনের আনন্দোৎসবের শখ হুমায়ূনের ছিল। রাজমাতা মাহম বেগমও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান। এর কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। এভাবে সম্পদ অপচয় করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গোয়ালিয়র যাত্রা

এই সমস্ত উৎসবের পর হুমায়ূন গোয়ালিয়র গেলেন, যা আগ্রা থেকে প্রায় ৭২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সেখানে তিনি দু'মাস (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৫৩৩ খ্রি.) অবস্থান করলেন। গোয়ালিয়র যাওয়াটা ছিল হুমায়ূনের কূটনৈতিক অভিপ্রায় ছিল।[৩] বাহাদুর শাহ চিতোর অবরোধ করে রেখেছিলেন আর রাজমাতা কর্ণাবতী হুমায়ূনকে রাখী পাঠিয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, তিনি রানীর সাহায্যের জন্য গোয়ালিয়র গিয়েছিলেন কিন্তু বাহাদুর শাহ ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত আছেন বিবেচনা করে তিনি তাঁর উপর আক্রমণ চালালেন না। বস্তবিকই হুমায়ূনের আশঙ্কা ছিল না জানি বাহাদুর শাহ চিতোরের

১. গুলবদন বেগমের মতে, ১২ কাতার উট, ১২ কাতার খচ্চর, সত্তর রাস তীপূচাক ঘোড়া ও ১০০ রাস ভারবাহী অশ্ব বণ্টন করা হল। ৭০০ ব্যক্তিকে বিশেষ খিলআত বণ্টন করা হল। গুলবদন বেগমের মতে, আঈনে বন্দি (বাজার সাজানোর প্রথা) মাহম প্রচলন করেন। মিসেস বেভারিজের মতে, এ কথা সত্য নয়। বাস্তবে, মাহমের আদেশে সম্ভবত জনসাধারণও বাড়িঘর সজ্জিত করে থাকবেন। দেখুন হুমায়ূননামা, বেভারিজ, ১১৩ - ১৪পৃ., ১১৩-র তৃতীয় পাদটীকা। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, ১২,০০০ ব্যক্তিকে বিশেষ বস্ত্র প্রদান করা হয়। তার মধ্যে দু' হাজার ব্যক্তিকে জড়োয়া সোনার কাজ করা বেল্ট ও খিলআতের উপর পরার বস্ত্র প্রদান করা হল। তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ৪৬।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ৫৮।

৩. গুলবদন বেগম লিখেছেন, আগ্রায় হুমায়ূন মাহম বেগমের কাছে প্রার্থনা করেন যে, আজকাল আমার একদম ভাল লাগে না, আপনার আদেশ হলে আমি আপনার সাথে গোয়ালিয়রের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাব। এই রকমই তিনি একটু আনন্দ লাভের অভিপ্রায়ে গোয়ালিয়র গিয়েছিলেন। (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৫)। গুলবদন বেগমের এ অনুমান বাহ্যিক আনন্দোৎসবের উপর ভিত্তি নির্ভরশীল। বাস্তবিক কারণটি সম্ভবত তাঁর জানা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর মোগল সাম্রাজ্যের উপরেও আক্রমণ করে বসেন। গোয়ালিয়র থেকে হুমায়ূন বাহাদুর শাহের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখতে চাচ্ছিলেন, কেননা, মেবার বিজয়ের ফলে গুজরাতের সীমা মোগল সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারত। এছাড়া পুরো রাজপুতানার সমস্ত সুবিধা বাহাদুর শাহই লাভ করতেন।

গোয়ালিয়র নিবাসের দুটি মাসই হুমায়ূন আনন্দোৎসবের মধ্যে ব্যয় করলেন। অভিজাত দরবার বসল ও জলসা হল। স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে হুমায়ূনকে ওজন করা হল এবং সুসজ্জিত অশ্বদল নিয়ে মিছিল বের করা হল। লোকেদের বিনামূল্যে ভোজন দেওয়া হল, হাতি সাজিয়ে ও অন্যান্যভাবে আননন্দোৎসব করা হল।[১] হুমায়ূনের গোয়ালিয়র নিবাস বর্থ হয় নি। কেননা, এই পরিস্থিতি দেখে বাহাদুর শাহ মার্চ ১৫৩৩-এ মেবারের সাথে সন্ধি করে গুজরাতে ফিরে গেলেন।

হুমায়ূন গোয়লিয়রে কেন অযথা সময় নষ্ট করলেন ? তিনি সেখানে রাজপুতদের সাহায্যের জন্য গিয়ে থাকলে সেজন্য তিনি সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না কেন ? এমনও প্রতীত হয় যে, হুমায়ূন এ সময় পর্যন্ত বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সম্ভবত, তিনি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁর মাতা মাহম বেগমের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে আগ্রায় ফিরে আসতে হল।[২]

মাহম বেগমের মৃত্যু

গোয়ালিয়রে দু'মাস অবস্থানের পর হুমায়ূন আগ্রায় ফিরে এলেন। তাঁর এত দ্রুত ফিরে আসার কারণ ছিল তাঁর মা মাহমের অসুস্থতা। মাহম বেগম পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। হুমায়ূন তাঁর চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে মাহম বেগমের ইন্তেকাল হয়ে গেল।[৩]

মাহম বেগম এক যোগ্য ও বিদূষী মহিলা ছিলেন। তিনি বাবুরের এমনই এক পত্নী ছিলেন যিনি দিল্লির সিংহাসনে বাবুরের পাশাপাশি বসার সৌভাগ্য লাভ

১. Humaun indulged in another series of festivitis and orgarized as if to announce to Bahadur that though he was even ready to face the sultan and had actually came out to meet him, he has not averse to peace. (ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ৫৯)।
বিদ্বান লেখকের এ মত স্বীকার করা বেশ কঠিন। যদি হুমায়ূন এই আনন্দোৎসবের দ্বারা বাহাদুর শাহকে ভয়ভীত করতে চাইতেন তাহলে এটা ছিল এক মস্ত বড় ভুল। বাহাদুর শাহ এ ধরনের চমক দ্বারা ভয়ভীত হওয়ার পাত্র ছিলেন না।

২. কাম্মিস্সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৩০ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৫৯-৬০।

৩. গুলবদন বেগমের মতে, ৯৪০ হিজরির ১৩ শাওয়াল (২৭ এপ্রিল ১৫৪৩ খ্রি.) তারিখে মাহমের মৃত্যু হয়। গুলবদন বেগমের এ তিথি ঠিক নয়। এর বিশ্লেষণের জন্য দেখুন হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন।[১] হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার পর মাহমের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় নি বরং বেড়েছিল। তিনি হুমায়ূনের আমলে সামাজিক উৎসবাদির প্রচলন করেন। বাবুরের মৃত্যুর পর মাহম আগ্রা ত্যাগ করেন নি এবং তিনি বাবুরের কবর দেখাশুনা করতে থাকেন। তাঁর ভাই মুহম্মদ আলী আসাস বাবুরের কবরের মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন। ষাটজন হাফিজকে নিয়মিত কুরআন পাঠের জন্য নিয়োজিত করা হয়। মাহম যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাবুরের মাজারের দু'ওয়াক্তের পানাহার মাহমের জায়গীরের আয় থেকে বণ্টন করা হত।[২] মাহমের মনে সর্বদাই এই ইচ্ছা জাগরুক ছিল যে, হুমায়ূনের একটি পুত্রসন্তান লাভ হোক এবং সেজন্য তিনি হুমায়ূনের বিয়ের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকালে তাঁর এ আশা আর পুরো হয় নি।[৩]

দীন পনাহ্

মাহমের মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন যাবত শোক পালন করা হল। তারপর, হুমায়ূন আগ্রা থেকে দিল্লি গেলেন। তিনি সেখানে এক নগর বসালেন, যা দীন পনাহ (ধর্মরক্ষক) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল।[৪] এই নগর বসানোর চিন্তা হুমায়ূনের মাথায় আসে গোয়লিয়রে অবস্থানকালে। তাঁর চিন্তা ছিল যে, তিনি এমন এক নগর নির্মাণ করবেন যার চারদিকে উঁচু প্রাচীর, কয়েক তলা উঁচু মহল, সুন্দর বাগিচা এবং উদ্যান থাকবে আর এ নগর জগতে অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।[৫]

এই নগর বসানোর জন্য দিল্লিতে যমুনা নদীর তীরে পুরাতন কেল্লার কাছে স্থান নির্বাচন করা হল। জ্যোতিষীদের দ্বারা দিনক্ষণ ঠিক করে এক শুভক্ষণে হুমায়ূন নগরের শিলান্যাস করলেন (জুলাই - আগস্ট ১৫৩৩ খ্রি.)। তাঁর প্রথম ইট রাখার পর উপস্থিত অন্যান্য আলিম ও সৈয়দরাও ইট রাখলেন এবং ঐ দিন বাদশাহের বিশেষ মহলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রায় ন'মাসে নগর প্রাচীর ও তার উপরি-অংশ এবং সদর দরজার নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেল।[৬]

AMARBOI.COM

---

১. আকবরনামা, ১ পৃ. ১১৪।

২. গুলবদন বেগমের বর্ণনানুসারে (বেভারিজ, পৃ. ১১১) প্রত্যেক দিন সকালে একটি গরু, দুটি ভেড়া ও পাঁচটি ছাগল এবং তৃতীয় প্রহরে পাঁচটি ছাগল বিতরণের জন্য জবাই করা হত।

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা পৃ. ১১২।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪। আবুল ফজল ও খন্দমীরের মতে, তিথি গণনার ভিত্তিতে এর তারিখ 'শহরে বাদশাহে দীন পনাহ' থেকে বেরিয়ে আসে, যার জোড় হয় ৯৪০ হিজরি (খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণী প্রসাদ, পৃ. ৫৯ - ৬০ ; গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৭)।

৫. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী ; বেণী প্রসাদ, পৃ. ৫৯-৬২।

৬. ঐ, পৃ. ৫৯ - ৬০। শিলান্যাস মুহররম ৯৪০ হি.তে (জুলাই - আগস্ট, ১৫৩৩ খ্রি.) হয় এবং এই ইমরাতগুলো ৯৪০ হি.-র শেষ অবধি (মে ১৫৩৪ খ্রি.) সম্পন্ন হয়ে যায়। বেণী প্রসাদ লিখেছেন (পৃ. ৬০ টিপ্পনী, ১) যে, ব্যানার্জির এপ্রিলে ইমারত সম্পন্ন হওয়ার কথা সত্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ব্যানার্জি হুমায়ূনের দীন পনাহ নির্মাণের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, দীন পনাহ নামক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা কোনো মূর্খতাজনিত কাজ ছিল না। লোদী সুলতানদের দিল্লি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর এ নতুন নগর বিশ্বের বুদ্ধিমানদের স্বর্গরাজ্য ছিল, যা সকল প্রকার ধার্মিক ব্যক্তিদের আকর্ষণ করত। দীন পনাহ হুমায়ূনের উদার নীতির প্রতীক ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি মুহম্মদ বিন তুগলকের ন্যায় আপন আদর্শের ঢ্যাঁরো পেটান নি। তিনি কবি, সুফী, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের স্বাগত জানান এবং তাঁর দরবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা উপস্থিত হন। ঐ যুগে মুসলিম সংস্কৃতির রাজধানী ইরান, তুর্কি বা মধ্য এশিয়ার অন্য কোনো নগর না হয়ে দিল্লিই ছিল। ড. ব্যানার্জি লিখেছেন, এ ছাড়া দীন পনাহ দ্বারা হুমায়ূন ইরানের সফভী সুলতান, ও তুরস্কের সুলতানের ধর্মীয় কট্টর নীতির সমালোচনা করতে চাচ্ছিলেন এবং এটা দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, এদেশগুলোর শাসকদের পথ সঠিক নয়।[১]

ড. ব্যানার্জির এ মত কল্পনা-নির্ভর। সম্ভবত, হুমায়ূনের মন-মস্তিষ্কে এর এতটা গুরুত্ব ছিল না। এ বিষয়ে আমরা কেবল এতটাই বলতে পারি যে, সিংহাসনে বসার পরে হুমায়ূন নব পর্যায়ে দিল্লির অন্য শাসকদের ন্যায় নতুন রাজধানী ও নতুন নতুন ইমারত বানাতে চাচ্ছিলেন। দীন পনাহ নির্মাণ ছিল তাঁর এই ইচ্ছারই প্রতীক। দীন পনাহর রাজনীতিক গুরুত্বের কথা সন্দেহজনক।

উৎসব ও দাওয়াত

দীন পনাহ স্থাপনের পর ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হুমায়ূন আগ্রায় ফিরে আসেন এবং হেরেমের মহিলাদের অনুরোধে তিনি আরো দুটি উৎসবের আয়োজন করেন। এগুলোর অন্যতম ছিল 'তিলিস্‌ম্‌'-এর জশন। এটি বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে সীমিত ছিল। এ জশন (আনন্দ মিছিল) নদীতীরে বিশেষ প্রকারের ভবনে প্রস্তুত করানো হল যার নাম রাখা হল 'তিলিস্‌ম্‌'।[২] এর মধ্যে একটি অষ্টভূজ কামরা ছিল যার মধ্যে এক অষ্টভূজী হাউজ ছিল, হাউজের মধ্যে এক অষ্টভূজ চবুতরা ছিল যার

বর্তমানে দীন পনাহ নগরের অস্তিত্ব আর নেই, কেবল দুর্গপ্রাচীরেরই অস্তিত্ব রয়ে গেছে মাত্র (ব্যানার্জি, হুমায়ুন ১, পৃ. ৬৩ - ৬৪)।

১. ব্যানার্জি, হুমায়ুন, ১, পৃ. ৬২ - ৬৩।

২. এই আনন্দোৎসব ও বিশেষ ঘরের জন্য দেখুন, খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী ; বেণী প্রসাদ, পৃ. ৪৫-৫৯ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৮-২৬। গুলবদন বেগম মহিলাদের নামও দিয়েছেন। হুমায়ূনের আনন্দোৎসবের ঝলক গুলবদন বেগম নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে পাওয়া যেতে পারে—

"সিংহাসনের উপর এবং নিচে সোনার জড়োয়া লাগানো হল এবং বহুমূল্য মোতি খচিত কাপড়ের টুকরো, যা দেড় গজ করে লম্বা ছিল, লাগানো হল ; ছোট কামরায় স্বর্ণ খচিত খাট বিছানো হল। পানদান, কুঁজো, সোনার পানপত্র এবং খাঁটি রুপোর তৈরি খাদ্যপাত্র তাকগুলোতে রাখা হল। হযরত বাদশাহ বললেন, আকা জানের আদেশ হলে হাউজে পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর বহুমূল্য ইরানী কারপেট বিছানো হল। তরুণ রূপবতী, সুন্দরী এবং গায়িকারা হাউজে বসল। হুমায়ূন খানজাদা বেগমের সাথে সোনার জড়োয়া বসানো সিংহাসনে ভবন প্রাঙ্গণে বসলেন। ভবনকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। কয়েক হাজার আশরাফি পুরস্কার হিসেবে বণ্টন করা হল। নৌকায় জেনানা (মহিলা) বাজার বসানো হল, যাকে একরকমের মীনাবাজারের প্রারম্ভিক রূপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

অন্য আন্দোৎসবটি ছিল হিন্দালের বিয়ে সম্পর্কিত। হিন্দালের বিয়ে হয় মাহদি খ্বাজার বোন সুলতানা বেগমের সাথে। এ বিয়ে মাহম বেগমের জীবৎকালে ঠিক হয়েছিল কিন্তু মাহমের অসুস্থতার কারণে উৎসব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই উৎসবই ধুমধামের সাথে পালন করা হল।[১]

গুলবদন বেগম আনন্দোৎসব ও দাওয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূন ও তাঁর পরিবারের মহিলারা স্বপ্নলোকের অধিবাসী ছিলেন। একদিকে বাহাদুর ও অন্য দিকে আফগানদের উত্থান তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল, সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অন্ধ ছিলেন। শুধু তাই নয়, হুমায়ূনও মনোরঞ্জন ও বিলাস ব্যসনে এতটাই মেতে উঠেছিলেন যেন জগত সংসারে এটাই তাঁর সবকিছু।

গুলবদন বেগম লিখেছেন, রবিবারের দিন বাদশাহ নদীর অপর পারে যেতেন। সেখানে হেরেমের প্রধান মহিলারা তাঁবুতে থাকতেন। তিনি যখন তাঁবুতে বসতেন তখন সেখানকার মহিলারা চারিদিক থেকে তাঁকে ঘিরে থাকত। এইভাবে হুমায়ূন মহানন্দে সময় অতিবাহিত করতেন। এই জলসায় বাদশাহর প্রধান বেগমের গুরুত্ব কমে যেত। একবার হুমায়ূনের প্রধানা মহিষী বেগা বেগম এর বিরোধিতা করলেন। প্রারম্ভে হুমায়ূন খুবই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু পরে তিনি প্রধান বেগমদের একত্রিত করে বোঝালেন যে, তিনি এই ধরনের জলসা বয়স্ক মহিলাদের খুশি করার জন্য করেছিলেন। এরপর, তিনি তাঁর বেগমদের কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তাঁরা এতে সন্তুষ্ট। সমস্ত বেগম বাধ্য হয়ে তাতে স্বাক্ষর করলেন।[২]

পৌঁছে দেওয়া হোক। আকা জান বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তিনি নিজে গিয়ে জিনের উপরে বসে পড়লেন। লোকেরা অসাবধান ছিল, এমন সময় ফোয়ারা খুলে দিলে তা থেকে পানি বেরুতে লাগল, জওয়ানদের মধ্যে বিচিত্র প্রকারের কোলাহল হতে লাগল। হাউজের কিনারায় একটি কামরা ছিল যাতে অভ্রকের খিড়কি লাগানো ছিল। তরুণেরা তাতে বসে ছিল আর বাজিকররা তাদের কেরামতি দেখাচ্ছিল।"

১. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১২৬ - ২৯।

২. হুমায়ূনামা, পৃ. ৩৭ - ৩৮ : বেভারিজ, পৃ. ১২৯ - ৩১ ; ড. ব্যানার্জি, (খণ্ড ১, পৃ. ৬৭) লিখেছেন, হুমায়ূন তাঁর বৃদ্ধ বিধবা আত্মীয়দের জন্য নিজের আনন্দ ত্যাগ করেছিলেন। বেগা বেগমের অভিযোগ স্ত্রীজনোচিত কারণে ছিল। সম্ভবত, হুমায়ূন এই অভিযোগের সুযোগ দিয়েছিলেন। বেগমদের একথা লেখানো হল যে, আপন ইচ্ছায় আপনি আসুন বা না আসুন আমরা এতে সন্তুষ্ট, তাঁর পদ অনুসারে তা কতটা উচিত ছিল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জামান মির্জার বিদ্রোহ

হুমায়ূনের অনেক নিকটাত্মীয় তাঁর সামনে অনেক কঠিন সমস্যা উপস্থিত করেন। তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ জামান মির্জা ও মুহম্মদ সুলতান মির্জার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার এবং বংশাভিজাত্যের বশবর্তী হয়ে এরা কয়েক বার হুমায়ূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং এইভাবে তাঁকে আরো কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেন।

প্রথম বিদ্রোহ

হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার পর ঐ বছরেই মুহম্মদ জামান মির্জা বিদ্রোহ করেন। কিন্তু এ বিদ্রোহ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে দমন করা হয়। হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করেন এবং তাঁকে খুশি করার জন্য তাঁর পুরাতন জায়গীরটিও তাঁকে দিয়ে দেন, যাতে তিনি কিছুটা সন্তুষ্ট হন। এইভাবে মুহম্মদ জামান মির্জা বিহারের জায়গীর পেলেন এবং মুহম্মদ সুলতান মির্জা কনৌজের।[১] মুহম্মদ জামান মির্জার প্রতি হুমায়ূন আরো উদারতারপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং তাঁকে বিহারের গভর্নর নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সৎ বোন মাসুমাকে, যাঁর বিয়ে মুহম্মদ জামান মির্জার সাথে হয়েছিল, এক মূল্যবান খেমা প্রদান করেন। হুমায়ূনের বিশ্বাস ছিল যে, এই দয়ার্দ্র ব্যবহারের ফলে মুহম্মদ জামান মির্জা রাজভক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু এমনটি হল না, কেননা, মির্জারা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং ভারতে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় বিদ্রোহ

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মুহম্মদ জামান মির্জা, মুহম্মদ সুলতান মির্জা, তাঁর পুত্র উলুঘ মির্জা ও অন্য এক রাজপুত্র বলীখুব মির্জা বিদ্রোহ করেন।[২] মনে হয়, এঁরা বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ধনলাভ করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, হুমায়ূনের সামরিক প্রশাসন ঢিলেঢালা এবং আমীররা অসন্তুষ্ট, এ কারণে তাঁকে পরাজিত করা যেতে পারে, হুমায়ূন এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন এবং গঙ্গাতটবর্তী ভোজপুরে[৩] তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। সেখান

---

১. আর্সকিন, ২, পৃ. ১৩ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ৬৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২ পৃ. ৪৬ - ৪৭। নিজামউদ্দীন মির্জাদের বিদ্রোহকে বিচিত্র ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। (ফিরিশতা, ব্রিগস, ২ পৃ. ৭৩ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৪)।

৩. ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, ১, পৃ. ৬৯) ভোজপুরকে বিহারের শাহাবাদ জেলা বলে নিশ্চিত করেছেন। এ ঠিক নয়। ভোজপুর নামে উত্তর প্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার একটি গ্রাম আছে। এ ২৬°১৭´ উত্তর ও ৭৯°৪১´ পূর্ব ফতেহগড়ের দক্ষিণে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তিনি ইয়াদগার নাসির মির্জাকে (বাবুরের ছোটভাই নাসির মির্জার পুত্র) বিহারের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠালেন। বিদ্রোহীরা রাজসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল কিন্তু পরাজিত হল এবং তিন মির্জাসহ আরো কয়েক জনকে বন্দি করা হল। প্রধান বিদ্রোহী মুহম্মদ জামান মির্জাকে বিয়ানায় পাঠানো হল। হুমায়ূন তিন প্রধান মির্জাকে চোখ সেলাই করে অন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। এই বন্দিদের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হল মির্জা ইয়াদগার বেগ তগাইকে।[১]

বলীখুব মির্জা ও মুহম্মদ সুলতান মির্জাকে তো অন্ধ করে দেওয়া হল কিন্তু মুহম্মদ জামান মির্জা জেল রক্ষককে তার পক্ষে টেনে নিলেন। যার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হল না। বিদ্রোহীরা ইয়াদগার বেগ তগাইকে নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়ে একটি জাল পাসের দ্বারা পালিয়ে গুজরাতে চলে গেলেন।[২] মুহম্মদ সুলতান মির্জা ও তাঁর দুই পুত্র উলুগ মির্জা ও শাহ মির্জাও বন্দিগৃহ থেকে পালিয়ে গেলেন। মির্জাদের বিদ্রোহ ও বন্দিগৃহ থেকে তাঁদের পলায়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূনের সতর্ক থাকার প্রয়োজন ছিল। এই সতর্কতা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, মোগল আমীর ও হুমায়ূনের নিকটাত্মীয়রা তাদের সহযোগিতা করেছেন। এই মির্জারাই বাহাদুর শাহের সাথে যোগ দিয়ে হুমায়ূনের খ্যাতি ও গৌরবের বড়ই ক্ষতি করেন। এরাই হুমায়ূনের গুজরাত আক্রমণের কারণ বনে যান।

AMARBOI.COM

---

১. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১১৪-১৫ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ১২৪। মুন্তাখাবউতাওয়ারিখ, বদায়ূনী, ১ পৃ. ৩৪৪। ইয়াদাগার বেগ হুমায়ূনের মামা ও তাঁর স্ত্রী হাজী বেগমের পিতা ছিলেন।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়
বাহাদুর শাহ্ ও মোগল সম্রাট

হুমায়ূনের বাহ্যিক শত্রুদের মধ্যে গুজরাতের শাসক বাহাদুর শাহের একটি বিশেষ স্থান ছিল। তার ক্রমবর্ধমান উন্নতি, কর্মকাণ্ড ও বিস্তারবাদী নীতি কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ক্ষমতার মদমত্তে দিশেহারা বাহাদুর শাহ একদিকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করলেন অন্য দিকে দলত্যাগী মোগল শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে লাগলেন। তাদের সহযোগিতায় তিনি মোগল সাম্রাজ্যকে পদদলিত করার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিককার ঘটনাবলী আগেই বর্ণিত হয়েছে। মালব বিজয় বাহাদুর শাহকে রাজপুতানার আরো নিকটে এনে দিল। এই সময়ে ভিলসা, উজ্জৈন ও রায়সীন[১] রাজপুত দলপতি[২] সিলহদীর অধিকারে ছিল। যতদিন যাবত এই অংশটি বাহাদুর শাহের প্রভাবমুক্ত ছিল ততদিন যাবত তাঁর মালব বিজয় অপূর্ণ ছিল। এইভাবে তাঁর বিস্তারবাদী নীতি ও এই অঞ্চলের সামরিক অবস্থান তাঁকে রায়সীন অধিকার করতে প্রলুব্ধ করল।

AMARBOI.COM

বাহাদুর শাহের রায়সীন বিজয়

বাহাদুর শাহ কয়েকটি কারণে সিলহদীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর গুজরাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সিলহদী তাঁর সেবায় উপস্থিত হন নি।[৩] এই

---

১. রায়সীন ২২°২৩ উত্তর ও ৭৭°৪৮´ পূর্বে, ভূপাল থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান স্টেট গেজেটিয়ার সিরিজ ভূপাল স্টেট, খণ্ড ৩, পৃ. ১১৩।

২. ইনি হলেন সেই সিলহদী, যিনি রাণা সাঙ্গার সাথে খানুয়ায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

৩. কথিত আছে, সিলহদীর হেরেমের ঠাটবাট বাহাদুর শাহের হেরেমের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাঁর কাছে নর্তকীদের চারটি দল ছিল যারা নিজেদের কলা-নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। যে সময়ে নর্তকীরা নৃত্য করত, সে সময়ে চল্লিশ জন যুবতী মশাল দেখাত (বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৬৬)। ড. ব্যানার্জি, (হুমায়ূন, ১ পৃ. ৮২) মিরআতে সিকান্দারীর ভিত্তিতে লিখেছেন যে, বাহাদুর শাহের অসন্তুষ্টির কারণ ছিল সিলহদীর হেরেমে বহুসংখ্যক মুসলিম মহিলার উপস্থিতি (বন্দিদশা)। কাম্মিস্‌সারিয়টও একথা সমর্থন করেছেন (হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩২৭)। একথা সত্য বলে মনে হয় না। বাহাদুর শাহের আক্রমণের প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানহানির বাহানায় বাহাদুর শাহ তাঁর উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সিলহদী বাহাদুরের ইচ্ছার কথা জানতেন। তিনি তঁকে খুশি করার জন্য নসসন খাঁ নামক এক আমীরকে তাঁর কাছে পাঠালেন, কিন্তু বাহাদুর শাহ এতে সন্তুষ্ট হলেন না। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সিলহদী বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ঐ সময়ে তাঁকে বন্দি করা হল। তখন তাঁর নাম বদলে গিয়ে সালাহউদ্দীন হয়ে গেল। গুজরাতের শাসককে খুশি করার জন্য সিলহদী মুসলমান হয়ে গেলেন। তবুও এ থেকে কোনো ফলাফল মিলল না। বাহাদুর উজ্জৈন ও ভিলসা আক্রমণ করে এ দুটি অধিকার করে নিলেন এবং একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রায়সীন দুর্গ অবরোধ করলেন।

সিলহদীর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই লক্ষণ সিংহ[১] সে সময়ে রায়সীন দুর্গ রক্ষা করছিলেন। সিলহদীর পুত্র ভূপতের বিয়ে হয়েছিল রানা সাঙ্গার কন্যার সাথে। এই আত্মীয়তার বলে রায়সীন রক্ষার জন্য মেবার থেকে সৈন্যদল আগমনের খবর এলো। এ খবর পেয়ে বাহাদুর শঙ্কিত হলেন কিন্তু তিনি রায়সীন দুর্গের অবরোধ ওঠালেন না। ঐ সময়ে সিলহদী তাঁর সাথেই ছিলেন। দুর্গের সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করাতে এবং আপন পরিবারের লোকজনদের দুর্গের বাইরে আনার অভিপ্রায়ে বাহাদুর শাহের আদেশ নিয়ে সিলহদী দুর্গের ভিতরে চলে গেলেন। দুর্গমধ্যে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য লোকেদের মধ্যে পেয়ে এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবীর ভর্ৎসনার ফলে তিনি পুনরায় হিঁদু হয়ে গেলেন এবং দুর্গমধ্যেই রয়ে গেলেন। এ খবর পেয়ে বাহাদুর শাহ তোপখানার সহায়তায়, যারা নেতৃত্বে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তুর্কি তোপচি রুমী খাঁ, দুর্গের উপর ভয়ংকর আক্রমণ হানলেন এবং দুর্গ অধিকার করে নিলেন। সিলহদীর স্ত্রী সাত শ' মহিলাসহ, যাদের মধ্যে মুসলিম মহিলাও ছিল, জওহর ব্রত পালন করে আগুনে পুড়ে মরল।[২] সিলহদী ও তাঁর ভাই লক্ষণ সিংহ অন্যান্য রাজপুত্রদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন। রায়সীন বাহাদুর শাহের অধিকার এসে গেল। বাহাদুর শাহ চান্দেরি, ভিলসা ও রায়সীন আলম খাঁকে দিয়ে দিলেন। আলম খাঁ এর আগে মোগল আমীর ছিলেন, সেখান

কারণ ছিল রাজনৈতিক, যা ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশ। ফিরিশতা (ব্রিগস, ৪ পৃ. ১১৭) স্পষ্টই লিখেছেন, এ ছিল বাহানা মাত্র।

১. ড. ইশ্বরী প্রসাদের মতে, এর নাম ছিল লক্ষণ সেন। (হুমায়ূন, পৃ. ৬২)।

২. দুর্গজয়ের পর মৃত মহিলাদের ছাইভস্ম থেকে যে সোনা রূপা বাহাদুর শাহ লাভ করেছিলেন, তা তিনি বুরহানুল মুল্ক বুনয়ানি নামক এক আমীরকে দিয়েছিলেন। সমস্ত সভ্য মানুষই তা গ্রহণ করার জন্য নিন্দা করলে তিনিও সেই প্রাপ্ত ধন দান করে দেন (বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৫৬ - ৬৬ ; রাস, অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ২২৪-২৫)।
রায়সীন বিজয়ের জন্য দেখুন, বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৫৬-৬৬; ফিরিশতা, ব্রিগস, ৪ পৃ. ১১৭ - ২৩ ; কাম্মিস্সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৫৩০-২৮ ; রাম, অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, ১, পৃ. ২২৪ - ২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পালিয়ে এসে তিনি বাহাদুর শাহের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বাহাদুর শাহকে সহায়তা দিয়ে চলেছিলেন। বাহাদুর শাহের আশা ছিল আলম খাঁ পুরবিয়াঁ রাজপুতদের গুজরাতের অধীনে রাখতে সফল হবেন। রায়সীন অধিকার করার পর বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করলেন।

বাহাদুর শাহের প্রথম চিতোর অবরোধ

চিতোর দুর্গকে মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ বলে গণ্য করা হত। রাজপুতানা অধিকার করার পর প্রত্যেক বিজয়ী এটাকে অধিকার করা অবশ্যিক বলে মনে করেন। রাণা সাঙ্গার মৃত্যুর পর মেবারের অবস্থার বর্ণনা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দিয়ে এসেছি। মেবারের তৎকালীন রাজা বিক্রমাদিত্যের (১৫৩১- ৩৬ খ্রি.) মধ্যে রাণা সাঙ্গার কোনো গুণই ছিল না এবং তিনি ছিলেন মেবারের সিংহাসনের একেবারেই অযোগ্য। তিনি তাঁর অমূল্য সময় খেলাধুলা, শিকার, নারী ও মদের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। এরফলে রাজকার্য পরিচালনা করার সময় তিনি পেতেন না। তাঁর শাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতেন দরবারের ধান্দাবাজ আমীররা। তাঁর দুর্ব্যবহারের ফলে যারা তাঁর পূর্বপুরুষদের যুগেও ছিলেন তাঁরা প্রচণ্ড ক্রোধে আপনাপন জায়গীরে চলে গেলেন। তাঁর এই অব্যবস্থাজনিত কারণে লোকে তাঁর রাজত্বকে পপ্পা বাইয়ের রাজত্ব বলে অভিহিত করতেন।[১]

রাণা সাঙ্গা ও রত্ন সিংহের সাথে বাহাদুরের সুসম্পর্ক ছিল। বাহাদুর শাহের সিংহাসনারোহণের সময়ে রানা সাঙ্গা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। রত্ন সিংহও শত্রুঞ্জয় মন্দির মেরামতের জন্য তাঁর কাছ থেকে আদেশ লাভ করেন।[২]

এর বিপরীতে বিক্রমাদিত্য সিলহদীকে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সহায়তা দিয়ে বসলেন। যদিও এ কেবল সাহায্যের জন্যে ছিল, তা সত্ত্বেও বিক্রমাদিত্যের ব্যবহারে বাহাদুর শাহ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি এও জানতেন যে, রাণা সাঙ্গার আমীররা নতুন রাজার সাথে নেই, মেবারের জায়গীরদারদের মধ্যেও পারস্পরিক শত্রুতা বেড়ে চলেছিল। রাণা সাঙ্গার ভাইপো নরসিংহদেব ও অন্য বিদ্রোহীরাও বাহাদুর শাহের কাছে চিতোর আক্রমণের জন্য প্রার্থনা জানালেন।[৩] বাহাদুর চিতোর আক্রমণের এক ভাল বাহানা লাভ করলেন, যদিও চিতোর আক্রমণের অন্যান্য কারণও ছিল। বাহদুর শাহ জানতেন যে, মোগলদের বিরুদ্ধে আক্রমণের

১. বীর বিনোদ, ২ পৃ. ২৭ ; কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া , ৩ পৃ. ৫৩০ ; টড, অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টি কুইটিজ অব রাজস্থান, ১ পৃ. ২৪৮।
২. ওঝা, উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস, পৃ. ৩৯১।
৩. শর্মা, মেবার অ্যান্ড দি মোগলস, পৃ. ৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে রাজপুতদের বিশেষত, মেবারকে বশে রাখা আবশ্যক ছিল। মালব অধিকার করার পর তিনি রাণা সাঙ্গা কর্তৃক অধিকৃত মালব অংশটি অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।

বাহাদুর শাহ তাঁর অন্যতম দুই সেনাপতি মুহম্মদ খাঁ আসিরী ও খুদাবন্দ খাঁর নেতৃত্বে একটি অগ্রণী দলকে চিতোর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করলেন (১৫৩২ খ্রি.) এবং তিনি নিজেও তাঁদের পিছু রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সেনাপতিরা রণথম্ভোর[১], কনোর, গাগরোন, তিলহটী ও অন্য স্থানগুলো অধিকার করে নিলেন। জানুয়ারি ১৫৩৩ খিস্টাব্দে তাতার খাঁ চিতোরের সাতটির মধ্যে দুটি দ্বার অধিকার করে নিলেন। এই অবরোধে রুমী খাঁ[২] নামক তুর্কি তোপচি বড় যোগ্যতার সাথে কামানগুলোকে এক উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে দুর্গপ্রাচীরে কামান দাগতে শুরু করলেন। দুর্গরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করে রাণা সাঙ্গার বিধবা পত্নী রানী কর্ণবতী (কর্মাবতী) হুমায়ূনের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন।[৩] হুমায়ূন রাজপুত দূতের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং তাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতাষিক দিয়ে বিদায় দিলেন। তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তিনি গোয়ালিয়র পর্যন্ত এলেন এবং সেখানে দু'মাস অবস্থানের (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৫৩৩ খ্রি.) পর আগ্রায় ফিরে

---

১. রাথম্ভোর দুর্গ চিতোর পতনের পূর্বে না পরে অধিকৃত হয় এ নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাতের মতে, চিতোর অবরোধের আগে রণথেম্ভোর অধিকৃত হয়েছিল। ড. ব্যানার্জি এ মত স্বীকার করেছেন (হুমায়ূন, ১.পৃ ৮৫)।

২. ১৬শ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার আমীর সালমান রঈস নামক এক তুর্কি নৌ-সেনাপতির খুব নাম ছিল। তুর্কি শাসকেরা তাঁকে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি নিজেই ইয়েমেনের শাসক হয়ে বসে যান। ১৫২৯ এ তিনি নিহত হন। তাঁকে হত্যার প্রতিশোধ নেন তাঁর বোনের পুত্র মুস্তফা এবং তিনি নিজেই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। মুস্তাফার পিতা বাহরাম ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল থেকে এঁকে বাহাদুর শাহের সাহায্যের জন্য গুজরাতে যাওয়ার আদেশ দেন। ১৫৩১ এ মুস্তফা দিউ-এ এসে পৌছান। ঐ সময়ে পর্তুগিজরা দিউ আক্রমণ করেছিল। মুস্তফা বাহাদুর শাহের সৈন্যদের সাহায্য করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। পর্তুগিজরা পালিয়ে গোয়ায় চলে যায়। তাঁর সামরিক সাহায্যের ফলে বাহাদুর শাহ প্রভাবিত হন। তিনি তাঁকে রুমী খাঁ উপাধি দেন এবং তোপখানার প্রধান অধিকারীর পদে নিয়োজিত করেন এবং ভিরুচ-এর আমীর নিযুক্ত করেন। (হোয়াইটওয়ে, রাইজ অব পর্তুগিজ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৪-২৮ ; ডেনবার্স, পর্তুগিজ ইন ইন্ডিয়া, ১, পৃ. ৪০০-৪০২ ; অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ১, ২২০)। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রসিদ্ধ তোপচিদের অন্যতম বলে গণ্য হতে লাগলেন।

৩. রাজমাতা কর্ণাবতী পদমশাহ নামক দূত মারফত রাখী প্রেরণ করেন (শর্মা, মেবার আন্ডার দি মোগলস, পৃ. ৫০; অ্যানালস অব অ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান, পৃ. ৩৬৪-৩৬৪ ; কাম্বিস্‌সারিয়ট হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৩০-৩১)। কবিরাজ শ্যামলদাস (বীর বিনোদ, ২, পৃ. ২৭) লিখেছেন, বিক্রমাদিত্য স্বয়ং দিল্লি গেলেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (খণ্ড ৪, পৃ. ২২০ এ প্রার্থনা-পত্র পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন।[১] হুমায়ূন এইভাবে কর্ণাবতীকে কোন সহায়তা করলেন না। বাধ্য হয়ে নিম্নলিখিত শর্তে চিতোরকে আত্মসমর্পণ করতে হল।

১. মালবের যে অংশটি রানা সাঙ্গা দ্বিতীয় মাহমুদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তা মেবারের বাহাদুর শাহকে ফিরিয়ে দিতে হল।

২. মেবার থেকে প্রাপ্ত ১০টি হাতি, ১০০টি ঘোড়া ও পাঁচ কোটি টাকা বাহাদুর শাহ লাভ করলেন।

৩. গুজরাতের সুলতানের মুকুট, মালবের শাসক প্রথম মাহমুদ খিলজি ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং রাণা সাঙ্গা যা মালব থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তা রাণাকে বাহাদুর শাহ ফিরিয়ে দিলেন।[২] সন্ধির পর (মার্চ ১৫৩৩ খ্রি.) বাহাদুর শাহ তাঁর দুই আমীরকে রণথম্ভোর বিজয়ের জন্য ও তৃতীয় জনকে আজমীরে রেখে নিজে মাণ্ডু অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

রানী কর্ণাবতীর নিমন্ত্রণ হুমায়ূন কোথায় পেয়েছিলেন একথা নিশ্চিতভাবে বলা বেশ কঠিন। কিন্তু মনে হয় চুনার থেকে ফিরে আসার সময়ে পেয়েছিলেন। হুমায়ূন আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র আসেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং ঐ সময়ে তিনি শুধুমাত্র সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূনের গোয়ালিয়র অবস্থানের কারণেই বাহাদুর অনতিবিলম্বেই মেবারের সাথে সন্ধি করে নেন, কেননা, তিনি মোগল ও রাজপুতদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩]

চিতোরের সাফল্য বাহাদুর শাহের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিল। যদিও তিনি চিতোর অধিকার করতে সফল হন নি, তা সত্ত্বেও তিনি ধন ও টাকা উভয়ই লাভ করেন। রণথম্ভোর অধিকারে আসার ফলে সামরিক দৃষ্টিতে এক শক্তিশালী দুর্গ তাঁর অধিকারে এসে গেল।[৪] রণথম্ভোর, আজমীর ও নাগোর বিজয় রাজপুতানাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল। বাহাদুর শাহ সুবিধামতো সে সময়ে পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করে সেগুলো অধিকার করতে পারতেন।[৫]

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, ১১৬। খন্দকার কানুনে হুমায়ূনী, ড. বেণী প্রসাদ, পৃ. ৬১।

২. ফিরিশতা. ব্রিগস, ৪, পৃ.১২৪ ; বেলে হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ.৩৬৯-৭২ ; কাম্মিস্সারিয়েট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩২৯-৩০। মিরাতে সিকান্দারীর তার মতে, বাহাদুর শাহ এক কোটি টাকা ও ড. ব্যানার্জির (হুমায়ূন খণ্ড ১, পৃ. ৮৭) মতে পাঁচ কোটি টাকা লাভ করেন।

৩. ব্যানাচির্জ হুমায়ূন, ১, পৃ. ৯৭-৯৮।

৪. রণথম্ভোর দুর্গটি চম্বলের তটে অবস্থিত। চম্বল নদী কাল্পিতে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এই রকমই আগ্রা থেকে থাট্টা যাওয়ার রাস্তা ও কান্দাহার থেকে বুরহানপুর যাওয়ার রাস্তা পরস্পরে আজমীরে এসে মিলে যেত। ফলে বাণিজ্যিক ও সামরিক দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

৫. রঘুবীর সিংহ.পূর্ব. আধুনিক রাজস্থান, পৃ. ২৫; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহাদুর শাহের দরবারে মোগল সাম্রাজ্যের শরণার্থীবর্গ

সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বাহাদুর শাহের দরবার এমন সব লোকেদের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল যাঁরা মোগলদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর দরবারে এমন কিছু লোকের সমাগম হচ্ছিল যারা মোগলদের শত্রু ছিলেন। এইভাবে বাহাদুর শাহের দরবার মোগলদের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই শরণার্থীদের আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—আফগান শরণার্থী ও মোগল শরণার্থী।

আফগান শরণার্থী

আফগান শরণার্থীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলম খাঁ জিঘাট। তিনি কাল্পির গভর্নর ছিলেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহারের আফগানদের বিরুদ্ধে বাবুরকে সহায়তাও দিয়েছিলেন। হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি গুজরাতে পালিয়ে আসেন। এখানে তিনি বাহাদুর শাহের দরবারে শরণ নেন।[১] রায়সীন বিজয়ের পর বাহাদুর শাহ ভিলসা, চান্দেরী রায়সীন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো তাঁকে দিয়ে দেন। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল, কেননা, রণথম্ভোর, নাগোর ও আজমীর বিজয়ের পর বাহাদুর শাহের সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের কাছে এসে পৌঁছেছিল। এই স্থানগুলোর দায়িত্ব আলম খাঁ জিঘাটের উপর অর্পণ করা থেকে এটাই প্রতীত হয় যে, তিনি বাহাদুর শাহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। আলম খাঁ-ও তাঁর নতুন প্রভুর প্রতি ততদিন পর্যন্ত অনুগত ছিলেন, যতদিন না তিনি মোগলদের হাতে বন্দিত্বপ্রাপ্ত হন।

আফগানদের মধ্যেকার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সুলতান আলম খাঁ আলাউদ্দিন লোদী। তিনি সুলতান সিকান্দার লোদীর ভাই এবং বাহলুল লোদীর পুত্র ছিলেন। দিল্লির সিংহাসনে বসার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বারবার পক্ষ পরিবর্তন করেন কিন্তু কখনোই সফল হননি। সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে তিনি সুলতান মাহমুদ শাহের ওখানে আশ্রয় নেন। ইব্রাহীম লোদীর আমলে তিনি গুজরাতের শাসক সুলতান মুজাফফর শাহের স্বীকৃতিতে ইব্রাহীম লোদীর বিরোধিতা করার প্রয়াস চালান। বাবুরের আক্রমণের পূর্বে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। বাবুর তাঁর সাথে সন্ধি করেন, যার ফলে, ইব্রাহীম লোদীকে হটিয়ে আলম খাঁকে দিল্লির সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়। বাবুর তাঁর চতুর্থ ভারতীয় আক্রমণ

---

১. জাফরুল ওয়ালেহর লেখক আবদুল্লাহ লিখেছেন, আলম খাঁ ১২,০০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০ হাতি নিয়ে বাহাদুর শাহের সাথে মিলিত হন। সুলতান (বাহাদুর) এবং হুমায়ূনের মধ্যে নামমাত্র সন্ধি ছিল, এ কারণে সুলতান (আলম)-এর প্রতি তিনি সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। (রিজভি, হুমায়ূন ২, পৃ. ৪৪৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলম খাঁর পক্ষে করেছিলেন[১] এবং তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তনের আগে দীপালপুরটি তাঁকে দিয়ে দেন। আলম খাঁ এই অঞ্চলগুলো অধিকারে রাখতে পারেন নি এবং পালিয়ে পুনরায় কাবুলে পৌঁছে যান। বাবুর তাঁর সাথে সন্ধি করেন, যে অনুসারে তিনি আলম খাঁকে দিল্লির সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন ঠিক সেই অনুসারে আলম খাঁ লাহোর ও তার পশ্চিমাংশকে বাবুরকে দিতে স্বীকৃত হন। সেখান থেকে বাবুরের আদেশপত্র নিয়ে তিনি পঞ্জাবে আসেন। এখানে তিনি পঞ্জাবের বিদ্রোহী আফগান আমীরদের সাথে মিলে যান এবং তাদের সাথে তিনিও সুলতান ইব্রাহীম লোদীর উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু পরাজিত হন।[২] বাবুরের পঞ্চম এবং অন্তিম আক্রমণের সময় তিনি পুনরায় বাবুরের সাথে মিলিত হন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের সাথে তিনি রাণা সাঙ্গার বিরুদ্ধে খানুয়ার যুদ্ধে অংশ নেন।[৩] এর অল্পকালের মধ্যে বাবুরের সাথে তাঁর মতভেদ হলে বাবুর তাঁকে বন্দি করে বাদাখশানে কিলা-এ-জাফরে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকেও আলম খাঁ পালিয়ে যান এবং গুজরাতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেন। দিল্লির সিংহাসনে তাঁর অধিকার দেখানোর জন্য তিনি আলম খাঁর স্থলে সুলতান আলাউদ্দীন নাম ধারণ করেন।

আলম খাঁ আলাউদ্দীন লোদীর পুত্র তাতার খাঁও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি নও-জওয়ান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বীর ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে যৌবনের আবেগ এবং অনুভব কম ছিল। তাতার খাঁ তাঁর পিতাকে দিল্লির সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন আর এজন্য তিনি বাহাদুর শাহকে বারবার উৎসাহিত করছিলেন। বাহাদুর শাহ তাতার খাঁর সৈনিক গুণাবলীর জন্য প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনার প্রতি অধিক মনোযোগ দেন নি।

এমনও মনে হয় যে, বাহাদুর শাহ আলম খাঁর পক্ষে ছিলেন না, কেননা, আলম খাঁ দিল্লির তখ্‌তে বসার গৌরব লাভ করেন নি। কেবল লোদী বংশের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই তিনি নিজেকে এর হকদার বলে মনে করতেন। বাবুরও তাঁকে মান দেন নি এবং তাঁকে কোনো প্রকারের উৎসাহও দেন নি। শুধু তাই নয়, বারবার পক্ষ পরিবর্তন করে তিনি নিজেকে স্বার্থান্ধ ও অবিশ্বস্ত বলে প্রতীত করে তুলেছিলেন। গুজরাতে আসার আগে তিনি বাদাখশানে কয়েক বছর বন্দি ছিলেন। এ সকল পরিস্থিতিতে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাহাঁতক স্থানীয় সমর্থন লাভ করতেন— সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আলম খাঁ আলাউদ্দীন লোদীর সাহায্যের জন্য বাহাদুর শাহকে মোগলদের সাথে যুদ্ধ করতে হত। তাঁদের সাথে

১. উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১২০।
২. উইলিয়ামস অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১২১।
৩. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৫৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন আর সাফল্যের আশাও বেশি ছিল না। তা সত্ত্বেও লোদী বংশের প্রধান ব্যক্তিকে নিজের দরবারে রেখে বাহাদুর শাহ তাঁকে এমন অস্ত্র রূপে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন যা মোক্ষম বলে প্রতীত হয়।

এই সমস্ত প্রধান আফগান উমরাহ্ ছাড়াও বহুসংখ্যক আফগান বিহার, বাংলা ও দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে এসে বাহাদুর শাহের বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই মোগলদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাদের বিরোধিতার জন্য সদা-তৎপর ছিলেন। তারীখে গুজরাত গ্রন্থের লেখক আবু তুরাব ওয়ালি লিখেছেন : "সুলতান বাহলুলের সন্তান, যিনি মোগলদের প্রভুত্বের কারণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুলতান বাহাদুরের রাজ্যে তিনি আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। এঁরা প্রতিকার এবং নিজেদের ক্ষতিপূরণের জন্য দফায় দফায় তাঁকে হিঁদুস্তান আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করতেন।"[১]

মোগল শরণার্থী

মোগল শরণার্থীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন মুহম্মদ জামান মির্জা, যাঁর সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি। নভেম্বর ১৫৩৪ এ মুহম্মদ জামান মির্জা মোগল বন্দিশালা থেকে পালিয়ে গুজরাতে পৌছান। বাহাদুর তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁকে ধন-সম্পদ, জায়গীর ও সম্মান প্রদান করেন[২] যাতে তিনি অন্য মোগল বিদ্রোহীদেরও তাঁর পক্ষে আনতে পারেন। মুহম্মদ জামান মির্জা অনতিবিলম্বেই বাহাদুর শাহের দরবারে মোগল শরণার্থীদের নেতা বনে গেলেন। বাহাদুরের ধনের সহায়তায় তিনি মোগল সৈনিকদের নিজের বশে আনার প্রয়াস চালালেন এবং এইভাবে ১০,০০০ মোগল সৈনিককে নিজের পক্ষাধীন করে নিলেন।[৩]

এইভাবে বাহাদুর শাহের দরবারে মোগল বিরোধী দুটি দল সৃষ্টি হয়ে গেল। বাহাদুর শাহ এ দুই দলকে সময়মতো মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চাচ্ছিলেন। এ দুটি দল পরস্পর বিরোধী ছিল কিন্তু বাহাদুর শাহ মোগল বিরোধী ভাবনার ভিত্তিতে নিজের নেতৃত্বে এদের একত্রিত করতে চাচ্ছিলেন। সুলতান আলম খাঁ আলাউদ্দীন লোদী ও জামান মির্জা দুজনেই দিল্লির সিংহাসনে বসতে

---

১. আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ, ৩।

২. মীর আবু তুরাব ওয়ালি তারীখে গুজরাতে (পৃ, ২) লিখেছেন, হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের "পারস্পরিক মতভেদ এবং বিরোধের কারণ ছিলেন মুহম্মদ জামান মির্জা।" মিরাতে সিকান্দারের লেখক সিকান্দারও একথা সমর্থন করেন। এই ঘটনার পর দুই সম্রাটের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়, পরে আমরা এর বর্ণনা দেব। মিরাতে সিকান্দার, বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত পৃ. ৩৭৫।

৩. আকবরনামা, ২, পৃ. ১২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচ্ছিলেন। বাহাদুর শাহ বাস্তবে কারো পক্ষে ছিলেন না, কেননা, তিনি স্বয়ং দিল্লি অধিকার করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি দু'জনের কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না ; বরং নিজের জন্য তাঁদের ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন।

হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের কূটনৈতিক সম্বন্ধ

বাহাদুর শাহ নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য অন্য রাজ্যগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালালেন। বাংলার শাসক নুসরত শাহের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শের খাঁর উত্থান দেখে বাহাদুর শাহ তাঁর কাছেও আর্থিক সাহায্য পাঠালেন।[১] এর অর্থ ছিল প্রয়োজনে একে অন্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। অর্থাৎ, বাহাদুর শাহের সাথে মোগলদের যুদ্ধ বাধলে শের খাঁ লুটতরাজ ও বিদ্রোহ করে পূর্ব সীমানায় মোগল শক্তি খর্ব করে দেবেন।

একদিকে বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের শত্রুদের প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন অন্যদিকে তিনি তাঁদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূনের মনের সন্দেহ দূর করার জন্য দীন পনাহর শিলান্যাসের পর (আগস্ট ১৫৩৩ খ্রি.) তিনি কাজী আবদুল কাদির ও মুহম্মদ মুকিমকে নিজের দূত রূপে বহুমূল্য উপহার হুমায়ূনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[২] তাঁরা হুমায়ূনের কাছে বাহাদুর শাহের পক্ষ থেকে উপহার পেশ করলেন এবং তাঁর মায়ের মৃত্যুর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করলেন। হুমায়ূন রাজপ্রাসাদের মহাপ্রতিহারকে তাঁদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাঠালেন এবং মৈত্রী-পত্র পাঠিয়ে সুলতানকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস চালালেন।[৩]

বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সাথেও সন্ধি করলেন। ২০ জানুয়ারি ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ জেনারেল নূনা দে কুনহা, মালিক তুগানকে, যিনি বাহাদুর শাহের নামে বেসিন শাসন করতেন, পরাজিত করলেন। বাহাদুর শাহ ঐ সময়ে চিতোর আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন। চিতোরের প্রথম অবরোধের পর বাহাদুর শাহ দিউ গেলেন, কিন্তু পর্তুগিজদের শাস্তি না দিয়ে তিনি তাদের সাথে সন্ধি করলেন (ডিসেম্বর, ১৫৩৪ খ্রি.)। এই সন্ধি অনুসারে বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের বেসিন দিয়ে দিলেন এবং তাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক সুবিধাও প্রদান করলেন। এর বিনিময়ে পর্তুগিজরা সুলতানকে পূর্ণরূপে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।[৪] এইভাবে বাহাদুর শাহ মোগলদের আক্রমণ করার আগে পর্তুগিজদেরও নিজের পক্ষে টেনে নিলেন।

১. ঐ পৃ. ৪৮।
২. আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ. ৫; আকবরনামা ২,পৃ. ১২৪।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪।
৪. ডেনওয়ার্স, দি পর্তুগিজ ইন ইন্ডিয়া, ১, পৃ. ৪১৬-১৭ ; হোয়াইটওয়ে, রাইজ অব পর্তুগিজ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২৩৬ ; কাম্মিস্‌স্যারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, ৩৪৯-৫০ থেকে উদ্ধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহাদুর শাহের মহাপরিকল্পনা

মোগল ও আফগান দুই দলের পারস্পরিক শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে বাহাদুর শাহ পূর্ণরূপে লাভবান হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মুহম্মদ জামান মির্জা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চিতোর বিজয় বাহাদুর শাহের উৎসাহ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেনা সংগ্রহ করার জন্য তিনি তাতার খাঁকে ২০ কোটি পুরাতন গুজরাতি টনকা দিলেন।[১] এর সহায়তায় তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ৪০,০০০ সৈনিক একত্রিত করলেন। বাহাদুর শাহ মোগল সাম্রাজ্যের উপর তিন দিক থেকে আক্রমণ চালানোর পরিচালনা করলেন। তিনি স্বয়ং এক-চতুর্থাংশ সৈন্য নিয়ে চিতোর আক্রমণ করে, এই অভিযানগুলোর পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে চাচ্ছিলেন।[২]

এই পরিকল্পনা মতে[৩] আলম খাঁ লোদীকে একটি বড় সেনাদলসহ কালিঞ্জর আক্রমণের জন্য পাঠানো হল। এই অভিযানটির লক্ষ্য ছিল মোগলদের বিভ্রান্ত করা। কালিঞ্জর দুর্গ তখনো পূর্ণরূপে হুমায়ূনের অধিকারে আসে নি। যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, কালিঞ্জরের রাজা আত্মসমর্পণ করে এবং ১২ মণ সোনা প্রতিটি প্রাণের বিনিময়ে দিয়ে মোগলদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। এখানে সাফল্য লাভের পর আলম খাঁর তাতার খাঁর সাথে মিলিত হওয়ায় কথা ছিল। সম্ভবত শের খাঁর কাছে থেকেও সাহায্য আসতে পারত।

অন্য এক বাহিনী বুরহানুল মুলক বনিয়ানীর নেতৃত্বে দিল্লি অভিমুখে পাঠানো হল। এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল নাগোর, দিল্লি ও পশ্চিম পঞ্জাব অঞ্চলে উপদ্রব সৃষ্টি করা। সম্ভবত, এইভাবে কান্দাহার, লাহোর ও আজমীরের রাজপথ দখল করে নেওয়াটাই এর লক্ষ্য ছিল।

তৃতীয় বাহিনী তাতার খাঁর নেতৃত্বে আগ্রা আক্রমণের জন্য পাঠানো হল।[৪] বাস্তবিক রূপে এটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য এবং এই দলে সবচেয়ে বেশি সৈন্য ছিল। বাহাদুর শাহ স্বয়ং মোগল সাম্রাজ্যের কোনো অংশে আক্রমণ করলেন না। তিনি কোনো একটি উপযুক্ত স্থান থেকে তিনটি অভিযানের উপরই নজর রাখতে

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮ ; আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ. ৭ ও ১২।

২. বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১ পৃ. ৯৩-৯৪।

৩. কিছু হস্তলিপিতে মুলতানি ও কিছুতে বনিয়ানী লেখা রয়েছে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ এঁকে ভুলক্রমে তাতার খাঁর পিতা লিখেছেন। তাতার খাঁর পিতা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খাঁ। ড. ব্যানার্জি (খণ্ড ১ পৃ. ৯৪) এঁকে বুরহান মুলক নরপালী লিখেছেন।

৪. মিরাতে সিকান্দারীর মতে, তাতার খাঁর লক্ষ ছিল বিয়ানার পথ ধরে দিল্লি আক্রমণ করা। হুমায়ূনকে হয় তাতার খাঁর সাথে যুদ্ধ করতে হত নতুবা দিল্লি তাতার খাঁর অধিকারে চালে যেত। বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচ্ছিলেন যাতে প্রয়োজনে তিনি তাদের সাহায্য করতে পারেন। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল মোগল রাজধানী। এইভাবে , এই কৌশলে যে, উপর্যুক্ত দলগুলো পরাজিত হলে, এ সমস্ত অভিযানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এই বলে তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, আর সফল হলে তাদের সাহায্য করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করে নেওয়া।

বাহাদুর শাহের অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, এ কাজটি ছিল সম্পূর্ণরূপে মোগলদের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট করা এবং হুমায়ূন এই অভিযানকে সম্পূর্ণরূপে বাহাদুর শাহের কারসাজি বলে মনে করবেন এবং তাঁকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। এছাড়া সৈন্যদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেওয়ায় শক্তি খর্ব হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সাফল্যের আশাও ছিল না। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,বাহাদুর শাহের পরামর্শদাতাদের এ যুক্তি সত্য ছিল। কিন্তু বাহাদুর শাহ তা আমলে নেন নি। সম্ভবত, মোগলদের সাথে প্রত্যক্ষরূপে যুদ্ধ করার সাহস তাঁর ছিল না। বাহাদুর শাহ স্বয়ং চিতোর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সসৈন্যে তিনি চিতোর অভিমুখে প্রস্থান করলেন। এখান থেকে সমস্ত আফগানের উপর নজর রাখা যেত এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্যও করা যেত।

AMARBOI.COM

বাহাদুর শাহের পরিকল্পনার অসফলতা

দুর্ভাগ্যবশত বাহাদুর শাহের পরিকল্পনা সফল হতে পারল না। বাহাদুর শাহের অভিযানের খবর পাওয়ামাত্রই হুমায়ূন বিহার থেকে আগ্রায় ফিরে এলেন।[১] তাতার খাঁর সেনা প্রবল বেগে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তিনি বিয়ানা অধিকার করার পর আগ্রা আক্রমণ করার জন্য সৈন্য পাঠালেন। আগ্রায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। হুমায়ূন অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ আসকারি ও হিন্দালকে ১৮,০০০ অশ্বারোহী[২] ও কাসিম হুসেন সুলতান, জাহিদ বেগ, দোস্ত বেগ ও ইয়াদগার নাসির মির্জার ন্যায় সেনানায়কদের তাতার খাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। এঁরা বিয়ানা পুনরাধিকার করে নিলেন। তাতার খাঁ মোগল সৈন্যদের আগমনের কারণে মন্দরাইল[৩] এ ফিরে এলেন। সেখানে তিনি ৪০,০০০ সৈন্যসহ শত্রুদের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর বাহিনীর অধিকাংশই ছিল ভাড়াটে

১. আকবরনামা ১, পৃ. ১২৬।
২. আবুল ফজল তাঁর সেনা সংখ্যা ১৮,০০০, আবু তুরাব ১৫,০০০ ও মিরাতে সিকান্দারীর লেখক ৫,০০০ লিখেছেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৯ ; আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ. ১২ ; বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২।
৩. আগ্রার দক্ষিণে বিয়ানার সমীপে ২৬°১৮ উত্তর এবং ৭৭°১৮ পূর্বে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্য, যুদ্ধজয়ের চেয়ে লুটতরাজের দিকে তাদের বেশি আগ্রহ ছিল। যুদ্ধের আশঙ্কায় এসব সৈন্য ধীরে ধীরে তাঁর বাহিনী ছেড়ে পালাতে লাগল।[১] তাঁর অধিকাংশ সৈনিক তাঁকে ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়ল। মন্দারাইলে যে সময়ে যুদ্ধ শুরু হয় সে সময় তাতার খাঁর কাছে মাত্র ৩,০০০ ঘোড়সওয়ার ছিল।[২]

হিন্দাল ৫,০০০ অশ্বরোহীসহ বিয়ানা থেকে অগ্রসর হলেন। তাতার খাঁ তাঁর সৈন্যদের পালাতে দেখেও নিজে পালাতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, তিনি[৩] সুলতানের কাছ থেকে ধন নিয়েছেন, এখন তিনি তাঁর কাছে কীভাবে মুখ দেখাবেন ? পরিণামে এক ভীষণ যুদ্ধ হল। তাতার খাঁ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে ৩০০ সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন (নভেম্বর ১৫৩৪ খ্রি.)। বাহাদুর শাহ তাতার খাঁ-কে কোনো অবস্থাতেই মোগলদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। মিরাতে সিকান্দারীর মতে, তাঁকে নিজের বাহিনী ঠিক রেখে সুলতান বাহাদুর শাহের জন্য অপেক্ষা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল।[৪] কিন্তু তাতার খাঁ প্রবল আবেগের বশে এ নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি পরাজিত আগেই হয়েছিলেন কিন্তু এর পিছনে বড় হাত ছিল তাঁর ভাড়াটে সৈন্যদের, যারা তাঁকে ধোঁকা দিয়েছিল। তাতার খাঁ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন। তাঁর বীরত্ব নিসন্দেহে অসাধারণ ছিল।

তাতার খাঁর মৃত্যুর পর প্রধান অভিযান শেষ হয়ে গেল। এর ফলে, বাহাদুর শাহের পরিকল্পনা বড় ধাক্কা খেল। দিল্লি ও কালিঞ্জর অভিযান থেকেও সাফল্য আসে নি, যদিও এঁরা পঞ্জাবে কিছুটা বিশৃঙ্খলা অবশ্যই সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিচ্ছৃঙ্খলার খবর শুনে এবং গম্ভীর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, একথা অনুভব করে তাঁতার খাঁকে পরাজিত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ূনের এ সিদ্ধান্ত ছিল সময়ানুগ এবং তাঁর যোগ্য শাসকজনোচিত গুণের প্রকাশ।

বাহাদুর শাহের পরিকল্পনার ব্যর্থতা সূচিত হল মন্দরাইলে তাঁতার খাঁর পরাজয় থেকে। তিন আক্রমণকারী বাহিনীর গতি ও শক্তি সমান ছিল না। এ কারণে এঁদের আক্রমণ সমান প্রভাবশালী হওয়াও সম্ভব ছিল না। উদাহরণত, আলাউদ্দীন লোদী ও বুরহানুল মুলকের বাহিনী তাঁতার খাঁর বাহিনীর চেয়ে কিছুটা

১. বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২ ; আর্সকিন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ২, পৃ. ৪৬ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ৯৫।

২. ব্যানার্জি, পৃ. ৯৫ ; আকবরনামা ১ পৃ. ১২৯।

৩. আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ. ১২ - ২৩।

৪. বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮২। বাহাদুর শাহের এই আদেশের কারণ ছিল, তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তাতার খাঁ মোগলদের উপর বিজয়লাভে সমর্থ হলে তিনি নিজেই দিল্লির সিংহাসন অধিকার করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ছিল, যার ফলে, তাঁদের পরাজয়ে বেশি সময় লাগে নি। সবচেয়ে মনোরঞ্জক ব্যাপার ছিল বাহাদুর শাহের চোখ মারার মতো রাজনৈতিক কার্যাবলী। তিনি লুকিয়ে গা বাঁচিয়ে মোগলদের উপর আক্রমণ হানতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের বিভক্ত করে নিজের পরাজয়ে নিজেই অংশগ্রহণ করলেন। হুমায়ূনের তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত ও তাঁর ভাইদের সহযোগিতাও এতে অংশগ্রহণ করল।

এই অভিযানগুলো বাহাদুর শাহের মনোভাব স্পষ্ট করে দিল। তিনি মোগল সাম্রাজ্য থেকে পলায়িত ব্যক্তিত্বের শুধু আশ্রয়ই দেন নি ; বরং তাদের ধন-সম্পদ, উৎসাহ এবং সাহায্যও দিয়েছিলেন। এই অভিযানগুলোর ফলে হুমায়ূনের বাহাদুর শাহের দিক থেকে ভয় এসে গেল। বাস্তবে, একজন কূটনীতিজ্ঞের ন্যায় তাঁর বাহাদুর শাহের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধ করাটা অনিবার্য হয়ে উঠল।[১]

হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের পত্র-ব্যবহার

হুমায়ূনের গুজরাত অভিযানের পূর্বে হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের মধ্যে পত্র-ব্যবহার হয়। তাঁরা দু'জন পরস্পরকে চারটি করে পত্র লেখেন। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু শেষ দুটি পত্র দীর্ঘ এবং কূটনৈতিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রগুলো বাহাদুর শাহ ও হুমায়ূনের চিন্তাধারার অতিরিক্ত সমকালীন কূটনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করে। এই পত্রগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহাদুর শাহ অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথায় হুমায়ূনকে খুশি করতে চাচ্ছিলেন, যদিও তলে তলে সৈন্য সংগ্রহ করে মোগল সাম্রাজ্য নির্মূল করে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সমস্ত পত্র পাঠ করে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে, বাহাদুর শাহের মনোবৃত্তি ও কর্মকাণ্ড দেখেও হুমায়ূন পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুমান করতে পারেন নি।

এই পত্রাবলী পাঠ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া যায় যে, মধ্য যুগে স্থায়ীরূপে কোনো রাজদূত থাকতেন না। কখনো কখনো প্রয়োজনানুসারে এক রাজ্য অন্য রাজ্যে দূত পাঠাতেন। এই দূতদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত,

---

১. ড. ব্যানার্জির নিম্নলিখিত মতের সাথে একমত হওয়া কঠিন—Humayun did not complain of Bahadurs aiding Tatar Khan nor did Sultan Bahadur follow the defeat up by other expeditions. Humayun kept quiet on the subject, guessing probably that it was purely the outcome of the mad-cap Tatar's enthusiasm. Humayun ignored the other to expeditions also. For the present he remained perfectly satisfied with the complete discomfiture of the enemy in all the three quarters. (হুমায়ূন, ১ পৃ. ৯৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সাধারণত রাজ্যগুলো বিদেশী দূতদের অধিক প্রশ্রয় দিত না, কেননা, এই রাজদূতেরা গোয়েন্দাগিরির কাজও করতেন। এ অভিযোগ বহুলাংশে সত্যও ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে ইরান ও ভারতের মধ্যেকার রাজদূতদের কার্যাবলী এর প্রমাণ।[১]

প্রথম পত্র : দীন পনাহ সম্পূর্ণ হওয়ার দু'মাস পর বাহাদুর শাহ হুমায়ূনকে অভিনন্দনপত্র পাঠান। হুমায়ূন দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তিনি এর উত্তরে এক দূত পাঠান যাকে মৌখিকভাবে কিছু কথা বলে দেন বাহাদুর শাহকে বলার জন্য। বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের দূতকে স্বাগত জানালেন। তারপর সর্বপ্রথম তাঁর সাথে দরবারে সাক্ষাৎ করলেন, যেখানে সমস্ত প্রধান আমীর উপস্থিত ছিলেন। তারপর পুনরায় এক বিশেষ দরবারে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন,. সেখানে দূত সমস্ত কথা তাঁকে বললেন, যে কথা বলার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাঁকে বললেন যে, সুলতানের এমন ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, যারা দুই রাজ্যর মধ্যে মিত্রতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হুমায়ূন সুলতানের প্রতি এমন আশা পোষণ করেন। উভয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ রাখা উচিত নয়।[২]

হুমায়ূনের দূতকে রাজপ্রাসাদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করা হল এবং তাঁর জন্য সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হল। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্য ভালমতো ভাতারও ব্যবস্থা করা হল। দূত বাহাদুর শাহের ব্যবহারে এতটা প্রসন্ন হলেন যে, তাঁর মনে হল হুমায়ূনকে ত্যাগ করে বাহাদুর শাহের কাছেই রয়ে যান। অবশেষে, বাহাদুর শাহ তাঁকে উপহারাদি ও পত্রসহ দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর পত্রে শুধু এতটাই উল্লেখ করলেন যে, হুমায়ূন তাঁর হাজিব (দূত) মারফত যে কথা বলে পাঠিয়েছেন তা তাঁর শিরোধার্য।[৩]

দ্বিতীয় পত্র : সেপ্টেম্বর ১৫৩৫ এ হুমায়ূন কাল্পি গেলে সেখানকার গভর্নর আলম খাঁ পালিয়ে গুজরাতে চলে গেলেন, সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হল। বাহাদুর শাহ রায়সীন, ভিলসা ও চান্দেরির জায়গীরও তাঁকে দিয়ে দিলেন। মুহম্মদ জামান মির্জাও এইভাবে অভ্যর্থনা পেলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহাদুর শাহ যে প্রতিশ্রুতি প্রথম পত্রে দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী চলতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

হুমায়ূন কাল্পি থেকে দ্বিতীয় পত্র লিখলেন, যাতে তিনি বাহাদুর শাহ কর্তৃক মুহম্মদ জামান মির্জাকে অভ্যর্থিত করার বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং তাঁকে এই বলে

১. বেণীপ্রসাদ, জাহাঙ্গীর পৃ. ২৯২ - ৯৭।
২. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ২২৮ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১ পৃ. ৯৯ - ১০০ হতে উদ্ধৃত।
৩. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ২৩০ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১ পৃ. ১০০ - ১০১ হতে উদ্ধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতর্ক করে দিলেন যে, এর দুষ্পরিণাম বাহাদুর শাহকেই ভোগ করতে হবে। পত্রের শেষে তিনি হযরত মুহম্মদের[১] বাণীর উল্লেখ করলেন, যাতে বলা হয়েছিল যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ।[২]

বাহাদুর শাহের উত্তর হুমায়ূন আগ্রায় ১৫৩৪-এর নভেম্বরে পেলেন। এর ভাষা বড় সংযত ছিল। বাহাদুর শাহ এতে লেখেন, মুহম্মদ জামান মির্জাকে হুমায়ূনের পুত্রতুল্য বিবেচনা করে তিনি তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হুমায়ূনের ইচ্ছা পুরো করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন।[৩] বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের মধ্যে বিশ্বাস পয়দা করে তাঁকে এমন অবস্থায় রাখতে চাচ্ছিলেন যাতে তাঁর দিক থেকে হুমায়ূনের মধ্যে কোনো আশঙ্কা না থাকে। অথচ বাস্তবে, বাহাদুর শাহ মোগল-বিরোধী কার্যকলাপ ও সেনা সংগঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

তৃতীয় পত্র : হুমায়ূনের তৃতীয় পত্র ছিল রূপকের মতো, যা পড়লে মনে হয় দু'জন দার্শনিক পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করছেন, জগতে সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি কে ? অন্যজন উত্তর দিচ্ছেন, সেই ব্যক্তি, যার কোনো বন্ধু নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন, না, বরং সেই ব্যক্তি যার বন্ধু ছিল কিন্তু সে তাকে হারিয়েছে।[৪] এইভাবে হুমায়ূন ইশারা ইঙ্গিতে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হুমায়ূনের ন্যায় বন্ধু হারানোর মতো হঠকারিতা করা বাহাদুর শাহের উচিত নয়।

AMARBOI.COM

বাহাদুর শাহ তাঁর তৃতীয় উত্তরে যুদ্ধের পাঁচটি কারণের উল্লেখ করেছেন।[৫] তিনি তা থেকে এই পরিণাম নির্ধারণ করলেন যে, এই পাঁচ কারণের মধ্য থেকে যুদ্ধ করার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে, তিনি লিখলেন যে, কারো প্রতি তাঁর মধ্যে বৈরীভাব নেই। তাঁর অর্থব্যয় এবং সৈন্য

---

১. ইসলামের পবিত্র নবীর নাম শোনামাত্রই 'সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'পড়তে হয়।
—অনুবাদক

২. ঐ, ঐ।

৩. ঐ, ঐ। বাহাদুর শাহ যে শেরটি তার শিরোনামে ব্যবহার করেছিলেন, তার অর্থ "তোমার প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হবে না, এ বিষয়ে কোনো উপেক্ষা করা হবে না।"

৪. অ্যারাবিক হিস্ট্রি গুজরাত ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১ পৃ. ১০২ থেকে উদ্ধৃত। উপসংহারে একটি শের লেখেন, যার অর্থ : 'বন্ধুত্বের গাছ লাগাও যাতে মনষ্কামনা পুরো হওয়ার ফল ফলতে পারে ; শত্রুতার বৃক্ষ উপড়ে ফেল, কারণ এ থেকে অসংখ্য কষ্টের জন্ম হয়।'

৪. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাতের লেখক আবদুল্লাহ, হাফিজ দামিশকীর আদাব গ্রন্থ থেকে যুদ্ধের নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন— (১) রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, (২) নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা, (৩) ন্যায়ের স্বার্থে কোনো রাজ্যের উপর আক্রমণ করা, (৪) সম্পদ বাড়ানোর লিপ্সা এবং (৫) বিজয় ও লুট ইত্যাদির জন্য পৃথিবীকে যুদ্ধে পরিপূর্ণ করে দেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একত্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য হল কেবল ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং জিহাদ। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, যদি অন্য কেউ তার সাথে হিংসা করে তাহলে আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।[১]

চতুর্থ পত্র : হুমায়ূনের চতুর্থ পত্রটি[২] দীর্ঘ এবং তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের সম্পর্ক ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে পড়ছিল। বাহাদুর শাহের আশ্বাসের উপর হুমায়ূনের আর বিশ্বাস ছিল না। এ কারণে তাঁর পত্রে কিছুটা কঠোরতার ছাপ রয়েছে। পত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, বাহাদুর শাহ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন। তিনি যদি মিত্রতা চান তাহলে মোগল বিদ্রোহীদের তাঁর রাজ্য থেকে বের করে দিতে হবে নতুবা তাদের আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই পত্রেও হুমায়ূন তাঁকে বোঝানোর প্রয়াস চালান যে, মুহম্মদ জামান মির্জাকে স্বাগত জানানোটা কোনো দিক দিয়েই ন্যায়সঙ্গত বা ঠিক ছিল না এবং তিনি পুনরায় শান্তির আশা করলেন।

হুমায়ূনের অন্তিম পত্রের উত্তর[৩] লেখেন সুলতান মুহম্মদ লারী এবং এই পত্রে তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। তিনি হুমায়ূনের পত্রকে বিস্ময়োদ্রেককারী শব্দে পূর্ণ (বিচিত্র শৈলীসমৃদ্ধ) এবং তার বিষয়বস্তু অভিমানপূর্ণ এবং নিরর্থক বলে অভিহিত করেন। হুমায়ূনের দূত মোগল বিদ্রোহীদের গুজরাত থেকে বের করে দেওয়ার প্রস্তাবকে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেন।

মুহম্মদ জামান মির্জার বিষয়ে পত্রে লেখা হয়েছে যে, তিনি প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। তিনি উদাহরণ দিয়ে একথা বোঝানোর প্রয়াস চালালেন যে, আশ্রয়প্রার্থী

---

৩. শেরটির অর্থ হল : "ইহলোকে পরলোকে কারো সাথে আমাদের শত্রুতা বা বিদ্বেষ নেই ; আমাদের সাথে যে শত্রুতা করে তাঁর উপর আল্লাহর অনুকম্পা বর্ষিত হোক।"

৪. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১. পৃ. ১০৩ - ১০৭।

৫. এই পত্রের জন্য দেখুন, বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৭৫ - ৮০ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ১১৭-২১। বাহাদুর শাহ লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর পত্র ব্যবহার মোল্লা মাহমুদ মুনশী করতেন। তিনি প্রথমে হুমায়ূনের দরবারে ছিলেন কিন্তু হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে তিনি সেখান থেকে গুজরাতে পালিয়ে আসেন। এখানে বাহাদুর শাহ তাঁকে তাঁর মুনশী নিযুক্ত করেন। হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ স্বরূপ তিনি তাঁকে কঠোর ভাষায় পত্র লেখেন। যে সময়ে পত্র পড়ে শোনানো হয় সে সময়ে বাহাদুর শাহ নেশায় চুর হয়ে ছিলেন। পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরদিন একথা অবগত হওয়ার পর বাদশাহ মালিক নসসনকে পত্র বাহককে থামানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নরওয়ার (২৫°২৯ উত্তর ও ৭৭°৫৮ পূর্বে) থেকে পিছু ধাওয়াকারী ব্যক্তি ফিরে আসেন। দূত পত্র নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মিরাতে সিকান্দারীর লেখক সখেদে লিখেছেন—
"Every disgrace that fell upon the Sultans administration and all the calamities which affected his fortunes were due to the scribling of this insolent man." (বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর (বাহাদুর শাহের) পূর্বপুরুষদের একটি ঐতিহ্য। তিনি লেখেন, মুহম্মদ জামান মির্জা তাঁকে (বাহাদুর শাহকে) বন্ধুত্বের বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন এবং তিনি তাঁকে কোনো অবস্থাতেই ফিরিয়ে দিতে রাজি নন। হুমায়ূনের গোয়ালিয়র যাত্রার কথা বাহাদুর শাহ আলোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, ঐ সময়ে তিনি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং এ অবস্থায় এক মিত্রের পক্ষে এভাবে অভিযানে অংশ নেওয়া উচিত হয় নি। বাহাদুর শাহ পরে লিখছেন যে, তাঁর আক্রমণের খবর পেয়ে কয়েক স্থানে লোকেরা বিদ্রোহ করছে এবং তাঁর নামে আর খুতবা পড়ছে না। পত্রের উপসংহারে তিনি লিখেছেন, সবাই জানেন যে, আল্লাহর কৃপায় কোনো সম্রাট তা সে যত বড় বাহিনীই তাঁর থাকুক না কেন, কেউ তাঁর বংশ নির্মূল করতে পারবে না। তিনি স্বয়ং এক বড় আফগান সেনাদল গড়ে তুললেন এবং হুমায়ূনের মন-মস্তিষ্ক থেকে আত্মম্ভরিতা মুছে ফেলে দেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করলেন। সামনে আর বেশিদিন নেই, আল্লাহ অনতিবিলম্বেই তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দেবেন।

কূটনৈতিক পত্রাবলীর গুরুত্ব

হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহের এই পত্র বিনিময়ে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহ তাঁর প্রয়োজন মতো অবকাশও পেলেন। এতে সন্দেহ নেই যে,শত্রুর কূটনীতি অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে দেওয়ার তৎপরতা ও উৎসাহ হুমায়ূনের মধ্যে ছিল না। হুমায়ূন পত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করলেন।

AMARBOI.COM

আন্তর্জাতিক আইন ও সম্পর্কের দৃষ্টিতে হুমায়ূনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পর্যালোচনা-করলে আমরা বলতে পারি যে, হুমায়ূন যুদ্ধের স্থলে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বাহাদুর শাহের কাছে নিজের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাচ্ছিলেন আর তিনি ছিলেন যুদ্ধের চেয়ে শান্তির পক্ষপাতি, কিন্তু হুমায়ূনের জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাস্তবিকরূপে হুমায়ূনের চারিত্রিক দৌর্বল্য ছিল এবং তাঁর মধ্যে অলসতা ছিল। সেই কারণে তিনি পত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন।

পত্রাবলী থেকে একথা প্রতীত হয় যে, হুমায়ূন গুজরাত দরবারের শরণার্থীদের প্রশ্ন বিশেষরূপে উত্থাপন করেছিলেন। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে স্বাগত জানানো ও তাদের সহযোগিতা করাটা রাজ্য ও সুলতানের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করত। রাজ্য শক্তিহীন হলে সে রাজ্যের শাসক অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্য থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে দ্বিধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন। আশ্রয় দেয়ার পরিণামে প্রয়োজনে যুদ্ধ বিগ্রহও বেধে যেত। যদি হুমায়ূনের এ দাবি মিত্র রাজ্যকে, আরেক মিত্ররাজ্যের শত্রুদের আশ্রয় দেয়া উচিত নয়, কথাটি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের হুমায়ূনের জীবনেরই দু'একটি ঘটনা স্মরণ রাখতে হবে। যেখানে তিনি স্বয়ং শরণার্থীদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন সেখানে বাংলার পরাজিত শাসককে গদিতে বসানোর জন্য হুমায়ূন স্বয়ং শের খাঁর বিরুদ্ধে বাংলা আক্রমণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং শের খাঁর সাথে কৃত সন্ধি ভঙ্গ করেন, যার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ইরানের শাসক শাহ তহমাস্প শরণার্থী হুমায়ূনকে এক সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। এ রকম বাহাদুর শাহও মালব আক্রমণ এই কারণেই করেন, কেননা, তাঁর ভাই চাঁদ খাঁ সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক সুলতান মাহমুদ তাঁকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সমস্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো আশ্রিত ব্যক্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি আমীর কিংবা শাসকের মনোবৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। যদিও মধ্যযুগে আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করার ব্যাপারটিকে মান্য করা হত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়
গুজরাত অভিযান : জয় ও পরাজয়

নভেম্বের, ১৫৩৪ এ হুমায়ূন আগ্রায় ফিরে এলেন। তিনি প্রায় ১৮ মাস দিল্লি, আগ্রা, জৌনপুর ও গোয়ালিয়রে অতিবাহিত করেন। আগ্রায় কয়েক মাস কেটে গেল সৈন্য সংগ্রহের কাজে। বাংলা ও গুজরাত দুই দিক থেকেই তাঁর ভয় ছিল। এ কারণে কোনদিকে আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে গুজরাত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তিনি বাহাদুর শাহের সাথে পত্র ব্যবহার করলেন, কিন্তু তাঁর শেষ পত্রটি তাঁর মহাপরিকল্পনা ও তাঁর অবশিষ্ট আশাও শেষ করে দিল।[১] বাহাদুর শাহের মহাপরিকল্পনায় কেবল তাঁর সৈন্যরাই চিতোর অবরোধ করে রেখেছিল। অতএব, গুজরাত আক্রমণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। হুমায়ূন আগ্রা থেকে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে (ডিসেম্বর ১৫৩৪ খ্রি. অথবা ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে) রওনা হয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

বাহাদুর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ

যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে, বাহাদুর শাহের মহাপরিকল্পনার একটি অঙ্গ ছিল চিতোর আক্রমণ করা। নভেম্বর, ১৫৩৪ এ তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে চিতোর অভিযানে অগ্রসর হলেন। রাজা বিক্রমজিৎ প্রথম পরাজয় থেকে সতর্ক হন নি। বাহাদুর শাহ তাঁকে লাইচা নামক স্থানে পরাস্ত করলেন।[২] বাহাদুর শাহ এখান থেকে অগ্রসর হয়ে চিতোর অবরোধ করলেন। এই সংঘর্ষ দ্বিতীয় সাকের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। শাসন ব্যবস্থা রানী কর্ণবতী নিজের হাতে তুলে নিলেন, বিক্রমজিৎ এবং উদয় সিংহকে বুন্দি পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং দুর্গরক্ষার ভার

১. বদায়ূনী লিখেছেন, হুমায়ূন মুহম্মদ জামান মির্জাকে ফেরত পাঠানোর জন্য বাহাদুর শাহকে পত্র লেখেন । বাহাদুর শাহ এর কঠোর উত্তর দেন, যার ফলে হুমায়ূন গুজরাত আক্রমণের সংকল্প করেন। (মুন্তাখাবউততাওয়ারিখ, ১. পৃ. ৩৪৫)। মিরাতে সিকান্দারীও একথা সমর্থন করেন। (বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮১)।

২. ব্যানার্জি হুমায়ূন ১, পৃ. ৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেউলিয়া প্রতাপগড়ের বাঘসিংহ রাওয়াতকে দেওয়া হল।[১] রাজমাতার আমন্ত্রণে সমস্ত রাজপুত চিতোর রক্ষার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। এইভাবে আপদ্‌কালে চিতোরে পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল।

সারঙ্গপুর ও উজ্জৈনে হুমায়ূন

আগ্রা থেকে হুমায়ূন মালব অভিমুখে রওনা হলেন। বেতওয়া নদীর তটে সর্বপ্রথম তিনি রায়সীন দুর্গের কাছে পৌছলেন।[২] এ দুর্গ কিছু সময়ের জন্য বাহাদুর শাহের অধিকারে এসেছিল। দুর্গাধিপতি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন এবং হুমায়ূনের নামে দুর্গের নামকরণের আশ্বাস দিলেন। হুমায়ূন তা স্বীকার করে নিয়ে সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে সারঙ্গপুর পৌছালেন।[৩]

হুমায়ূনের আক্রমণের ফলে বাহাদুর শাহ চিন্তিত হলেন। অরক্ষিত গুজরাতে হুমায়ূনের আক্রমণ বড়ই ক্ষতির কারণ হতে পারত। গুজরাত রক্ষার জন্য তিনি চিতোর অবরোধ ত্যাগ করে রাজধানী মাণ্ডুতে ফিরে এসে হুমায়ূনের আক্রমণের কবল থেকে দেশরক্ষার কথা চিন্তা করলেন। ঐ সময়ে তাঁর মন্ত্রী সদর খাঁ তাঁকে একটি কূটনৈতিক পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, চিতোর অবরোধ এখন শেষ পর্যায়ে। এজন্য তা জয় করতে আর বেশি সময় লাগবে না। এজন্য দুর্গ অবরোধে আরো বেশি শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। সময় পাওয়ার জন্য তিনি একটি কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি এখন ধর্মযুদ্ধে (জিহাদ) লিপ্ত আছেন। এ সময়ে কোনো মুসলিম শাসকের পক্ষে তাঁর উপর আক্রমণ করা ধর্মবিরোধী কাজ হবে, সেজন্য হুমায়ূন তাঁর উপর কখনোই আক্রমণ করবেন না।[৪] বাহাদুর শাহ একথা মানতে রাজি ছিলেন না, কেননা, তিনি জানতেন যে, হুমায়ূন এ ধরনের মূর্খতা করবেন না। কিন্তু তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শে হুমায়ূনকে একটি পত্র লিখে প্রার্থনা করলেন যে, যতদিন যাবত তিনি ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত আছেন, ততদিন যেন তিনি তাঁর উপর আক্রমণ না করেন। হুমায়ূন একথা মেনে নিলেন এবং চিতোর পতন পর্যন্ত সারঙ্গপুর ও উজ্জৈন-এ থেমে থাকলেন।[৫]

---

১. বাঘসিংহ রাণার স্থান গ্রহণ করেন, ফলে, তাঁকে দীওয়নজী বলে অভিহিত করা হতে থাকে, বাঘসিংহের বংশধররা পরে দীওয়ান উপাধি ধারণ করেন (রায় বিনোদ, ২.পৃ.৩৩)।

২. সারঙ্গপুর মধ্য প্রদেশে বোম্বাই-আগ্রা মহাসড়কে ইন্দোর থেকে ৭৪ মাইল ২৩°৩৪´ উত্তর ও ৭৬°২৯´ পূর্বে অবস্থিত।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩০ ; আবু তুবার, তারীখে গুজরাত ১৩ ; ফিরিশ্‌তা, ব্রিগস, ২ পৃ. ৭৪-৭৬; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৪৯।

৪. আকবরনামা ১, পৃ. ১৩০ ; আবু তুরা, তারীখে গুজরাত, ১৩ ; ফিরিশতা, ব্রিগস ২ পৃ. ৭৫ - ৭৬ ; তবকাতে আকবরী, দে. ২. পৃ. ৪৯।

৫. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪ ; তবকাতে আকবরী, দে ২ পৃ. ৪৯ ; মুন্তাখাবউততাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৩৪৬ ; ফিরিশতা, ব্রিগস. ২, পৃ. ৭৫ - ৭৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ব্যানার্জি হুমায়ূনের বাহাদুর শাহের উপর আক্রমণ না করাকে সমর্থন করেছেন।[১] তাঁর মতে, সেখানে থেমে থেকে শুধু মুসলিম ঐতিহ্য পালনই করেন নি ; বরং এরফলে তিনি নিম্নলিখিত ভাবে লাভবানও হয়েছিলে—

১। তিনি বাহাদুর শাহের রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে তো রেখেই ছিলেন, তদুপরি, আলম খাঁ, যিনি বাহাদুর শাহের সহায়তার জন্য চিতোর গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর জায়গীর হারিয়ে বসলেন।

২। সারঙ্গপুর ও উজ্জৈনে অবস্থান করে হুমায়ূন মালবের অধিবাসীদের এবং পুরবিয়াঁ রাজপুতদের নিজের পক্ষে টানার এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন।

৩। তিনি নিজেকে মাণ্ডুগড় ও গুজরাতের সেনাদের মধ্যে রেখে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, বাহাদুর শাহের পক্ষে তাঁরই শিবিরের পথ ছাড়া তাঁর নিজের রাজধানীতে পৌছানোর আর কোনো পথ ছিল না।

৪। চিতোর বিজয়ের পর বাহাদুর শাহ যদি তাঁর ভারি কামানগুলোসহ আহমদাবাদ যাওয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে হুমায়ূন তাঁর হালকা কামানগুলো নিয়ে তাঁর চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে সেখানে পৌছে যেতে পারতেন।

৫। বাহাদুর শাহ ও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ূনের জন্য রাজপুতদের পরোক্ষ সহায়তা লাভ সম্ভব ছিল, কেননা, বাহাদুর শাহের উত্তর ও পশ্চিম উভয় দিকেই রাজপুত ছিল। অনুমান হয়, রাজপুতেরা হুমায়ূনকে খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি পৌছে দিয়ে থাকবেন, কেননা, এ ধরনের কোনো কষ্টের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় নি।[২]

ড. ব্যানার্জির এ মত সঠিক বলে প্রতীত হয় না। হুমায়ূন যদি এ সময়ে রাজপুতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন তাহলে রাজপুতদের চিরকালের জন্য হুমায়ূনের মিত্র বনে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল আর ভবিষ্যতে তাঁকে যে ধরনের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সম্ভবত, তার মোকাবিলা তাঁকে আর করতে হত না। এই দৃষ্টিতে হুমায়ূন এক বড় ভুল করে বসলেন এবং বড় এক সুযোগ হাতছাড়া করে ফেললেন। বাস্তবিক রূপে, হুমায়ূন রাজপুতদের সহায়তার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। তিনি যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে তাঁর ভবিষ্যতই বদলে যেত।[৩]

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১ পৃ. ১১৯-২০।

২. হুমায়ূনের পক্ষে আমরা এও বলতে পারি যে, হুমায়ূন উজ্জৈনে যাত্রা বিরতি করে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকে তিনি বাহাদুর শাহের প্রধান সেনা ছাউনী মাণ্ডুকে খানদেশ (যেখানকার শাসক বাহাদুর শাহের মিত্র ছিলেন এবং বাহাদুর শাহের সৈন্যদের মধ্যে চিতোরে উপস্থিত ছিলেন) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন। সেখান থেকে তিনি গুজরাত, চিতোর ও দাক্ষিণাত্যের উপরও নজর রাখতে পারতেন।

৩. Humayun however, was guided by intuition and inspiration rather than by cool interence from carefully surveyed facts (শর্মা, মেবার আন্ডার দি মোগলস, পৃ. ৫৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিতোর পতন

বাহাদুর শাহ যখন জানতে পারলেন যে, হুমায়ূন তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন না তখন তিনি নব উদ্যমে পুনরায় চিতোর অবরোধ শুরু করলেন। এই অবরোধের পূর্ণ দায়িত্ব ভারত-বিখ্যাত তোপচি রুমী খাঁর উপর অর্পণ করা হল।

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শুরুতেই রুমী খাঁর কামানগুলো দক্ষিণ-পশ্চিমে নিরাপত্তা পংক্তিগুলো বিধ্বস্ত করতে শুরু করল। এই অংশের রক্ষক হাড়া অর্জুন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তা রক্ষা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু কামানের সামনে তিনি টিঁকে থাকতে পারলেন না। রুমী খাঁ দুর্গের অন্যান্য অংশেও কামান দাগতে শুরু করলেন, যার ফলে ভীতত্রস্ত হয়ে রানী কর্মাবতীসহ ১৩,০০০ রাজপুত মহিলা জহরব্রত নিয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিলেন এবং পুরুষেরা প্রধান ফটক খুলে যুদ্ধের জন্য দলে দলে বেরিয়ে পড়ল। ভঁয়রো পোলে ভীষণ যুদ্ধ হল, যাতে বহু রাজপুত মারা গেল। প্রায় ৩,০০০ বালককে কুঁয়োগুলোতে ফেলে দেওয়া হল, যাতে তারা শত্রুদের হাতে ধরা না পড়ে। এইভাবে প্রায় ৩২,০০০ মানুষ মারা গেল।[১]

সংঘর্ষ ও নরসংহারের পর বাহাদুর শাহ ১৫৩৫ এর ৮ মার্চে চিতোর দুর্গ অধিকার করে নিলেন। তিনি রুমী খাঁকে এই দুর্গটি প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু আমীর রুমী খাঁর বিরোধী ছিলেন। এ জন্য বাহাদুর শাহ এ দুর্গ রণথম্ভোরের দুর্গরক্ষক নসসন খাঁকে অর্পণ করলেন। তাঁর ভয় ছিল এর ফলে রুমী খাঁ খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।

AMARBOI.COM

মন্দসৌর

চিতোর পতনের খবর শুনে হুমায়ূন বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উজ্জৈন থেকে অগ্রসর হয়ে মন্দসৌর এলেন। বাহাদুর শাহ চিতোর থেকে গুজরাত পৌঁছে যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু মোগলদের সতর্কতায় তিনি তাতে সফল হতে পারলেন না।

মন্দসৌরে উভয় পক্ষের সৈন্যরা এক ঝিলের কাছে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান নিল।[২] মোগলদের একটি অগ্রবর্তী দল বাহাদুর শাহের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিল কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ল না। রণনীতির বিষয়ে বাহাদুর শাহের সেনাপতিদের মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রধান সেনানায়ক তাজ খাঁ ও সদর খাঁ হুমায়ূনের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করার পক্ষে রায় দিলেন। তাঁদের মত ছিল গুজরাতী সৈন্যরা চিতোর বিজয়ের ফলে উৎসাহিত ছিল। সে সময়ে আক্রমণ করলে সাফল্যের পূর্ণ আশা ছিল। রুমী খাঁ এর বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, বাহাদুর শাহের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর কামান।

---

১. ঐ পৃ. ৫৫ ; বীর বিনোদ, ২ পৃ. ৩১।
২. আকবরনামা ১ পৃ. ১৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ্য যুদ্ধে এর ব্যবহার অনিবার্য ছিল। তিনি রসিকতার সুরে বললেন, শক্তিশালী কামান থাকতে সাধারণ তরবারি ও তীর বল্লম দিয়ে যুদ্ধ করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি মত দিলেন, চারদিকে গাড়ি দিয়ে ঘেরা টোপ তৈরি করা হোক এবং চারদিকে পরিখা খনন করা হোক। মোগল সৈন্যরা এর কাছে আসামাত্রই কামান বন্দুক দিয়ে তাদের হত্যা করা যাবে।[১]

বাহাদুর শাহ রুমী খাঁর মত কয়েকটি কারণে মেনে নিলেন। সদর খাঁর পরিকল্পনা ছিল আক্রমণ। এর বিপরীতে রুমী খাঁর পরিকল্পনায় আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয়ের সমন্বয় ছিল। সম্ভবত, বাহাদুর শাহ মোগলদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে ভয় পেতেন। সদর খাঁ তাঁর মতের সমর্থনে শক্তিশালী দলিলও পেশ করেছিলেন। চিতোর বিজয়ের ফলে যেখানে গুজরাতী সৈন্যদের উল্লাস ছিল, সেখানে মোগল সৈন্যরা ক্লান্ত ছিল না। রুমী খাঁ ছিলেন কামান-বিশেষজ্ঞ। চিতোর বিজয়ের অনেক কৃতিত্বই ছিল তাঁর, যার ফলে, তাঁর যোগ্যতার জয়জয়কার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বাহাদুর শাহ রুমী খাঁর পরিকল্পনাই গ্রহণ করলেন।

বাহাদুর শাহের স্বীকৃতি মাত্রই রুমী খাঁ তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করে দিলেন। তাঁর সৈন্যদের চারদিকে তিনি গাড়ি ও সংরক্ষিত কামান দিয়ে একটি রক্ষা-প্রাচীর গড়ে তুললেন। একদিকে ঝিল ছিল। অবশিষ্ট তিন দিকে পরিখা করে একে আরো সুরক্ষিত করে দেওয়া হল। বাহাদুর শাহ ও তাঁর সৈন্যরা এই ঘেরাটোপের মধ্যে ছিলেন। একটি আক্রমণকারী ঘোড়সওয়ার দলও ছিল। এদের লক্ষ্য ছিল মোগলদের ভয়ভীত করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে তারা গুজরাতী কামানগুলোর সামনে এসে পড়ে এবং তাদের হত্যা করা যায়। এই পরিকল্পনা বাবুরের পরিকল্পনার সাথে, যা তিনি পানিপথে প্রথম যুদ্ধে করেছিলেন, মিল ছিল।[২] বাহাদুর শাহ পানিপথের যুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধকলা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, রুমী খাঁর পরিকল্পনা সফল হবে।

প্রারম্ভে রুমী খাঁ সাফল্য লাভ করলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মোগলদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেল। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল মুহম্মদ জামান মির্জা ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বহু সংখ্যক মোগল সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করে গুজরাতী তোপের মুখে পড়ে যাওয়ায় বেঘোরে প্রাণ হারাল।[৩] মোগল সৈন্যরা তোপের মুখে যেতে খুব ভয় পাচ্ছিল।[৪]

---

১. ঐ পৃ. ১৩১; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫০ ; আবু তুরাব, পৃ. ১৩ - ১৪। "Flushed with their success at Chitor Bahadur's troops might have overwhelmed the imperial army had they been immidiately led to the a attack." (কাম্বিস্‌সারিয়ট হিস্ট্রি অব গুজরাত পৃ. ৩৫০)।

২. দেখুন, আকবরনামার ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ১, পৃ. ৩০২ ; হেনরি বেভারিজের পাদটীকা।

৩. আকবরনামা ১, পৃ. ১৩২।

৪. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন বাহাদুর শাহের সৈন্যদের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন, তিনি দু'একবার গুজরাতী সৈন্যদের রক্ষাব্যূহ নষ্ট করার চেষ্টা করলেন কিন্তু বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসতে হল। এবার হুমায়ূন সিদ্ধান্ত নিলেন গুজরাতী সৈন্যদের এমনভাবে ঘিরে ফেলবেন যাতে কোনো প্রকারের বাইরের সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। যে পথ দিয়ে গুজরাতী সৈন্যদের প্রয়েজনীয় রসদ-সামগ্রী আসত, তিনি সেই পথে পাহারা বসিয়ে দিলেন যাতে তা আর তাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। এছাড়া তিনি তাঁর সৈন্যদের গুজরাতী সৈন্যদের কাছে যেতে নিষেধ করে দিলেন।[১]

এই পরিকল্পনায় তিনি সাফল্য লাভ করলেন। গুজরাতী সৈন্যদের খাদ্যসামগ্রী, ঘোড়ার দানাপানি, ইন্ধন ইত্যাদি পেতে বড়ই অসুবিধা হতে লাগল, যার ফলে বাহাদুর শাহের শিবিরে হাহাকার পড়ে গেল। খাদ্যাভাব দেখা দিল। বাহাদুর শাহ বাঞ্জারদের সহায়তার দশ হাজার গরুর গাড়ি ভর্তি খাদ্যসমগ্রীর ব্যবস্থা করলেন এবং সেগুলো নিয়ে আসার জন্য পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠালেন।[২]

কিন্তু দুর্ভগ্যবশত, এ খবর হুমায়ূন পেয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁর সৈন্যদের সাহায্যে এ খাদ্যসামগ্রী মোগল-অধিকারে নিয়ে নিলেন। এর ফলে, গুজরাতী সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের কষ্টও অনেক বেড়ে গেল।[৩] এপ্রিল মাস এসে গিয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যই বর্ষা শুরু হয়ে যেতে পারত। ঐ সময়ে ঝিল পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত, যার ফলে, হুমায়ূনকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হত। তিনি এ সময় শের খাঁর থেকেও দূরে ছিলেন। সম্ভবত যুদ্ধের এমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহও হতে পারত। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূন বাহাদুর শাহের দুরবস্থার সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলেন এবং তিনি ২৫ এপ্রিল বাহাদুর শাহের সৈন্যদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। বাহাদুর শাহও এই পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এমনই হতাশাজনক অবস্থায় তিনি পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৫ এপ্রিল রাতে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর হীরে-জহরত, কামান ও জানোয়ারগুলোকে নষ্ট করে দিলেন যাতে সেগুলো শত্রুর হস্তগত না হয়। যে সময়ে তাঁর প্রিয় দুই হাতি 'শিরজা' ও 'পত্সিঙ্গার'-এর শুঁড় কেটে দেওয়া হচ্ছিল এবং তাঁর দুই প্রসিদ্ধ কামান 'লায়লা' ও 'মজনু' নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছিল সে সময়ে তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন।[৪]

রাত্রিকালে তিনি তাঁর পাঁচজন বিশ্বস্ত আমীরকে সাথে নিয়ে, যাঁদের মধ্যে কদর শাহ (যিনি পরে মালবের শাসক হন) ও খানদেশের শাসক প্রমুখ ছিলেন, বাহাদুর শাহ পিছনের পথ ধরে বেরিয়ে এক শুনশান পথ ধরে মাণ্ডু অভিমুখে রওনা

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫১ ; আবু তুরাব, পৃ. ১৪ ; বেলে হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮৪।

২. বেলে, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৮৪-৮৫, দশ হাজার গরুর গাড়ি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়।

৩. ঐ, পৃ. ৩৮৫। মিরাতে সিকান্দারীর মতে, রুমী খাঁ এ খবর হুমায়ূনকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

৪. আকবরনামা, ১ পৃ. ১৩২; বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৪-৮৬ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২. পৃ. ১২৬-২৮: অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, ১. পৃ. ২৩২ ; এবং ২৩৯ - ৪০ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪ - ৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেলেন।[১] প্রারম্ভে শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার জন্য তিনি আগ্রার পথ ধরে অগ্রসর হলেন, কিছু দূর গিয়ে তিনি পুনরায় মাণ্ডুর দিকে ফিরে এলেন।

রাত্রে বাহাদুর শাহের শিবির থেকে হই-হট্টগোলের আওয়াজ শুনে হুমায়ূন তাঁর পলায়নের খবর পেলেন। প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হয় নি। ৩০,০০০ সৈন্যসহ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে হুমায়ূন তাঁর শিবিরে অপেক্ষমাণ রইলেন।[২] তিনি বাহাদুর শাহের সৈন্যদের উপর ঐ সময়ে আক্রমণ করলেন না, ঐ সময়ে আক্রমণ করলে তিনি তাঁর সৈন্যদের পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারতেন।

ড. ব্যানার্জি হুমায়ূনের এই আক্রমণ না করার নীতিকে সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, হুমায়ূন এমন মহান বীর ছিলেন যে, তিনি কখনো শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিতেন না, সেই সাথে তিনি এও লিখেছেন যে, বাহাদুর শাহের সামরিক যোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হুমায়ূনের ছিল। সেজন্য তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। বিশেষত, এই কারণে তাঁর অবরোধ নীতি সাফল্য লাভ করছিল। এ ছাড়া হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের রাত্রিবেলায় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছিলেন, যাতে সুবিধামতো শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে পারেন।[৩]

ড. ব্যানার্জির এ মত পরস্পর বিরোধিতার দলিল। এক তো হুমায়ূন বীর ছিলেন, দ্বিতীয়ত, বাহাদুর শাহের দুর্বলতার সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে চান নি অথবা তাঁর প্রতি ভয়ে ভীত ছিলেন। এ একেবারেই পরস্পরবিরোধী মন্তব্য। বাস্তবে আমরা যদি বিবেচনা করি তাহলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহাদুর শাহের শিবিরে যে সময়ে জীব-জানোয়ার এবং অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট করে ফেলা হচ্ছিল এবং রুমী খাঁ মারফত হুমায়ূন যখন বাহাদুর শাহের পলায়নের খবরও পেয়েছিলেন, সে সময়ে হুমায়ূন একথা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর ভয় ছিল যে, একথা তাঁকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যাতে তিনি গুজরাতী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন। ৩০,০০০ অশ্বারোহীসহ হুমায়ূনের সতর্কতার সাথে প্রতীক্ষার এটাই ছিল কারণ। তাতে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বাহাদুর শাহের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিতেন। এ হুমায়ূনের বীরত্ব নয় ; বরং অদূরদর্শিতার প্রতীক ছিল এটি।

বাহাদুর শাহের পলায়নের কারণ

শক্তিশালী তোপখানা এবং নতুন বিজয়ে উল্লসিত সৈন্যরা থাকা সত্ত্বেও বাহাদুর শাহ যুদ্ধ কেন করলেন না ? হুমায়ূন কর্তৃক খাদ্য অবরোধ পরিকল্পনার পরিণাম স্বরূপ তাঁর

---

১. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ২১; ফিরিশতা ব্রিগস, ২, পৃ. ৭৬ - ৭৭; আবু তুবাব, পৃ. ১৫, অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, প, ২৪০ এর মতে, তাঁর সাথে পলায়নকারীদের সংখ্যা দশের কম ছিল।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩২।

৩. ব্যানার্জী, হুমায়ূন ১ পৃ. ১২৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবিরের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছিল। বাহাদুর শাহের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর তোপখানা যা রুমী খাঁর দ্বারা সঞ্চালিত হত। বাহাদুর শাহের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে, রুমী খাঁ মোগলদের সাথে আঁতাত করেছেন। দিনকে-দিন অবস্থার অবনতি থেকে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং রুমী খাঁর দিক থেকে তাঁর সংশয় আরো দৃঢ় হয়ে গেল। এ জন্য এখান থেকে তিনি কোনো উপায়ে পালিয়ে নিজের সুদৃঢ় দুর্গে গিয়ে পৌঁছাতে চাচ্ছিলেন। রুমী খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাওয়ামাত্রই তিনি তাঁর আধিকারিককে রুমী খাঁকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। ঐ ব্যক্তি রুমী খাঁকে-এ খবর দিয়ে দিল।[১] হুমায়ূনের সাথে রুমী খাঁর পত্র-ব্যবহার তো চলছিলই, এবার বাহাদুর শাহকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুবর্ণসুযোগও পেয়ে গেলেন এবং তিনি হুমায়ূনের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।[২] বাহাদুর শাহ রুমী খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এতটা ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পলায়নের কথা তাঁর বিশ্বস্ত আমীরদেরও বলেন নি। ৮০ বছর বয়সী খুদাবন্দ খাঁ, যিনি আগে মন্ত্রী ছিলেন, এ খবর শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

বাহাদুর শাহের সৈন্যদের পলায়ন

বাহাদুর শাহের পলায়নের ফলে গুজরাতী সৈন্যরা বড়ই নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। তাদের না পালানোর পথ রইল আর না সেখানে অবস্থান করা সম্ভব ছিল। যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। এর মধ্যে সদর খাঁ ও ইমাদুল মুলক বুদ্ধি ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। যতটা সৈন্য তাঁদের পক্ষে একত্রিত করা সম্ভব ছিল, তাদের একত্রিত করে রাত্রি শেষে ভোরবেলা নিজেদের পতাকা উড়িয়ে এবং বাদ্য বাজাতে বাজাতে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে গেলেন, যেন তাঁরা পরাজিত না হয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এই সৈন্যদের সাথে খুদাবন্দ খাঁও ছিলেন। বার্ধক্য ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না এবং তাঁর চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি পালকি চড়ে মাণ্ডু অভিমুখে এগিয়ে চলেছিলেন।[৩]

AMARBOI.COM

---

১. কাম্মিস্‌সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৫৩-য় Hist des Decouvertes des portugais by Latitau- এর অংশ, ১, পৃ. ২১২-র ভিত্তিতে উদ্ধৃত।

২. রুমী খাঁ হুমায়ূনের সাথে কোথায় মিলিত হয়েছিলেন এ ব্যাপারে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। জওহর এর মতে, রুমী খাঁ মন্দসৌর থেকে বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া করে পথিমধ্যে মিলিত হন (জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৫)। আকবরনামার মতে, তিনি নালচায় মিলিত হন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩২ - ১৩৩)। নিজামউদ্দীন আহমদ কোনো স্থানের উল্লেখ করেন নি। মিরাতে সিকান্দারীর মতে, রুমী খাঁ বাহাদুর শাহের পলায়নের আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন (বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৫)। এই লেখকদের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রুমী খাঁ মন্দসৌর ও মাণ্ডুর মধ্যবর্তী স্থানে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হন। মোগল ঐতিহাসিকেরা একথা সমর্থন করেন এবং তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন না। এর বিপরীতে গুজরাতী ঐতিহাসিকরা তাঁর নিন্দা করেছেন।

৩. আবু তুরাব, পৃ. ১৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন ইয়াদগার নাসির মির্জা, কাসিম হুসেন সুলতান ও হিন্দু বেগের নেতৃত্বে একটি সেনাদল গুজরাতী সৈন্যদের ধাওয়া করার জন্য পাঠালেন। খুদাবন্দ খাঁ দ্রুতবেগে পালাতে অসমর্থ ছিলেন, যার ফলে, মোগলরা তাঁকে অতি সহজেই বন্দি করে ফেলল।[১] হুমায়ূন খুদাবন্দ খাঁর সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করলেন। মোগলরা সদর খাঁর পিছু ধাওয়া করল কিন্তু ধরতে পারল না। তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে মাণ্ডু দুর্গে বাহাদুর শাহের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

হুমায়ূন বাহাদুর শাহের শিবিরের পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসপত্র অধিকার করে নিলেন। পুরো তাঁবু ঐভাবেই রেখে গিয়েছিলেন। তাঁবুর ঠাটবাট মোগলদের হতচকিত করে দিল। আবু তুরাব ওয়ালির মতে, পুরো তাঁবুটি প্রায় এক মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সোনার কাজ করা তাঁবুটি ছিল মখমলের তৈরি। এর খুঁটিগুলো ছিল সোনা ও রুপোর তৈরি। এ দেখে হুমায়ূন আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা, বাহাদুর শাহ সমুদ্র ও পৃথিবী দুয়েরই বাদশাহ ছিলেন।[২] এ সকল বস্তু ছাড়া মোগলরা বহু সংখ্যক গুজরাতী বন্দি লাভ করল যাদের মধ্যে খুদাবন্দ খাঁ ছাড়াও বাহাদুর শাহের শ্বশুর ও থাট্টার ভূতপূর্ব শাসক জাম ফিরোজও ছিলেন। হুমায়ূন খুদাবন্দ খাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁকে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে রেখে দিলেন। হুমায়ূন রুমী খাঁকেও খিলআত দিয়ে স্বাগত জানালেন।[৩]

---

১. আকবরনামা ১, পৃ. ১৩৩ ; মাসিরে রহীমী, ১, পৃ. ৫২৬।

২. মিরাতে সিকান্দারীর মতে, সুলতান সিকান্দার লোদী বলতেন, দিল্লির আয় গম ও বজরা থেকে আর গুজরাতের আয় মুংগা ও মোতি থেকে (বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৬ কাম্মিস্সায়িট, পৃ. ৩৫২)।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩২ - ৩৩। রুমী খাঁর বিষয়ে মিরাতে সিকান্দারীর লেখক সিকান্দার তাঁর পিতার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যিনি হুমায়ূনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং এই ঘটনার সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লিখেছেন, যে সময়ে হুমায়ূন মন্দসৌরে বাহাদুর শাহের পরিত্যক্ত শিবিরে পৌছালেন তখন তিনি অন্যান্য বস্তুর সাথে একটি তোতা পাখিও লাভ করেন। হুমায়ূন তাকে তাঁর কাছে রেখে দিলেন। যখন রুমী খাঁর নাম ধরে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আহ্বান জানান হল, তখন তোতা পাখিটি বলল, "ফট রুমী খাঁ হারামখোর, ফট রুমী খাঁ হারামখোর" (অর্থাৎ হারামখোর রুমী খাঁর উপর অভিসম্পাত)। এ কথা সে দশবার বলল। রুমী খাঁর মাথা নত হয়ে গেল। তখন হুমায়ূন তাঁকে বললেন, "কোনো মানুষ একথা বললে তার জিভ কেটে নেওয়া যেত। কিন্তু এই পাখিকে কী করা যাবে ?" উপস্থিত লোকেরা বুঝে গেলেন যে, রুমী খাঁ যখন বাহাদুর শাহের শিবির থেকে পালিয়ে যান তখন বাহাদুর শাহের দরবারিরা একথা বলে থাকবেন যা তোতা পাখিটি শুনে নিয়েছিল এবং রুমী খাঁর নাম শুনে সে কথাই সে পুনরাবৃত্তি করেছে। (বেলে, পৃ. ৩৮৬ - ৮৭; অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, ১, পৃ. ৩৩৫)।

আর্সকিন, ২, পৃ. ৫৫ ; ব্যানার্জি হুমায়ূন ১, পৃ. ১২৪; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৭৩ - ৭৫। মোগল ঐতিহাসিকেরা তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গি তো সহজেই অনুধাবন করা যায়। রুমী খাঁর জীবনের ঘটনাবলী যেখানে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ সেখানে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না। তিনি এমনই এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জামান মির্জা, যিনি তখনও বাহাদুর শাহের সাথে ছিলেন, এখান থেকে পালিয়ে তিনি পঞ্জাব ও থাট্টার দিকে চলে গেলেন।[1] কামরানের অনুপস্থিতিতে তিনি পঞ্জাবে লুটতরাজ শুরু করে দিলেন। বাহাদুর শাহের এই দুরবস্থায় চিতোর লাভবান হল এবং রাজপুতরা পুনরায় সেটি অধিকার করে নিল।[2]

মাণ্ডু

হুমায়ূনও বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া করে মাণ্ডুর কাছে পৌঁছালেন এবং তিনি নালচায়, যা মাণ্ডুর দিল্লি দরওয়াজা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, নিজের শিবিরে স্থাপন করলেন।

মাণ্ডু দুর্গটিকে মধ্যযুগের শক্তিশালী দুর্গগুলোর মধ্যে গণ্য করা হত। এটি ২৩ মাইল পরিধি জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং চারিদিক খাঁজকাটা প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত ছিল।[3] মন্দসৌর থেকে পালিয়ে বাহাদুর শাহ এখানেই মোগলদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

গুজরাতী সৈন্যরা মন্দসৌর থেকে পলায়নের ফলে হতাশ হয়ে পড়েছিল। রুমী খাঁ ও অন্যান্য সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা বাহাদুর শাহকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। হুমায়ূন জানতেন মাণ্ডুর দুর্গ এত শক্তিশালী যে, অত সহজে তার পতন ঘটানো যাবে না। এছাড়া পূর্ব দিকে শের খাঁর গতিবিধির উপর তাঁর মনোযোগ ছিল। মাণ্ডুর দুর্গ অধিকাল ধরে অবরোধ করে রাখলে বিপদের আশঙ্কা ছিল। বর্ষা ঋতু এগিয়ে আসছিল যার ফলে অন্য অসুবিধারও আশঙ্কা ছিল। এ কারণে তিনি পুনরায় বাহাদুর শাহের সাথে সন্ধি বার্তা শুরু করলেন।

হুমায়ূন সৈয়দ আমীর ও বৈরাম খাঁকে বাহাদুর শাহের কাছে দূত রূপে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, বর্ষা ঋতুতে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। হুমায়ূন প্রস্তাব রাখলেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুজরাতের অংশটি বাহাদুর শাহের অধীনে থাকুক এবং মালব ও অন্যান্য অংশ মোগলদের অধিকারে থাকুক।[4] হুমায়ূন একথাও মেনে

AMARBOI.COM

যিনি তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবকিছুই করতে পারতেন। যখন তিনি চিতোর দুর্গ না পেলেন তখন খুবই নিরাশ হলেন। এমনও মনে হয় যে,তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, বাহাদুর শাহের কাছ থেকে তিনি বেশি লাভবান হতে পারবেন না। এইভাবে তিনি মোগলদের কাছে থেকে অধিক লাভবান হতে চাচ্ছিলেন।

১. আকবরনামা ১ পৃ. ১৩২।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, পৃ.১২৯ ; ওঝা, উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস, পৃ. ৪০১ ; শর্মা, মেবার অ্যান্ড দি মোগলস, পৃ. ৫৮।

৩. মাণ্ডু দুর্গের বর্ণনার জন্য দেখুন, আরকিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট ১৯১২-১৩, ইং. পৃ. ১৪৮-৫১।

৪. বার্তা ছিল : তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। কখনো কখনো তো ভাইয়ে ভাইয়েও ঝগড়া বিবাদ হয়। কেননা, বর্ষা ঋতু এসে গেছে, অতএব, আমাদের সেবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেন যে, তাঁর এই প্রস্তাবের কারণ প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধের অসুবিধা। এইভাবে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধিবার্তা শুরু হল এবং বাহাদুর শাহও সন্ধিবার্তাকে স্বাগত জানালেন।

হুমায়ূনের প্রতিনিধি মাওলানা মুহম্মদ ফরগালী (পরগলী) এবং বাহাদুর শাহের প্রতিনিধি সদর খাঁ নালচা ও মাণ্ডুর মধ্যবর্তী নীলী সবিল নামক স্থানে মিলিত হলেন। গুজরাতের পক্ষ থেকে সদর খাঁকে সহায়তা দেয়ার জন্য হুমায়ূন দু'জন বিশিষ্ট মৌলবীকেও অংশ নেয়ার স্বীকৃতি হুমায়ূন দিয়ে দিলেন।[১] সন্ধিবার্তা প্রারম্ভে সফল হল না এবং হুমায়ূন দুর্গ আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু মৌলবীদের সহায়তায় সন্ধির শর্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। এ অনুসারে চিতোর গুজরাতের এবং মাণ্ডু ও তার নিকটবর্তী অংশ মোগলদের লাভ হত।[২] মোগল সম্রাট তো মেনেও নিলেন, কেননা, অনতিবিলম্বেই তিনি মাণ্ডু অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।

এক ব্যক্তিগত পত্রে হুমায়ূন সন্ধির স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। এ অনুসারে গুজরাত ও চিতোর বাহাদুর শাহের লাভ হত—এ সিদ্ধান্ত হল যে, বাহাদুর শাহ মাণ্ডু দুর্গের পশ্চিম দ্বার লোয়ানি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন আর মোগলরা উত্তর দ্বার অর্থাৎ দিল্লি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন।

বাহাদুর শাহ এই শর্ত স্বীকার করে নিয়ে তিনি তাঁর সিপাহিদেরও একথা জানিয়ে দিলেন। এর পরিণামস্বরূপ সৈনিক এবং গুজরাতী কর্মকর্তারা প্রায় ধরেই নিলেন যে, এবার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে তাঁদের মন থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সতর্কতা দূর হয়ে গেল।

ঐ রাতে প্রায় দু'শ' মোগল সৈনিক মাণ্ডু দুর্গের প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে এবং দড়ির সহায়তার দুর্গমধ্যে ঢুকে পড়ল। তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে অন্য সৈনিকদের সহায়তায় দুর্গ অধিকার করে নিল।[৩] এ খবর পেয়ে হুমায়ূন ঘোড়ায়

ছাউনীতে থাকার কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে মাণ্ডুকে আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক যাতে আমরা বর্ষা ঋতুতে সেখানে শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারি। তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের রাজ্য গুজরাতে সুখে শান্তিতে থাকো।

১. এই বিশিষ্ট মৌলবীদ্বয় ছিলেন ঐতিহাসিক আবু তুরাবের পিতা শাহ কুতুবুদ্দীন শুকরুল্লাহ ও তাঁর চাচা শাহ কামালুদ্দীন ফুতুহুল্লাহ। আবু তুবাব, পৃ. ১৬-১৭।

২. আবু তুরাব, পৃ. ১৬ ; আকবরনামা ১ পৃ. ১৩৩ ; অ্যারাবিক হিস্ট্রি, পৃ. ২৪১ ; ড. ব্যানার্জী হুমায়ূনের চিতোর দেয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, হুমায়ূন এই কারণে একে স্বীকার করেন, কেননা, এতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না আর চিতোর লাভের ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। রাজপুতদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল এবং তিনি তাঁদের উপর শাসন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এ ছাড়া হুমায়ূন জানতেন যে, বাহাদুর শাহ চিতোর তাঁর অধিকারে রাখবেন না। (হুমায়ূন, খণ্ড, ১, পৃ. ১৩২)।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৩ ; কাম্বিস্‌সারিয়েট, পৃ. ৩৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চড়ে তাঁর লোকেদের সাথে দুর্গ দ্বারের দিকে এগিয়ে এলেন। দিল্লি দরওয়াজা দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। সদর খাঁ তাঁর লোকদের নিয়ে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং আহত হওয়ার পরেও স্ব-স্থানে দৃঢ় থাকলেন। অবশেষে, এক উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁকে মাণ্ডু দুর্গের অভ্যন্তরে সোনগড় (সুগড়) এর দিকে নিয়ে গেলেন।[১] যার রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল সুলতান আলম খাঁর উপর।

কাদির শাহ, যাঁর উপর দুর্গরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল, মোগলদের প্রবেশের খবর পেয়ে দুর্গের গম্বুজ থেকে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে বাহাদুর শাহের শয়নাগারে গিয়ে পৌছালেন। বাহাদুর শাহের সেবক তাঁকে ভিতরে যেতে দিতে রাজি হল না। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বাহাদুর শাহ জেগে উঠলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তাঁকে ভিতরে ডেকে নিলেন। পরিস্থিতি জ্ঞাত হওয়ার পর বাহাদুর শাহ ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাথে কাদির শাহ ও ভূপত রায়ও ছিলেন। রুমী খাঁ ভূপত রায়কে বাহাদুর শাহের পক্ষ ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে হুমায়ূনের সদ্ব্যবহারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ভূপত রায় তাঁর পক্ষ ত্যাগ করলেন না।[২]

প্রারম্ভে বাহাদুর যুদ্ধ করতে চাইলেন কিন্তু সোনগড়ে পৌছে তিনি অনুভব করলেন যে, অবস্থা প্রতিকূল। তিনি মাণ্ডু ছেড়ে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি ঘোড়া দড়ি দিয়ে বেঁধে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। পালাবার সময়ে মোগলদের উজবেক সৈনিক বুরি তাঁকে চিনে ফেললেন।[৩] এ সৈনিক এ খবর তাঁর সেনাপতি কাসিম হুসেনকে দিলেন। কিন্তু কাসিম হুসেন এই বলে তাঁর কথা উপেক্ষা করলেন যে, গুজরাতের সুলতান মাত্র তিনচার জন সিপাহি নিয়ে চলে যাবেন না। এইভাবে ভাগ্য বাহাদুর শাহের পলায়নে সহযোগিতা করল।

---

১. আকবরনামা, পৃ. ১৩৪ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২ পৃ. ৫২।

২. মিরাতে সিকানদারীর মতে, রুমী খাঁ ভূপতকে একটি পত্রে লিখেছেন, "তোমার কী জানা আছে যে, বাহাদুর শাহ তোমাদের বংশের কী ক্ষতিটাই না করেছেন ? এই হত্যাকারীর জন্য প্রাণ দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এখন প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসে গেছে। আক্রমণ হওয়ামাত্রই তোমার অধীনস্থ ফটকগুলি খুলে দেবে। হুমায়ূন তোমার পিতার স্থলে তোমাকে বসাবেন এবং অনেক অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। লেখকের মতে, মাণ্ডু রাজ্যের পতন হয় ভূপত রায়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে (বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৭ - ৮৮)। এর বিপরীতে আবুল ফজল স্পষ্ট লিখেছেন যে, ভূপত রায় বাহাদুর শাহের সাথে পালিয়ে যান। (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৩) আবু তুরাবও ভূপত রায়ের প্রভুভক্তিকে সমর্থন করেছেন (তারীখে গুজরাত, পৃ. ১৮)।

৩. পুরি, বুরি বা নূরি প্রথমে সুলতান বাহাদুর শাহের সেবক ছিলেন এবং পরে কাসিম খাঁ তাঁর জীবন বাজি রেখে বাহাদুর শাহকে বাঁচিয়েছিলেন। (ব্রিগস, ২, পৃ. ৭৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাণ্ডুর গণহত্যা

মাণ্ডু দুর্গ অধিকার করার পর মঙ্গলবারের দিনের শুরু থেকেই হুমায়ূন রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তিনি গণহত্যার ঘোষণা দিলেন। তিন দিন যাবত মোগল সৈনিকরা মাণ্ডুর গলি-ঘুঁচিগুলোতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন।[১] অবশেষে, চতুর্থ দিনে বাহাদুর শাহের বন্ধু (মঞ্জু) নামক এক গায়কের গানে প্রভাবিত হয়ে হুমায়ূন সবুজ বস্ত্র পরিধান করলেন এবং গণহত্যা বন্ধের আদেশ দিলেন।[২] গণহত্যার কারণে মাণ্ডুতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হল না। আহত অবস্থায় সদর খাঁকে হুমায়ূনের সামনে আনা হল। হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।[৩] অন্য আমীরদের সাথেও দয়ার্দ্র ব্যবহার করা হল।

হুমায়ূনের মেবার আসার শুরু থেকেই সদর খাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। তিনি এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, তিনি মোগল সৈন্যদের ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাবেন না। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে এতটাই অটল ছিলেন যে, পরে কাম্বেতে গুজরাতীরা তাঁকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাতে তিনি রাজি হন নি।

যেখানে সদর খাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা হল সেখানে আলম খাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করা হল এবং তাঁর হাঁটুর রগ কেটে দিয়ে তাঁকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে দেওয়া হল।[৪]

---

১. আকবরনামা ১ পৃ. ১৩৪ ; অরেবিক হিস্ট্রি, পৃ. ২৩৩।

২. একদিন বাহাদুর শাহের এক সভাগায়ক কলাবন্ত মঞ্জুকে ধরে হুমায়ূনের সামনে নিয়ে আসা হল। হুমায়ূন খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল। খুশহাল বেগ মঞ্জুর পরিচয় দিলেন এবং বললেন, হে বাদশাহ, এই মঞ্জু কলাবন্ত গায়কদের বাদশাহ। বাদশাহ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন। খুশহাল বেগ পুনরায় বললেন, হিন্দুস্তানে এমন শিল্পী আর হবে না। বাদশাহ বললেন, 'একটু গাও।' মঞ্জু ফার্সি সঙ্গীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর গান শুনে বাদশাহের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি রক্ত বসন ত্যাগ করে সবুজ বসন গ্রহণ করলেন। মঞ্জুকে বললেন ; 'যা চাও, চেয়ে নাও, তোমাকে দেয়া হবে।' মঞ্জু তাঁর আত্মীয়-বন্দিদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। মঞ্জুকে ঘোড়ার পিঠে বসানো হল এবং সে যাকে চাইল মুক্ত করে দেয়া হল। কিছু লোক বাদশাহকে বললেন মঞ্জু সবাইকে মুক্ত করে দিচ্ছে। হুমায়ূন বললেন, 'কোনো ব্যাপার নেই, সে আজ আমার কাছে আমার রাজ্যটি চাইলেও আমি অস্বীকার করতাম না।' কিছুদিন হুমায়ূনের কাছে থাকার পর মঞ্জু পালিয়ে আবার বাহাদুর শাহের কাছে চলে গেলেন। বাহাদুর শাহ তাকে বললেন, 'আমার হারানো বস্তু আমি ফিরে পেয়েছি।' (মিরাতে সিকান্দারী, বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৮ - ৯০) মিরাতে সিকান্দারীর লেখকের পিতা ঐ সময়ে হুমায়ূনের দরবারে ছিলেন যখন মঞ্জুকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৩. মাণ্ডুর পতনের পর সদর খাঁর বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। আবুল ফজলের মতে, বীরত্বের জন্য সদর খাঁকে স্বাগত জানানো হয় এবং তাঁকে মোগল বাহিনীতে রেখে দেওয়া হয়। (আকবরনামা, ১ পৃ. ১৩৪)। এর বিপরীতে মিরাতে সিকান্দারীর লেখক লিখেছেন, সদর খাঁ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন (বেলে, গুজরাত, পৃ. ৩৮৮)। আবুল ফজলের কথাই সঠিক।

৪. তবকাতে আকবরী, দে, ২ পৃ. ৫২, পাদটীকা, ১, আকবরনামা, পৃ. ১৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাণ্ডু হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা

হুমায়ূনের মাণ্ডু নিবাস ও দুর্গ অধিকার করার ঘটনা আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং হুমায়ূনের চরিত্রের এমন কিছু অংশ আমাদের সামনে এসে যায় যা অনুধাবন করা সহজ নয়। হুমায়ূন নিজে সন্ধিবার্তা শুরু করেন। সন্ধিবার্তায় তিনি সর্বদাই উদারতা প্রদর্শন করেন। এই কারণে হুমায়ূন বাহাদুর শাহের মৌলবীদেরও তাতে অংশ দেওয়ার অধিকার দেন এবং পরে বাহাদুর শাহকে চিতোর প্রদানেও স্বীকৃতি দেন। শুধু তাই নয়, তিনি ফরমান দ্বারা সন্ধি পাকাপোক্ত করে দেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি রাতের বেলায় কেন দুর্গ আক্রমণ করলেন ? মোগল এবং গুজরাতী ঐতিহাসিকরাও এর উপর আলোকপাত করেন নি। হয় হুমায়ূন বাহাদুর শাহকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সন্ধিবার্তা করেন যার ফলে তিনি দুর্গরক্ষা ব্যবস্থা ঢিলা করে দেন যাতে মোগলদের তা অধিকার করতে সুবিধা হয়, নতুবা মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু ঘটে যায় ফলে তিনি সন্ধি ভঙ্গ করে আক্রমণ চালিয়ে দেন। যাই হোক না কেন, হুমায়ূনের এ কাজ নিন্দনীয়। তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন এবং গুজরাতীদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মোগলদের কোনো বিশ্বাস নেই।

হুমায়ূন একদিকে স্বীকৃত সন্ধি ভঙ্গ করলেন, অন্যদিকে তিনি এতটা ক্রুদ্ধ হলেন যে, তিনদিন ধরে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। তাঁর এত ক্রোধের কারণ কী ছিল ? তিনি কী মনে করেছিলেন যে, মাণ্ডু দুর্গের অধিবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানাবেন ? যাই হোক, এই হত্যাকাণ্ডের ফলে তিনি গুজরাতীদের সদ্‌ভাবনা নষ্ট করে দিলেন। এবার গুজরাতীদের সামনে মোগলরা শুধুমাত্র নৃশংস হত্যাকারী, মিথ্যাবাদী ও বিদেশী রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। হুমায়ূনের এই হঠকারিতার কারণে গুজরাতে গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, যার পরিণামে মোগলদের গুজরাত ছেড়ে চলে যেতে হল।

চম্পানীর

মাণ্ডু থেকে পালিয়ে বাহাদুর শাহ আহমদাবাদ হয়ে চম্পানীর পৌঁছালেন। চম্পানীরের দুর্গটি বরোদা থেকে ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীতে এটি একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল এবং গুজরাতের সুলতানেরা এখানে তাঁদের রাজকোষ সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

হুমায়ূন মাণ্ডুতে কেবলমাত্র তিনদিন রইলেন। তিনি সিন্ধুর শাসক মির্জা হুসেন আর্গুনকে উত্তর দিক থেকে গুজরাত আক্রমণের জন্য একটি পত্র পাঠালেন এবং লিখলেন, পাটনে পৌঁছে যেন তিনি হুমায়ূনকে সে খবর জানিয়ে দিয়ে তাঁর পরবর্তী আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করেন।[১]

১. তারীখে সিন্ধ অথবা তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৬২-৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন ৩০,০০০ অশ্বারোহী[১] সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহকে ধাওয়া করে আহমদাবাদ গিয়ে পৌঁছালেন। এ নগরও লুট করা হল।[২] এখান থেকে অগ্রসর হয়ে হুমায়ূন চম্পানীর দুর্গের নিকট পৌঁছালেন এবং পিপলি দরওয়াজার কাছে অবস্থিত ইমাদুল মুলক নামক দীঘির কাছে গিয়ে অবস্থান নিলেন। তারপর, নগরে প্রবেশ করলেন এবং দুর্গ বাহাদুর শাহের অধিকারেই রয়ে গেল।

বাহাদুর শাহ ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি দুর্গে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী একত্রিত করে নিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও হুমায়ূনের পৌঁছানোর খবর শুনে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তিনি রাজকোষ, হীরে জহরত ও মহিলাদের মসনদে আলী, আবদুল আজীজ আসদ খাঁর হাতে দিউ পৌঁছানোর জন্য তুলে দিলেন।[৩] দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন রাজা নরসিহ দেব ওরফে কাহ্ন রাজ (খাঁ জাঁহা) ও ইখতিয়ার খাঁর উপর এবং মাত্র ২০০ সৈন্য সাথে নিয়ে কম্বে অভিমুখে পালিয়ে গেলেন। নগর ত্যাগের পূর্বে তিনি মুহম্মদাবাদ-চম্পানীরে (চম্পানীরের দুর্গটি যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল) আগুন লাগিয়ে দিলেন।

হুমায়ূন নগরে (মুহম্মদাবাদ-চম্পানীর) প্রবেশ করলেন এবং সর্বপ্রথমেই তিনি আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করলেন। হিঁদুবেগ সহ অন্য সৈন্যদের (প্রায় ২০,০০০) তিনি দুর্গ অবরোধের জন্য ছেড়ে দিলেন এবং প্রায় ১,০০০ অশ্বরোহী সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহকে ধাওয়া করার জন্য রওনা হয়ে গেল। হুমায়ূন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ধাওয়া করলেন কিন্তু বাহাদুর শাহের কম্বে নগর ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টা পর সেখানে পৌঁছালেন।

কম্বেতে বাহাদুর শাহ ১০০ জাহাজের একটি বহর পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর ভয় হল যে, না জানি তা মোগলদের হাতে চলে যায়। এ কারণে সেগুলো নষ্ট করে দিয়ে তিনি দিউ চলে গেলেন।[৪]

---

১. কাম্বিস্‌সারিয়টের মতে, ১০,০০০ (হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৩৫৫)।

২. বদায়ূনী, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৩৪৬ ; তবকাতে আকবরী, দে পৃ. ৫৩।

৩. অ্যারাবিক হিস্ট্রি, পৃ. ২৪৩।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৪। তারীখে ফিরিশতার ইংরেজি অনুবাদক কর্নেল ব্রিগস তুর্কি ঐতিহাসিক ফেরদির তথ্যের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন, বাহাদুর শাহ এখান থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও হীরে জহরত যা তিন লোহার সিন্ধুকে ছিল, মদীনা পাঠিয়ে দিলেন। এতে সেই সমস্ত ধনসম্পদ ছিল যা তিনি জুনাগড়, চম্পানীর, আবুগড়, চিতোর ও মালব থেকে লাভ করেছিলেন। এ সম্পদ ভারতে ফিরে আসে নি, এই সম্পদের কারণে তাঁকে ঐশ্বর্যশালী সুলায়মান (Sulaiman the magnificent) বলা হতে লাগল; বাহাদুর শাহ গুজরাতের সুলতানদের পেটিও, যা বহুমূল্যবান ছিল, তাঁর দূতের মাধ্যমে সুলেমানের কাছে এই আশায় পাঠিয়ে দিলেন যে, 'Grand seignior' থেকে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য লাভ করবেন। ফিরিশতা, ব্রিগস, ৩৪ পৃ. ১৫১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন কম্বে থেকে কয়েকটি কারণে আর অগ্রসর হলেন না।[১] তিনি কেবল একটি ছোট সেনাদল বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দিউ পর্তুগিজদের অধিকারে ছিল। হুমায়ূনের ভয় ছিল অগ্রসর হলে তার সাথে সংঘর্ষ হবে। বাহাদুর শাহ তাদের সাথে বার্তালাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে সংঘর্ষের আশঙ্কা আরো বেশি ছিল। এছাড়া চম্পানীর তখনো মোগলদের অধিকারে আসে নি এবং অধিকাংশ মোগল সৈন্য সেখানেই ছিল। হুমায়ূনের কাছে কম্বেতে সৈন্য কম ছিল এবং চম্পানীরের রাজকোষ[২] তৎক্ষণাৎ অধিকার করা আবশ্যক ছিল।

মাণ্ডুর ঘটনার পর বাহাদুর শাহ সন্ধির কোনো বার্তা শুরু করেন নি। মোগলদের উপর থেকে তাঁর বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহের স্থান হতে স্থানান্তরে পলায়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মনে মোগলদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সাহস আর অবশিষ্ট ছিল না। মাণ্ডুর পর হুমায়ূন এমন গতিতে বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া করেছিলেন যে, তা দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও আশ্চর্য হতে হয়। আশ্চর্যের কারণ হল, হুমায়ূনের গতির অভাব ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন। সম্ভবত এ তাঁর জীবনবৈচিত্র্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। যেখানে তিনি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দ্রুতবেগে শত্রুর পিছু ধাওয়া করেছেন, সেখানে তার সাথে এ ঘটনা মেলে না। আর বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, প্রয়োজন হলে হুমায়ূন অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিজেতার গুণও প্রদর্শন করতে পারতেন।

চম্পানীর থেকে একটি ছোট্ট সেনাদল নিয়ে বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া করাটাকে আমরা হুমায়ূনের দুঃসাহস বলেও অভিহিত করতে পারি। বিশেষত, যখন একথা স্পষ্ট ছিল যে, বাহাদুর শাহ গুজরাতে জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাদের মোগল বিরোধী মনোভাব আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল।

এছাড়া চম্পানীর দুর্গ অধিকার না করে আগে অগ্রসর হওয়াটা কাহাঁতক যুক্তিসঙ্গত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের উপর দু'দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে দিলে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত। হুমায়ূনের সৌভাগ্য যে, এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি এবং এ কারণে হুমায়ূনের পক্ষে

---

১. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাতের লেখক লিখেছেন, দিউ থেকে বাহাদুর শাহ তাঁর আমীর মাহমূদ লারি ও মুহতরম খাঁকে রুমী খাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য কম্বে পাঠালেন। এঁরা রুমী খাঁর কাছে গিয়ে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে হুমায়ূনের দিউ আক্রমণ থেকে বিমুখ করার জন্য বললেন। রুমি খাঁ হুমায়ূনকে বোঝালেন যে, সামুদ্রিক জলবায়ু তাঁর জন্য ক্ষতিকর এবং এখন ফিরে আসাই শ্রেয়। হুমায়ূন একথা মেনে নিলেন, কেননা এ সময়ে আহমদাবাদ থেকে অশান্তির খবর এলো। অ্যারাবিক হিস্ট্রি ১, পৃ. ২৪৬-২৫৭; কাম্মিস্‌সারিয়েট, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

২. ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৪২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা একথা বলতে পারি যে, তিনি অবস্থা পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, গুজরাতী ও বাহাদুর শাহের মধ্যে মোগলদের মোকাবিলা করার শক্তি আর নেই।

গাওয়ার ও কোলী জাতির আক্রমণ

হুমায়ূন কম্বেতে সেখানকার শাসনকর্তা সৈয়দ শরীফ জিলানির আতিথ্যের আনন্দ লাভ করছিলেন। ঐ সময়ে বাহাদুর শাহের দুই আধিকারিক মালিক আহমদ লাড এবং রুকন দাউদ হুমায়ূনের প্রতি বাহাদুর শাহের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। তাঁরা কোলী ও গাওয়ার জাতির[১] দলপতিদের সহায়তা নিলেন এবং রাতের আঁধারে মোগল শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে তাকে নষ্টভ্রষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিলেন। কম্বের অধিবাসীরা ছিল মোগল বিরোধী এবং গুজরাতীদের মধ্যে মোগল বিরোধী মনোভাব আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল। সংযোগবশত, হুমায়ূনের শিবিরে এক যুবক বন্দি ছিল, যাকে কম্বের কাছে বন্দি করা হয়েছিল। তার মা এই পরিকল্পনার খবর পেয়ে পুত্রের প্রাণের ভয়ে (যে হুমায়ূনের শিবিরে ছিল) ভীত হয়ে উঠেছিল। সে এই খবর জানিয়ে পুত্রকে মুক্ত করার চিন্তা করল। প্রারম্ভে হুমায়ূনের সৈন্যরা এই বৃদ্ধার কথা শুনে উপহাস করল কিন্তু শেষে তাকে হুমায়ূনের কাছে নিয়ে গেল। বৃদ্ধা রাতের আঁধারে মোগল সৈন্যদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানাল এবং অবশেষে সে বলল যে, 'আমার কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে আমাকে ও আমার ছেলেকে হত্যা করবেন।' হুমায়ূন বুড়ি ও তাঁর পুত্রের উপর পাহারা বসিয়ে দিলেন এবং আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন পাঁচ ছ'হাজার কোলী ও গাওয়ার জাতির লোক হুমায়ূনের শিবিরে আক্রমণ হানল। হুমায়ূনের সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল এবং সফলভাবে তাদের মোকাবিলা করল। আক্রমণকারীরা বড়ই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল। হুমায়ূনের বাহিনীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই সংঘর্ষে বিশেষভাবে কাজে এলেন। কিন্তু আক্রমণকারীরা পরাজিত হল। হুমায়ূন বৃদ্ধা ও তাঁর পুত্রকে মুক্ত করে দিলেন।[২]

এই লুটতরাজের ফলে, আবুল ফজলের বর্ণনানুসারে বহু অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হয়ে যায়, এগুলোর মধ্যে মোল্লা সুলতান আলীর হাতে লেখা ও উস্তাদ বিহজাদ কর্তৃক চিত্রিত তিমুরনামা[৩]ও ছিল। পরে এই পুস্তক পুনরুদ্ধার করা হয় এবং

---

১. এই জাতিগুলোর বিষয়ে জানার জন্য দেখুন, বোম্বে গেজেটিয়ার ৯, খণ্ড, ১, পৃ. ২৩৭-২৩৯; হোদীওয়ালার (স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, ১, পৃ. ৪৮৮) মতে, প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি হল গাঁওয়ার। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, কোলী ও গাওয়াররা বন্য জাতিগোষ্ঠীর লোক।

২. আকবরনামা, পৃ, ১৩৬ ; গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ, ১৩২ ; আবু তুরাব, পৃ. ২০-২১।

৩. আকবরনামা, পৃ. ১৩৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবরের গ্রন্থাগারেও তা বিদ্যমান ছিল। এই আক্রমণ থেকে হুমায়ূন দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে যান, নইলে এই আকস্মাৎ আক্রমণে বহুসংখ্যক মোগল সেনাও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। আক্রমণকারীরাও একটি ভুল করে। তারা মোগল সৈন্যদের পরাজিত করার স্থানে লুটপাট শুরু করে। এই সময়ে মোগলরা সম্মিলিতভাবে তীর বল্লম দিয়ে তাদের উপর ধুন্ধুমার আক্রমণ চালিয়ে দেয়, ফলে তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারীখে গুজরাতের লেখক আবু তুরাব লিখেছেন, যে রাতে গাওয়াররা আক্রমণ চালায় ঐ রাতে সদর খাঁর রক্ষকরা তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতে থাকলে তিনি রাজি হলেন না এবং তিনি বললেন, আমি বাদশাহের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাঁর সেবা থেকে আমি বিচ্যুত হব না। এই কোলাহলের মধ্যে সদর খাঁ ও জাম ফিরোজও নিহত হলেন। হুমায়ূনের কাছে এ খবর পৌছালে তিনি বড় দুঃখ পেলেন।[১]

কম্বে লুট

এই আক্রমণের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে হুমায়ূন কম্বে লুণ্ঠন ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। যার ফলে, কম্বে প্রায় নষ্টভ্রষ্ট হয়ে গেল।[২]

চম্পানীর দুর্গ বিজয়

কয়েক দিন কম্বেতে অবস্থানের পর হুমায়ূন চম্পানীর এলেন এবং এই দুর্গ অবরোধ করতে শুরু করলেন। বাহাদুর শাহ চম্পানীর ত্যাগের সময় এই দুর্গ রক্ষার জন্য রাজা নরসিংহ দেব ও ইখতিয়ার খাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। রুমী খাঁ কামান ব্যবহার করলেন। দু'পক্ষ থেকে গোলাগুলি হল।

মোগল সৈন্যদের পিছু হটে গিয়ে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিতে হল। দুর্ভাগ্যবশত রাজা নরসিংহ দেব আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।[৩] এরপর ইখতিয়ার খাঁ দুর্গপতি হলেন। তিনি খুবই বীরত্ব ও সাহসের সাথে দুর্গ রক্ষা করলেন। মোগলদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে, অনেক চেষ্টার পরেও এঁরা দুর্গে রসদ পৌছাতে পূর্ণরূপে প্রতিহত করতে পারছিল না। দুর্গের চারদিকে জঙ্গল

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৬।
২. আবু তুরাব, তারীখে গুজরাত, পৃ. ২১।
৩. মিরাতে সিকান্দারীর মতে, যে সময়ে বাহাদুর শাহ নরসিংহ দেবের মৃত্যুসংবাদ পেলেন তখন তিনি সখেদে বলনে, "চম্পানীর কেল্লা হাতছাড়া হয়ে গেল।" উজির আফজল খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী কোনো খবর পেলেন ?' বাহাদুর শাহ বললেন, 'না, রাজা নরসিংহ দেব নিহত হয়েছেন। এই মোল্লার (অর্থাৎ ইখতিয়ার খাঁ) এত শক্তি কোথায় যে তিনি এই কেল্লা রক্ষা করবেন ?" (বেবল, গুজরাত পৃ. ৩৯০-৯২)। অরেবিক হিস্ট্রি অব গুজরাতের লেখকও একথা সমর্থন করেন (অরেবিক হিস্ট্রি, পৃ. ২৩৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। যার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এ জন্য মোগলদের কামানগুলো তেমন সুবিধা করতে পারছিল না।

চারমাস পর একদিন জঙ্গলে হুমায়ূন একদল কৃষককে দেখতে পেলেন যারা দুর্গমধ্যে রসদ পৌছে দিচ্ছিল। এদের বন্দি করে প্রচণ্ড মারধর করা হল। এরা দুর্গের কাছে চোরা গোপ্তা পথের সন্ধান দিয়ে দিল। হুমায়ূন দেখলেন দুর্গপ্রাচীর ৬০ থেকে ৮০ ফুট উঁচু এবং এতটা সপাট যে, তার উপরে চড়া খুবই কঠিন ব্যাপার। পরদিন চাঁদনি রাতে মোগলরা দুর্গপ্রাচীরের উপর ওঠার প্রয়াস চালালেন। হুমায়ূন প্রাচীরের বাইরে থেকে লোকদেখানো আক্রমণের ভান করলেন, যাতে দুর্গের অভ্যন্তরের লোকেরা ভয় না পায়। তিনি সত্তর আশিটি মোটা পেরেক বানালেন। এই পেরেকগুলো দুর্গপ্রাচীরের গায়ে একটার উপর একটা ঠুকে পুঁতে দেওয়া হল এবং এইভাবে এই লোহার সিঁড়ির সহায়তায় মোগলরা প্রাচীরের উপরে পৌছাল। ৩৯ ব্যক্তির উপরে পৌছানোর পর বৈরাম খাঁ ও তারপর হুমায়ূন পৌছালেন।[১] এইভাবে প্রায় ৩০০ লোক সকাল হওয়ার সাথে সাথে দুর্গপ্রাচীরে উঠে পড়লেন এবং তাঁরা দুর্গদ্বার অধিকার করে নিলেন, যাতে সহজে মোগলরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ইখতিয়ার খাঁ[২] সংঘর্ষ অসম্ভব দেখে পরদিন দুর্গ সমর্পণ করে দিলেন।[৩] হুমায়ূন তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন কিন্তু শত্রুপক্ষের অন্য সৈনিকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা হল।

চম্পানীর দুর্গে বাহাদুর শাহ ও তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজকোষ সঞ্চিত ছিল। দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার কারণে বাহাদুর শাহ একে সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন নি। এর সমস্ত কোষ হুমায়ূন লাভ করলেন।[৪] সম্রাট খুশি হয়ে সোনা, রূপা ও হীরে জহরত ঢালে করে ভরে নিয়ে মোগল আমীর ও সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

AMARBOI.COM

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৩।

২. আবুল ফজল ইখতিয়ার খাঁর যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিপুণ জ্ঞাতা ছিলেন এবং কবিতাও লিখতেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৮।

৩. চম্পানীর দুর্গ অধিকারের তারিখ সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবুল ফজলের মতে চম্পানীর দুর্গের পতন হয় সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে, বদায়ূনীর মতে, ৯ সফর এবং আবু তুরাবের মতে ৬ সফর তারিখে। (আবু তুরাব পৃ, ২৪, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৮)। আবুল ফজল লিখেছেন এর তারিখ সফরের প্রথম সপ্তাহ বেরিয়ে আসে এর অক্ষর গণনা থেকে। এ হিসেবে ঐ তারিখ হয় ৯৪৩ হিজরির সফর মাসের প্রথম সপ্তাহ (২০ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই ১৫৩৬ খ্রি.) এর মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে।

৪. জওহর লিখেছেন, সুলতান বাহাদুর শাহের কোষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। বাহাদুর শাহের আলম খাঁ নামক এক বিশ্বস্ত আমীর, যিনি পুনরায় মোগল আমীর বনে গিয়েছিলেন, তিনি এর সন্ধান জানতেন। সন্ধান জানার জন্য তাঁকে মদ খাওয়ানো হল। মদের নেশায় তিনি সেই হাউজ ও কূপের সন্ধান দেন যেখানে বাহাদুর শাহের পূর্বপুরুষদের কোষের সন্ধান পাওয়া গেল। গুজরাতের সুলতান সোনা ও রুপো গলিয়ে ঐ কূপে ঢেলে দিতেন। (জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬-৭)।

কিছু মোগল সৈনিকের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা

প্রচুর পরিমাণে ধনলাভ করার পর হুমায়ূন ও তাঁর আমীররা বড়ই সন্তোষ লাভ করলেন এবং তাঁরা দেবরায় দীঘির তটে বিজয় লাভের পর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী যেমন, কিতাবদার (গ্রন্থাগারিক), সিলাহদার (শস্ত্র-ব্যবস্থাপক), দাওয়াতদার (লিখন সামগ্রীর ব্যবস্থাপক) প্রমুখ শরাবের নেশার চুর হয়ে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াজদির লেখা জাফরনামা পাঠ করছিলেন। এতে হযরত সাহেব কিরানীর প্রারম্ভিক বিজয়ের বর্ণনা ছিল। তিনি চল্লিশ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাহচর্যে থাকতেন। তাঁরা একে একতার গুরুত্ব বোঝালেন[১] এবং বললেন যে, চল্লিশ জন ব্যক্তি সংগঠিত থাকলে বিজয় তাঁদের চিরসাথী হবে। এই মোগল কর্মচারীরা নিজেদের সংখ্যা গণনা করলেন এবং এ কথা জেনে যে, এদের সংখ্যা ৪০০ অর্থাৎ তাঁদের সংখ্যা চল্লিশের শক্তির চেয়ে দশগুণ বেশি। তাঁরা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা নিলেন এবং তাৎক্ষণিক অভিযানের জন্য রওনা হয়ে গেলেন।[২]

হুমায়ূন তাঁদের এই মূর্খতাপূর্ণ অভিযানে বড়ই অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা আক্রমণের আদেশ নেন নি। এই চারশ' ব্যক্তির পক্ষে দাক্ষিণাত্য বিজয় ছিল একেবারেই অসম্ভব। এই ধরনের কার্যাবলীর প্রশ্রয় দিলে অনুশাসনহীনতার প্রতি উৎসাহ বেড়ে যেত এবং মোগল সৈন্যদের খ্যাতিও প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেত।

পরদিন সকালে হুমায়ূন এদের পলায়নের খবর পেলেন। তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি বাহিনী পাঠানো হল এবং তাদের বন্দি করে হুমায়ূনের সামনে পেশ করা হল। ঐ দিন ছিল মঙ্গলবার। হুমায়ূন রক্তবসন পরে ফৌজদারি মামলার বিচার করছিলেন। তাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে হুমায়ূন তাদের কঠোর শাস্তি দিলেন। কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করা হল, কিছু ব্যক্তিকে হাতির পদতলে পিষ্ট করা হল আর বহু সংখ্যক ব্যক্তির নাক, কান ও হাত-পা কেটে দেওয়া হল।[৩]

ঐ দিন মাগরিবের নামাজের সময়ে ইমাম ফিল (আলাম তারা কাইফা বা সুরায়ে ফিল) নামক কুরআনের সুরা পাঠ করলেন। এতে মুহম্মদ[৪] সাহেবের জন্মবর্ষ (৫৭১

১. একদিন হযরত সাহেব কিরানি তাঁর প্রত্যেক সাথীর কাছ থেকে দুটি করে বাঁশের লাঠি নিলেন এবং সেগুলোকে একসাথে বেঁধে সেগুলো ভেঙে ফেলতে বললেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কেউ তা ভাঙতে পারল না। তারপর, তিনি সেই বান্ডিল খুলে দিলেন এবং প্রত্যেককে দুটি করে কাঠি দিলেন। এবার এগুলো তারা একে একে ভেঙে ফেলল। কিরানি তাদের বোঝালেন যে, তারা যেখানেই যাবে সেখানে কেউ তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না এবং তারা সাফল্য লাভ করবে।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৯।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৯।

৪. সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতে হয় প্রিয়নবীর নাম শুনে। এ প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।—অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রি.)-এ ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহার হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করা এবং আল্লাহর আদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখিদের দ্বারা তাদের মেরে তা তাড়ানোর পর লেখা হয়েছে, হে রসূল! তুমি কী দেখোনি তোমার আল্লাহ হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করলেন ? তাদের সমস্ত আয়োজন কী আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেননি ?

হুমায়ূনের মনে হল ইমাম তাঁর দণ্ডদানের কথা মনে করেই এই বিশেষ সুরাটি পাঠ করেছেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইমামকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। মওলানা মুহম্মদ ফরগলী এই ইমামকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। বেচারি ইমামকে হত্যা করা হল। ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ইমামকে এমন কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য হুমায়ূন খুব অনুতপ্ত হলেন। আবুল ফজল লিখেছেন হুমায়ূন সারা রাত ধরে কান্নাকাটি করলেন।[১]

এই মূর্খদের দণ্ড দেওয়ার প্রয়োজন তো ছিলই, কিন্তু হুমায়ূন তাঁদের সাথে যে কঠোর আচরণটি করলেন, তাকে ন্যায়সঙ্গত বলে অভিহিত করা যায় না। তাঁর অনুভব করা উচিত ছিল যে, এটি ছিল একটি নববিজিত স্থান, এখানে নিজের সৈনিকদের মূর্খতার জন্য তাঁর এ ধরনের ক্রূরতা দেখানো মোটেও ঠিক ছিল না। ইমামের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্বর। হুমায়ূন এখানে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি।[২]

AMARBOI.COM

চম্পানীর বিজয়ের প্রতিক্রিয়া

চম্পানীর বিজয় থেকে হুমায়ূন প্রচুর ধন লাভ করেন। দানী পিতার পুত্র হওয়ার ফলে তিনি আমীর ও সৈনিকদের তাঁদের পদমর্যাদানুসারে যতটা পরিমাণ সোনা বা রুপো তাঁর ঢালে আসা সম্ভব ছিল তাদের দিয়ে দিলেন। নিজের বিজয় উপলক্ষে তিনি চম্পানীর থেকে নিজের নামে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন করলেন।[৩] আবুল ফজল লিখেছেন, চম্পানীর বিজয় ও অগাধ ধনসম্পত্তি লাভের কারণে হুমায়ূন শাহানা জশন-এ ব্যস্ত থাকতেন এবং ভোগবিলাসের আয়োজন করতেন।[৪] চম্পানীরের কোষ ও গুজরাত বিজয়ের ফলে যে লাভ হতে পারত তার উপযুক্ত ব্যবহার তিনি করতে পারলেন না। এইভাবে তিনি সময় নষ্ট করলেন।

---

১. আকবরনামা ১, পৃ. ১৪০।

২. Humayun who was never stateman inflicted sanguinary punishments on that psendo-adventures (ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, পৃ. ১৪৮)। আর্সকিনও এর নিন্দা করেছেন (খণ্ড ২, পৃ. ৬৯)।

৩. কাম্মিসসারিয়ট, পৃ. ৩৬০-২৬১। লাহোর মিউজিয়মে একটি মুদ্রা আছে, তার এক পিঠে লেখা আছে চম্পানীর 'বিজয় ৯৪২ হি.; এবং অপর পিঠে লেখা আছে 'শহর মুকররমে নির্মিত'। ঐ বছরের অন্য এক মুদ্রার 'শহর আল-আর্মা' লেখা আছে। টেলর দি কয়েন্স অব গুজরাত সালতানাত, J.B.B.R.A.S. 1903. XXI. পৃ. ৩১৭ - ১৮)।

৪. আকবরনামা, ১ পৃ. ১৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ব্যানার্জি তাঁর চম্পানীরে যাত্রা বিরতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, তিনি দশ মাসের মধ্যে গুজরাত ও মালব অধিকার করে নিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ পালিয়ে গুজরাতের বাইরে দিউ চলে গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূন তাঁর বিজিত প্রদেশগুলোতে সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চাচ্ছিলেন, যাতে জনসাধারণের বিশ্বাস লাভ করতে পারেন। এ ছাড়া চম্পানীরে প্রাপ্ত কোষ তাঁর সহায়কদের মধ্যে বিতরণ করতে চাচ্ছিলেন। এরই সাথে সাথে বিদ্বান লেখক লিখেছেন, প্রাপ্ত ধন তাঁকে অভিযানের প্রতি উদাসীন করে তুলল।[১]

ড. ব্যানার্জি তো একদিকে বলছেন যে, হুমায়ূনের যাত্রা-বিরতির কারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করা আবার অন্যদিকে বলছেন চম্পানীরে প্রাপ্ত ধনের পরিণামে তাঁর মনে অভিযানের প্রতি বিরক্তি এসে গিয়েছিল। এ হল পরস্পরবিরোধী উক্তি। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূন ভোগ বিলাসে ব্যস্ত ছিলেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি তিনি আগ্রহ দেখান নি। এ কথা লেখার পর যে, হুমায়ূন চম্পানীরে ধন লাভের পর শাহানা জশনে ব্যস্ত থাকতেন, আবুল ফজলের প্রশাসন সম্পর্কিত যুক্তি যে, "শাসককে, যদি তিনি ব্যস্ত থাকেন, তাহলে এমন কিছু ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত যাঁরা রাজকীয় কর্মচারী ও উমরাহদের প্রতি নজর রাখতে পারেন,"[২] একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, আবুল ফজলের ইঙ্গিত হুমায়ূনের প্রতি। আর্সকিনের এ মত সঠিক যে, চম্পানীর বিজয়ের পর হুমায়ূন আনন্দোৎসবে মেতে থাকতেন এবং তিনি শাসনকার্যে মনোযোগী ছিলেন না।[৩]

হুমায়ূন তাঁর আনন্দোৎসবে এতটা ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি রাজস্ব আদায়ের কোনো ব্যবস্থা করেন নি।[৪] গুজরাতের জনগণ এতে প্রসন্ন ছিল না এবং জমিদার ও প্রজাদের একটি প্রতিনিধিদল দিউতে বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং এরা সুলতানের কাছে রাজস্ব আদায়ের জন্য কাউকে নিযুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানাল। বাহাদুর শাহ তাঁর আমীরদের প্রস্তাব দিলেন কেউ সেখানে গিয়ে রাজস্ব আদায় করতে থাকুক। প্রারম্ভে, এই কঠিন কাজটি করার জন্য কেউ প্রস্তুত হলেন না। অবশেষে, ইমাদুল মুলক নিবেদন করলেন যে, "এই কাজ করতে আমি রাজি আছি কিন্তু শর্ত হল প্রয়োজনমতো অর্থ ব্যয়ের অধিকার আমাকে দিতে হবে। লোকদের একত্রিত করার জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তার হিসাব যেন আমার কাছ থেকে নেওয়া না হয়। এই সম্পদ ব্যয়ের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা সুলতানের কোষে অবশ্যই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।" সুলতান তা মেনে নিয়ে

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১ পৃ. ১৪০।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৮-৩৯।
৩. আর্সকিন, ২ পৃ. ৭৬ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ৮০ ও কাম্বিস্‌সারিয়েট, পৃ. ৩৬৪-এরও এই অভিমত।
৪. কাম্বিস্‌সারিয়েট, পৃ. ৩৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশপত্র দিয়ে দিলেন।[১] এর অতিরিক্ত ইমাদুল মুলকের কথামতো বাহাদুর শাহ তাঁর মোহর লাগিয়ে কিছু সাদা কাগজও দিয়ে দিলেন যার ভিত্তিতে তিনি (ইমাদুল মুলক) যাকে ইচ্ছা জায়গীর দিতে পারতেন। এইভাবে বাহাদুর শাহের পূর্ণ প্রতিনিধিরূপে ইমাদুল মুলক কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।[২] গুজরাতী জনসাধারণ যেরকম নিষ্ঠার সাথে রাজস্ব আদায়ের জন্য বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানায় এমন উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। এ থেকে জনগণের সততা, বাহাদুর শাহের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং মোগলদের প্রতি তাদের অপ্রিয় মনোভাবের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে যায়। বাহাদুর শাহকে যারা আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিল হিঁদু, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহাদুর শাহ হিঁদু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছিলেন।

ইমাদুল মুলকের উন্নতি এতটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল যে, আহমদাবাদ পৌছাতে পৌছাতেই তাঁর সৈন্য সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে গেল। পথে পথে রাজস্ব উসুল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করতে করতেই তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। আহমদাবাদে জুনাগড়ের হাকিম মুজাহিদ খাঁ ১০,০০০ অশ্বারোহী সহ তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন।[৩] যে সময়ে তিনি বেতওয়া পৌছালেন সে সময়ে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ৫০,০০০ এ গিয়ে পৌছাল।[৪] বাহাদুর শাহও পর্তুগীজদের কাছ থেকে ৫০০ ইউরোপীয় সৈন্য নিয়ে ইমাদুল মুলকের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।[৫]

AMARBOI.COM

ইমাদুল মুলকের পরাজয়

ইমাদুল মুলকের সৈন্য সংগঠন ও গতিবিধির ফলে মোগলদের স্বপ্নভঙ্গ হল। চম্পানীর দুর্গে তরদী বেগকে নিযুক্ত করে হুমায়ূন আহমদাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন, যা গুজরাতী জাতীয়তাবাদীদের কেন্দ্রভূমি রূপে গড়ে উঠছিল। নিজামউদ্দীন

১. কাম্মিস্‌সারিয়্যট, পৃ. ৩৬৬।

২. আবু তুরাব পৃ. ২৬-২৭।

৩. আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৮)। এর মতে, যে কারো কাছে দুটি ঘোড়া থাকলে তিনি তাকে এক লক্ষ গুজরাতী টাকা দিতেন। আবুল ফজলের এ কথা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। এ থেকে আমরা কেবল এই অনুনমান করতে পারি যে, ইমাদুল মুলক পানির মতো খরচ করেন।

৪. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত, ১, পৃ. ৫৭-৫৮ এর মতে, তাঁর সৈন্য সংখ্যা ৩০,০০০ ও আবু তুরাবের মতে (পৃ. ২৭) ৫০,০০০ হয়ে গেল। আবুল ফজল লিখেছেন, তাঁর বাহিনীতে খুব কম সময়ের মধ্যে ৩০,০০০ অশ্বারোহী একত্রিত হয়ে গেল। পুনরায় তিনি লিখেছেন, মুজাহিদ খাঁ ১০,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে এসে মিলিত হলেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৮)। এরফলে, এ সংখ্যা অনেক বেশি বলে মনে হয়। নিজামউদ্দীনের মতে, ৫০,০০০ সৈন্য একত্রিত হল (তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৫৬) ফিরিশতা (ব্রিগস, ২, পৃ. ৮০) এর সমর্থন করেছেন।

৫. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ লিখেছেন, চম্পানীর ত্যাগের পূর্বে তিনি গুজরাত লুণ্ঠন থেকে প্রাপ্ত ধনসম্পদ সৈনিকদের মধ্যে পুনরায় বণ্টন করে দিলেন।[১] মহেন্দ্রী নদীর তটে পৌছে হুমায়ূন সেখানে অবস্থান নিলেন। ইমাদুল মুলক তো প্রস্তুত ছিলেনই, তিনি যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। প্রথম সংঘর্ষটি হল আসকারির নেতৃত্বাধীন অগ্রগামী মোগল বাহিনীর সাথে নাদিয়াদ নামক প্রান্তরে ও মাহমুদাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে।[২] মোগল সৈন্যদের অগ্রবর্তী দল পরাজিত হল এবং নিকটবর্তী খুনহড় বৃক্ষরাজির আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করল।[৩] গুজরাতী সৈন্যরা লুটতরাজে নেমে পড়ল। ইতিমধ্যে মির্জা ইয়াদগার নাসির, মীর হিন্দু বেগ ও কাসিম হুসেন খাঁ সসৈন্যে সেখানে এসে পৌছালেন। ভীষণ যুদ্ধ হল। হুমায়ূনও সসৈন্যে এসে পৌছালেন। গুজরাতী সৈন্যরা পরাজিত হল এবং তাদের ২,০০০ সৈন্য মারা পড়ল।[৪] এই বিজয়ের ফলে আহমাদাবাদ ও নেহরওয়াল (পাটন) মোগলদের অধিকারে এসে গেল। তাঁরা এও অনুভব করলেন যে, গুজরাতী জনসাধারণ তাদের বিরোধী এবং গুজরাত অধিকার করে রাখাটা তাদের জন্য সহজ নয়। এই পরাজয় গুজরাতীদের কোমর ভেঙে দিয়ে গেল। এত শীঘ্র পরাজয়ের আশঙ্কা তাদের ছিল না।

---

১. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ, ৫৭।

২. এই যুদ্ধ মাহমুদাবাদ ও নারিয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়। ড. ব্যানার্জি একে মাহমুদাবাদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন (হুমায়ূন, পৃ. ১৫২ ও পাদটীকা ২)। তিনি লিখেছেন, ফিরিশতা এই নাম দিয়েছেন। ফিরিশতা এই যুদ্ধ মাহমুদাবাদের কাছে সংঘটিত হওয়ার কথা লিখেছেন, (ফিরিশতা পৃ. ২১৫ ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৩) মাহমুদাবাদ নয়। আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৩) একে নারিয়াদ প্রান্তর ও মাহমুদাবাদের মধ্যবর্তী স্থান বলেছেন। (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫৭)।

৩. এই যুদ্ধের ঘটনার বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। (আবুল ফজল, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪০) এর মতে, আসকারির পরাজয়ের সূচনাতেই ইয়াদগার নাসির মির্জা প্রমুখ পৌছে গেলেন। ফিরিশতা (ব্রিগস ২, পৃ. ৮০) এর মতে, ইমাদুল মুলক আসকারির দ্বারা পরাজিত হন। নিজামউদ্দীন আহমদের পিতা ঐ সময়ে আসকারির উজির ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার দেয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মোগল সৈন্যদের অগ্রগামী দল আসকারির নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। ইমাদুল মুলকের বাহিনী পরাজিত হয়। আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত ছিল। ঐ সময়ে গুজরাতী সৈন্যরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। আসকারি তাঁর সৈন্যদের সুব্যবস্থিত করতে না পেরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেন। গুজরাতীরা লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আসকারি ঝোপঝাড় থেকে বাইরে এলেন। গুজরাতীরা পরাজিত হল। (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫৭-৫৮) আবু তুরাব (তারীখে গুজরাত পৃ. ২৭-২৮)-এর মতে, আসকারি যুদ্ধ করতে না পেরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। ইমাদুল মুলকের সৈন্যরা লুটপাটে নেমে পড়ল। এই সময়ে কাসিম হুসেন খাঁ ও হিন্দু বেগের নেতৃত্বে হুমায়ূনের সৈন্যরা এসে পড়ল। আসকারি মির্জাও তাঁর সৈন্যদের সংগঠিত করে নিয়ে এলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল, যার ফলে, গুজরাতীরা পরাজিত হল।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪০ ; তবকাতে আকবরী, দে, ১, পৃ. ৫৭-৫৮। আকবরনামার মতে, নিহত গুজরাতী সৈনিকদের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে ছিল। নিজামউদ্দীনের মতে ২,০০০। দেখুন, রাস, অ্যারাবিক হিস্ট্রি ১, পৃ. ২৪৯ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ৭৩-৭৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন সসৈন্যে কাঁকরিয়া তাল নামক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন যা আহমাদাবাদ থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ছিল। সবরমতী নদী পার হয়ে তিনি সেরখীজ বনওয়ার (আহমদাবাদের পাঁচ মাইল দক্ষিণে)-এর প্রধান স্থানগুলো দেখতে লাগলেন। আশঙ্কা করছিলেন বিজয়ী সৈন্যরা আহমদাবাদ প্রবেশ করলে লুটপাট চালাবে। এই কারণে হুমায়ূন মির্জা আসকারি ও তার লোকেদের ছাড়া কাউকে আহমদাবাদের ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেন না।[১] হুমায়ূন এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন।

গুজরাতের শাসন ব্যবস্থা

গুজরাত বিজয়ের পর সেখানকার শাসন সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিল। আমীর হিন্দু বেগ ও অন্য অভিজ্ঞ পরামর্শদাতারা হুমায়ূনকে পরামর্শ দিলেন যে, বাহাদুর শাহকে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে গুজরাতের শাসক হিসেবে নিয়োজিত করা হোক। বাহাদুর শাহ এ সময়ে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদার ব্যবহার তাদের চিরকালের জন্য বন্ধু করে নিত এবং শেরশাহের সাথে সংঘর্ষে তারা এক শক্তিশালী সহযোগী বনে যেত। এই দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু বেগ হুমায়ূনের চেয়ে এই পরিস্থিতি অনেক বেশি অধ্যয়ন করেছিলেন।

হুমায়ূন এ পরামর্শ স্বীকার করলেন না। তিনি গুজরাতকে মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।[২] আসকারিকে গুজরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল এবং তাকে আহমদাবাদকে তাঁর শাসনকেন্দ্র বানানোর আদেশ দেওয়া হল। তাঁর সহায়তার জন্য হিন্দু বেগকে ৫,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল, যে স্থানে যখনই সৈন্যের প্রয়োজন শাসনকর্তার পরামর্শ মোতাবেক সেখানেই সৈন্য পাঠাতে হবে।[৩]

গুজরাত রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভাজিত করে দেওয়া হল এবং প্রত্যেক ভাগের শাসনভার এক একজন আমীরের উপর অর্পণ করা হল। এইভাবে ইয়াদগার নাসিরকে পাটন ; কাসিম হুসেন সুলতানকে ভরৌচ, নওসারি ও সুরাত ; দোস্ত ইশাক বেগ আকাকে কম্বে এবং বরোদা ; মীর বুচকা বাহাদুরকে মাহমুদাবাদ ;

---

১. আকরনামা, ১, পৃ. ১৪১।

২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৭-৮। জওহর লিখেছেন, হিন্দু বেগ ও অন্যান্য আমীরদের মত শুনে হুমায়ূন খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি বললেন, "যে রাজ্য আমরা অস্ত্রবলে জয় করেছি তা নষ্ট করা উচিত নয়। এই রাজ্য সুব্যবস্থিত করে এর শাসনব্যবস্থা দিল্লির অধীনে করা উচিত।"

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তরদী বেগকে চম্পানীরে নিযুক্ত করা হল।[১] এঁরা সকলেই শাসনকর্তার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন।

হুমায়ূন গুজরাতের শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কয়েকজন প্রধান আমীর নিযুক্ত করা ছাড়া তিনি আর কোনো গঠনমূলক কাজ করেন নি। গুজরাতে কোনো উর্বরভূমি বের করা হল না যা থেকে স্থায়ী আমদানি আসতে পারত। আসকারি ও তাঁর অধীনস্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশের শাসকদের পারস্পরিক সম্বন্ধও স্পষ্ট ছিল না। এইভাবে বিজিত অংশগুলোকে অধীনস্ত রাখার জন্য কিছু ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা ব্যতিরেকে তাঁর শাসনব্যবস্থার মান শূন্য বলে প্রতীত হয়।

গুজরাতের শাসনব্যবস্থার পর বাহাদুর শাহকে চিরকালের মতো পরাজিত করার মানসে হুমায়ূন দিউ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিনি আহমদাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত ধন্দুকা নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু এ সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ থেকে এমন কিছু ঘটনার খবর পেলেন যার ফলে তাঁকে এ চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে হল।

হুমায়ূনের অনুপস্থিতির ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের অবস্থা

হুমায়ূনের মালব ও গুজরাতে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরিণামস্বরূপ তাঁর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ঢিলেমি এসে গেল। কয়েক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং তাঁর কর্মচারীদের পক্ষে সেখানে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ল। মুহম্মদ সুলতান মির্জা তাঁর দুই পুত্রের সহায়তায় মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি কনৌজ থেকে জৌনপুর পর্যন্ত বিশাল এলাকার উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।[২] আগ্রার নিকট এবং দোয়াবেও এর প্রতিক্রিয়া হল এবং এখান থেকেও বিদ্রোহের খবর পাওয়া গেল। শের খাঁর গতিবিধিও সন্তোষজনক ছিল না। মালবের দুই আফগান আমীর সিকান্দার খাঁ ও মল্লু খাঁ নর্মদা নদীর নিকটবর্তী ভূ-ভাগে বিদ্রোহ করে বসলেন

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪১, সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত নিযুক্তিতে মতদ্বৈধতা আছে। অরেবিক হিস্ট্রি (খণ্ড ১, পৃ. ২৫৮) অনুসারে, আহমদাবাদে মির্জা হিন্দোল, আসকারি ও হিন্দু বেগ ; নেহরওয়ালা পাটনে ইয়াদগার নাসির মির্জা ; ভরৌচ, সুরাত এবং নওসারিতে কাসিম হুসেন খাঁকে এবং চম্পানীরে তরদী বেগকে নিযুক্ত করা হল (বেলে গুজরাত, পৃ. ৩৯২-৯৩)। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, আহমাদাবাদে মির্জা আসকারিকে, নেহরওয়ালা পাটনে মির্জা ইয়াদগার নাসিরকে, ভরৌচ হিন্দু বেগকে, চম্পানীর তরদী বেগকে এবং বরোদা কাসেম হুসেন খাঁকে দেওয়া হল। (তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ৫৮)। আবুল ফজলের বর্ণনা অধিক প্রামাণ্য মতে হয় এবং তা-ই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। দেখুন, কাম্মিস্‌সারিয়েট, পৃ. ৩৬৮।

২. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৮২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সেখানকার জায়গীরদার মেহতর জম্বুরকে পালিয়ে উজ্জৈনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল। এই প্রদেশে নিযুক্ত মোগল সৈনিকরাও পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিল। দরবেশ আলী কিতাবদার প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে দুর্গরক্ষার প্রয়াস চালালেন, কিন্তু তিনি দুর্গরক্ষা করার সময় নিহত হলেন ; যার ফলে অন্য রক্ষকরাও বড়ই নিরাশ হয়ে দুর্গ সমর্পণ করে দিলেন।[১]

গুজরাত থেকে মাণ্ডু

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি হুমায়ূনকে খুবই চিন্তিত করে তুলল। বাহাদুর শাহের পিছু ধাওয়া না করে তিনি এখন কেন্দ্রীয় স্থান থেকে নিজের সাম্রাজ্যের উপর দৃষ্টি রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কম্বে, বরোদা, সুরাত, নন্দাবর ও আসীরগড় হয়ে হুমায়ূন বুরহানপুর পৌঁছালেন। এখানে তিনি এক সপ্তাহ রইলেন।[২] তাঁর এই পরিস্থিতি দক্ষিণের রাজ্যগুলোকে সাবধান করে দিল। গুজরাত বিজয়ের ফলে তারা এই ভেবে আশঙ্কিত হল যে, হুমায়ূন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রসার দাক্ষিণাত্যেও ঘটাতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বুরহান নিজাম শাহ, দামাদ শাহ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শাসকরাও আত্মসমর্পণপত্র লিখে তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিলেন।[৩] হুমায়ূন তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে দেখে সম্ভবত আশ্চর্য হলেন কিন্তু তিনি যুগপৎ আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করলেন, কেননা, তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের সংবাদ সন্তোষজনক ও আশাব্যঞ্জক ছিল না। এখান থেকে হুমায়ূন মাণ্ডু চলে গেলেন। এই স্থানটি তাঁর এতই ভাল লেগে গেল যে, তিনি এখানে কয়েক মাস রয়ে গেলেন এবং একে তাঁর সাম্রাজ্যের অস্থায়ী কেন্দ্র বানিয়ে নিলেন।[৫]

এখান থেকে তিনি আগ্রা ও মির্জাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারতেন। বাহাদুর শাহ দিউতে ছিলেন। মালবের বিদ্রোহীরা পালিয়ে গেল। রণথম্ভোর, চিতোর ও আজমীর বাহাদুর শাহের অধীনে ছিল। সুরাত ছিল রুমী খাঁ সফরের অধীন। কাঠিয়াবাড়ের লোকেরা তখনো বাহাদুর শাহকে নিজেদের প্রভু বলে জ্ঞান করত। বাহাদুর শাহ, শের খাঁকে মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করছিলেন। এমন কঠিন সমস্যার উপর দৃষ্টি রাখার জন্য মাণ্ডু হুমায়ূনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে প্রতীত হল।

ঐ সময়ে ঐতিহাসিক খন্দমীর ইন্তিকাল করলেন। তাঁর মৃতদেহ দিল্লি নিয়ে গিয়ে শায়খ হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া এবং আমীর খসরুর মাজারের সমীপে দাফন করা হল।[৫]

---

১. আকবরনামা, ২, পৃ. ১৪১-১৪২।
২. ঐ পৃ. ১৪২, তবকাতে আকবরী, দে, ২. পৃ. ১৪।
৩. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৮০-৮১।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪২।
৫. ফিরিশতা, ব্রিগস ২, পৃ. ৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুজরাতে মুক্তি আন্দোলন

হুমায়ূনের গুজরাত ত্যাগের পর তিন মাস পর্যন্ত সেখানে শান্তি বজায় রইল। সেই সাথে মালব পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থারও অনেক উন্নতি হল। সিকান্দার খাঁ সতওয়াস ও মল্লু খাঁ উজ্জৈন ও হিন্দিয়া ত্যাগ করে চলে গেলেন, বুরহানুল মুলক বামিয়ানীকে রণথম্ভোর থেকে বিতাড়িত করা হল এবং দরিয়া খাঁ ও মুহাফিজ খাঁকে রায়সীন থেকে হটিয়ে দেওয়া হল। মির্জা হিন্দাল, মির্জাদের পরাজিত করে তাদের জৌনপুরের দিকে তাড়িয়ে দিলেন। শের খাঁর উন্নতি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই তিনমাসে মোগলরা গুজরাতে তাঁদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা কোন গঠনমূলক কাজ করলেন না যার ফলে গুজরাতের বিভিন্ন অংশ থেকে বিদ্রোহের খবর আসতে লাগল। যদি আসকারি সুযোগ্য শাসনকর্তা রূপে নিজেকে তুলে ধরতে পারতেন তাহলে মোগল আমীরদের সাথে নিয়ে তিনি গুজরাতে এক শক্তিশালী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এবং মোগল সাম্রাজ্যও রক্ষা পেত। দুর্ভাগ্যবশত, আসকারি তাঁর অমূল্য সময় দাওয়াত-নিমন্ত্রণের মধ্যে বরবাদ করলেন আর সেই সাথে আমীররাও তাঁর অনুকরণ করলেন। গুজরাতের মোগল আমীরদের আসকারির উপর কোনো বিশ্বাস ছিল না এবং তাদের মধ্যে একতাও ছিল না। এর পরিণাম স্বরূপ তাঁরা গুজরাতের বিদ্রোহ দমন করতে অপারগ হলেন।

গুজরাতে মোগলদের আচরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা বিদেশী এবং গুজরাতীদের হৃদয়েও তাঁদের জন্য কোনো মায়া মমতা নেই। মাণ্ডু ও চম্পানীরের দুর্গগুলোতে মোগলরা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল গুজরাতের জনগণ তখনো তা ভুলতে পারেনি। এ ছাড়া বাহাদুর শাহ্ গুজরাতের জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। পরাজয়ের পর মোগলদের দুর্ব্যবহারের ফলে জনগণের হৃদয়ে বাহাদুর শাহের প্রতি ভালবাসার আগুন আরো বেশি করে জ্বলে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে গুজরাতের জনসাধারণ বাহাদুর শাহের সাথেই ছিল। স্বয়ং বাহাদুর শাহ গুজরাতের নিকটবর্তী দিউ দ্বীপে অবস্থান করছিলেন। সুরাত দুর্গ তাঁর অধিকারে ছিল এবং তাঁর এক নৌবহরও ছিল যা নিকট সমুদ্রে চক্কর লাগিয়ে ফিরত। এইভাবে বাহাদুর শাহ যে কোনো সময়ে গুজরাত আক্রমণ করতে পারতেন এবং মোগলদের প্রতি অসন্তুষ্ট জনতার পক্ষে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

মোগল বিরোধী প্রথম বিদ্রোহ হল নওসারিতে। সুলতান বাহাদুর শাহের এক আমীর নূরউদ্দীন খাঁনে জহাঁ সিরাজি তাঁকে ছেড়ে হুমায়ূনের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। হুমায়ূন তাঁকে সুরাতের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এঁর পদ হিন্দু বেগের অধীনে ছিল। তিনি তাঁর নতুন প্রভুকে ত্যাগ করে পুনরায় বাহাদুর শাহের পক্ষাবলম্বন করলেন। তিনি আবদুল্লাহ খাঁ উজবেকের উপর আক্রমণ চালিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে পরাস্ত করে দিলেন[১] এবং নওসারি অধিকার করে নিলেন। আবদুল্লাহ খাঁ এখান থেকে পালিয়ে ভরৌচ চলে গেলেন। বিদ্রোহীরা রুমী খাঁ সফরের[২] সহযোগিতায় সুরাতও অধিকার করে নিল। খাঁনে জহাঁ স্থল পথে এবং রুমী খাঁ সমুদ্রপথে একযোগে ভরৌচ আক্রমণ করলেন। এরফলে, কাসিম হুসেন খাঁ[৩] পড়ি-মরি করে পালিয়ে চম্পানীর গিয়ে পৌছালেন। ওখান থেকে পুনরায় পালিয়ে তিনি আহমদাবাদ চলে গেলেন। এক গুজরাতী আমীর সৈয়দ ইসহাক, বাহাদুর শাহ যাঁকে শিতাব খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন, কম্বে অধিকার করে নিলেন। মালিক সৈয়দ আহমদ লাদ, দোস্ত ইশাক বেগ আকাকে বড়োদা থেকে বিতাড়িত করে তা অধিকার করে নিলেন।[৪]

উত্তর গুজরাতে মোগল বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। আসকারি পরামর্শের জন্য ইয়াদগার নাসির মির্জাকে পাটনে ডেকে পাঠালেন। আবু তুরাব তারীখে গুজরাত এ লিখেছেন, আসকারি তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, গুজরাতীরা পাটনের নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌছেছে, অতএব, তাঁর উচিত হল আহমদাবাদের দিকে রওনা হওয়া, যাতে সবাই মিলে যুদ্ধ করা যায়। মির্জা নাসির পাটন ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আসকারি লিখেছিলেন যে, একথা অমান্য করলে তাকে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হবে। বাধ্য হয়ে ইয়াদগার নাসিরকে আহমদাবাদ যেতে হল।[৫]

মূর্খতাবশত, তিনি সৈন্যদেরও সাথে নিয়ে গেলেন। সুলতান বাহাদুরের দুই আমীর দরিয়া খাঁ ও মুহাফিজ, সুলতানের সাথে সাক্ষাতের জন্য দিউ যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পাটনকে অরক্ষিত দেখে তা অধিকার করে নিলেন।[৬] গুজরাতীদের বিদ্রোহ ও মোগলদের পলায়নের পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌছে গেল যে, মোগলদের কাছে গুজরাত ও মালবের তিনটি প্রধান স্থান (আহমাদাবাদ, চম্পানীর ও মাণ্ডু) মাত্র রয়ে গেল।

AMARBOI.COM

মোগলদের অবস্থা

আসকারি তাঁর স্বভাব, ব্যবহার ও যোগ্যতার বলে না মোগল আমীরদের প্রসন্ন করতে পারলেন আর না গুজরাতী জনতাকে। তিনি তাঁর শাসনকর্তারা পদকে

১. আবু তুরাব, পৃ. ২৯, আকবরনামা, ১ পৃ. ১৪২-৪৩ ; তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ৫৮।
২. এই রুমি খাঁ সফর ছিলেন সুরাত দুর্গের নির্মাতা এবং তোপচি রুমী খার থেকে ভিন্ন।
৩. কাসিম হুসেন সুলতান, সুলতান হুসেন বাইকরার বংশধর ছিলেন এবং হুমায়ূনের আত্মীয় ছিলেন। খানুয়ায় যুদ্ধে তিনি প্রধান অংশের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে বাবুর তাঁকে বদায়ূনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। (ব্যানার্জি, হুমায়ূন ১, প. ১২৯)।
৪. আবু তুরাব, পৃ. ২১ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫৮-৫৯ ; আকবরনামা, পৃ, ১৪৩।
৫. আবু তুরাব, পৃ, ২৯।
৬. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিক গুরুত্ব দিতে চাচ্ছিলেন এবং গুজরাতের সমস্ত আমীরকে তিনি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারী বলে মনে করতেন। এর বিপরীতে মোগল আমীররা তাঁকে তাঁদের মতোই একজন আমীর বলে মনে করতেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা হুমায়ূনের অধিক বিশ্বস্ত ছিলেন তাঁরা আসকারি থেকে সাবধান থাকতেন এবং প্রধান আদেশগুলো তাঁরা সরাসরি হুমায়ূনের কাছ থেকে পেতে চাইতেন। এইভাবে মোগল আমীরদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল না এবং আসকারিও তাঁদের মধ্যে এই ভাব উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হলেন।

গুজরাতী মুক্তি আন্দোলনের প্রসার সমস্ত মোগল সৈনিককে সতর্ক করে দিল। আসকারি ও হিন্দু বেগ মাণ্ডুতে হুমায়ূনের কাছে নিরন্তর খবর পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও নিশ্চিত আদেশ পেতে চাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূন তাঁদের কথার কোনো জবাব দিলেন না। এরফলে, তাঁরা খুব নিরাশ হলেন। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু বেগ আসকারিকে নিজের নামে খুতবা পড়িয়ে ও মুদ্রার প্রচলন করে গুজরাতের স্বাধীন শাসক বনে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন।[১] আসকারি প্রথমেই তা অস্বীকার করলেন, কিন্তু এ যে তাঁর মনের কথা ছিল না একথা আসকারির একটি দাওয়াতের ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

আসকারির দাওয়াত

AMARBOI.COM

একদিন সন্ধ্যায় আসকারি যখন তাঁর মিত্রদের সাথে বসে শরাব পান করছিলেন তখন তিনি নেশার ঘোরে বলে ফেললেন, তিনি আল্লাহর প্রতিরূপ। গজনফর, যিনি সম্পর্কে তাঁর দুধ ভাই ছিলেন, রসিকতা করে বললেন, "হ্যাঁ কিন্তু মদের নেশায়।" একথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলেই হেসে ফেললেন। আসকারি কিছুটা দূরে থাকার ফলে এই রসিকতার কিছুই শুনতে পাননি। একথা যখন তাঁকে বলা হল তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং গজনফরকে বন্দি করে বন্দিগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। গজনফর সেখান থেকে ৩০০ সাথী নিয়ে পালিয়ে বাহাদুর শাহের

১. ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, ১ পৃ. ১৬১-৬৩) হিন্দু বেগের এই পরামর্শকে হঠকারি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই কারণেই গজনফরকে পরে বন্দি করা হয় এবং তরদী বেগের মনে সন্দেহ জাগে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন পৃ. ৮৫) এর যুক্তি হল "Hindu Beg a blunt Soldier that he was, decided that a do nothing emperor was no master for him." ড. ত্রিপাঠী (রাইজ অ্যান্ড ফলর পৃ. ৮২-৮৩) যুক্তি হল, হিন্দু বেগ বুঝতেন যে, এই পরামর্শের ফলে, আমীর ও গুজরাতি জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাবে যে, আসকারিকে নিজেদের শাসক বলে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই তাদের রাজ্যের ঐক্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ফিরিশতা (ব্রিগস, ৪ পৃ. ৮২) স্পষ্ট লিখেছেন যে, হিন্দু বেগ এই পরামর্শ সৈন্যদের বিশ্বাস প্রাপ্তির জন্য দিয়েছিলেন (ফিরিশতা, ব্রিগস ৪ পৃ. ৮১)। বদায়ূনী লিখেছেন যে, আসকারি হিন্দু বেগের সাথে একত্রে খুতবা পড়াতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৫৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।[১] তিনি মোগলদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে তাঁকে তাদের উপর আক্রমণ চালনার মন্ত্রণা দিলেন।[২] গজনফরের পালানোর পরিণামস্বরূপ অন্য মোগল আমীররাও আসকারিকে ছেড়ে বাহাদুর শাহের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

বাহাদুর শাহের সাথে সংঘর্ষ

হুমায়ূন মাণ্ডু থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বাহাদুর শাহ দিউতে পড়ে রইলেন। সেখান থেকে গুজরাতের উপর দৃষ্টি রেখে তা পুনরুদ্ধার করার সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। গুজরাতের ঘটনাবলীর খবর তিনি নিরন্তর পেয়ে চলেছিলেন। গুজরাতের মুক্তি আন্দোলন এবং কয়েকটি প্রধান স্থান তাঁর নামে অধিকৃত হয়ে যাওয়ার পর গজনফর কর্তৃক মোগলদের শোচনীয় অবস্থার খবর অবগত হওয়ার তাঁর মোগলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হল। বাহাদুর শাহ দিউ থেকে বেরিয়ে সরখেজ-এর নিকট তাঁর শিবির স্থাপন করলেন।

আহমাদাবাদে মোগলরা কিছুদিন রইলেন কিন্তু পরিস্থিতি বিগড়ে যাচ্ছিল। মোগল সৈন্যদের সংখ্যা গুজরাতী সৈন্যদের চেয়ে অনেক কম। ২ : ৫ (অনুপাতে) ছিল। এ ব্যতিরেকে গুজরাতের জনসাধারণের অসহযোগ ও মোগল আমীরদের পারস্পরিক মতভেদ অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। প্রথমে আসকারির ইচ্ছা ছিল গিয়াসপুরে যুদ্ধে করা কিন্তু ইমাদুল মুলকের সামরিক শক্তি বেড়ে চলেছিল। আহমাদাবাদ সুরক্ষিত ছিল না। সেখান থেকে যুদ্ধ করাও সঙ্গত ছিল না। এই কারণে আসকারি, হিন্দু বেগ প্রমুখ তাঁদের পূর্ণশক্তি চম্পানীরে কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরফলে, সংঘবদ্ধভাবে গুজরাতী সেনাদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল এবং পরাজয় হলেও মোগল বাহিনী পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হত না। বিজয়ী হওয়ার পর আহমাদাবাদ পূর্ণরূপে অধিকৃত হতে পারত।[৩] আসকারি সসৈন্যে চম্পানীর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে আসাবল নামক স্থানে

---

১. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৫৯-৬০ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৮১-৮২। আবুল ফজল এর বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি ; বরং কেবল এতটাই লিখেছেন যে, পারস্পরিক অসহযোগ ও অদূরদর্শিতার কারণে গজনফর ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৩)।

২. আকবরনামা ১, পৃ. ১৪৩ ; তবকাতে আকবরী, দে ২, পৃ. ৫৯-৬০।

৩. ফিরিশতা (ব্রিগস, ৪, পৃ. ১৩০) লিখেছেন, গুজরাতের বিদ্রোহ এবং মোগল শাসনের ব্যর্থতা দেখে মোগল আমীররা মতবিনিময় সভার আয়োজন করলেন এবং বললেন "সম্রাট এখন মাণ্ডুতে অবস্থান করছেন। গুজরাত অধিকার রাখা আর শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার পর আমাদের এখানে থাকা অর্থহীন। শের খাঁ পূর্ব প্রান্তে বাংলায়, দিল্লি অধিকারের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছেন। এজন্য আমি মনে করি যে, চম্পানীর পৌঁছে সেখানকার রাজকোষ অধিকার করে নিয়ে আমাদের পক্ষে আবার চলে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহাদুর শাহ ও আসকারির সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য তিনদিন যাবত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে, আসকারির সৈন্যরা বিনা যুদ্ধে চম্পানীর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে গেল।[১] তাঁর এইভাবে পালিয়ে যেতে দেখে বাহাদুর শাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি মোগল সৈন্যদের ধাওয়া করলেন এবং তাদের পশ্চাদ্দিক থেকে, ইয়াদাগার নাসির যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যুদ্ধও হল এবং মোগলদের অনেক ক্ষতি হল। আসকারি এখান থেকে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চম্পানীর গিয়ে পৌঁছালেন।

চম্পানীরে তরদী বেগ তাঁর এবং তাঁর ঘোড়াদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। আসকারি তরদী বেগকে জানালেন অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর এবং তাঁর কাছে ধনের সাহায্য চাইলেন যাতে তিনি বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারেন। তরদী বেগ হুমায়ূনের সম্মতি ব্যতিরেকে আসকারিকে ধন সাহায্য দিতে রাজি হলেন না।[২] হুমায়ূন সে সময়ে চম্পানীরের অদূরে মাণ্ডুতে অবস্থান করছিলেন। তরদী বেগ, হুমায়ূনকে আসকারির কর্মকাণ্ডের খবর জানিয়ে দিলেন। সেই সাথে এই মতও প্রকাশ করলেন যে, আসকারির মনোভাব পবিত্র নয় এবং আগ্রার উপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। আসকারি তরদী বেগকে সর্বপ্রকার বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি হুমায়ূনের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো প্রকারের সাহায্য দিতে রাজি হলেন না। তরদী বেগের কাছ থেকে কোনো প্রকারের সাহায্যের আশা না দেখে আসকারি ষড়যন্ত্র রচনা করলেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রধান আমীরদের একটি গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হল যাতে তরদী বেগকেও ডাকা হল। বাস্তবিকই আসকারি তরদী বেগকে আপন অধিকারে রাখতে চাচ্ছিলেন। তরদী বেগের মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গে চলে গেলেন এবং আসকারি ও তাঁর সৈন্যদের দুর্গ থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। টালবাহানা করার জন্য তাদের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেওয়া হল।[৩] নিজের পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিণামে আসকারি আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

---

১. আকবরনামা ১, পৃ. ১৪৩ বেলে, পৃ. ৩৯৩ ; আবু তুরাব, পৃ. ৩০। "এই কারণে যে তিনি না হযরত জাহাঁবনীর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন আর না তাঁর মনোভাবও পবিত্র ছিল, অতএব, নিকৃষ্ট ও অন্ধকারময় ধ্যান-ধারণা ও অশুদ্ধ কল্পনার কারণে যুদ্ধ না করেই চম্পানীর অভিমুখে প্রস্থান করলেন আর নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্ম সংঘটিত হল।" (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৩)।

২. আকবরনামা ১, পৃ. ১৪৪।

৩. আবু তুরাব (তারীখে গুজরাত, পৃ. ৩১) লিখেছেন, তরদী বেগ আসকারির সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল, যিনি মির্জাদের ওখান থেকে আসছিলেন। তিনি তাঁর কানে কানে বললেন, "মির্জারা আপনাকে বন্দি করার পরিকল্পনা নিয়েছে।" তরদী বেগ আবু তুরাবের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন এবং তাঁকে খবর নেওয়ার জন্য পাঠালেন এবং যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আসকারির উদ্দেশ্য ভাল নয় তখন তিনি তাঁকে ওখান থেকে চলে যেতে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের আগ্রা প্রত্যাবর্তন

গুজরাতে বিদ্রোহের সময়ে হুমায়ূন মাণ্ডুতে অবস্থান করছিলেন। হুমায়ূন মালবে থাকতে আসকারির আগ্রা যাত্রার খবর পেলেন। এ খবর পেয়ে তাঁর মোহ ভঙ্গ হল এবং নিজের সৈন্যদের একত্রিত করে তিনিও আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন যাতে আসকারির আগেই তিনি সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন।

মোগলদের পলায়নের খবর পাওয়ামাত্রই বাহাদুর শাহ মহেন্দ্রী নদী পার হয়ে চম্পানীর অভিমুখে প্রস্থান করলেন। দুর্গরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করে যতটা সহায় সম্পদ নেওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে তিনি হুমায়ূনের পথ ধরলেন। তরদী বেগের পলায়নের খবর পাওয়ামাত্রই বাহাদুর শাহ দুর্গ অধিকার করে নিলেন। এইভাবে গুজরাট পুনরাধিকার হয়ে গেল।[১] যে মোগলরা চম্পানীর দুর্গে ছিল বাহাদুর শাহ তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়া এবং রাস্তা খরচ দিয়ে সেখান থেকে তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

তরদী বেগ মাণ্ডুতে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হলেন এবং সেখান থেকে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। আগ্রা মহাসড়কে চিতোরের কাছে আসকারি ও হুমায়ূনের মধ্যে সাক্ষাৎ হল এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে পুনরায় সুসম্পর্ক স্থাপিত হল, যাতে হেরেমের মহিলারাও সাহায্য করলেন। এইভাবে, মোগলদের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে দুই ভাই মোগল মহিলাদের সঙ্গে আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

হুমায়ূন আসকারিকে তো ক্ষমা করলেনই, সেই সাথে অন্য আমীরদেরও তিনি দণ্ড দিলেন না।[২] আগ্রায় ফিরে হুমায়ূন হিন্দু বেগকে জৌনপুরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন এবং কয়েক মাস পর তাঁকে আমীরুল উমরা উপাধি দিলেন। মির্জা নাসিরকে কালপির গভর্নর নিযুক্ত করা হল। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুই ভাইয়ের মধ্যেকার মতভেদ দূর হয়ে গিয়েছিল।

আসকারি হুমায়ূনের কাছে না গিয়ে আগ্রা অভিমুখে কেন রওনা হলেন ? আবুল ফজল ও কয়েকজন সমকালীন ঐতিহাসিকের মতে, আসকারি স্বাধীন হতে ও আগ্রা অধিকার করতে চাচ্ছিলেন।[৩] তাঁর মনে যে আশাই উদয় হোক না কেন, তিনি নিজের নামে খুতবাও পড়ান নি এবং নিজের নামে মুদ্রাও প্রচলন করেন নি, যেমনটি পরে হিন্দাল করেছিলেন। সম্ভবত, তিনি আগ্রায় রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নি।

---

১. অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত (খণ্ড, ১, পৃ. ২৬০) এর মতে, গুজরাতে হিজরি সনের হিসেবে মোগল অধিকার কায়েম থাকে ১৩ মাস ১৩ দিন। (২৫ এপ্রিল ১৫৩৫ থেকে ২৪ মে ১৫৩৬ খ্রি.) রামস, অরেবিক হিস্ট্রি, ১, পৃ. ২৬০।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৪।

৩. ঐ, আবু তুরাব, (পৃ. ৩১)-এর মতে আসকারির উদ্দেশ্য ছিল আগ্রা অধিকার করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরদী বেগের ব্যবহারের সমীক্ষা

তরদী বেগ, আসকারিকে কেন সাহায্য করেন নি ? তবকাতে আকবরীর লেখক নিজামউদ্দীন লিখেছেন, আসকারি ও তাঁর সাথীরা যখন চম্পানীর গিয়ে পৌঁছালেন তখন তরদী বেগ বিদ্রোহ শুরু করে দুর্গ বন্ধ করে দিয়ে বসে রইলেন এবং হুমায়ূনকে খবর পাঠালেন যে, আসকারি বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১] এইভাবে তিনি দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তরদী বেগের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। ফিরিশতা লিখেছেন, আসকারি চম্পানীর ও গুজরাতের অন্যান্য অংশ অধিকার করে নিজের নামে খুতবা পড়াতে ও নিজের নামে মুদ্রা প্রচল করতে চাচ্ছিলেন।[২] বদায়ূনী লিখেছেন, আসকারি হিন্দু বেগের সহায়তায় নিজের নামে খুতবা পড়াতে চাচ্ছিলেন।[৩] তারীখে গুজরাতের লেখক আবু তুরাবের মতে, যে সময়ে আসকারি চম্পানীর পৌঁছান তখন তরদীবগ তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে ঘোড়া দেন ও প্রত্যেকের আদর-সৎকার করেন কিন্তু সম্রাটের আদেশ ব্যতীত রাজকীয় কোষ থেকে তিনি একটি পয়সাও দিতে রাজি হলেন না। এরপর, তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আসকারি তাঁকে বন্দি করতে চাচ্ছেন তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন।[৪] আবু তুরাব পরে লিখেছেন যে, মির্জাদের খুব শোচনীয় অবস্থা ছিল, অতএব, তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, আসকারি বাদশাহ হোন আর হিন্দু বেগ হোন তার উকিল। অন্য মির্জাদের নামেও বড় বড় জায়গীর রাখা হল কিন্তু তরদী বেগ তাঁকে মাণ্ডু যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং অবশেষে তিনি তাঁর সৈন্যদের উপর কামান দেগে দিলেন। আবদুল্লাহ তাঁর আরবি ভাষায় লেখা গুজরাতের ইতিহাস (জফরুল্‌ বালেহ ওয়া মুজফফর ওয়া আলেহ)-এ আবু তুরাবের মত সমর্থন করেছেন।[৫] আবুল ফজলের মতে, মির্জাদের উদ্দেশ্য ছিল চম্পানীর অধিকার করে আসকারিকে সুলতান বানানো।[৬]

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আসকারি গুজরাতী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চম্পানীর এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। তিনি তরদী বেগের কাছে ধন, সৈন্য ও সুরক্ষিত স্থান চাচ্ছিলেন, যাতে সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে

---

১. তবকাতে আকবরী, দে, ২, ৬১।

২. ফিরিশতা ফা, পৃ. ২১৬ ব্রিগস অনুবাদ (খণ্ড ২, পৃ. ৮২-৮৩) ভিন্ন।

৩. "মির্জা আসকারি যিনি আমাদাবাদে ছিলেন, বাদশাহর পূর্বদিকে প্রস্থান করে যাওয়ার পর আমীর হিন্দু বেগ বুচিনের সাথে মিলে নিজের নামে খুতবা পড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তিনি নিতান্ত সাধারণ যুদ্ধ করার পর চম্পানীর পৌঁছলেন। সেখানকার হাকিম তরদী বেগ দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছিলেন। আসকারি মির্জার বিদ্রোহ সম্পর্কিত পত্র দরবারে পাঠানো হল।" (বদায়ূনী, পৃ. ৪৭)।

৪. রিজভি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৪৬৭।

৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে পারেন। তিনি হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন। গুজরাত এত দ্রুত ও এত কম সময়ের মধ্যে জয় হয়েছিল যে, আসকারি আশা করেছিলেন যে, অতি সহজে তিনি তা শাসন করতে পারবেন। মোগলদের ধনেরও অভাব ছিল না। কিছুটা স্বভাব ও কিছুটা পরিস্থিতিবশত আসকারি বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন থাকেন। বিদ্রোহ তাঁর চোখ খুলে দিল এবং তিনি হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন।

আসকারি গুজরাতের গভর্নরও ছিলেন। তরদী বেগ ছিলেন তাঁর অধীন। এইভাবে, বিধানগত দৃষ্টিতে তাঁর পূর্ণ আশা ছিল যে, তরদী বেগ তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন। সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ার দরুন আসকারির অসন্তুষ্টি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আসকারি তরদী বেগকে বন্দি করে চম্পানীরে সঞ্চিত কোষ ও সৈন্যদের অধিকার করে নিতে চাচ্ছিলেন। এতেও তিনি সফল হলেন না। গুজরাতে কেবল চম্পানীর দুর্গই মোগলদের অধিকারে রয়ে গিয়েছিল। হুমায়ূনের বিরক্তি ও তরদী বেগের দুর্ব্যবহারের কারণে গুজরাতে থাকা অসম্ভব জেনে আসকারি আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

তরদী বেগ আসকারির সাথে দুর্ব্যবহার কেন করলেন ? তিনি ছিলেন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি। রাজ্যের গভর্নর ও সম্রাটের ভাইয়ের সাথে তিনি বিনা কারণে দুর্ব্যবহার করেন নি। এ নিশ্চিত যে, তরদী বেগ হুমায়ূনের প্রতি গভীরভাবে অনুগত ছিলেন। আসকারির গতিবিধি সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, তাঁর মধ্যে স্বাধীন শাসক হওয়ার খাহেশ জেগেছে। এ কারণে আসকারির প্রত্যেকটি আচরণের প্রতি তিনি পূর্ণরূপে সতর্ক ও জাগরূক ছিলেন। প্রারম্ভে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, তিনি তাঁকে বন্দি করার ষড়যন্ত্র করছেন এবং আসকারি হুমায়ূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে দিলেন না।[১]

বিধানগত দৃষ্টিতে তরদী বেগের ব্যবহার ভুল ছিল। কিন্তু হুমায়ূনের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখলে তাঁকে দোষী বলে বিবেচনা করা যায় না।

আরেকটি প্রশ্ন বিবেচ্য, আসকারি যদি হুমায়ূনের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন তাহলে তাঁর মাণ্ডু যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে না গিয়ে তিনি আগ্রা গেলেন কেন ? এর দুটি কারণ থাকতে পারে : হয় তিনি লজ্জাবশত পালিয়ে আগ্রায় যেতে চাচ্ছিলেন যেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, নতুবা তিনি বিদ্রোহ করতে চাচ্ছিলেন। আসকারির মনে স্বাধীন হওয়ার কতটা সাহস ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কেননা, কিছুদিন পূর্বে হিন্দু বেগের পরামর্শ মতো, তিনি নিজেকে গুজরাতের শাসক বলে ঘোষণা করার সাহস পান নি। আগ্রা যাওয়ার সময় তাঁর গতি এতই মন্থর ছিল

১. ব্যানার্জি হুমায়ূন. ১, পৃ. ১৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, হুমায়ূন তাঁকে চিতোরে গিয়ে ধরে ফেলেন। বাস্তবিকই তাঁর যদি আগ্রা অধিকারেরই উদ্দেশ্য থাকত তাহলে তিনি হুমায়ূনের আগেই আগ্রায় পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।[১] তরদী বেগের অসহযোগিতার ফলে কোনো লাভ হয়নি। আসকারি তো গুজরাতে থেকে গেলেনই, তরদী বেগকেও চম্পানীর ছেড়ে চলে যেতে হল এবং এইভাবে গুজরাতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে গেল।

গুজরাত থেকে মোগলদের পলায়নের কারণ

মোগলরা যেভাবে অতি সহজে গুজরাত জয় করেছিলেন, ঠিক ঐভাবেই তাঁদের হাত থেকে তা বেরিয়ে গেল। এই দুষ্পরিণামের কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. হুমায়ূন গুজরাতে মাণ্ডু ও চম্পানীরের হত্যাকাণ্ড দ্বারা গুজরাতীদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মাণ্ডুতে সন্ধি নিশ্চিত করার পর তিনি তা ভঙ্গ করেছিলেন। এইভাবে গুজরাতীদের মনে মোগলদের উপর আর কোনো বিশ্বাস ছিল না, সেই সাথে মোগল-বিরোধী মনোভাবের জন্ম হল।

২. গুজরাত থেকে মাণ্ডু যাওয়ার আগে হুমায়ূন গুজরাতের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যান নি। অসংখ্য সমস্যা তিনি ঐভাবে রেখেই চলে গিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জীবিত ও স্বাধীন ছিলেন। সুরাত তখনো বাহাদুর শাহের আমীর রুমী খাঁ সফরের অধীনে ছিল। বাহাদুর শাহের নৌ-বহর তখনো সমুদ্রে চক্কর লাগিয়ে ফিরছিল, তিনি তাঁকে স্থায়ীভাবে পরাস্ত করার কোনো ব্যবস্থাই করে যান নি। কাঠিয়াবাড় তখনো বাহাদুর শাহের অধীনে ছিল এবং তাঁর অধিকাংশ আমীর স্বাধীন ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূন গুজরাতে কেবল বাহাদুর শাহকে উচ্ছেদ করতে এবং সামরিক শক্তির বলে তা অধিকার করার অধিক কোনো কাজ সাংগঠনিক দৃষ্টিতে করেন নি।

৩. কোনো বিদেশী ভূখণ্ড অধিকার করতে হলে সর্বপ্রথম সে দেশের জনগণকে অনুভব করাতে হয় যে, বিদেশী শাসন তাদের পূর্বের শাসনের অধিক উত্তম। মোগলদের জন্য সবচেয়ে বড় আবশ্যক ছিল গুজরাতের জনগণের মন জয় করে নেওয়া এবং এমন শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাতে তারা খুশি ও সন্তুষ্ট হয়। মোগলরা গুজরাতে কোনো সংগঠিত ও সুব্যবস্থিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টাই করেন নি, যার পরিণামে গুজরাতের অধিবাসীদের বাহাদুর শাহ ও তাঁর শাসনব্যবস্থার কথা নিরন্তর স্মরণে আসতে থাকে।

৪. আসকারি তাঁর দাওয়াত ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে নতুন পরিস্থিতিতে তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। শাসকের দৃষ্টিতে আসকারি ও বাহাদুর শাহের মধ্যে বাহাদুর শাহের স্থান ছিল অনেক উচ্চে। গুজরাতের অধিবাসীরা একজন অযোগ্য, বিদেশী ও বিলাসী শাসকের অধীনে কীভাবে থাকতে পারত?

---

১. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. মোগল দলপতিদের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য ছিল এবং তাঁদের মধ্যে সদ্‌ভাবনারও নিতান্ত অভাব ছিল। মোগলদের হিতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে তাঁরা অসমর্থ ছিলেন। হুমায়ূন গুজরাতে আসকারিকে নিযুক্তির সময়ে তাঁর সাথে অন্য আমীরদের সম্পর্ক নিশ্চিত করে দেন নি। এই কারণে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে আসকারিকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছু তো তাঁর সমর্থক হলেন কিন্তু কিছু আমীর হুমায়ূনের প্রতি সর্বক্ষণই তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে গেলেন। এইভাবে তাঁর গুজরাতের গভর্নরের গতিবিধির প্রতি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারী-কর্মকর্তারা সর্বদাই নজর রাখতেন। এই কারণে তরদী বেগ তাঁর বিরোধিতা করলেন এবং মোগলরা গুজরাতের বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে সমর্থ হলেন না।

৬. বাহাদুর শাহ জনপ্রিয় শাসক ছিলেন এবং গুজরাতীরা তাঁর জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। বাহাদুর শাহের সমর্থনে কৃত আন্দোলন গুজরাতের গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। যার মোকাবিলা করা মোটেই সহজ ছিল না।

৭. আহমাদাবাদের মোগল কেন্দ্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবস্থিত মোগল কর্মকর্তা ও স্থানগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হতে পারে নি, এর পরিণামে এ সমস্ত অংশ একের পর এক হাতছাড়া হয়ে গেল।

৮. হুমায়ূন মালবে মোগল শাসন স্থায়ীত্ব করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেন নি। এইভাবে, এই অঞ্চলটি যত সহজে হাতে এসেছিল তত সহজেই হাত থেকে বেরিয়ে গেল। হুমায়ূন মালবে কয়েক মাস অতিবাহিত করলেন তা সত্ত্বেও তিনি সেখানকার শাসনব্যবস্থার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখালেন না।

৯. হুমায়ূন এ বিষয়ে এতটা অমনোযোগিতা দেখালেন যে, চম্পানীর দুর্গে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন না। তরদী বেগ যতটা সম্ভব তা সাথে করে নিয়ে গেলেন। অবশিষ্টাংশ বাহাদুর শাহ পুনঃপ্রাপ্ত হলেন।[১] সম্পূর্ণ কোষ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে দিল্লি বা আগ্রায় পাঠিয়ে দেয়াটাই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল।

১০. এও প্রতীত হয় যে, মোগলদের গুপ্তচর বিভাগ সজাগ ও যোগ্য ছিল না। এই কারণে হুমায়ূন ও আসকারির পক্ষে গুজরাতের বিভিন্ন অঞ্চলের খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠার পরেই তাঁরা খবর পেলেন।

১১. আগ্রা প্রত্যাবর্তনের আগে বা পরেও বাহাদুর শাহ বিষয়ে তাঁর মতের কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাঁর সাথে সন্ধি করে তাঁকে তাঁদের পক্ষে টেনে নিলে সেটাই বরং হত মোগলদের জন্য সুবিধাজনক। গুজরাত থেকে মোগলরা এমনভাবে পালিয়ে এল যেন সেখানকার সাথে তাদের কোনো সম্বন্ধই ছিল না।

---

১. কাম্মিস্‌সায়িয়ট, পৃ. ৩৭০-৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. হুমায়ূন গুজরাতের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি কেন নিশ্চিন্ত বসে রইলেন ? তিনি গুজরাতের পরিস্থিতির উপর কেন মনোযোগী হলেন না ? গুজরাতে বিদ্রোহ ও মোগলদের পরাজয়ের খবর পাওয়া সত্ত্বেও তিনি গুজরাতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেন করলেন না ? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুবই কঠিন। হুমায়ূন কী আসকারিকে গুজরাতের শাসনকর্তা বানিয়ে অথবা একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন ? অথবা তিনি তাঁর অলসতা ও আফিমের নেশায় এতটাই চুর ছিলেন যে, তিনি এর প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারলেন না ? যদি একথা মেনেও নেওয়া যায় যে, গুজরাতে পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য তাঁর কাছে ছিল না, এজন্য তিনি সাহায্য পাঠাননি অথবা সামরিক সাহায্য চাওয়া হয়নি, তবুও একথা বলা কঠিন যে, এ সমস্ত বিদ্রোহের সময়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেন পরামর্শ দিলেন না ? তিনি এই বিরক্তিভাব কেন অবলম্বন করলেন ? স্পষ্ট যে, হুমায়ূনের অমনোযোগিতাই মোগলদের গুজরাত থেকে পলায়নের প্রধান কারণ বনে গেল।[১]

বাহাদুর শাহের মৃত্যু

গুজরাত পুনরাধিকার করার পর বাহাদুর শাহ তাঁর আমীরদের সাথে মন্দসৌরে রুমী খাঁর রায় মেনে না নেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন।[২] তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল তাঁর এই ভুলটাই। গুজরাত বিজয় তাঁর অপূর্ণ কাজকে পূর্ণ করার অবসর দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পরিস্থিতি ঠিকমতো সামলে ওঠার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল।

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর যে সময় বাহাদুর শাহ দিউতে ছিলেন তখন পর্তুগিজদের সাথে একটি সন্ধি করেন। এই সন্ধির দ্বারা পর্তুগিজ গভর্নর নূনি দে কুনহা জল-স্থল উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বাহাদুর শাহ এর প্রতিদানে দিউতে পর্তুগিজদের একটি দুর্গ-নির্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু দিউতে প্রাপ্ত রাজস্বের উপর পর্তুগিজ রাজার কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি এবং তা বাহাদুর শাহই লাভ করতে থাকেন। বাহাদুর শাহ বেসিন সম্পর্কিত প্রারম্ভিক শর্তাবলীকেও স্বীকৃতি দিয়ে দেন। উভয় দলই ধর্মান্তরকরণ না করার জন্য উভয়কেই প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩] এই সন্ধি বাহাদুর শাহের

---

১. "The reasons for the Mughal collapse may be found in the passive resistance of the send up reinforcements." (?????????? পৃ. ৩৬৯)
২. অরেবিক হিস্ট্রি, পৃ. ২৫৯-৬০ ; কাম্বিস্সারিয়ট, পৃ. ৩৭১।
৩. অরেবিক হিস্ট্রি, পৃ. ৩৯৪-৯৫ ; কাম্বিস্সারিয়ট, পৃ. ৩৬৩-৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদারতার চরম সীমা ছিল, কেননা, পর্তুগিজরা বিগত ২৫ বছর ধরে দিউ লাভের জন্য চেষ্টা করে আসছিল কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারে নি।[১]

মোগলদের পলায়ন ও বাহাদুর শাহের এত দ্রুত গুজরাত পুনরাধিকার করতে দেখে গুজরাতীরা আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা ভুলে যায় নি যে, বাহাদুর শাহের কঠোরতাই তার প্রসারের প্রধান সহায়। এদিকে বাহাদুর শাহের সাথে পর্তুগিজদের সম্পর্কও ভাল যাচ্ছিল না। বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের চাল বুঝতেন এবং তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতি তিনি সদা-জাগরুক ছিলেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পর তাঁর এই ভেবে খুব দুঃখ হল যে, কী কুক্ষণে তিনি পর্তুগিজদের দিউতে দুর্গ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন।

দিউতে দুর্গ নির্মাণের পর দুর্গের পর্তুগিজ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকল। বাহাদুর শাহ দুর্গ ও নগর প্রাচীরের মধ্যে একটি দেওয়াল দিয়ে পরস্পরকে পৃথক করে দিতে চাচ্ছিলেন। পর্তুগিজরা এজন্য প্রস্তুত ছিল না। শুধু তাই নয় ; পর্তুগিজরা দিউ বন্দর দিয়ে বাহাদুর শাহের জাহাজও যেতে দিত না। এই কঠিন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বাহাদুর শাহ চম্পানীর দুর্গ থেকে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দিউ এলেন। ১৫৩৬ এর ১৩ নভেম্বর রাত ৮টায় তিনি কোনো খবর না দিয়েই দিউ-এর দুর্গে গেলেন। পর্তুগিজরা সতর্ক ছিল। বাহাদুর শাহের সাথে কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন। সহজেই তাঁকে হত্যা করা যেত। কিন্তু পর্তুগিজ দুর্গপতির সাহসে কুলল না। এই ভুলের জন্য পর্তুগিজ গভর্নর দুর্গপতিকে ভর্ৎসনা করল। বাহাদুর শাহ রাতে ফিরে এলেন।[২] ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাহাদুর শাহ পর্তুগিজ গভর্নরকে সমুদ্রতটে একটি দাওয়াতের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি জানতে পেয়েছিলেন যে, বাহাদুর শাহ তাকে বন্দি করে তুরস্কের সুলতানের কাছে পাঠাতে চাচ্ছেন। এ ভয়ে অসুস্থতার ভান করে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে আপত্তি করলেন এবং তার সম্বন্ধী ম্যানুয়েল দ্য সসাকে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পাঠালেন। খবর পেয়ে বাহাদুর শাহ স্বয়ং নূনোকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫৩৭ খ্রি.)।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই কয়েকজন ব্যক্তিকে[৩] সাথে নিয়ে বাহাদুর শাহ নৌকায় রওনা হয়ে গেলেন। মিরাতে সিকান্দরীর বর্ণনা মতে, বাহাদুর শাহের কয়েকজন আমীর তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সেখানে না যাওয়ার জন্য বোঝালেন কিন্তু তিনি থামলেন না। নূনো এভাবে বাহাদুর শাহের পৌঁছানোর কথা আশাই করেন নি। তিনি তাঁর সাথে

---

১. এই সন্ধি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাটলেহি নামক এক পর্তুগিজ একটি ছোট ষোল ফুট লম্বা, নয় ফুট চওড়া এবং সাড়ে চার ফুট গভীর নৌকায় করে পর্তুগালের শাসককে এ খবর জানানোর জন্য অতি দ্রুত পালিয়ে পর্তুগালে চলে গেল। (কাম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩৭৩)।

২. কম্মিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩৭৪-৭৫।

৩. পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের মতে ১৩, ও মিরয়াতে সিকান্দরীয় মতে, ৫। বেলে গুজরাত, পৃ. ৩৯৫-৯৭ ; কাম্মিস্‌সারিয়ট. পৃ. ৩৭৬ ও ৩৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিত হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিলেন। বেশ কিছু আলামত দেখে বাহাদুর শাহের সন্দেহ হল তাদের মনোভাব ভাল নয়। নূনো সুস্থ ছিলেন এবং দাওয়াতে না আসাটা তার বাহানা মাত্র ছিল। বাহাদুর শাহ দ্রুত তাঁর নৌকায় এসে গেলেন তিনি নৌকা চালানোর আদেশ দিয়ে দিলেন। সেই সময়ে পর্তুগিজদের এক ঝাঁক নৌকা এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল। বাহাদুর শাহ তাঁর সাথীদের নিয়ে অত্যন্ত বাহাদুরির সাথে যুদ্ধ করলেন কিন্তু এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে পর্তুগিজদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। গত্যন্তর না দেখে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনে ফেলল এবং এক পর্তুগিজ নাবিক বল্লমের আঘাতে তাঁকে হত্যা করল এবং তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দিল, যা অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও আর পাওয়া গেল না।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে পর্তুগিজ এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্দেহ দু'পক্ষ থেকেই ছিল এবং সাধারণ বিষয়গুলোও এই দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল। বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সমুদ্রতট থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছিলেন। পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহাদুর শাহের প্রতি পর্তুগিজদের আশঙ্কা ছিল ভিত্তিহীন। বাহাদুর শাহের তাকে বন্দি করার ইচ্ছা থাকলে তিনি অস্ত্রহীন ও অরক্ষিত অবস্থায় পর্তুগিজ গভর্নরের সাথে কেন সাক্ষাৎ করতে গেলেন ? বাহাদুর শাহ পর্তুগিজ শিবিরে অরক্ষিতভাবে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে নৃশংসভাবে নিহত হন এতে কোনো সন্দেহ নেই।[১]

বাহাদুর শাহ গুজরাতে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, সেখাকার জনগণ তাঁর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করল না এবং কয়েক বছর ধরে গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের খবর আসতে থাকল।[২]

বাহাদুর শাহের চরিত্র ও তাঁর পরাজয়ের কারণ

ভারত ইতিহাসের প্রান্তীয় শাসকদের মধ্যে বাহাদুর শাহের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। যে সময়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময়ে গুজরাতে কঠিন অবস্থা বিরাজ

---

১. বাহাদুর শাহের মত্যুর জন্য দেখুন, ফিরিশতা, ব্রিগস, ৪, পৃ. ১৩২-৪১ ; বোম্বে গেজেটিয়র, খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৭-৫১ ; বেলে, পৃ. ২৯৪-২৯৭; আর্সকিন, ২, পৃ. ৯১-৯৫ ; হোয়াইটওয়ে, রাইজ অব পর্তুগিজ পাওয়ার, ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪৪-৫০ ; অরেবিক হিস্ট্রি, ১, পৃ. ২৬১-৬২ ; কাম্মিস্সারিয়ট, পৃ. ৩৮২-৮৩ ; বর্ড, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ২৬১ পাদটীকা।

২. আবুল ফজল লিখেছেন, তাঁর মৃত্যুর কথা লোকেরা বিশ্বাস করে নি এবং কিছু লোকের ধারণা তিনি প্রাণ বাঁচিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেন যাকে নিজামুল মুল্ক বাহাদুর শাহ বলে স্বীকার করেন এবং তিনি তাঁর সাথে চৌগান খেলেন। এইরকমই তারীখে গুজরাতের লেখক আবু তুরাবের উপর ভিত্তি করে আবুল ফজল লিখেছেন, বাহাদুর শাহের গুরু কুতুবউদ্দীন সিরাজীর বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি এমন সব বিষয়ে আলোচনা করেন যা বাহাদুর শাহ ছাড়া আর কেউ জানত না। (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিল। আপন যোগ্যতা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে সুস্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন এবং ভারতের সৈন্যদের মধ্যে তাঁর সৈন্যদের প্রথম শ্রেণীতে গণ্য করা হতে থাকে। সাত-আট বছরের মধ্যেই তিনি নিকটস্থ রাজ্যগুলোর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তার করে নিলেন। তিনি তাঁর শক্তি এতটাই বাড়িয়ে নেন যে, দিল্লির বাদশাহর বিরুদ্ধেও সম্মুখ সমরে উপস্থিত হয়ে যান। শুধু তাই নয়, তাঁর দরবার মোগল-সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদেরও একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমকালীন ঐতিহাসিকেরা তাঁর বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, জনপ্রিয়তা ও গতিশীলতার প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর দানশীলতার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁর দরবারের এতটাই ধন লাভ করতেন যে, তাঁর মন্ত্রীর নকল মুদ্রার প্রয়োগ করতে হত। গায়ক মঞ্জুও হুমায়ূনের দরবার থেকে ফিরে এলে বাহাদুর শাহ এতটা সন্তুষ্ট হন যে, তিনি বলেন যা কিছু খোয়া গিয়েছিল তিনি তাঁর সবই ফিরে পেয়েছেন, এখন আল্লাহর দরবারে চাওয়ার মতো তাঁর আর কিছু নেই।

বাহাদুর শাহের শাসনের প্রতি তাঁর হিঁদু প্রজারাও প্রসন্ন ছিলেন। গুজরাতে তাঁর পক্ষে গণ-আন্দোলনে হিঁদুরাও পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেছিল। রাজস্ব উসুল করার জন্য তাঁর কাছে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হিঁদুরাও ছিলেন। রাজা নরসিংহ দেবের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, চম্পানীর হাতছাড়া হয়ে গেছে, যদিও ইখতিয়ার খাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তিরাও তার রক্ষাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

বাহাদুর শাহের চরিত্রে কিছু দোষও ছিল। তিনি তাঁর শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত ক্রূর ছিলেন এবং নিজের ভাইদের হত্যা করে তিনি একটি কুকীর্তি স্থাপন করেন। তিনি অতিমাত্রায় মদও ধরেছিলেন এবং কথিত আছে যে, পর্তুগিজদের কাছে গমনকালেও মদের নেশায় চুর হয়ে ছিলেন। কখনো কখনো তিনি অবিমৃষ্যকারিতা এবং হঠকারিতাও করে ফেলতেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পর্তুগিজদের কাছে যাওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না।

এত সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও বাহাদুর শাহের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। যে সময়ে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২০। ১১ বছর রাজত্বের পর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর। এত অল্প বয়সে তিনি যে সাফল্য লাভ করেন সাধারণত যা সম্ভব হয় না। বাহাদুর শাহের মতো যোগ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতান, যাঁর সৈন্যরা সংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল, তারা মোগলদের কাছে এত দ্রুত কীভাবে পরাজিত হয়? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে আগেই হাত খুলে যুদ্ধ করেন নি। মন্দসৌর, চম্পানীর, মাণ্ডু সকল স্থান থেকেই পলায়ন করেন। তাঁর সাহস তখনই ফিরে এসেছিল যখন হুমায়ূন গুজরাত থেকে ফিরে যান এবং গুজরাতে গণ-আন্দোলনের সর্বগ্রাসী প্রভাব পড়েছিল। এতসব সত্ত্বেও তাঁর পলায়নের কারণ কী ছিল? তাঁর জীবন ও শাসন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে একথাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাহাদুর শাহ যেখানে রাজপুত, মালবের শাসক, পর্তুগিজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কখনোই হতোৎসাহিত হন নি সেখানে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর সাহস হয় নি। মনে হয়, পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, যেখানে তিনি দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধের সেই ভয়াবহতা তাঁর মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। এই কারণে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তিনি সাহস পাননি। তিনি নিজেই আফগান এবং মোগলদের যুদ্ধকে কাচ ও পাথরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছিলেন। সম্ভবত, এই ভীতিই তাঁকে মোগলদের থেকে তাড়িয়ে ফিরত। তাঁর পরাজয়ের এটাই ছিল প্রধান কারণ।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর গুজরাত

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর পর্তুগিজ গভর্নর দিউতে অবস্থিত বাহাদুর শাহের কোষ, তোপখানা ইত্যাদি অধিকার করে নেন। দিউ-এর জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, অনেক কষ্টে তা শান্ত করা গিয়েছিল। গুজরাতের জনগণ ও আমীরদের দুঃখ ও নিরাশার কোনো সীমা-পরিসীমা রইল না।

মুহম্মদ জামান মির্জার হুমায়ূন বিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। বাহাদুর শাহের মন্দসৌর থেকে পলায়নের পর মুহম্মদ জামান মির্জা সিন্ধুতে চলে যান, কিন্তু সেখানে কোনো সুবিধা করতে পারেন নি। সেখান থেকে তিনি লাহোরে যান। কামরান সে সময়ে কান্দাহার রক্ষার জন্য ইরানের শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, যার বর্ণনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। মুহম্মদ জামান সুযোগ গেলেন। তিনি প্রথমে লাহোর অধিকার করতে চাইলেন, কিন্তু সেখানকার আধিকারিকরা কামরানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকলেন।[১] মুহম্মদ জামান মির্জা লাহোর অবরোধ করলেন। এই সময়ে কামরান লাহোর ফিরে এলেন। এবার বাধ্য হয়ে মুহম্মদ জামান মির্জা এখান থেকে পালিয়ে দিল্লির আশপাশে গিয়ে চক্কর দিতে লাগলেন (১৫৩৬ খ্রি. বর্ষাঋতুতে)। মোগল সাম্রাজ্যে সাফল্যের কোনো আশা না দেখে কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় গুজরাতের দিকে চলে গেলেন।

বাহাদুর শাহের কোনো সন্তান ছিল না, যার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সমস্যা দেখা দিল। মুহম্মদ জামান মির্জা গুজরাতের এই কঠিন সমস্যা থেকে লাভবান হলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুতে তিনি দুঃখিত ও শোকার্ত হওয়ার অভিনয় করলেন এবং হেরেমের মহিলাদের সামনে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে পাগলের মতো কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁকে অনেক বোঝানোর পরেও শান্ত হলেন না। তিনি রাজমাতার কাছে প্রার্থনা করলেন যে, বাহাদুর শাহ তাঁকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন সেজন্য তিনি যেন তাঁকে আপন পুত্রের ন্যায় গণ্য করেন। তাঁকে

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১২৬-২৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝানো হল যে, গুজরাতে মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না সেজন্য তাঁর মন্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলা উচিত। তা সত্ত্বেও জামান মির্জা রাজমাতা ও হেরেমের মহিলাদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা লাভ করলেন এবং তার সহায়তায় তিনি বড় সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।[১] বাইরে তো তিনি বাহাদুর শাহের হত্যার জন্য পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলতেন এবং অন্যদিকে গোপনে তিনি তাদের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন। নিজের পক্ষে টানার জন্য তাদের তিনি ধন তো দিলেনই, এর অতিরিক্ত ২৭ মার্চ ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধি অনুসারে তিনি মঙ্গলোর, দমন ও সমুদ্র তটের প্রায় আড়াই ক্রোশ ভূমি তাদের দিয়ে দিলেন যেন তিনি গুজরাতের সুলতান। এর প্রতিদানে পর্তুগিজদের সহায়তায় দিউ-এর শাফা মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পড়ানো হল।[২]

ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহের আমীররা মুহম্মদ জামানের বিরোধী হয়ে গেলেন। বাহাদুর শাহ তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে, তাঁর আপন বোনের পুত্র খানদেশের মীরান শাহ এবং তারপর তাঁর মরহুম ভাই আবদুল লতিফের পুত্র মুহম্মদকে নিযুক্ত করেছিলেন। এর অতিরিক্ত মুহম্মদ জামান মির্জার প্রতি তাঁর মনে কোনো ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল না। তিনি মোগল সম্রাটের আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর অতীত কার্যাবলীর দরুন তিনি ছিলেন অবিশ্বস্ত ব্যক্তি। গুজরাতের মোগল-বিরোধী গণ-আন্দোলনের পর মোগল সম্রাটের আত্মীয়ের পক্ষে আর সেখানকার সিংহাসনে বসার আশা ছিল না। এছাড়া মুহম্মদ জামান মির্জা তাঁর বিলাস-ব্যসনের কারণে গুজরাতীদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গুজরাতের সিংহাসন অধিকার করার মারপ্যাঁচও তাঁকে তাদের আরো বিরোধী করে তোলে। ইমাদুল মুলক্ মালিকের নেতৃত্বে দিউয়ের নিকট উনা নামক স্থানে মুহম্মদ জামান মির্জা পরাজিত হলেন এবং তাঁর সৈন্যরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।[৩] গুজরাত থেকে পালিয়ে তিনি সিন্ধু ও সেখান থেকে উত্তর ভারতে চলে গেলেন।

AMARBOI.COM

বাহাদুর শাহের বোনের পুত্র মীরান মুহম্মদ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে বরাবর তাঁর সহযোগী হয়ে থাকেন এবং সুলতানের সব কটি প্রধান অভিযানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর আমীররা তাঁকে সিংহাসনে বসান কিন্তু তাঁর শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কয়েক সপ্তাহ পরেই বাহাদুর শাহের ভাই লতিফ খাঁরর পুত্র মুহম্মদ, তৃতীয় মাহমুদ নামে গুজরাতের সিংহাসনে বসেন। (১৫৩৮-১৫৫৪ খ্রি.)।

---

১. কাম্বিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩৮৭-৮৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৬ দ কাম্বিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩৮৮।

৩. বেলে, পৃ. ৪০১ ; কাম্বিস্‌সারিয়ট, পৃ. ৩৮৮। এই যুদ্ধে বাবুরের প্রধানমন্ত্রী মীর খলীফার পুত্র হিসামুদ্দীন মীরাক বড়ই বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি যুদ্ধ করে গুজরাতী সৈন্যদের প্রতিরোধ করেন, যার ফলে, মুহম্মদ জামানের পালিয়ে যেতে সুবিধা হয়ে গেল। (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৭৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের গুজরাত অভিযানের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য

গুজরাত অভিযানে হুমায়ূনের প্রায় দু'বছর সময় লেগে যায়। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যে সংঘঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে তিনটি হল প্রধান।

১. কান্দাহারে ইরানী আক্রমণ,
২. মির্জাদের বিদ্রোহ এবং
৩. শের খাঁরর উত্থান।

১. কান্দাহারে ইরানী আক্রমণ

হুমায়ূনের গুজরাত অভিযানের সময়ে ইরানে কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব মোগল সাম্রাজ্যের উপরেও পড়ে। ইরানের শাসক শাহ তাহমাস্পের মন্ত্রী শিমুল শাহকে হত্যা করে, তাঁর ভাই শাম মির্জাকে, যিনি হেরাতের গভর্নর ছিলেন, সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র রচনা করেন কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি। শাহের ভয়ে ইরান থেকে পালিয়ে তাঁরা কান্দাহার আক্রমণ করেন। কান্দাহারের দুর্গপতি খ্বাজা কলাঁ বড়ই বীরত্বের সাথে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করেন। খবর পেয়ে কামরানও কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। ইরানীরা পরাজিত হল (ফেব্রুয়ারি ১৫৩৫ খ্রি.)।[১] ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কান্দাহার পুনরাক্রমণ করলেন। খ্বাজা কলাঁ এবার দুর্গ রক্ষা করতে সমর্থ হলেন না। তিনি শহর খালি করে দিলেন এবং দীওয়ানখানাকে উত্তম ফরাশ ও মূল্যবান বস্তু দিয়ে সাজিয়ে[২] কান্দাহার বিজয়ের পর শাহ তাহামস্প কান্দাহারের শাসনভার বুদাগ স্বয়ং থাট্টা উছ্-এর পথ ধরে লাহোর পৌছালেন। কামরান তাঁর কাপুরুষতায় ক্ষুব্ধ হলেন এবং একমাস যাবত তাঁকে অভিবাদনের অনুমতি দিলেন না। নিজে প্রস্তুত হয়ে কয়েক মাস পর, মির্জা হায়দারকে লাহোরের শাসক নিযুক্ত করে কান্দাহার পুনরাক্রমণ করলেন।

AMARBOI.COM

---

১. আকবরনামা, , পৃ. ১৩৫ এর মতে, খ্বাজা কলাঁ আট মাস যাবত দুর্গ রক্ষা করেন।

২. আবুল ফজলের বর্ণনানুসারে খ্বাজা কলাঁ বাদশাহদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বস্তু, ভোজনসামগ্রী ইত্যাদি সাজালেন এবং দুর্গের চাবি শাহের কাছে পাঠিয়ে বলে পাঠালেন যে, দুর্গরক্ষার শক্তি-সামর্থ্য কোনটাই তাঁর নেই। সেই জন্য তিনি একটি ঘর মেহমানের জন্য সাজিয়ে রেখে চলে যাবেন। তিনি স্বয়ং শাহের সামনে উপস্থিত হলেন না, কেননা, এ প্রভুভক্তির বিরোধী কাজ ছিল। (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৫)। বদায়ূনীর মতে, দীওয়ানখানা খুব ভাল করে সাজিয়ে বন্ধ করে রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন। পরে তিনি লিখেছেন, শাহ তাহমাস্প তাঁর প্রশংসা করলেন এবং বললেন "কামরান মির্জার সেবক বড়ই উত্তম।" (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৪৭-৪৮)। নিজামউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, তিনি একটি, চীনীখানা, যা খুব ভাল করে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। উত্তম ফরাশ ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে চলে গেলেন। মি. দে 'চীনীখানা' বলতে চীনা মাটির তৈরি বলে অভিহিত করেছেন। (তবকাতে আকবরী, দে. ২, ৬১)। আবুল ফজল চীনীখানার উল্লেখ করেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দাহার বিজয়ের পর শাহ তাহমাস্প কান্দাহারের শাসনভার বুদাগ খাঁ কাচারের উপর অর্পণ করে ইরানে ফিরে যান। কামরান সেখানে পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করলেন। বুদাগ খাঁ দুর্গ সমর্পণ করে ফিরে চলে গেলেন।[১] এইভাবে ইরানের শাহের কাছ থেকে কান্দাহার পুনরাধিকার করার কৃতিত্ব কামরান অর্জন করলেন।

২. মির্জাদের বিদ্রোহ

মুহম্মদ জামান মির্জার আত্মীয় মুহম্মদ সুলতানও হুমায়ূনকে স্বস্তিতে থাকতে দেন নি। হুমায়ূনের রাজত্বের প্রথম বর্ষেই তিনি মুহম্মদ জামান মির্জার সহযোগে দু'বার বিদ্রোহ করেছিলেন। দ্বিতীয় বারের মাথায় তাঁকে অন্ধ করে দেয়া হয় এবং মুহম্মদ জামানের সাথেই তাঁকে বন্দিগৃহে রাখা হয়। মুহম্মদ জামান মির্জার সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ইনিও পালিয়ে যান এবং কোথাও লুকিয়ে থাকেন। গুজরাত অভিযানে হুমায়ূনের ব্যস্ততার সুযোগে সুলতান মির্জা বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে তো স্বয়ং অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাঁর কয়েকজন পুত্র ছিল[২] যারা এদিক ওদিক খুব ধুমধান করে চলাফেরা করত। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ সুলতান মির্জা কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিনি কনৌজ ও বিলগ্রাম অধিকার করে নিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের অন্যান্য স্থান অধিকার করার জন্য পাঠালেন। এইভাবে উলুগ মির্জাকে জৌনপুর ও শাহ মির্জাকে কড়া মানিকপুরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। মির্জা হিন্দাল একটি বাহিনী নিয়ে এদের প্রতি অগ্রসর হলেন। কনৌজের কাছে হিন্দাল গঙ্গা নদী পার হলেন। এখানে ভীষণ যুদ্ধ হল এবং ভীষণ ধূলি-ঝড়ের কারণে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ল। সুলতান মির্জা জৌনপুরের দিকে পালিয়ে গেলেন। হিন্দাল বিলগ্রাম অধিকার করে নিলেন। এই সময়ে হুমায়ূনের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে পড়ল। হিন্দাল মির্জা, সুলতান মির্জা ও তাঁর পুত্রদের এবারেও পরাজিত করে জৌনপুর অধিকার করে নিলেন। বিদ্রোহীরা বাংলার দিকে পালিয়ে গেল।[৩] এইভাবে হিন্দাল এক কঠিন পরিস্থিতিতে মোগল সাম্রাজ্যকে সাহায্য করলেন।

৩. শের খাঁর উত্থান

হুমায়ূন ও শের খাঁর মধ্যে চুনারের সন্ধির বর্ণনা চতুর্থ অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। চুনার থেকে আগ্রা ফেরার পর হুমায়ূন গুজরাত আক্রমণ করেন। এইভাবে হুমায়ূন তাঁর শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রায় চার বছর (১৫৩২-৩৬ খ্রি.) সময় পেয়ে গেলেন। এই

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৩৫-৩৬ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬১।

২. তাঁর ৬ পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।—উলুগ মির্জা, শাহ মির্জা, মুহম্মদ মির্জা, ইবরাহীম মির্জা, মাসুদ হুসেন মির্জা ও আকিল মির্জা।

৩. জওহর, (স্টুয়ার্ট, পৃ. ৯-১০) লিখেছেন যে, এরা পালিয়ে পূর্ণিয়ার দিকে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়কালে তিনি শুধু বিহারের শাসকই হলেন না ; বরং আফগানদের একচ্ছত্র নেতাও বনে গেলেন।

দৌরার যুদ্ধের পর মাহমুদ লোদীর প্রভুত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং শের খাঁ আফগানদের একমাত্র নেতা বনে যান। তিনি আফগানদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করালেন এবং আফগানদের জীবন দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। আব্বাস খাঁ লিখেছেন, বহু আফগান নিজেদের দুরবস্থার কারণে সর্বত্যাগী ফকির হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা এবার শের খাঁর বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেলেন। শের খাঁ আফগানদের সৈনিক হতে বাধ্য করলেন এবং যারা সৈনিক হতে আপত্তি করলেন তাদের হত্যা করালেন।[১]

চুনারের সন্ধির পরিণামস্বরূপ শের খাঁর পুত্র কুতুব খাঁ ৫০০ অশ্বরোহী সৈন্য নিয়ে হুমায়ূনের সাথে মালব গিয়েছিলেন। শের খাঁ এতে চিন্তিত ছিলেন এবং তিনি তাঁকে কোনো-না-কোনোভাবে ডেকে নিতে চাচ্ছিলেন। তাঁর আদেশে কুতুব খাঁ হুমায়ূনকে ছেড়ে সসৈন্য মন্দসৌর থেকে পালিয়ে এলেন। এরফলে শের খাঁ স্বস্তি পেলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর পুত্র বাস্তবে হুমায়ূনের কাছে বন্ধক রূপে ছিলেন এবং তাঁর মোগল-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিশোধ তিনি তাঁর পুত্রের উপরে নেবেন।[২] সম্ভবত, শের খাঁ কালা পাহাড়ের বিধবা কন্যা বিবি ফতেহ মালিকাকে বিয়ে করে তার ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন কিন্তু বিয়ের পর তিনি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করেন নি।[৩]

অভ্যন্তরীণ সংগঠন পূর্ণ করার পর শের খাঁ তাঁর পূর্ব সীমান্তে দৃষ্টিপাত করলেন। নুসরত শাহের মৃত্যুর (৯৩৯ হি. ডিসেম্বর, ১৫৩২ খ্রি.) পর বাংলার কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসন অধিক কাল স্থায়ী হতে পারে নি। তাঁর সিংহাসনে বসার চার মাস পর মাহমুদ শাহ তাঁকে হত্যা করে স্বয়ং বাংলা সিংহাসন অধিকার করেন। (মে ১৫৩৩ খ্রি.) তিনি সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য ছিলেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে তিনি অসমর্থ হলেন। ইতিমধ্যে পর্তুগিজরা বাংলায় এসে গিয়েছিল এবং তারা বাংলার কঠিন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধিক হতেও অধিকতররূপে লাভবান হতে চাচ্ছিল। মাহমুদ শাহের রাজত্বকে হাজিপুরের গভর্নর মখদুমে আলম মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কেননা, তিনি তাকে নুসরত শাহের পুত্রের হত্যাকারী বলে মনে করতেন। মাহমুদ মুঙ্গেরের হাকিম কুতুব খাঁর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বিহার আক্রমণের জন্য পাঠালেন। শের খাঁ আফগানদের পারস্পারিক ঝগড়া অশান্তি দূরীকরণের চেষ্টা করছিলেন। তিনি

---

১. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫২।

২. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ১১২।

৩. আব্বাস খাঁর মতে বিবি ফতেহ মালিকা শের খাঁকে তিন শ' মণ সোনা দেন। শের খাঁ তাঁর ব্যয় নির্বাহের জন্য দুটি পরগনার আমদানি তাঁকে দিয়ে দেন। (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫৫ ; এবং তাঁর বিবাহের বর্ণনার জন্য দেখুন, পৃ. ৩৫২-৫৪)। ড. কানুনগো তাঁর এ আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন "This is an indefinsable act of Spoilation of a helpless woman and deserves unqualified condemenation." (শেরশাহ, পৃ. ১১১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের একত্রিত করলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি কুতব খাঁর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। একদিন তিনি অকস্মাৎ কুতুব খাঁর সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে কুতুব খাঁ মারা গেলেন এবং তাঁর সৈন্যরা হাতি, কামান ও রাজকোষ ছেড়ে পালিয়ে গেল। শের খাঁ তাঁর পুরাতন মিত্র, শেখ ইসমাঈল সূর ও হামিদ খাঁ ককরকে তাঁদের বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ যথাক্রমে শুজাত খাঁ ও সরমস্ত খাঁ উপাধি দিলেন।[১]

মুহম্মদ শাহ অন্য এক বাহিনী মখদুমে আলমের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। শের খাঁ তাঁর মিত্র মখদুম আলমের সাহায্যার্থে মির্জা হুসেনকে পাঠালেন। মখদুম আলম তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখার জন্য শের খাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যুদ্ধে বিজয়ী হলে তিনি তাঁর কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নেবেন। এই যুদ্ধে মখদুম আলম মারা গেলেন।[২] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত কোষ শের খাঁ লাভ করলেন, যা তাঁর শক্তির প্রসারের জন্য খুবই উপযোগী সিদ্ধ হল।

শের খাঁর উত্থানের ফলে নুহানী ও জালাল খাঁ সতর্ক হয়ে গেলেন। কোনো প্রকারে শের খাঁকে তাঁর অধীনে রাখার আশা না দেখে জালাল খাঁ নুহানী আমীর ও সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে বাংলা অভিমুখে চলে গেলেন। (সেপ্টেম্বর ১৫৩৩ খ্রি.)। মাহমুদ কুতুব খাঁর পুত্র ইব্রাহীম খাঁর নেতৃত্ব একটি বাহিনী শের খাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল জালালকে পূর্ণরূপে বিহারে প্রতিষ্ঠিত করা। সুরজগড় নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হল (১৫৩৪ খ্রি.)[৩] যাতে শের খাঁ বিজয়ী হলেন। এই বিজয় শের খাঁকে বিহারের প্রকৃত শাসক বানিয়ে দিল।[৪]

অনুকূল সময় দেখে শের খাঁ বাংলা আক্রমণের জন্য যোগ্য সেনাপতিদের সৈন্যাপত্যে তাঁর সৈন্য পাঠালেন (১৫৩৫ খ্রি. এর মধ্যবর্তী সময়ে)। তিনি স্বয়ং পরিস্থিতি অবলোকন করতে থাকলেন, কেননা, বাহাদুর শাহ পরাজিত হয়েছিলেন এবং শের খাঁ আশঙ্কা করছিলেন হুমায়ূন না জানি কখন আগ্রায় দ্রুত ফিরে আসেন। তাঁর এ সন্দেহও ছিল যে, না জানি কখন সুলতান মাহমুদ শাহ হুমায়ূনের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে বসেন। হুমায়ূন এদিকে আর ফিরবেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে শের খাঁ নিজেও (জানুয়ারি, ১৫৩৬ খ্রি.র মধ্যবর্তী সময়ে) বাংলা অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর বাহিনীতে ১,৫০০ নৌকা এবং ১,৫০০ হাতিও ছিল।

তেলিয়াগড়ির নিকট, মাহমুদ শাহের সাহায্যে রত পর্তুগিজরা তাঁকে প্রতিহত করার প্রয়াস চালাল। শের খাঁ তাঁদের ধোঁকা দিলেন এবং অন্য পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ করলেন। বাংলার সৈন্যরা রাজধানী রক্ষার জন্য ফিরে এল। শের খাঁ গৌড়

---

১. কাননগো শেরশাহ, পৃ. ৮৩-৮৫ ; স্ট্যুয়ার্ট, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ. ৭৬।
২. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৩৪।
৩. ঐ, পৃ. ৪৪১-৪২ ; কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ৯৮-১০৫।
৪. "The victory of Surajgarh gave an air of legitimacy to Sher Khans virtual assumption of the sovereignty of Bihar." (কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ১০৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবরোধ করলেন। বাধ্য হয়ে মাহমুদ শাহকে তের লক্ষ স্বর্ণ দিনার দিয়ে শের খাঁর সাথে সন্ধি করতে হল। এর অতিরিক্ত শের খাঁ ৯০ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৩০ মাইল প্রশস্ত একটি ভূমিও লাভ করলেন।[১]

শের খাঁ প্রারম্ভেই বাহাদুর শাহকে তাঁর মিত্র রূপ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের উভয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আগ্রার সিংহাসনের উপর। এই কারণেই তাঁরা একে অন্যকে এই লক্ষ্যে সাহায্য করে আসছিলেন যে, একজন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং অন্যজন পূর্ব দিক থেকে মোগল সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেবেন। আবুল ফজল লিখেছেন, বাহাদুর শাহ শের খাঁর কাছে অভিজ্ঞ দূত ও উপহার পাঠিয়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, পরে তিনি বণিকদের মাধ্যমে শের খাঁকে ধন দিয়ে সাহায্য করেন।[২] এই ধন সম্ভবত তিনি এই কারণেই দিয়েছিলেন যে, এর প্রয়োগ তিনি যেন পূর্ব প্রান্তে বিদ্রোহের জন্য করেন যাতে হুমায়ূনের জরাত অভিযানের মনোভাব ত্যাগ করতে হয়। বাহাদুর শাহের পরাজয়ের পর তাঁর বহু সংখ্যক সৈন্য শের খাঁর বাহিনীতে ভর্তি হয়ে যায়।[৩] এইভাবে, একদিকে তো আরব সাগরে বাহাদুরের অস্ত হয়ে গেল আর অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে শের খাঁর উদয় হল।

১৫৩৬-এর শেষ অবধি শের খাঁ তাঁর শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। বিহারে তিনি পূর্ণরূপে শক্তিশালী ছিলেন। বাংলার শাসক পরাজিত হয়েছিল এবং শের খাঁ বাংলা অধিকারেরও পরিকল্পনা করছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মোগল বিরোধী আন্দোলনের তিনি একচ্ছত্র নেতা রয়ে গিয়েছিলেন। লাদ মালিকা ও ফতেহ মালিকাকে বিয়ে করে, মখদুমুল মুলকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়ে এবং বাংলার শাসকের কাছ থেকে ধন উসুল করে তিনি তাঁর আর্থিক অবস্থা মজবুত করে নিয়েছিলেন। ধনের সহায়তায় তিনি সৈন্য সংগঠন করে নেন। এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল আফগান, যাদের অনেকেই মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল এবং যাদের মোগলদের শুধু পরাজিত করার লালসাই ছিল না ; বরং লক্ষ্যও ছিল। এই সৈন্যরা আবেগে ভরপুর ছিল। শের খাঁর সহযোগীদের মধ্যে আজম হুমায়ূন সরওয়ানি, মিয়া বিবন, কুতুব খাঁ, মারুফ ফরমূলী প্রমুখ প্রতিভাশালী আমীরও ছিলেন। শের খাঁ তাঁর কার্যাবলী ও আচরণ দ্বারা তাদের সবার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এঁরা এঁদের প্রিয় নেতার জন্য সমস্ত প্রকারের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, হুমায়ূনের গুজরাত অভিযান শের খাঁর উত্থানের জন্য আশীর্বাদ রূপে প্রতীয়মান হল।

---

১. কানুনবেগ, শেরশাহ, পৃ. ১২৬-২৭।
২. আকবরনামা, ১, পৃ, ১৪৮।
৩. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়
শের খাঁর সাথে সংঘর্ষ

গুজরাত অভিযান থেকে হতাশ হুমায়ূন দুঃখিত ও বিষণ্ন চিত্তে আগ্রায় ফিরে এলেন। গুজরাত ও মালব তাঁর হাত থেকে যেভাবে বেরিয়ে গেল তা যে কোনো সম্রাটের জন্য লজ্জাজনক ছিল। অনন্তর, গুজরাত আক্রমণের পরিণাম কী হল ? যেখানে রাজত্বের প্রশ্ন ছিল তা বাহাদুর শাহের অধিকারে এসে গেল, কদর শাহ মালব অধিকার করে নিলেন এবং বাহাদুর শাহের পরাজয়ের পর রাণা বিক্রমাদিত্য চিতোর অধিকার করে নিলেন।[১] এইভাবে গুজরাত অভিযানের আগের পরিস্থিতি সেখানে আবারো ফিরে এল। এর অতিরিক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মোগল সম্রাটের যশ ও খ্যাতি গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল। তাঁর অসফলতার পর তাঁর দুর্বলতা ও ভুলত্রুটিগুলো ফুলে ফেঁপে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এই সমস্ত কারণে হুমায়ূনের মন ভীষণভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যা মন থেকে মুছে ফেলা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আগ্রায় ফিরে আসার পরেও হুমায়ূনের মন থেকে গুজরাতের মোহ চলে যায় নি এবং রাজধানী ও সাম্রাজ্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তিনি পুনরায় গুজরাত আক্রমণ করে তাকে তাঁর অধীনে আনতে চাচ্ছিলেন।[২] এই সময়ে অন্য এক সমস্যা তাঁকে আকৃষ্ট করল। আহমদনগরের শাসক বুরহান নিজাম শাহ হুমায়ূনকে পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, গুজরাত, খানদেশ, বিজাপুর ও বরারের শাসকরা সম্মিলিতভাবে তাঁর রাজ্যের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছেন। তিনি হুমায়ূনের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁদের সৈন্যরা তাঁর রাজ্যে আক্রমণ করলেই তিনি যেন এই রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন।[৩] এ খুবই আকর্ষণীয় নিমন্ত্রণ ছিল, কেননা, এই অভিযানের সাফল্য থেকে তাঁর গুজরাত অভিযানের লজ্জা ও গ্লানি দূর হতে পারত, কিন্তু কয়েকটি কারণে হুমায়ূন তা স্বীকার করলেন না। আহমদনগরের সাহায্যার্থে যাওয়ার জন্য তাঁর

---

১. কিংবদন্তী অনুসারে হুমায়ূন স্বয়ং গুজরাত থেকে ফেরার সময় রাণাকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একথা সত্য নয়। মাণ্ডু থেকে হুমায়ূনের চিতোরের পথ ধরে ফেরার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু রাণা এর আগে চিতোর অধিকার করে নিয়েছিলেন। শর্মা, মেবার আন্ডার দি মুগলস্ পৃ. ৫৮-৫৮ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ১৬৭-৬৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৭।

৩. ফিরিশতা, ব্রিগস, ৩, পৃ. ২২৮-২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। হুমায়ূনের কাছে ঐ সময়ে সেনা প্রস্তুত ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে শের খাঁ ও আফগানদের সংগঠন এমন ভয়ংকর হয়ে উঠছিল যে, তার সমুচিত ব্যবস্থা না করে তাঁর পক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ চালানোটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হত না। এছাড়া হুমায়ূনের অবসাদগ্রস্ত মন গুজরাত ও মালবের ঘটনা থেকে এত পরিমাণে দুঃখী ও নিরাশ ছিল যে, ঐ দিকে পুনরাক্রমণ করার সাহস তাঁর আর হল না।

হুমায়ূনের আগ্রায় বিরতির কারণ

হুমায়ূন আগ্রায় প্রায় এক বছর অবধি বিরত থাকলেন।[১] এই সময়ে শের খাঁ শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। হুমায়ূনের গুজরাত অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ শের খাঁর গতিবিধিও ছিল। তারপর, তাৎক্ষণিক আক্রমণ না করে এত সময় কেন বরবাদ করলেন ? বাহাদুর শাহ গুজরাত পুনরাধিকার করে নিয়েছিলেন। হুমায়ূন আগ্রা থেকে তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখতে চাচ্ছিলেন। বিদ্রোহী মির্জারাও সাম্রাজ্যের এদিকে-ওদিকে চক্কর কেটে ফিরছিল এবং তারা যে কোনো সময়ে রাজধানীতে আত্মপ্রকাশ করতে পারত। হুমায়ূন আসকারিকে মির্জাদের বিরুদ্ধে সম্ভলের দিকে পাঠালেন কিন্তু তাঁর কোনো খবর এল না।[২]

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাহাদুর শাহ নিহত হলেন এবং মুহম্মদ জামান মির্জা গুজরাতের সিংহাসন অধিকার করার চেষ্টা করলেন। মুহম্মদ জামান মির্জার মতো ব্যক্তির পক্ষে গুজরাত শাসন করাটা বিপন্মুক্ত ছিল না। ইতিমধ্যে আহমদনগরের নিমন্ত্রণও এসে পৌঁছাল। হুমায়ূন পূর্ব বা পশ্চিমের কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারছিলেন না।

এই সময়ে জুনায়েদ বরলাসের মৃত্যু হয়ে গেল। তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং জৌনপুরের শাসক হিসেবে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হুমায়ূন তাঁর স্থলে হিন্দু বেগকে নিযুক্ত করলেন। এ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একট পদ, কেননা, হিন্দু বেগকে সাধারণ গভর্নরের কাজের অতিরিক্ত শের খাঁর উপরও নজর রাখতে হত। হুমায়ূন হিন্দু বেগকে শের খাঁর পুরো খবরাখবর পাঠানোর আদেশ দিলেন।

আব্বাস খাঁ লিখেছেন, হিন্দু বেগের আক্রমণের খবর পেয়ে শের খাঁ উপঢৌকনাদি পাঠিয়ে নতুন গভর্নরের কাছে নিবেদন করলেন তিনি সম্রাটকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাতে সম্রাট না বিচলিত হয়েছিলেন আর না তিনি মোগল সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি হিন্দু বেগের কাছে এই মর্মে প্রার্থনা জানালেন তিনি যেন

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, পৃ. ১৩৩ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১, পৃ. ৩৪৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬১।

২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাটকে জানিয়ে দেন যে, তিনি যেন এদিকে না আসেন। তিনি তাঁর পত্রে নিজেকে একজন মোগল সেবক ও রাজভক্ত বলে ঘোষণা করলেন। শের খাঁর এই উপঢৌকনাদি ও আত্মনিবেদন দেখে হিন্দু বেগ বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং তিনি শের খাঁর উকিলের সামনেই বললেন, "আমি যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না।" ঐ সময়েই শের খাঁর উকিলের সামনেই তিনি পত্র লেখালেন যে, "শের খাঁ আপনার প্রতি একনিষ্ঠ। তিনি হযরত বাদশাহর নামে খুতবা পড়াচ্ছেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেছেন। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা অতিক্রম করেন নি। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কোনো অনুচিত কাজ কারন নি যাতে তাঁর উপর কোনো অভিযোগ থাকতে পারে।"[১]

হুমায়ূন গুজরাত অভিযান থেকে এসে সেনা সংগঠন শুরু করলেন। সৈনিকদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বাদাখশানের লোকদের নিযুক্ত করলেন।[২] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পরিস্থিতির দিক থেকে তিনি সচেতন ছিলেন। হিন্দু বেগের রিপোর্ট সম্পর্কে আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন আসে। প্রথম প্রশ্ন, হিন্দু বেগের রিপোর্ট কী সঠিক ছিল ? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, হুমায়ূনের কী তা মেনে নেয়া উচিত ছিল ?

আব্বাস খাঁ স্পষ্টই লিখেছেন যে, হিন্দু বেগকে ঘুষ খাইয়ে শের খাঁ তাঁর ইচ্ছামতো চিঠি লিখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ, হিন্দু বেগের রিপোর্ট সঠিক ছিল না। রিপোর্ট পড়ে জানা যায় যে, হিন্দু বেগ সেটি এমনভাবে লিখিয়েছিলেন যাতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা না যায়। শের খাঁ না নিজের নামে খুতবা পড়িয়েছিলেন আর না নিজের নামে মুদ্রা চালিয়েছিলেন। তিনি মোগল রাজ্যে আক্রমণও চালান নি। সেজন্য তাঁকে বিদ্রোহী বলাটাও ঠিক ছিল না। হুমায়ূন হিন্দু বেগের রিপোর্ট মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু বেগের উপর হুমায়ূনের গভীর বিশ্বাস ছিল। এই কারণে তিনি হিন্দু বেগকে জৌনপুরের গভর্নর পদে স্থায়ীরূপে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমীরুল উমরা উপাধি ও অলঙ্কৃত কুর্সিতে বসার সম্মানও প্রদান করেন।[৩]

হিন্দু বেগের রিপোর্ট মেনে নেয়াটা হুমায়ূনের উচিত ছিল না। একথা সত্য যে, শের খাঁ নিজের নামে খুতবা পড়ান নি এবং মুদ্রাও চালান নি কিন্তু তিনি এমন কাজ করেছিলেন যা থেকে তাঁর নীতি স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। গুজরাত অভিযানে শের খাঁর পুত্র কুতুব খাঁর সসৈন্যে মোগল বাহিনী থেকে পালিয়ে আসাটা কী অপরাধ ছিল না ? শের খাঁ বিহারের জায়গীর ও নতুন বিজিত প্রদেশগুলোর জন্য দিল্লিকে কোনো কর বা উপহার পাঠান নি। এ ছাড়া, এক এমন ব্যক্তির জন্য, যিনি নিজেকে মোগল আমীর বলে উল্লেখ করেন, তাঁর পক্ষে একটি স্বাধীন রাজ্যের

১. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫৬।
২. আহমদ ইয়াদগার সালাতীনে আফাগেনা।
৩. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বাংলা) উপর আক্রমণ করা, এসব কী স্পষ্টই শের খাঁর মোগলদের চমকে দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ড ছিল না? হিন্দু বেগ গুজরাতে আসকারিকে স্বাধীন হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন ব্যক্তির উপর এতটা বিশ্বাস করা উচিত ছিল না। হিন্দু বেগের উপর হুমায়ূনের এমন গভীর বিশ্বাস কেন ছিল, একথা বলা কঠিন।

বাস্তবে হুমায়ূন পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুমান করতে পারেন নি। তিনি আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করা ব্যক্তি ছিলেন। কোনো কাজের গুরুত্ব বুঝে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। কোনো কাজ শুরু করতে তিনি অযথা দেরি করতেন। এই কারণে গুজরাত অভিযানে তিনি বেশ কয়েকটি জায়গায় থেমে থাকেন। পরে বাংলায়ও তিনি এইভাবে কয়েক মাস ব্যর্থ সময় কাটিয়ে দেন। এইভাবে কঠিন অভিযানগুলোর মধ্যে আরাম করাটা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া হুমায়ূন কোনো বিশেষ অভিযান কিংবা কোনো বিশেষ কাজে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পরতেন না। ফিরিশতার মতে, হুমায়ূন অতি মাত্রায় আফিম খেতে শুরু করে দিয়েছিলেন, নিজামউদ্দীন তো স্পষ্টই লিখেছেন যে, গুজরাত থেকে ফেরার পর হুমায়ূন এক বছর আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দেন।[১] উপর্যুক্ত বর্ণনাবলী থেকে এই উপসংহারে আসা যায় যে, হুমায়ূন যিনি প্রকৃতিগতভাবে অলস ও আরামপ্রিয় ছিলেন, তিনি হিন্দু বেগের রিপোর্ট পাওয়ার পর আরো আরামে বসে গেলেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ খুললেন না, যতক্ষণ না শের খাঁ বাংলা আক্রমণ করলেন।

শের খাঁর গতিবিধি

হিন্দু বেগের আশ্বাস থেকে শের খাঁর বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হুমায়ূন এখন আর কিছুদিন তাঁর উপর আক্রমণ করবেন না। ইতিমধ্যে বাংলা আক্রমণ করে তিনি তো অধিকার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গত বাংলা অভিযানের সময় পর্তুগিজরা বাংলার শাসক মাহমুদকে সহযোগিতা করেছিল। এর ফলে, শের খাঁর বড় অসুবিধা হয়েছিল। এরা গুজরাতে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কির সুলতান সুলেমান ও বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীর দ্বারা তাদের সম্মিলিত আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এই কারণে পর্তুগিজরা মাহমুদকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় ছিল না। এই সময়টি ছিল বাংলা আক্রমণের উপযুক্ত সময়। শের খাঁ রাজস্ব পরিশোধ না করার অজুহাতে বাংলা আক্রমণ করেছিলেন।[২] মাহমুদের পক্ষে শের খাঁর মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। তিনি

---

১. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬১।

২. কম্পোসের পথে মাহমুদ কর দিতে অস্বীকার করেন যার ফলে শের খাঁ আক্রমণ চালিয়ে দেন। (হিস্ট্রি অব গুজরাত ইন বেঙ্গল, পৃ. ৪০)। ড. কানুনগোর মতে, তিনি মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে অক্টোবর, ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে অতিক্রমণ করেন যখন হুমায়ূন আগ্রায় ছিলেন (শেরশাহ, পৃ. ১৩৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালিয়ে গৌড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। শের খাঁর সৈন্যরা নগরের দিকে প্রস্থান করল এবং তার আশপাশের স্থানগুলো অধিকার করে নিল।

বাংলা অভিযান

হুমায়ূন শের খাঁর বাংলা অভিযানের খবর পেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবার বাংলা আক্রমণ অবশ্যই করা উচিত।[১] আক্রমণের পূর্বে তিনি রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করলেন। এইভাবে দিল্লি ও তার নিকটবর্তী স্থানগুলো রক্ষা ও শাসনের দায়িত্বভার মীর ফখর আলীর উপর অর্পণ করা হল। আগ্রায় মীর মুহম্মদ বখশীকে ও কালপিতে ইয়াদগার নাসির মির্জাকে নিযুক্ত করা হল।[২]

এইভাবে রাজধানী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর শাসন সুব্যবস্থিত করায় হুমায়ূন আসকারি ও হিন্দালকে সাথে নিয়ে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই আগ্রা থেকে রওনা হয়ে গেলেন।[৩] তাঁর সাথে তাঁর বেগমগণ এবং সাম্রাজ্যের প্রধান আমীর রুমী খাঁ, তরদী বেগ, বৈরাম খাঁ, কাসিম হুসেন খাঁ উজবেক, জাহিদ বেগ, জাহাঙ্গীর কুলি বেগ প্রমুখ ছিলেন। অধিকাংশ আমীর নদীপথে রওনা হলেন এবং সৈন্যরা স্থলপথে।

হুমায়ূনের আক্রমণের খবর পেয়েই শের খাঁ এর প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে কোনো কর্মকাণ্ডই চালান নি। তিনি না পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর হয়েছেন আর না মোগল সাম্রাজ্যের কোনো অংশে হস্তক্ষেপ করেছেন। এজন্য সম্রাটের তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়। হুমায়ূন এই প্রতিবাদের কোনো জবাব না দিয়েই আরো এগিয়ে গেলেন।

হুমায়ূনের অভিযানের ফলে শের খাঁ চিন্তিত হলেন। তিনি গৌড় অবরোধের ব্যবস্থা করে সেখানে খাওয়াস খাঁকে নিযুক্ত করলেন। চুনার দুর্গের রক্ষার দায়িত্ব তাঁর পুত্র কুতুব খাঁ ও অন্যান্য আফগানদের উপর অর্পণ করলেন। শের খাঁ স্বয়ং আফগান পরিবারগুলোর সাথে ভরকুণ্ডা[৪] চলে গেলেন। বাইরে থেকে তিনি দুই দুর্গ ও হুমায়ূনের গতিবিধিরি উপর নজর রাখতে পারতেন।

আগ্রা থেকে প্রস্থান করে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে চুনার পৌঁছালেন।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৭ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৪৮ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২. পৃ. ৮৩-৮৫।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৯।

৩. হুমায়ূন কোন তারিখে রওনা হয়েছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আবুল ফজল তারিখ দেন নি। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, ১৪ সফর ৯৪২ হিজরি, ১২ আগস্ট ১৫৩৫ খ্রি. (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬২) ; ফিরিশতার মতে, ১৪ সফর, ৯৪৩ হিজরি (২৭ জুলাই ১৫৩৭ খ্রি.) (ফিরিশ্‌তা. ফা. পৃ. ২১৬) ; ব্রিগসের অনুবাদে (খণ্ড ২, পৃ. ৮৩) আট সফর রয়েছে, এটি ভ্রান্ত।

৪. এ দুর্গ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) আধুনিক বীরভূম জেলায় অবস্থিত ছিল। আঈনে-আকবরী খণ্ড ২, পৃ. ১৫৩-এর মতে, ভরকুণ্ডা শরীফাবাদ সরকারের একটি পরগনা ছিল। দেখুন, ব্লখম্যানের নিবন্ধ, জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৭৩ খ্রি. পৃ. ২২৩, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জামান মির্জার আত্মসমর্পণ

আগ্রায় হুমায়ূন তাঁর বোন মাসুমা সুলতান বেগম (মুহম্মদ জামান মির্জার স্ত্রী)-এর একান্ত প্রার্থনায় মুহম্মদ জামান মির্জাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। চুনারের নিকবর্তী স্থানে মুহম্মদ জামান মির্জা হুমায়ূনের শিবিরে এলেন। মির্জা আসকারি ও মির্জা হিন্দাল তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং পরদিন একই দরবারে তাঁকে দু'বার খিলআত, পেটি এবং ঘোড়া প্রদান করা হল।[১] মুহম্মদ জামান মির্জাকে এই সম্মান হুমায়ূন তাঁর ভগ্নিপতি হিসেবেই দিয়েছিলেন। শাসনকার্যের দৃষ্টিতে এই ধরনের ব্যবহার সম্রাটের দুর্বলতার প্রতীক ছিল।

চুনার অবরোধ

হুমায়ূনের চুনার অবরোধের সময়েই শের খাঁর সৈন্যরা গৌড় অবরোধ করে রেখেছিল। গৌড়ে বাংলার শাসকের রাজকোষ ছিল। হুমায়ূনের বাংলায় পৌঁছানোর আগেই শের খাঁ গৌড় অধিকার করে নিলে সেখানকার রাজকোষ, ভূ-ভাগও, এবং যশও লাভ করতেন, যাতে তাঁর শক্তিও বেড়ে যেত। এসব বিবেচনা করে হুমায়ূনের বয়োজ্যেষ্ঠ আমীর দিলাওয়ার খাঁ প্রমুখ পরামর্শ দিলেন যে, চুনার বিজয়ের চিন্তা না করে বরং মোগল সৈন্যরা অগ্রসর হোক এবং শের খাঁর গৌড়ের রাজকোষ হস্তগত করার আগেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাক।

এর বিপরীতে অন্য কয়েকজন আমীরের পরামর্শ ছিল আগে চুনার অধিকার করে পরে মোগল বাহিনী অগ্রসর হোক। হুমায়ূন খানে খানান ইউসুফ খায়েলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "নওজওয়ানদের রায় হল প্রথমে চুনার অধিকার করা হোক, বয়স্কদের রায় হল গৌড়ে অত্যাধিক ধন-সম্পদ রয়েছে এবং আগে গৌড় অধিকার করাই উচিত এবং লাভজনক। এরপর, চুনার অধিকার করা আরো সহজ হবে।" হুমায়ূন এর উত্তরে বললেন, আমি নওজওয়ান এবং নওজওয়ানদের পরামর্শই আমি মেনে নিচ্ছি। আমি চুনার দুর্গকে পেছনে ফেলে রেখে যাব না।[২]

চুনার অধিকার করতে হুমায়ূনের প্রায় ৬ মাস লেগে গেল। এর মধ্যে শের খাঁ গৌড় অধিকার করে তার সমস্ত কোষ সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে দিলেন এবং কিছু

বীমসের গবেষণা-নিবন্ধ, জার্নাল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৯৬-৯৭ খ্রি.। এই স্থানটি চুনার থেকে ৫০ মাইল ২৪°৩৪′ উত্তর, ৮৩°৩৪′ পূর্বে অবস্থিত। হোদীওয়ালা ১, পৃ. ৪৫০ ; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫০ এ একে নহরকুণ্ডা বলা হয়েছে, এ ভ্রান্ত।

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৪৯-৫০ ; ও জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৩।

২. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৫৭ ডর্ন হিস্ট্রি অব দি আফগানস্, পৃ. ১০৬। আকবরনামা ও তবকাতে আকবরীতে এই পরামর্শদাতা-গোষ্ঠীর উল্লেখ নেই। জওহর ও ফিরিশতাও এর উল্লেখ করেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের মধ্যে হুমায়ূনকে পরাস্ত করতে সফল হলেন। এই পটভূমিতে কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকও হুমায়ূনের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন এবং কেউ কেউ এর সমর্থন করেছেন।

ড. ব্যানার্জি হুমায়ূনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।[১] তাঁর মতে, (১) গুজরাতের খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা হুমায়ূনের ছিল। চম্পানীর দুর্গ অধিকার না করেই তিনি কম্বে অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঐ অভিযানে হুমায়ূন প্রারম্ভে জয় লাভ করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই পুরো রাজ্য তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ূন এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছিলেন না। (২) শের খাঁর দৃষ্টিতে চুনারের অনেক গুরুত্ব ছিল। পাঁচ বছর আগে তিনি মোগলদের চুনার প্রত্যর্পণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। চুনার বিজয়ের ফলে আফগানরা দক্ষিণ বিহারে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেতে পারত। চুনারের রাজকোষ সরিয়ে ফেলা হয় নি, তাও হুমায়ূনের হস্তগত হওয়ার আশা ছিল। (৩) বাংলার শাসক মাহমুদের শের খাঁর কাছে এত দ্রুত পরাজয়ের আশা হুমায়ূন করেন নি। (৪) ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে হুমায়ূন স্বয়ং আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন আর মাহমুদ কাহাঁতক্ শের খাঁর মোকাবিলা করতে পারতেন আর কতটা পারতেন না, এতে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। মাহমুদের প্রতি হুমায়ূনের আগ্রহ গৌড় পতনের পর এবং হুমায়ূনের সাথে তাঁর সাক্ষাতের পরে শুরু হয়। (৫) হুমায়ূন শের খাঁর যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। (৬) মখজানে আফগানার লেখকের এই মত সঠিক বলে প্রতীত হয় যে, গৌড় আক্রমণের পরামর্শ হুমায়ূনের আমীররা ধনের লোভেই দিয়েছিলেন, অন্য পরিস্থিতির কারণে নয়। যদি হুমায়ূন চুনার অধিকার না করে অগ্রসর হতেন তাহলে মাহমুদের সহায়তার জন্য তাঁকে বাংলা পার করতে হত। এই যুদ্ধ কী উত্তর ভারতের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত টেনে আনা উচিত ছিল ? বিদ্বান লেখকের মতে, ঘটনার পর বুদ্ধিমান হওয়া সহজ। হুমায়ূনের প্রকৃত ভুল ছিল শের খাঁর সঠিক মূল্যায়ন না করা। এছাড়া বাংলার শাসকের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য কোনো অনুরাধও জানানো হয় নি। এই কারণে হুমায়ূন আরামসে কিন্তু সঠিকভাবে চুনার অবরোধ করতে শুরু করলেন।[২]

উপর্যুক্ত যুক্তি ছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, চুনার শের খাঁর অধিকারে রয়ে গেলে এবং হুমায়ূন অগ্রসর হলে তাঁর সৈন্যদের উপর চুনার এবং বাংলা উভয় দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হতে পারত। চুনার দুর্গ আফগানদের শক্তির প্রতীক ছিল। এ আগ্রা ও পাটনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। সামরিক দৃষ্টিতে এর অনেক গুরুত্ব ছিল। এমন দুর্গ শের খাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না। এটি অধিকার করা ব্যতিরেকে বেনারস-বক্সার সড়ক শের খাঁর অধীনে ছেড়ে দিলে, এতে তিনি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতেন।

১. ব্যানার্জী হুমায়ূন, ১, পৃ. ২০০-২০২।
২. ব্যানার্জী, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে, গৌড়ের পতনের ফলে শের খাঁর ধন ও যশ লাভ হত এবং তাঁর শক্তিও অনেক বেড়ে যেত। শুধু তাই নয়, বিজয়ের উল্লাসে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহও বেড়ে যেত। যদি হুমায়ূন অগ্রসর হয়ে বাংলার শাসককে সহায়তা করতেন তাহলে তিনি তাঁর পরম মিত্র বনে যেতেন। বাংলার সম্রাট ও মোগল সম্রাট দুয়ে মিলে শের খাঁর রাজ্য ও তাঁর শক্তি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারতেন। কেননা, শের খাঁর শক্তির মূল কেন্দ্র বাংলা এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। একথা বলা ঠিক নয় যে, যুদ্ধকে ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ঠিক ছিল না। শের খাঁর উপর আক্রমণ করার সময় বাংলা পর্যন্ত যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা ছিল। হুমায়ূন একথা জানতেন। এই কারণে তিনি তাঁর রাজধানীর এমন ব্যবস্থাই করেছিলেন যাতে অধিক সময় লেগে গেলেও কোনো অসুবিধা না হয়। এই যুক্তি যে, মাহমুদের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর প্রতি হুমায়ূনের আগ্রহ দেখা দেয়, এ হুমায়ূনের অদূরদর্শিতাই প্রমাণ করে।

উভয় পক্ষের যুক্তির পর্যালোচনা থেকে এবং পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে আমরা হুমায়ূনের বাস্তবিক ভুলের অনুমান করতে পারি। শের খাঁর যোগ্যতার সঠিক অনুমান হুমায়ূনের ছিল না। তিনি তাঁকে শুধুমাত্র বিদ্রোহী বলে মনে করতেন। তাঁর আশা ছিল যে, চুনার দুর্গ খুব দ্রুত অধিকারে এসে যাবে কিন্তু তা অধিকার করতে ছ'মাস লেগে গেল। এই রকমই, চুনার দুর্গের শক্তি সম্পর্কেও তাঁর সঠিক ধারণা ছিল না।[১] সুলতান মাহমুদ এত দ্রুত পরাজিত হবেন এ আশাও তাঁর ছিল না। এমনও মনে হয় যে, হুমায়ূনের গুপ্তচর বিভাগ উত্তম ছিল না। যার ফলে শের খাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা তিনি পান নি। হুমায়ূন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে এক ভয়ঙ্কর ভুল করেন। জ্যেষ্ঠ আমীরদের তাঁর একথা বলা উচিত হয় নি যে, আমিও নওজওয়ান, এবং আমি নওজওয়ানদের মতামতই স্বীকার করি। তাঁর এই ধরনের কথায় বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ আমীররা আঘাত পান এবং তাঁদের মনে এই ধারণা জেগে ওঠা স্বাভাবিক ছিল যে, সম্রাট তাঁদের অমর্যাদা করলেন। যদি হুমায়ূন চুনার দুর্গ অবরোধের দায়িত্ব অন্য কোনো ব্যক্তির উপরে অর্পণ করে স্বয়ং বাংলা অভিমুখে প্রস্থান করতেন তাহলে তো আরো ভাল হত। এতে সেনা-বিভাজনের ভয় অবশ্যই ছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় ধন ব্যয় করে যদি সৈন্য সংগ্রহ করা হত তাহলে কয়েক মাস সময় অবশ্যই বাঁচানো যেত।

চুনার অধিকার

চুনার দুর্গ অধিকার করার দায়িত্ব রুমী খাঁর উপর অর্পণ করা হল। বাহাদুর শাহকে ত্যাগ করার পর রুমী খাঁ হুমায়ূনের সেবায় এসে গিয়েছিলেন। হুমায়ূন তাঁকে মীর

---

১. তারীখে এলচীয়ে নিজাম শাহের মতে, হুমায়ূন যখন চুনার দুর্গ জয় না করেই বাংলা অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তখন আলী কুলি তোপচি নামক হুমায়ূনের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী তাঁকে বললেন যে, তিনি অনতিবিলম্বেই কেল্লা ফতেহ্ করে নেবেন। হুমায়ূন তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। রিজ্‌ভি, হুমায়ূন , ২, পৃ. ৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতশ উপাধি প্রদান করেন। রুমী খাঁ দুর্গ নিরীক্ষণ করলেন। তিনি দেখালেন যে, স্থল ভাগের অংশটি এত দৃঢ় ছিল যে, তাতে সাফল্য লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। দুর্গের দুর্বল স্থানের খবর নেয়ার জন্য তিনি কুলাফাত নামক এক হাবশি ক্রীতদাসকে প্রচণ্ডভাবে বেত মারলেন। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় কুলাফাত চুনার দুর্গের অধিপতির কাছে গেল এবং সেখানে সে রুমী খাঁর ব্যবহারের নিন্দা করল এবং চুনারের দুর্গপতির সেবায় নিজেকে অর্পিত করল। আফগানরা তার প্রতি সৎ-মনোভাব দেখাল, তার ক্ষতস্থানে মলম-পট্টি বেঁধে দিল এবং চুনার দুর্গের অনেক তথ্য তাকে জানিয়ে দিল। কুলাফাতের মাধ্যমে রুমী খাঁ চুনার দুর্গের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা জানতে পারলেন এবং সেই মতে তিনি অধিকারের প্রয়াস চালালেন। কুলাফাতের দেওয়া তথ্যানুযায়ী রুমী খাঁ কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল কামানের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করা। রুমী খাঁ নৌকার উপরে কামান বসালেন। এ ছিল নৌকায় চলমান কামান যা বেশ উঁচু ছিল। এতে এমনই এক ব্যবস্থা ছিল যে, নৌ-বহরের মাধ্যমে কামানগুলোকে দুর্গের কাছে নিয়ে কামান দেগে দুর্গপ্রাচীর উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারত। এতে এমনই ব্যবস্থা ছিল যে, প্রয়োজনে স্থলপথেও আক্রমণ চালানো যেত। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পর দুর্গ আক্রমণ করা হল। ধুন্ধমার যুদ্ধ হল যাতে আফগানরা বড় বীরত্ব প্রদর্শন করল। সাত শ' মোগল মারা গেল এবং রুমী খাঁর নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরদিন তা মেরামত করা হল এবং মোগলরা পুনরাক্রমণ করার ব্যবস্থা করল। দুর্গের আফগানরা দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে দুর্গ সমর্পণ করে দিল।[১]

দুর্গ সমর্পণের পর বহু সংখ্যক আফগান সৈনিককে বন্দি করা হল। জওহরের মতে, ৩০০ তোপচির হাত কেটে নেওয়া হল যাতে ভবিষ্যতে তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে না পারে। আবুল ফজল ও জওহর দু'জনেই লিখেছেন যে, হুমায়ূন তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। জওহর এর দায়দায়িত্ব রুমী খাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আবুল ফজলের মতে, মুঈদ বেগ দুলহাই নামক হুমায়ূনের এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা তাদের হাত কেটে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিল, যেন তা সম্রাটেরই আদেশ। দু'জনেই লিখেছেন, এতে হুমায়ূন খুব রুষ্ট হন—এ কাজের জন্য তিনি তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করেন।[২] আশ্রিত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত

১. চুনার দুর্গ কীভাবে বিজিত হয় এ সম্পর্কে বিশদ ও স্পষ্ট বিবরণ সমকালীন ঐতিহাসিকেরা দেন নি। আবুল ফজল তাঁর আকবরনামায় (খণ্ড ১, পৃ. ১৫১) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। নিজামউদ্দীন আহমদের বর্ণনায় 'মোকাবিলা কোব' নির্মাণের বিশদ বিবরণ এসেছে, (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬৩-৬৪)। জওহর-এর বর্ণনা সবচেয়ে বেশি। তিনি কুলফাতকে পাঠানোর এবং আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১২-১৪ ; তারীখে-আলফি।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫১। জওহর স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৪। আবুল ফজলের বর্ণনানুসারে, হুমায়ূন দু'হাজার ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন এবং দুলহাই এদেরই হাত কেটে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। জওহর-এর মতে, দুলহাই তোপচিদের হাত কেটে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিদের সাথে এই ধরনের আচরণ ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একথা বলা যে, হুমায়ূনের আদেশের বিরুদ্ধে তাদের হাত কেটে নেওয়া হয়েছিল, এখন প্রশ্ন ওঠে যে, হুমায়ূন তাঁর আদেশ লংঘনকারী ব্যক্তিদের কী শাস্তি দিয়েছিলেন ? দণ্ডাদেশ যদি তিনি না দিয়ে থাকতেন তাহলে এটা কী তাঁর মৌন সম্মতি প্রকাশ করে না ? এর দ্বারা কী মোগল সম্রাটের আমীরদের অনুশাসনহীনতা প্রকট হয় না ? যে কোনো দৃষ্টিতেই এই অত্যাচারের জন্য নিশ্চিতরূপে হুমায়ূনই দায়ী ছিলেন।

চুনার বিজয় উপলক্ষে হুমায়ূন এক দরবার বসালেন যাতে তাঁর আমীরদের মধ্যে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের পুরস্কৃত ও খিলআত প্রদান করা হল। রুমী খাঁর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে চুনার দুর্গের গভর্নর নিযুক্ত করা হল। দুর্ভাগ্যবশত রুমী খাঁ তা ভোগ করতে পারলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মোগল সাথীরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাবশত তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করল। তাঁর মৃত্যুর পর চুনার দুর্গ মীরক বেগকে প্রদান করা হল।[১]

শের খাঁর রোহতাস দুর্গ অধিকার

হুমায়ূনের চুনার দুর্গ অবরোধের সময় শের খাঁ গৌড় দুর্গের অবরোধ আরো কঠোর করে তুললেন। বিহার ও বাংলার অধিকাংশ স্থানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। জালাল খাঁ ও খাওয়াস খাঁর উপর গৌড় দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করে শের খাঁ পুনরায় ভরকুণ্ডায় চলে গেলেন।

শের খাঁ ইতিমধ্যে অনুভব করে নিয়েছিলেন যে, ভরকুণ্ডার দুর্গ তাঁর এবং অন্যান্য আফগান পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। গৌড়ে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ইত্যাদি রাখার সমস্যাও ছিল। এই দৃষ্টিতে রোহতাস[২] দুর্গ তাঁর কাছে খুবই উপযুক্ত প্রতীত হল। রোহতাস দুর্গের রাজার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, বিশেষত, তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চূড়ামণি[৩] তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। যে সময়ে জায়গীর সম্পর্কিত সংঘর্ষ চলছিল সে

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫১। জওহরের বর্ণনা আকবরনামা থেকে ভিন্ন। জওহর লিখেছেন, চুনার বিজয়ের পর হুমায়ূন এক শাহানা জশন আয়োজন করেন, তারপর তিনি রুমী খাঁকে জিজ্ঞাসা করেন চুনার দুর্গ কেমন ? রুমী খাঁ উত্তর দিলেন, এমন কেল্লা ফতেহ হলে তা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। হুমায়ূন জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্গ কাকে দেওয়া যায় ? রুমি খাঁ উত্তর দিলেন, উপস্থিত আমীরদের মধ্যে বেগ মীরকের চেয়ে যোগ্য কেউ নেই। হুমায়ূন দুর্গ মীরক বেগকে দিয়ে দিলেন। এরফলে, অন্য সমস্ত আমীর রুমী খাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করল। (তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৪)।

২. রোহতাস দুর্গ বিষয়ে ফিরিশতা (ব্রিগস, ২, পৃ. ১১৬-১৭) লিখেছেন যে, তিনি ভারতে অনেক পাহাড়ি দুর্গ দেখেছিলেন কিন্তু রোহ্তাস দুর্গের সমতুল্য একটাও ছিল না। এটি একটি পাহাড় শ্রেণীর উপর পাঁচ বর্গ ক্রোশ জুড়ে অবস্থিত ছিল। পানির সুবিধা এবং দুর্গে পৌঁছাতে একটাই রাস্তা থাকার দরুন তা অজেয় হয়ে উঠেছিল।

৩. আব্বাস খাঁ রাজার নাম দেন নি কিন্তু লিখেছেন যে, তাঁর চূড়ামণি নামে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। আবুল ফজলের মতে, রাজার নাম ছিল চিন্তামন এবং তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে তাঁর ভাই নিজাম সপরিবারে তাঁর ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শের খাঁ চূড়ামণিকে পত্র লিখেছিলেন যে, তিনি বড়ই সমস্যার মধ্যে আছেন। এবং তাঁকে কিছু দিনের জন্য রোহতাস দুর্গটি দিয়ে দেওয়া হোক। চূড়ামণির কথায় রাজা স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু শের খাঁ যখন ভরকুণ্ডা থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনকে পাঠিয়ে দিলেন তখন রাজা দুর্গে প্রবেশ করতে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন যে, তিনি যখন নিজামকে তাঁর দুর্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন সে সময়ে তাঁর সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য মাত্র ছিল। এবার শের খাঁর সৈন্য রাজার সৈন্যের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। শের খাঁ রাজাকে লিখলেন যে, রাজার কথাতেই তিনি ভরকুণ্ডা থেকে তাদের পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ূন খবর পেলে আফগান পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দেবেন সেজন্য তার দায় রাজার উপরে বর্তাবে। শের খাঁ চূড়ামণিকে ৬ মণ সোনা ঘুষ দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, কিছুদিনের জন্য দুর্গটি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হোক। তিনি ভয়ও দেখালেন যে, দুর্গ তাঁকে না দিলে তিনি হুমায়ূনের সাথে যোগ দেবেন এবং রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন। চূড়ামণি রাজাকে বোঝালেন এবং ধমকিও দিলেন যে, তিনি শের খাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। রাজা বাধ্য হয়ে আফগানদের প্রবেশ করতে দিলেন। শের খাঁ আফগান সৈন্যদের পালকিতে করে লুকিয়ে দুর্গের মধ্যে পাঠালেন এবং গায়ের জোরে দুর্গ অধিকার করে নিলেন।[১]

AMARBOI.COM

(আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৩)। ফিরিশতার মতে, রাজার নাম ছিল হরিকৃষ্ণ রায় (ব্রিগস, ২, পৃ. ১১৫)। আর্সকিন রাজার নাম লিখেছেন, হরিকৃষ্ণ বরকিস। (হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া আন্ডার বাবুর অ্যান্ড হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৪৭) হোদীওয়ালার মতে (স্টাডিজ, ১, পৃ. ৪৫২) বরকিস ভুল। কিছু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে হরকিসন এর স্থলে মার্জিনে বরকিসও লেখা থাকার কারণে হরিকৃষ্ণের সাথে বরকিসও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর্সকিন, ২, পৃ. ১৪৭।

১. শের খাঁ পালকিতে করে আফগানদের পাঠিয়ে রোহ্তাস দুর্গ অধিকার করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তারীখে খানজাহান লোদীর মতে, শের খাঁ ১২০০ পালকিতে করে দু'জন করে আফগান-সৈনিককে ভিতরে পাঠিয়ে দেন, শুধুমাত্র শুরুর দিককার পালকিগুলোতে কয়েকজন করে বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। আহমদ ইয়াদগারের মতে, কেবল তিনশ' পালকি ছিল, প্রতিটিতে দু'জন করে সৈন্য এবং চারজন করে রোহিলা পালকি-বাহক ছিলেন। এরা সবাই ভিতরে মার-কাট শুরু করে দিল, রাজাকে হত্যা করল এবং দুর্গ অধিকার করে নিল। ফিরিশতা পালকির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, শের খাঁ পালকিওয়ালা সৈনিকও রেখেছিলেন। এছাড়া টাকা রাখার বাক্সে করে তিনি গোলাগুলিও পাঠিয়ে দিলেন এবং ছদ্মবেশী লাঠিয়াল সৈনিকও ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। এরা ভিতরে প্রবেশ করে সুযোগ বুঝেই রাজার লোকদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ অধিকার করে নিল। ফিরিশতার মতে, রাজা দুর্গ থেকে পালিয়ে গেলেন (ব্রিগস, ২, পৃ. ১১৫-১৬)।
নিজামউদ্দীনে আহমদও পালকি পাঠানোর কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, ১০০০ পালকি ছিল এবং তাতে একজন করে সৈনিক ছিল। প্রথম দিককার কয়েকটি পালকিতে মহিলারা ছিলেন। রাজার লোকেরা প্রথম দিককার পালকিগুলো নিরীক্ষণ করেছিল। এ দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শের খাঁর প্রতারণগার সাহায্য নিয়ে দুর্গ অধিকার করাটা তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক। রাজা বড় দুঃসময়ে নিজামকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শের খাঁ এর সবকথাই ভুলে গেলেন। রাজার অস্বীকার করা থেকে বোঝা যায় যে, শের খাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। শের খাঁর চূড়ামণিকে ঘুস দেয়া থেকে প্রতীত হয় যে, তিনি দুর্গ হস্তগত করতে চাচ্ছিলেন। পালকির কাহিনী অস্বীকার হলেও শের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারবেন না।

বেনারস-বিজয় ও শের খাঁর সাথে সন্ধিবার্তা

চুনার বিজয়ের পর হুমায়ূন অগ্রসর হয়ে বেনারস অধিকার করে নিলেন। কিছু দিন বেনারসে যাত্রা বিরতি করার পর মোগল সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে শোন নদীর তটে মনের[১] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। জওহরের মতে তাঁর ইচ্ছা ছিল ভরকুণ্ডা অভিমুখে যাওয়ার[২] যেখান থেকে শের খাঁ তাঁর বাংলা ও বিহারের সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। মনের-এ হুমায়ূন সন্ধির কথা চিন্তা করলেন। এই চিন্তা তাঁর মনে কেন জাগল তা বলা কঠিন, কেননা, চুনার বিজয়ের পর তাঁর সন্ধি-বার্তা শুরু করার স্থলে আফগানদের পরাভূত করার সংকল্প করা উচিত ছিল। হুমায়ূন কবুল হুসেন তুর্কমানকে তাঁর দূত করে পাঠালেন এবং তিনি সন্ধির নিম্নলিখিত শর্তগুলো রাখলেন :[৩]

১. শের খাঁ মোগলদের সেবায় উপস্থিত হবেন।
২. শের খাঁ বাংলার শাসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজসিক ছত্র ও অন্যান্য রাজসিক প্রতীকচিহ্নগুলো মোগল সম্রাটকে অর্পণ করবেন।
৩. শের খাঁ রোহতাস ও বাংলার অধিকার ত্যাগ করবেন।
৪. চুনার ও জৌনপুরের অঞ্চল অথবা অন্য জায়গীর, যা শের খাঁ পছন্দ করেন তা তিনি পাবেন।

শের খাঁর পক্ষে এই সমস্ত শর্ত মেনে নেয়ার অর্থ ছিল পূর্ণরূপে মোগলদের সমীপে আত্মসর্পণ করা। সম্ভবত, চুনার বিজয়ের পর মোগলরা এত বেশি প্রসন্ন

শের খাঁ এই বলে আপত্তি করলেন যে, তিনি মহিলাদের তল্লাশি করার অধিকার দেবেন না। রাজা তা মেনে নিলেন (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৬২-৬৩)। আব্বাস খাঁ সেরওয়ানী তাঁর তারীখে শেরশাহীতে পালকির কথা অস্বীকার করেছেন। (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬১-৬২)। শের খাঁর চরিত্র, তাঁর প্রয়োজনীয়তা ও সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এ ঘটনা সত্য বলে প্রতীত হয়।

১. মনের পাটনা থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ঐ সময়ে শোন নদী ও গঙ্গা নদীর মোহনা ছিল এখানে। আঈনে আবকরী, ২, পৃ. ১৬৩।
২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৫।
৩. ঐ পৃ. ১৫-১৬। দূতের নাম আবুল হুসেন তুর্কমান বা কবল। হুসেন তুর্কমান ছিলেন। স্ট্যুয়ার্ট তাঁর অনুবাদে এঁর নাম কেবল হুসেন তুর্কমান লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন যে, তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন শের খাঁর কাছ থেকে যে কোনো শর্ত স্বীকার করিয়ে নেবেন। শের খাঁর পক্ষে এ সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এ সমস্ত শর্ত স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ ছিল ঐ সময় পর্যন্ত শের খাঁ নিজের এবং আফগানদের জন্য যা-কিছু করেছিলেন তা সবই বরবাদ করে দেওয়া। শের খাঁ দেখলেন যে, কূটনৈতিক উত্তরও ঐভাবে দেওয়া উচিত। মোগলদের শর্তাবলী তিনি সরাসরি অস্বীকার করে দিলে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। শের খাঁ তাৎক্ষণিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গৌড় থেকে প্রাপ্ত ধন তিনি সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। তিনি হুমায়ূনের প্রস্তাবের বিপক্ষে অন্য প্রস্তাব রাখলেন এবং বললেন যে, পাঁচ-ছ' বছরের পরিশ্রম ও তরবারির শক্তিতে তিনি বাংলা জয় করেছেন এবং তাঁর বহুসংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছে।[১] তিনি হুমায়ূনের সামনে নিম্নলিখিত শর্তগুলো উপস্থিত করলেন :[২]

১. শের খাঁ মোগলদের বিহার সমর্পণ করবেন।
২. বাংলা শের খাঁ লাভ করবেন এবং সুলতান সিকান্দারের সময়কার সীমাই হবে তাঁর সীমান্ত।
৩. শের খাঁ বাংলা থেকে প্রতি বছর দশ লক্ষ টাকা পাঠাবেন।
৪. শের খাঁ বাংলা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত রাজসিক প্রতীক চিহ্ন মোগল সম্রাটকে পাঠিয়ে দেবেন।
৫. মোগল সম্রাট তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে আগ্রায় ফিরে যাবেন।
৬. শের খাঁ জীবনভর হুমায়ূনের সেবক ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এ সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়া হল[৩] এবং হুমায়ূন শের খাঁর জন্য ঘোড়া ও খিলআত পাঠালেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়ে বাংলা থেকে গৌড়ের পতন সংবাদ এল এবং বাংলার পরাজিত শাসক হুমায়ূনের কাছে এক দূত পাঠালেন। কয়েক দিন পরেই তিনি নিজেই পরাজিত ও আহত হয়ে হুমায়ূনের কাছে এসে

১. ঐ পৃ. ১৬।
২. আব্বাস, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬২।
৩. এ সমস্ত শর্ত হুমায়ূনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা স্পষ্ট নন। আফগান ঐতিহাসিকদের মতে, মোগল সম্রাট এ সমস্ত শর্ত স্বীকার করেছিলেন কিন্তু পরে সুলতান মাহমুদের পৌঁছানোর পর তা অস্বীকার করেন। তারীখে শেরশাহী ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬২-৬৩। জওহরের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সন্ধির শর্তাবলী তখনও নিশ্চিত হয় নি এবং কথাবার্তা চলছিল (জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৬)। গুলবদন বেগমের মতে, হুমায়ূন এসব শর্ত পর্যালোচনা করছিলেন, এমন সময় বাংলার শাসক এসে পৌঁছান (হুমায়ূননামা, বেভারিজ পৃ. ১৩৩)। সম্ভবত, এসব শর্ত মানিয়ে নেওয়ার পর হুমায়ূন ভেবেছিলেন যে, বাংলার সুলতানের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে পুরাতন শর্ত মানিয়ে নেবেন। ইতিমধ্যে, শের খাঁ সন্ধি হবে না ভেবে বাংলা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছালেন। মাহমুদ ও হুমায়ূনের মিলনের পূর্ণ ঘটনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁকে একথাও বিশ্বাস করালেন যে, গৌড় ছাড়াও বাংলার অধিকাংশ ভাগ তাঁর প্রতি অনুগত ছিল। বাংলার খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। তিনি হুমায়ূনের কাছে বাংলা আক্রমণ করে শের খাঁকে পরাজিত করার প্রার্থনা জানালেন। তিনি তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই বিশ্বাসের পরিণামে এবং পরাজিত শাসকের সহায়তার ইচ্ছায় হুমায়ূন নিশ্চিত সন্ধি ভঙ্গ করলেন। সম্ভবত, এ সিদ্ধান্তে শের খাঁর কিছু ব্যবহারও সহায়তা করে থাকবে। কেননা, তখনো পর্যন্ত শের খাঁ কোনো ভূ-ভাগই মোগলদের দেন নি। এবং যখন হুমায়ূনের কর্মচারীরা রোহতাস অধিকার দুর্গ করার জন্য পৌঁছালেন তখন তাঁদের হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। এই পরিস্থিতিতে সন্ধি ভেঙে গেল।

সন্ধি-বার্তা ও বিফলতা সম্বন্ধে কিছু কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। হুমায়ূনের সন্ধি-বার্তা শুরু করা উচিত হয়নি। এতে তাঁর দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। আর তিনি ভুলক্রমে দিলেও সন্ধির শর্তাবলী নিশ্চিত হওয়ার পর তা ভেঙে দেওয়া ঠিক ছিল না। এর ফলে, আফগানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, হুমায়ূন মিথ্যাবাদী এবং তাঁর কথার কোনো বিশ্বাস নেই। শের খাঁ এ সুযোগে লাভবানও হলেন এবং তিনি তাঁর সৈনিকদের বললেন যে, তিনি সর্বপ্রকার সন্ধির জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি মোগলদের সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও মোগলরা সন্ধির জন্য প্রস্তুত নয়, যদিও আফগানরা কেবল থাকার জায়গাই চাচ্ছিলেন, ততটুকু দেয়ার জন্যও মোগলরা প্রস্তুত নয়। তিনি হুমায়ূনের বিরুদ্ধে সন্ধি করার পর তা ভঙের দোষেও দোষী করলেন। অবশেষে তিনি বললেন, এখন যে পরিস্থিতি, তাতে আফগানদের সামনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

হুমায়ূন সুলতান মাহমুদের কথা বিশ্বাস করে নিলেন। তিনি বাস্তব অবস্থা জানার চেষ্টা করলেন না। তিনি চাইলে জানতে পারতেন যে, বাংলায় সুলতান মাহমুদের অধিকার নামে মাত্র রয়ে গিয়েছিল এবং ঐ পরিস্থিতিতে ওখানে যাওয়া ঠিক ছিল না। মাহমুদ হুমায়ূনের আশ্রয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সহায়তা করা ছিল হুমায়ূনের নৈতিক কর্তব্য, কিন্তু প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে সহায়তা করাকে ঠিক বলে অভিহিত করা যায় না। বিশেষত, যখন সন্ধি হয়ে গিয়েছিল, কাউকে সহায়তা দেয়ার জন্য সন্ধি ভঙ্গ করা বা নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করাটা কোনো দিক দিয়েই ঠিক ছিল না।

বাস্তবে শের খাঁ সময় চাচ্ছিলেন, যাতে ধীরে-ধীরে মোগলদের সাহস ও শক্তি তলানিতে এসে ঠেকে এবং তিনি গৌড় থেকে রাজকোষ সরিয়ে ফেলার এবং শক্তি সঞ্চয় করার সময় পেয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূন শের খাঁর এই চাল বুঝতে পারেন নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, বিহার ও বাংলার মধ্যে একটিকে সমর্পণ করার প্রশ্নে বাংলাকে নিজের অধীনে রাখাটাকে শের খাঁ উচিত বলে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন, যদিও তিনি তাঁর জীবনের বিরাট একটা অংশ বিহারেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিহার তাঁর জন্মভূমিও ছিল। বাস্তব অবস্থা দেখে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সন্ধি ভঙ্গ করার দায় হুমায়ূনের উপরেই পড়ে। গুজরাত অভিযানেও তিনি এইভাবে বাহাদুর শাহের সাথে সন্ধি ভঙ্গ করেছিলেন।

হুমায়ূনের বাংলায় প্রবেশ

সন্ধি-বার্তার বিফলতার পর হুমায়ূন মনের থেকে বাংলা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। মুঈদ বেগ, তরদী বেগ, জাহাঙ্গীর কুলি প্রমুখের নেতৃত্বে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈনিকের আগ্রগামী একটি দল আগে আগে চলল। অন্য দলটি স্বয়ং হুমায়ূনের নেতৃত্বে অগ্রণী দলের সাত ক্রোশ পিছে পিছে চলল।[১] কিছু সেনা জলপথে এবং কিছু সেনা স্থলপথে চলল। পাটনা পর্যন্ত হুমায়ূন ঐ পথ ধরে গেলেন যে পথ ধরে বাবুর আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। এই পথ ধরে যাত্রা করার ফলে মোগল সৈন্যরা গঙ্গার নিকটে ছিল এবং সেই সাথেই বাংলা আক্রমণ করার এটাই ছিল সবচেয়ে সরল পথ। পাটনায়, সম্রাটের কিছু সহায়ক বর্ষা ঋতু শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযান স্থগিত করার পরামর্শ দিলেন।[২] সুলতান মাহমুদ এর বিরোধিতা করলেন। তিনি হুমায়ূনকে বোঝালেন, এটা করলে আফগানরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এ মত হুমায়ূনের কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হল এবং তিনি কাসিম হুসেন সুলতানকে পাটনার গভর্নর নিযুক্ত করে[৩] মোগল সৈন্যদের মুঙ্গেরের দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। যে সময়ে হুমায়ূন পাটনায় ছিলেন ঐ সময়ে শের খাঁ নিকটবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। মুঈদ বেগের গুপ্তচররা এ খবর তাদের সেনানায়কদের দিয়ে দিল। মুঈফ বেগের জানা ছিল না যে, শের খাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক কম ছিল। তিনি এমন ভয় পেলেন যেন শের খাঁ মোগল বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে আসছেন। তিনি হুমায়ূনের সাথে পরামর্শ করা উচিত এবং আবশ্যক বলে মনে করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্রাটকে এ খবর জানিয়ে দিলেন। হুমায়ূন আদেশ দিলেন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য। ঐ দিন পুরো খবর পাওয়া গেল না। পরদিন জানা গেল যে, শের খাঁ ঐ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। পথিমধ্যে শের খাঁর সাথে সঈফ খাঁর দেখা হল যিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের রোহতাস দুর্গে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। মোগলরা নিকটে থাকার কারণে শের খাঁ, তাঁকে পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আফগান নেতার জীবন বিপন্ন দেখে সঈফ খাঁ তাঁর পরিবার-পরিজনকে রোহতাস দুর্গে

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫১।
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৫।
৩. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৪-৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শের খাঁর উপর অর্পণ করে স্বয়ং গুগারঘরে মোগলদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

পরদিন মোগলরা শের খাঁর পিছু ধাওয়া করল। কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর তারা দেখল সঙ্গৈফ খাঁ তাঁর ভাইদের সাথে গুগারঘর সড়কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যুদ্ধ হল প্রায় দুপুর পর্যন্ত এবং মোগলরা বিজয়ী হল। সঙ্গৈফ খাঁর তিন ভাই মারা গেলেন এবং তিনি নিজে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বেহোঁশ হয়ে গেলেন। তাঁকে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসা হল। হুমায়ূন তাঁর বীরত্ব ও শের খাঁর প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রশংসা করে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে শের খাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।[১] ইতিমধ্যে শের খাঁর সেখান থেকে ইচ্ছামতো পালিয়ে যাওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। পাটনা থেকে মুঙ্গের হয়ে হুমায়ূন ভাগলপুর পৌঁছালেন।[২] এখান থেকে কোলগাঁও (কহলগাঁও)-এর নিকট তিনি জাহাঙ্গীর কুলি বেগ ও বৈরাম খাঁ প্রমুখকে পাঁচ-ছ' হাজার অশ্বারোহীসহ অগ্রগামী দল রূপে গড়ি পাঠালেন।[৩] পথিমধ্যে, 'কহলগাঁও'য়ের নিকট খবর পাওয়া গেল যে, আফগানরা সুলতান মাহমুদের দুই পুত্রকে হত্যা করেছে। এই দুঃসংবাদ শুনে শোকাবেগ সামলাতে না পেরে সুলতান মাহমুদও মৃত্যুবরণ করেছেন। সুলতানের মৃতদেহ সাদুল্লাপুর এনে সেখানে দাফন করা হল।[৪] হুমায়ূন কহলগাঁও থেকে প্রস্থান করে তেলিয়াগড়ির নিকট পৌঁছালেন।

হুমায়ূনের পূর্বপ্রান্তের অভিযানে বাংলার সুলতানের মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। সুলতানের উপস্থিতিতে হুমায়ূনের বাংলা অধিকার করতে অনেক সুবিধা হত। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর পুত্রদেরও মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে বাংলার সুলতানের পক্ষ নিয়ে বাংলা অধিকার করার বাহানাও শেষ হয়ে গেল।

শের খাঁ তাঁর পুত্র জালাল খাঁকে ১৩,০০০ দক্ষ সৈন্য সহ তেলিয়াগড়িতে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁকে গৌড়ের রাজকোষ রোহতাস দুর্গে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত হুমায়ূনকে সেখান প্রতিরোধ করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। জালাল খাঁকে সহায়তার জন্য তাঁর সেনাপতি খাওয়াস খাঁকেও সেখানে নিয়োজিত রাখলেন। জালাল খাঁ পাহাড়ি পথের প্রান্তে উঁচু স্থানে কামান বসিয়ে নিয়েছিলেন, যা থেকে আগত মোগল সৈন্যদের উপর আক্রমণ করা যেতে পারত। এইভাবে এই পাহাড়ি পথে প্রবেশ করতে মোগলদের খুবই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল।

---

১ কহলগাঁও কালগৌগ, ভাগলপুরে ২৫°১৬' উত্তর ও ৮৭°১৪' পূর্বে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫২। গড়ি সাঁওতাল পরগনার একটি গিরিপথ। উত্তরে গঙ্গা নদী ও দক্ষিণে রাজমহল পর্বতশ্রেণী। আবুল ফজল একে বাংলার দরজা বলেছেন।

৩. মাল গেজেটিয়ার, পৃ. ২০১।

৪. তারীখে শেরশাহী, ইলয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেলিয়াগড়ি থেকে কিছু দূরে হুমায়ূন তাঁর শিবির ফেলেছিলেন। মোগলরা স্ব-স্থান থেকে তাদের উত্তেজিত করতে থাকল যাতে আফগানরা ঐ পাহাড়ি এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। শের খাঁ আফগানদের আগে আক্রমণ না করার আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। জালাল খাঁ ছিলেন নবযুবক এবং মোগলদের অপশব্দ ও ছোট-খাট আক্রমণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন দুপুর বেলা কিছু মোগল সৈনিক আফগানদের উত্যক্ত করার পর তাদের শিবিরে এসে বিশ্রাম করছিল। জালাল খাঁ কামান ও ৬,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ মোগল শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। জুলাই-আগষ্ট ১৫৩৮ খ্রি.। এই যুদ্ধে বৈরাম খাঁ তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করে শত্রুদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। বহু সংখ্যক মোগল সৈনিক ও কিছু বিশিষ্ট মোগল আমীর নিহত হলেন। মোগলরা পরাজিত হল[১] এবং বেঁচে-বর্তে যাওয়া মোগলরা পালিয়ে কোলগাঁও (কহলগাঁও)-এ হুমায়ূনকে এ খবর জানিয়ে দিলেন। ঐ সময়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টি পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলল। জালাল খাঁ গৌড়ের পথ অবরোধ করে রইলেন। এক মাস যাবত আফগানদের প্রতিরোধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মোগলরা সাফল্য লাভ করতে পারল না। ইতিমধ্যে শের খাঁ ঝাড়খণ্ডের[২] পথ ধরে গৌড়ের কোষ রোহতাস সরিয়ে দিলেন এবং জালাল খাঁকে তেলিয়াগড়ি থেকে আফগান সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিলেন। আফগান সৈন্যদের সরে যাওয়ার পর হুমায়ূন বিনা বাধায় গৌড় পৌঁছে গেলেন। এ ছিল হুমায়ূনের বড়ই সৌভাগ্য, কেননা, তেলিয়াগড়ি থেকে উদ্ধবনালা পর্যন্ত (প্রায় ৩৪ মাইল) পাহাড়ি গঙ্গা নদী এত নিকটে ছিল যে, আফগানরা চাইলে মোগলদের পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে পারত।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের বাংলা নিবাস

গৌড়[৩] অধিকার করে নেয়ার পর হুমায়ূনের সামনে গৌড়ের শাসনের সমস্যা এসে দেখা দিল। গৌড় ত্যাগের সময়ে আফগানরা তাকে নষ্টভ্রষ্ট করে দিয়ে

---

১. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫২।

২. ছোটনাগপুর ও বীরভূমের অরণ্যাঞ্চলকে ঝাড়খণ্ড বলা হয়। মুণ্ডারি ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল বা অরণ্য। (ব্লখম্যান, নোট্স ফ্রম মুহম্মাদান হিস্টোরিয়ানস অন ছুটিয়া নাগপুর পাচেট অ্যান্ড পালামউ জ. এ. সোসাইটি, বেঙ্গল, কোলকাতা, ১৮৭১ পৃ. ১১১)। আকবরনামার মতে বীরভূমি ও পচেত থেকে রতনপুর ও রোহতাসগড়, দক্ষিণ বিহার থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে ঝাড়খণ্ড বলা হত। (হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৪৫৩-৫৪)।

৩. গৌড় লখনৌতি বা লক্ষণাবতী নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এটি ২৫°৫২´ উত্তর ও ৮০°১০·৫´ পূর্বে অবস্থিত ছিল। বর্তমান গৌড় একটি টিলামাত্র, যদিও সে যুগে তা পনেরো-কুড়ি মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এখানে বাংলার শাসকদের নির্মিত অনেক ইমরাত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে আদিনা মসজিদ, সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ। এর উত্তর-পশ্চিমে সাদুল্লাপুরে মাহমুদের কবর রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল।[১] এবং বহু মানুষ মারা গিয়েছিল। বহুসংখ্যক মৃতদেহ পড়ে ছিল যাদের অন্তিম সৎকার করার কেউ ছিল না। হুমায়ূন মৃতদেহ সরিয়ে তাদের অন্তিম সংস্কার করালেন এবং নগর সাফাই করলেন। সুলতান মাহমুদের মৃতদেহও আনিয়ে গৌড়ের উপনগর সাদুল্লাপুরে দাফন করানো হল। শাসনের জন্য বাংলাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে হুমায়ূন সেখানে তাঁর আমীরদের নিযুক্ত করে দিলেন।[২] এর পর গৌড়ের নাম পরিবর্তন করে জান্নাতাবাদ[৩] করে দিলেন। বাংলার জলবায়ু তাঁর খুব পছন্দ হল।[৪] এই কাজগুলো ছাড়া হুমায়ূন সংগঠন সম্পর্কিত অন্য কোনো কাজ করলেন না যদিও তিনি সেখানে কয়েক মাস রয়ে গেলেন।[৫]

বিশেষ কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই বাংলা ও বিহার হুমায়ূনের অধিকারের এসে গেল। তেলিয়াগড়ি ছাড়া আর কোথাও যুদ্ধ হল না। সিন্ধুর শাসনকর্তা মির্জা শাহ হুসেন আরগুন মীর আলিকা আরগুনকে এই বিজয় উপলক্ষে হুমায়ূনকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।[৬] এ থেকে প্রতীত হয় যে, গুজরাত থেকে

---

১. "Sher Khan burnt and pillaged the city of Gaur and took possession of sixty millions in gold." (ক্যাম্পোস, হিস্ট্রি অব দি পর্তুগিজ, পৃ. ৪০)। এখানে শের খাঁ বলতে আফগানদের বোঝানো হয়েছে।

২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৮।

৩. গুলবদন, হুমায়ূনামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৪ ; কানুনগো, পৃ. ১৭৮। ফিরিশতার মতে, গৌড় শব্দের ফারসি অর্থ কবর বলে এর নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয় (ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৪)। সম্ভবত, ফিরিশতা এই শব্দটি অনুমান করে নিয়েছেন। স্টীন-গস্‌স-এর ফারসি-ইংরেজি অভিধানে গৌর শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে বিধর্মি, অগ্নিপূজক, কবরখানা, মরুভূমি, শরাব ও আনন্দোৎসব (পৃ. ১১০১)। বাংলার শাসক গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৩৯৬ খ্রি.)-এর মুদ্রায় জান্নাতাবাদ লেখা রয়েছে (স্মিথ ও রাইট, ক্যাটালগ অব কয়েনস্ ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ২, পৃ. ১৫৩, হুমায়ূন একথা জানতেন কি-না তা বলা কঠিন।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৩।

৫. হুমায়ূন গৌড়ে কতদিন ছিলেন, এ বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকরা একমত নন। গুলবদন বেগম (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৪)-এর মতে, তিনি সেখানে নয় মাস থাকেন ; তারীখে আলফি (রিজভী, হুমায়ূন, পৃ. ৫৩)-এর মতে, ১ বছর; বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৪৯)-এর মতে, দু'তিন মাস, নিজামউদ্দীন আহমদ, (দে, ২, পৃ. ১৬৩) ও ফিরিশতা, (বিগস, ২, পৃ. ৮৪-৮৫)-এর মতে, তিন মাস। ড. কানুনগো, (শেরশাহ, পৃ. ১৭৮)-এর মতে, তিনি ন'মাস বাংলায় থাকেন। ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন ১, পৃ. ২২৭)এর মতে, আট মাস (আগস্ট ১৫৩৮ খ্রি. থেকে মার্চ ১৫৩৯ খ্রি. পর্যন্ত) ড. ত্রিপাঠীর মতে, অক্টোবর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌড়ে প্রবেশ করেন এবং জানুয়ারি ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌড় ত্যাগ করেন (ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ১১৩) আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৭) লিখেছেন, যে সময়ে হুমায়ূন গৌড় থেকে রওনা হন সে সময়ে বান আসছিল এবং নদী পানিতে ভরে গিয়েছিল। বেভারিজের মতে (আকবরনামা ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ৩৪১ পাদটীকা-১) হুমায়ূন সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে রওনা হন, ড. কানুনগো (শেরশাহ, পৃ. ১৮০) অনুসারে মার্চ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে গৌড় থেকে রওনা হন।

৬. তারীখে সিন্ধু, পৃ. ১৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলায়নের ফলে মোগলদের মান-মর্যাদার যে ক্ষতি হয়েছিল, এই বিজয় তা কিছুটা কম করে দিয়েছিল এবং মোগলদের যশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গড়ি থেকে জালাল খাঁর সরে আসার পর হুমায়ূন হিন্দালকে, যাঁকে তিরহুত ও পূর্ণিয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর ইচ্ছায় এই অঞ্চলগুলো থেকে মোগল সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী নিয়ে আমার আদেশ দিলেন।[১] হিন্দাল সেখান থেকে বিনা আদেশে আগ্রার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি স্বয়ং বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

হিন্দালের বিদ্রোহের খবর পেয়ে মীর ফখর আলী দিল্লি থেকে আগ্রা এলেন। তিনি হিন্দাল মির্জাকে বোঝানোর প্রয়াস চালালেন এবং অনেক কষ্টে তাঁকে জৌনপুর যেতে রাজি করালেন। ইতিমধ্যে খুসরো বেগ কুকুলতাশ, জাহিদ বেগ, মির্জা নজর ও অন্য কয়েকজন আমীর হুমায়ূনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলা থেকে পালিয়ে মির্জা নূরুদ্দীনের কাছে কনৌজে গিয়ে উঠলেন। তাঁর দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে এঁরাও হিন্দালের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।[২] এসব ঘটনার খবর পেয়ে হুমায়ূন বাহলুলকে[৩] পাঠালেন হিন্দালকে বোঝানোর জন্য। হিন্দাল শেখকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে তাঁর মহলে স্থান দিলেন। বাহলুল তাঁকে বুঝিয়ে নিজের পক্ষে করে নিলেন। চার-পাঁচদিন পর মির্জা নূরুদ্দীন মুহম্মদ কনৌজ থেকে আগ্রায় এসে হিন্দালকে পুনরায় বিদ্রোহের এবং নিজের নামে খুতবা পড়ানোর জন্য প্রস্তুত করিয়ে নিলেন। কিন্তু শেখ বাহলুলের জীবিত থাকা অবস্থায় এসব ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার আশা ছিল না। বাহলুল যখন মির্জা হিন্দালকে পূর্ব প্রান্তে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করছিলেন তখন ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে শের খাঁকে অস্ত্র পাঠানোর পরিকল্পনার এবং তাঁর সাথে পত্রালাপের অভিযোগ এনে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করল। হিন্দালের নামে খুতবা পড়ানো হল।[৪] এবং তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন।

হিন্দালের এই ব্যবহারে তাঁর মা দিলদার বেগম খুবই দুঃখিত হলেন এবং হিন্দাল তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি শোকবস্ত্র (নীল পোশাক) ধারণ করলেন এবং

---

১. তারীখে শেরশাহীর মতে, জালাল খাঁর গড়ি ত্যাগ করার পর হুমায়ূন হিন্দালকে আগ্রায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে গৌড় অভিমুখে রওনা হয়ে যান (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৮)। আবুল ফজলের মতে, হুমায়ূন হিন্দালকে, যাঁকে তিরহুত এবং পূর্ণিয়া প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর প্রার্থনায় এই উদ্দেশ্যে বিদায় করা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর নতুন জায়গিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুসহ বাংলায় পৌঁছে যাবেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫২-১৫৩)। আবুল ফজলের বর্ণনা সঠিক বলে প্রতীত হয়, কেননা, হিন্দালকে ঐ পরিস্থিতিতে, যখন গৌড় অধিকারে আসে নি, তখন পাঠানোটা ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীত হয় না।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৫।

৩. শেখ বাহলুল গোয়ালিয়রের সুপ্রসিদ্ধ সাধক শায়খ গওস সাত্তারির বড় ভাই ছিলেন। বিল, ওরিয়েন্টাল বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারি, পৃ. ২৫৬।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৫ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৩৫০ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৫, তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন কিন্তু হিন্দালের উপর তার কোনো প্রভাব পড়ল না। তিনি আগ্রা থেকে দিল্লি অভিমুখে রওনা হলেন। এ খবর ইয়াদগার নাসির মির্জা ও মীর ফখর আলী দিল্লি পৌঁছে দিয়ে তা রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করলেন। হিন্দালের আগমন সংবাদ পেয়ে নিকটস্থ অধিকাংশ জায়গীরদার তাঁকে অভিবাদন জানালেন। হিন্দাল দিল্লি অবরোধ করলেন। মীর ফখর আলী কামরানকে এ খবর জানিয়ে দিয়ে তাঁকে এখানে আসার জন্য প্রার্থনা জানালেন। কামরান একটি বাহিনী নিয়ে দ্রুত দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্রই হিন্দাল দিল্লির অবরোধ ত্যাগ করে আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। ফখর আলী হিন্দালের প্রতি যতটা সতর্ক ছিলেন তার চেয়েও বেশি সতর্ক ছিলেন কামরানের প্রতি। তিনি কামরানকে দিল্লি অধিকার করার সুযোগ দিলেন না এবং তাঁকে হিন্দালকে ধাওয়া করার জন্য আগ্রা পাঠিয়ে দিলেন। হিন্দাল আগ্রা থেকে আলোয়ারের দিকে চলে গেলেন। দিলদার বেগম ও অন্য মহিলাদের মধ্যস্থতায় হিন্দাল ক্ষমা চাইতে রাজি হলেন। তাঁর গলায় কাপড় বেঁধে তাঁকে কামরানের সামনে উপস্থিত করা হল। এইভাবে হিন্দালের বিদ্রোহ পণ্ড হল।[১] হিন্দালের বিদ্রোহের দুষ্পরিণামের প্রভাব হুমায়ূনের বাংলা অভিযান এবং তাঁর সাম্রাজ্যের উপরেও পড়ল। হিন্দালের জায়গির তিরহুত ও পূর্ণিয়া বাংলায় প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত ছিল। তাঁর পলায়নের ফলে প্রবেশ দ্বারের প্রহরীরাও পালিয়ে গেল। হুমায়ূনের অত্যাবশ্যকীয় রসদসামগ্রী পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ল, যার ফলে তাঁর সৈন্যরা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেল। আগ্রায় বিদ্রোহের ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাও জটিল হয়ে পড়ল। শের খাঁ মোগলদের এই সংকট থেকে লাভবান হলেন এবং জৌনপুর ও বিহারের অন্য স্থানগুলো অধিকার করে নিলেন। দিল্লি ও আগ্রায় মোগল আমীররা হিন্দালের বিদ্রোহের প্রতি এতটা সতর্ক ছিলেন যে, তাঁরা ওদিকে সেনা পাঠাতে পারলেন না। এইভাবে তা শের খাঁর শক্তি-সঞ্চয়ের সহায়ক হয়ে গেল।

হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের সময় শের খাঁর পরিস্থিতি খুব কঠিন ছিল। তাঁর রাজ্যের তিন দিক—পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর মোগল সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। শের খাঁ তাঁর রাজ্যের সংলগ্ন অংশগুলো অধিকার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এইভাবে তিনি বেনারস আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিলেন এবং সেখানকার মোগল হাকিম মীর ফজল আলীসহ ৭০০ মোগলকে হত্যা করলেন।[২] এখান

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৬।

২. ঐ, পৃ. ১৫৩ তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৮ ; জওহর-এর মতে, ৭০০ মোগলকে শের খাঁ হত্যা করেন। তিনি স্থানের উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত, এদের বেনারসে হত্যা করা হয়েছিল। ড. কানুনগোর (শেরশাহ, পৃ. ১৭৫) মত হল, চুনার পতন ও সেখানকার তোপচিদের হস্ত কর্তনের ফলে শের খাঁ এত ক্রুদ্ধ ছিলেন যে, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি এই আচরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি জৌনপুর অবরোধ করলেন। হিন্দু বেগের মৃত্যুর পর বাবা বেগ জলায়র সেখানকার গভর্নর ছিলেন। তিনি জৌনপুরের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন এবং আগ্রা ও গৌড় থেকে সেনা পাঠানোর জন্য পত্র লিখলেন। আফগানরা জৌনপুর অধিকার করতে পারল না।[১] শের খাঁ জৌনপুর ত্যাগ করে কনৌজ পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ চষে বেড়ালেন। হায়বাত খাঁ নিয়াজী, জালাল খাঁ জালু, সরমস্ত খাঁ সেরওয়ানী ও অন্য আফগান আমীররা মিলে বাহরাইচ অধিকার করে নিলেন এবং সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে সম্ভল থেকেও মোগলদের তাড়িয়ে দিলেন।[২] খাওয়াস খাঁকে শের খাঁ খান খানান ইউসুফ খায়েলের বিরুদ্ধে মুঙ্গের পাঠালেন। খাওয়াস খাঁ তাঁকে বন্দি করলেন। যে-ই আফগানদের বিরোধিতা করল, সে-ই মারা পড়ল। এইভাবে দোয়াবের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মোগলদের অধিকার প্রায় শেষ হয়ে গেল।

শের খাঁ এ সমস্ত অংশ শুধু অধিকারই করলেন না ; বরং সেখানে উত্তম শাসনব্যবস্থাও কায়েম করলেন। এইভাবে তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য আমিল ও সুব্যবস্থা কায়েমের জন্য অন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন।

এই সমস্ত এলাকা শের খাঁর অধিকারে এসে যাওয়ার ফলে বাংলা ও আগ্রায় যাতায়াত ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ল।[৩] সম্ভবত, শের খাঁ আগ্রা থেকে বাংলা অথবা বাংলা থেকে আগ্রা যাতায়াতের খবরাখবর আটকে দিয়ে ভুল সংবাদ পাঠাতে থাকলেন। এইভাবে হুমায়ূন বাংলায় কয়েক মাস আটকে রইলেন।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের কারণ

গৌড় অধিকার করার পর হুমায়ূন সেখানে কেন এতদিন থেমে রইলেন ? এ এক ঐতিহাসিক সমস্যা, যা সমাধান করা খুব সহজ নয়। সাধারণত, বাংলা অধিকার করার পর সেখানকার উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তাঁর আগ্রায় ফিরে আসা উচিত ছিল। অবশ্য, বাংলায় লাগাতার যুদ্ধ হতে থাকলে সেখানে তাঁর অবস্থানের প্রয়োজন থাকত কিন্তু এই ধরনের কোনো সঙ্কটও ছিল না। এর বিপরীতে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী মহাসংকটের মধ্যে ছিল। আফগানদের উত্থান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হয়ে চলেছিল এবং তাঁর ভাইদের দৃষ্টি সাম্রাজ্যের উপর নিবদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন কেন এত সময় নষ্ট করলেন ? সমকালীন ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে

১. তারীখে শেরশাহীর মতে, মোগল গভর্নর মারা যান। (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৮)। এ কথা সঠিক প্রতীত হয় না, কেননা, গুলবদন বেগম ও আবুল ফজল চৌসার যুদ্ধের সময়ে সেখানে তাঁর থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৫ : আকবরনামা ১. পৃ. ১৫৮)।
২. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৮।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[১] যা এত সংক্ষিপ্ত যে, তা পুরোপুরি বোধগম্য হয় না। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই কল্পনার উপর নির্ভর করে হুমায়ূনের এই নিবাস সমর্থন করেছেন।[২] ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, মোগলরা শাসনব্যবস্থায় উদাসীনতার পরিচয় দেন এবং শের খাঁর কাছ থেকে তাঁরা সহজে কিছু পথ অধিকার করে নেয়ার ফলে গর্বের নেশায় চুর হয়ে ছিলেন। আফিমের নেশার কারণে হুমায়ূন রাজকার্যের প্রতি বীতশুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শের খাঁর সামরিক গতিবিধির ফলে আগ্রা ও বাংলায় যাতায়াত-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, যার ফলে নিয়মিত খবরাখবর তিনি পাচ্ছিলেন না। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রীও

---

১. জওহরের বর্ণনা মতে, হুমায়ূন ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেলেন এবং গৌড় অধিকারের পর এক মাস কেউ তাঁর দর্শন পেল না। তিনি সর্বদাই একান্ত গৃহে অবস্থান করতেন (জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ, ১৮)। আবুল ফজল লিখেছেন, বাংলার জলবায়ু হুমায়ূনের খুব ভাল লেগে যাওয়াতে তিনি ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেলেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৩)। যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে খবরাখবর শিবিরে পৌঁছাতে পারত না। কোনো খবর বাংলায় পৌঁছালেও তা হুমায়ূনের কাছে পৌঁছে দিতে কারো সাহস হত না, কেননা, তাঁর দুঃখের কারণ বনে যেতে পারে এরকম কোনো সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া নিষেধ ছিল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৭)। নিজামউদ্দীনের বর্ণনানুসারে, হুমায়ূন আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন। (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৬৩)। বদায়ূনীয় বর্ণনানুসারে, বাংলার জলবায়ু হুমায়ূনের খুব ভাল লেগে গেল। তিনি তাঁর নাম রাখলেন জান্নাতাবাদ এবং ওখানেই রয়ে গেলেন। (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৪৯)। ফিরিশতার বর্ণনানুসারে, ওখানকার জলবায়ু খারাপ ছিল, ফলে বহু ঘোড়া ও উট মারা গেল এবং এবং মানুষেরা রুগ্ন হয়ে পড়ল। (ফিরিশতা, ২, পৃ. ১২৫; ব্রিগস, পৃ. ৮৪-৮৫)। ব্রিগসের অনুবাদে উট ও ঘোড়া মরার উল্লেখ নেই। তারীখে আলফির লেখকও বাংলার জলবায়ু খারাপ হওয়ার কারণে ঘোড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (রিজভী, হুমায়ূন, ২, ৫৩)। গুলবদন বেগম লিখেছেন, তিনি গৌড়ে আরাম এবং নিরাপদে ছিলেন (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৪)। খুলাসাত্তাওয়ারিখের বর্ণনানুসারে, হুমায়ূন মহলে অনেকগুলো জশন করেন কিন্তু রাজকার্যের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। তারীখে দাউদীর মতে, শের খাঁ বহুসংখ্যক সুন্দরী নারী উপহার দিয়েছিলেন যার কারণে হুমায়ূন রাজকার্যে বিশেষ মনোযোগী হন নি। মখজানে আফাগেনার মতে, শের খাঁ মহলকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে হুমায়ূন তাতে আনন্দে লীন হয়ে গেলেন (ব্যানার্জি হুমায়ূন, ১, পৃ. ২১৩)।

২. ড. ব্যানার্জি স্বকপোলকল্পিতভাবে, যেমনটি তিনি স্বয়ং লিখেছেন, হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের নিম্নলিখিত কারণগুলো দর্শিয়েছেন (হুমায়ূন, ১, পৃ. ২১৩-১৪)। (১) হুমায়ূন ভাইদের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। আসকারি তাঁর সাথে ছিলেন। সম্রাট আসকারির স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান নি এবং তিনি তাঁর অন্য লোকদেরও বিপদে ফেলতে চান নি। (২) দিল্লি ও গৌড়ের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, যার ফলে তিনি কোনো সংবাদ ঠিকমতো পাচ্ছিলেন না। (৩) তিনি শের খাঁর শক্তি ও বিশেষত, তাঁর সামরিক দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা রাখতেন না। (৪) গৌড় নিবাসের প্রারম্ভিক অবস্থাটি অনুমানত তিনি অসুস্থ ছিলেন। পণ্ডিত লেখকের প্রথম ও চতুর্থ যুক্তিটি কল্পনানির্ভর। হুমায়ূন অসুস্থ হলে তো মোগল ঐতিহাসিকরা সে কথা উল্লেখ করতেন। তিনি কী গুজরাত ও মাণ্ডু অভিযানের সময়ে অসুস্থ ছিলেন? আসকারির অসুস্থতা ও তাঁর সৈন্যদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা থাকলে তাদের জন্য তিনি কী করেছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি পাচ্ছিলেন না।[১] ড. ত্রিপাঠীর মতে, বাংলার শাসন সম্পর্কিত সমস্যা, প্রয়োজনীয় রসদ-সামগ্রীর অভাব, হিন্দালের বিদ্রোহ ও যাতয়াত ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে সঠিক[২] সংবাদ পাওয়ার ব্যর্থতা ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য হুমায়ূনকে বাংলায় অবস্থান করতে হল।

ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীত হয় যে, রাজকার্যের প্রতি হুমায়ূন বীতশ্রদ্ধ হন নি। সিন্ধুর শাসকের দূত মীর আলিফের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। হিন্দালের বিদ্রোহের খবর শুনে তিনি শায়খ বাহলুলকে তাঁকে বোঝানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, অত্যাবশ্যকীয় রাজকার্য তাঁকে করতে হত। আবুল ফজল, জওহর, গুলবদন বেগম সকলেই লিখেছেন যে, সেখানকার জলবায়ু খারাপ ছিল। কথাটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুমায়ূন রাজকার্যে পুরোপুরি মনোযোগী হন নি। এ সময়ে হিন্দাল, যাঁকে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী নিয়ে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, আগ্রায় পালিয়ে যান। পশুখাদ্য ও সৈন্যদের আহারসামগ্রীর অভাব দেখা দেয়, যার ফলে, বহু সংখ্যক পশু মারা পড়ে।[৩] সৈন্যরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়, লোকেরা সুযোগ পেলেই বাংলা ছেড়ে আগ্রার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।[৪] এ সময়ে হুমায়ূন আনন্দ-বিনোদন ও জশন ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন। এ তাঁর চরিত্রের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তিনি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর আগেই নানা রকমের জশন করেছিলেন। স্বভাবগতভাবে হুমায়ূন আনন্দপ্রিয় ছিলেন, যার ফলে শাসনকার্য তিনি এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আমোদ-প্রমোদে তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে, দুঃসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে কেউ যেতেও সাহস পেত না। সম্ভবত, তিনি মস্তি পুরো করার জন্য আফিম সেবনের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন। সম্রাটের সাথে তাঁর হেরেমও ছিল এবং বাংলা অভিযানের প্রারম্ভে তিনি সেখানকার শাসন ব্যবস্থাও ঠিক করে দিয়েছিলেন, এ কারণে তিনি ঐ দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। হুমায়ূন শের খাঁর শক্তির অনুমান করতে পারেন নি। যে ব্যক্তি একবারও প্রকাশ্যে হাত খুলে যুদ্ধ করার সাহস দেখায় নি এবং প্রত্যেকবারই পালাতে থাকে, সে কী মোগল সাম্রাজ্য অধিকার করার স্বপ্ন দেখতেও সাহস করবে? হুমায়ূনের মধ্যে এক ভাল শাসকের গুণ ছিল না, যার কারণে তাঁর বাংলা নিবাস থেকে কোনো লাভ হল না।

---

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১২২-২৩।
২. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল. পৃ. ৯৩।
৩. ফিরিশতা, ২, ফা. পৃ. ২১৭।
৪. যেমন জাহিদ বেগ, খুসরো বেগ, কুকুলতাশ প্রমুখ। আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৪ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট পৃ, ১৮-১৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা অভিযানের ফলাফল

হুমায়ূনের বাংলা অভিযানের দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হল, শের খাঁর দর্প চূর্ণ করা এবং দ্বিতীয় কারণ হল, সুলতান মাহমুদকে বাংলা সিংহাসনে বসানো। মাহমুদের মৃত্যু ও তাঁর পুত্রদের হত্যার ফলে এ লক্ষ্য পুরো হল না। শের খাঁর শক্তিও খর্ব হল না। এর বিপরীতে তাঁর শক্তি আরো বেড়ে গেল। এইভাবে, হুমায়ূনের অভিযান অসফলই বলতে হবে। রাজধানীতে অনুপস্থিতির কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হল। শের খাঁর সাথে সন্ধি ভঙ্গ করার কারণে তাঁর মান অনেক কমে গেল এবং অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য বলে প্রতীত হয়েছিলেন। বাংলা নিবাসের ফলে মোগলদের অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তাঁর সৈন্যদেরও অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। অনুশাসনহীনতা, অস্ত্রশাস্ত্রের অপ্রতুলতা ও পশুমৃত্যু তাঁর সামরিক শক্তিকে হীন করে তুলেছিল।

হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের স্বপ্ন তখনই ভঙ্গ হল যখন তিনি তাঁর রাজধানীর হালচাল ও আফগানদের দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণের খবর পেলেন। সংকটকালীন পরিস্থিতির অনুমান এ থেকে করা যেতে পারে যে, বর্ষার কারণে নদীগুলো পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং পথ অবরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আর এ যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত[১] সময় ছিল না। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন আগ্রা প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন।

বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তন

বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কাউকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা আবশ্যক ছিল। মোগলদের আত্মবল এত কম হয়ে গিয়েছিল যে, প্রারম্ভে কেউই বাংলার গভর্নর পদ স্বীকার করে নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। জাহিদ বেগকে বাংলার গভর্নর পদ গ্রহণ করার কথা বলা হল। তিনি এর জন্য প্রস্তুত হলেন না। তিনি বললেন : "আমাকে হত্যার অন্য কোনো পথ না দেখে আমাকে বাংলায় রেখে যাওয়া হচ্ছে।" হুমায়ূন এতে রুষ্ট হলেন এবং তিনি এখান থেকে পালিয়ে আগ্রায় গিয়ে হিন্দালের সাথে মিলিত হলেন।[২] অবশেষে, ৫,০০০ অশ্বরোহী সেনাসহ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে বাংলায় রেখে হুমায়ূন গঙ্গা নদীর উত্তর উপকূলীয় পথ ধরে আগ্রায় রওনা হয়ে গেলেন।

উত্তরের উপকূলীয় পথ ধরে ফেরার দুটি কারণ ছিল— (১) খাওয়াস খাঁ মুঙ্গের অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং সেখানে মোগল গভর্নর খানে খানান ইউসুফ খায়েলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এইভাবে দক্ষিণ তটের পথ অরক্ষিত

১. আকবরনামা, ১, পৃ.১৫৭।
২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৮-১৯ ; আকবরনামা. ১, পৃ. ১৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গিয়েছিল। (২) শের খাঁর একটি বাহিনী গড়ির পার্বত্য পথ অবরোধ করে রেখেছিল, যা গঙ্গানদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল।

তিনি দিলাওয়ার খাঁ লোদীকে মুঙ্গের সুরক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু খাওয়াস খাঁর বিরুদ্ধে তিনি সফল হতে পারলেন না। আফগানরা মুঙ্গের অধিকার করে দিলাওয়ার খাঁকে বন্দি করল।

আফগানরা তেলিয়াগড়ির কাছে মোগলদের প্রতিরোধ করতে চাইল। বর্ষা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠল। অতিরিক্ত বর্ষার ফলে রাস্তা পিছল ও কাদায় ভরে উঠেছিল, অধিকাংশ ঘোড়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে মারা পড়ে গেল। সেনা সংগঠনও ঢিলা এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।[১]

হুমায়ূন অতিরিক্ত কষ্ট ও কাঠিন্যের ফলে এতটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজের উপরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সম্ভবত, তাঁর এ ভয়ও ছিল যে, তাঁর অন্য আমীররা, বিশেষত আসকারি, তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি আসকারিকে অগ্রণী দলের নেতৃত্বের অনুরোধ জানালেন এবং যে কোনো চারটি বস্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে বললেন। আসকারি তাঁর কাছে ধন, বাংলা থেকে প্রাপ্ত কিছু বহুমূল্য বস্তু, কিছু হাতি ও হিজড়ে চাইলেন।[৪] তাঁর এই দাবির কথা শুনে আমীররা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, ঐ সময়, যখন শের খাঁর সাথে সংঘর্ষ নিশ্চিত ছিল, তখন বীর সৈনিক, ধনসম্পদ ও অভিযানের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার স্থলে অন্য বস্তু চাওয়া উচিত হয় নি। তাদের রায় আসকারির পছন্দ হল এবং তিনি হুমায়ূনের কাছে অন্য তিন বস্তু প্রার্থনা করলেন : (১) সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হোক, (২) সৈনিকদের ভাতা বাড়ানো হোক, (৩) প্রয়োজনানুযায়ী ধন প্রস্তুত রাখা হোক। তিনি অভিযানের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হুমায়ূন তাঁর সমস্ত শর্ত স্বীকার করে নিলেন।

আসকারি গড়ি পার হলেন এবং সেখান থেকে কহলগাঁও হয়ে মুঙ্গেরের কাছে এসে পৌঁছালেন। সৈন্যরা তখনো পর্যন্ত গঙ্গানদীর উত্তর তট ধরে এগিয়ে চলেছিল। মুঙ্গেরের কাছে হুমায়ূন এক যুদ্ধ পরিষদের বৈঠক করলেন। তিনি তাঁর আমীরদের কাছে জানতে চাইলেন উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেকার কোন্ পথ ধরে চলা উচিত? বাহলুল বেগ, মোল্লা মুহম্মদ পরগারী ও অধিকাংশ আমীর উত্তরের তট ধরে চলে যাওয়ার পক্ষে রায় দিলেন। এর বিপরীতে মুঈদ বেগ বললেন, হুমায়ূনের মতো মহান সম্রাটের সেই পথ ধরেই ফিরে যাওয়া উচিত, যে পথ ধরে তিনি বাংলায় গিয়েছিলেন অর্থাৎ, তাঁর নদী পার হয়ে দক্ষিণের পথ ধরে যাত্রা করা উচিত। তিনি যদি তা না করেন তাহলে শের খাঁ এই বলে উপহাস করবেন যে,

---

১. তবকাতে আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৩।

২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২০। এ থেকে আসকারির চরিত্র অনুমান করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট তাঁর ভয়ে উত্তরের পথ ধরেছেন।[১] এই মত হুমায়ূন স্বীকার করে নিলেন এবং নদী পার হয়ে অন্য (দক্ষিণী) তট ধরে যাত্রা করতে লাগলেন।

ঐতিহাসিকেরা হুমায়ূনের পথ পরিবর্তনের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[২] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুমায়ূন আবেগতাড়িত হয়ে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সৈন্যদের অবস্থা ঠিক ছিল না। নদীর অপরাংশ আফগানদের অধিকারে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণের পথে তাকে পদে পদে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। জওহর লিখেছেন, আফগান সৈন্যরা তাঁদের পিছে পিছে আসছিল এবং কখনো কখনো ছোট-খাট যুদ্ধও হয়ে চলেছিল। মোগল সৈন্যদের এই দীন হীন অবস্থায় খবর পেয়ে শের খাঁ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত হলেন।

হুমায়ূনের সিদ্ধান্তের পক্ষে বলা যেতে পারে যে, মোগলরা দক্ষিণী পথের সাথে সুপরিচিত ছিলেন এবং উত্তরের পথ অরণ্যসংকুল হওয়ায় সামনে তেমন সুরিক্ষিত ছিল না। আসকারি এই পথ ধরে প্রত্যাবর্তনের কাঠিন্যের প্রতি সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। দক্ষিণী পথ ধরে মোগলরা চুনার পৌঁছাতে পারত, ঐ সময় পর্যন্ত যার পতন হয় নি। চুনার দুর্গ বড় ছিল, ফলে সেখানে মোগলদের অবস্থা শুধরে নেওয়ার সুবিধা ছিল। এই পথ পরিবর্তনের ফলে শের খাঁ আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার করে রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করলেন। এছাড়া এই পথের সুবিধার কারণে মোগল সৈন্যরাও আরো দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে লাগল।[৩]

দক্ষিণের পথ ধরে যাত্রা করায় হুমায়ূনের বিশেষ সুবিধা হল না। মনেরের কাছে তাঁকে আফগানদের সাথে এক নির্ণায়ক যুদ্ধ করতে হল। পরদিন আফগানরা হুমায়ূনের প্রসিদ্ধ কামান কোহশিকন, রুমী খাঁ যা সাফল্যের সাথে চুনায় দুর্গে প্রয়োগ করেছিলেন, অধিকার করে নিল। হুমায়ূন লোকেদের অস্ত্রশস্ত্রে সুজ্জিত হওয়ায় আদেশ দিলেন।[৪] চারদিন পর হুমায়ূন চৌসা[৫] পৌঁছালেন।

হুমায়ূনের বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় শের খাঁ রোহতাসের নিকটবর্তী এলাকা থেকে তাঁর গতিবিধি নিরীক্ষণ করছিলেন। হুমায়ূনের অগ্রসরতা নিয়ে তিনি আমীরদের সাথে পরামর্শ করলেন। সমস্ত প্রধান আমীর মোগলদের সাথে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন।[৫] এই দেখে যে, আফগানদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য রয়েছে এবং

---

১. আর্সকিন, ২, পৃ. ১৫৫ ; ড. কানুনগো (শেরশাহ, পৃ. ১৮৩) লিখেছেন : "Muyyid Beg proved the evilgenius of Humayun who was, as it were delivered into the hands of the enemy."

২. ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ৯৪।

৩. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২২ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১২৮, পাদটীকা ; কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

৪. চৌসা বিহার রাজ্যে বক্সার তহসিলের একটি গ্রামের নাম। বক্সার থেকে চার মাইল-পশ্চিমে ২৫°৫৪´ পূর্বে কর্মনাশা নদীর পূর্ব তটে অবস্থিত।

৫. শের খাঁর ভাষণ ও এই গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের জন্য দেখুন, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৬৯-৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত। শের খাঁ রোহতাসের পার্বত্যাঞ্চলের বাইরে এলেন এবং মোগলদের প্রতি অগ্রসর হলেন। যে সময়ে হুমায়ূন চৌসার কাছে পৌঁছালেন, প্রায় ঐ সময়েই শের খাঁর বাহিনীও তাঁর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে বিহিরা[১] নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে মাটির বেড়া দিয়ে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগল। দু'পক্ষের সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে কর্মনাশা নদী বয়ে চলেছিল। কাসিম হুসেন সুলতান নিবেদন করলেন ঐ সময়েই আক্রমণ চালানো হোক, কেননা, শের খাঁর সৈন্যরা ক্লান্ত ও অবসন্ন ছিল আর মোগল সৈন্যরা বিশ্রাম করে সতেজ হয়ে গিয়েছিল। এ মত হুমায়ূনের কাছে সঙ্গত বলে প্রতীত হল। কিন্তু ঐ সময়ে মুঈদ বেগ মত দিলেন, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত, বিচলিত হওয়া উচিত নয়।[২] হুমায়ূন এ কথা মেনে নিয়ে যুদ্ধ স্থগিত করে দিলেন।

কামরান আগ্রায় ছিলেন। ওখানকার পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। সেখানে কামরান ও মোগল আমীররা শের খাঁর বিরুদ্ধে হুমায়ূনকে সাহায্যের জন্য চৌসা অভিমুখে যাওয়ারও প্রস্তুতি নিলেন। এই সময়ে কিছু লোক কামরানকে বোঝালেন যে, চৌসা গেলে হুমায়ূন শত্রুদের তো বিনাশ করবেনই কিন্তু তাঁরা (কামরান ও তাঁর সমর্থকরা) ফেঁসে যাবেন।[৩] এসব কথা শুনে কামরান প্রমুখ পুনরায় ফিরে এলেন। যদি এই মোগল বাহিনী সেখানে পৌঁছাতে পারত তাহলে চৌসার যুদ্ধ ও হুমায়ূনের ভবিষ্যতের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেত।

AMARBOI.COM

চৌসার যুদ্ধ

মোগল ও আফগান সৈন্যরা গঙ্গানদীর দক্ষিণ তটে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে অপেক্ষমাণ রইল। দুই বাহিনীর মধ্যে শীর্ণা কর্মনাশা নদী প্রবাহিত ছিল। কর্মনাশা যদিও ছোট নদী ছিল তা সত্ত্বেও তা এত খরস্রোতা ছিল যে, তা সহজে পার হওয়া যেত না। কর্মনাশা ও গঙ্গানদীর সঙ্গম স্থলের শীর্ণা পশ্চিমাংশে আফগানরা জমা হয়েছিল এবং তার প্রশস্ত অংশে মোগলরা ছিল। দু'দলের পরিস্থিতি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আফগানদের অবস্থা মোগলদের

---

১. বিহিরা শাহাবাদ জেলায়, শাহাবাদ তফসিলে অবস্থিত। আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৮ এর মতে, বিহিরা ভোজপুরের নিকট একটি গ্রামের নাম। মখজানে আফাগেনায় একে ভুলক্রমে শতরা বা শুরা বলা হয়েছে। ডর্ন, পৃ. ১১৮, বাবুরনামা, বেভারিজ, ৩৬২-৬৭। বিহিরা ভোজপুর থেকে ২৫ মাইল পূর্বে, বক্সার থেকে পাঁচ মাইল ও ডুমরাঁও থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত।

২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২২-২৩। "Had the emperor of followed the sound advice tendered by the latter. the history or India Humayun commited another blunder in putting off the battle. He could have hoped to succeed by making in immediate attack only." ব্যানার্জি, ১, পৃ. ২২৪।

৩. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও রাস কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ৪৭১ ; ফিরিশতা, ব্রিগস ২, পৃ. ৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলনায় খারাপ ছিল। তারা দুই নদীর মধ্যস্থল ত্রিকোণ অংশের উপরিভাগে পড়ে গিয়েছিল। মোগলরা কর্মনাশা ও গঙ্গানদীর মধ্যভাগকে অবরোধ করার চেষ্টা করলে আফগানরা দুই দিক থেকে নদী ও এক দিক থেকে মোগল সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত এবং এই ত্রিকোণ ভাগ দিয়ে বেরনো কঠিন হয়ে পড়ত, কিন্তু দুভার্গ্যবশত, দু'পক্ষের সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি অবস্থায় তিন মাস (১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত) অবধি দাঁড়িয়ে রইল। এইভাবে তিনটি মাস ব্যর্থ অতিবাহিত হয়ে গেল।[১]

শের খাঁর যুদ্ধ স্থগিত করার কয়েকটি কারণ ছিল। তিনি খাওয়াস খাঁকে তৎক্ষণাৎ সসৈন্য এসে পৌঁছানোর জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শক্তি সঞ্চয়ও করে চলেছিলেন। শের খাঁর দৃষ্টি আকাশের উপরেও ছিল যাতে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। এছাড়া তিনি উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায়ও ছিলেন, এমন সুযোগ, যাতে আফগানরা মোগলদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারে। তিনি তখনো পর্যন্ত মোগলদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ছাড়া তাদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

চৌসা পৌঁছানোর পর মোগলদের সৈন্যদের অবস্থা ভাল ছিল না। কামরানের আগ্রায় নিবাসের কারণে সৈন্যদের মধ্যে আশংকা বিরাজ করছিল।[২] রসদসামগ্রী ছাড়াও পশুখাদ্যেরও অভাব ছিল। ইতিমধ্যে চুনার থেকে মীরাক বেগ ও জৌনপুর থেকে বাবা বেগ জলায়র আফগানদের ভয়ে পালিয়ে চৌসায় পৌঁছালেন। এরফলে, সহায়তা অবশ্যই পৌঁছাল কিন্তু সেই সাথে রসদসামগ্রী ও পশুখাদ্যেরও অভাব বৃদ্ধি পেল।[৩] আফগানদের দ্বারা পরাজিত হয়ে চুনার এবং জৌনপুর থেকে ফিরে আসা মোগল সৈনিকদের, চৌসার ময়দানে অপেক্ষমাণ মোগল সৈনিক ও সেনাপতিদের মানসিক অবস্থা ও সাহসের উপর কী প্রভাব পড়ল, আমরা সে বিষয়ে অনুমান করতে পারি। সৈন্যদের শোচনীয় অবস্থা দেখে হুমায়ূন সহায়তা লাভের জন্য এক দ্রুতগামী দূতকে আগ্রায় পাঠালেন কিন্তু আগ্রায় চলমান অবস্থার ফলে সেখান থেকে কোনো প্রকার সাহায্য পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে হুমায়ূন পুনরায় সন্ধিবার্তা শুরু করলেন। সন্ধিবার্তার জন্য হুমায়ূন শায়খ খলীলকে[৪] শের খাঁর কাছে তাঁর দূত করে পাঠিয়ে দিলেন। যে সময়ে হুমায়ূনের

---

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২৩ এর মতে, দু'পক্ষের সৈন্য দু'মাস পর্যন্ত পরস্পর সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হায়দার মির্জা (তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭০), বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১,পৃ. ৩৫০) ও ফিরিশতা (ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৫)-এর মতে তিন মাস।

২. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬৮।

৩. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৬।

৪. বদায়ূনীর (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫-৫১) মতে হুমায়ূন শায়খ আজীজকে পাঠান। পরে শের খাঁ শায়খ খলীলকে পাঠান। আব্বাসের মতে (ইলয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭১) হুমায়ূন শায়খ খলীলকে পাঠান। ইনি প্রসিদ্ধ সাধক হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকরের বংশধর ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূত পৌঁছান সে সময়ে হুমায়ূন জামার হাতা গুটিয়ে হাতে বেলচা নিয়ে জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে তাঁর সৈন্যদের সাথে মাটি কাটার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দূতকে দেখেই তিনি হাত ধুয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করে মাটিতেই বসে পড়লেন এবং সন্ধির কথাবার্তা শুরু করলেন। এমনও প্রতীত হয় যে, সন্ধির শর্তাবলীও নিশ্চিত হয়ে গেল। এ অনুসারে সিদ্ধান্ত হল যে, শের খাঁ সম্পূর্ণ বাংলা ও বিহারে তাঁর পুরাতন জায়গীর ফিরে পাবেন ; শের খাঁ হুমায়ূনের অধীনতা স্বীকার করে নেবেন এবং তাঁর নামে খুতবা পড়াবেন ও মুদ্রা চালাবেন ; চুনারের দুর্গও শের খাঁ লাভ করবেন।

এই ভেবে যে, কেউ যেন জানতে না পারে যে, মোগলরা দুরবস্থায় পড়ে সন্ধি করছেন, হুমায়ূন শের খাঁকে বললেন যে, তিনি নদীর ভাগটি ছেড়ে দিন যাতে মোগল সৈন্যদের কর্মনাশা নদী পার হতে কোনো অসুবিধা না হয়। এর অতিরিক্ত তিনি একথাও স্বীকার করালেন যে, নদীর পূর্ব তটে শের খাঁ ও তাঁর সৈন্যরা মোগলদের ধাওয়া খাওয়া জনিত কারণে কিছু দূর পর্যন্ত পিছু হটে যাবে।[১] এটা এই কারণে করা হল যাতে মোগলদের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং একথা প্রতীত হয় যে, আফগানরা তাদের শক্তিহীনতার কারণে পরাজিত হয়েছে।

হুমায়ূন এই ধরনের শর্ত কেন রাখলেন ? তাঁর কী শের খাঁ-র নিয়তের প্রতি সন্দেহ ছিল ? এ কী কেবল ঔপচারিক ছিল ? এ কথা বলা কঠিন। শের খাঁ মোগলদের এই ধরনের শর্ত কেন স্বীকার করে নিলেন ?[২] পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে একথা স্পষ্ট যে, তিনি কেবল লোক দেখানোর জন্য এটা করেছিলেন। শের খাঁ হুমায়ূনকে বিশ্বাস

ইনি সবার সামনে শের খাঁকে সন্ধির জন্য বোঝালেন। এর মধ্যে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "যদি তুমি শান্তি না চাও তাহলে যুদ্ধ করো।" শের খাঁ এর জবাবে বললেন, আপনি যা কিছু বলছেন তা আমার জন্য মঙ্গলজনক। তারপর পারিতোষিক দিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে একান্তে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আফগানরা তাঁর পূর্ব পুরুষদের বড়ই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তিনি তাঁকে খুশি করে তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধ না শান্তি—এ বিষয়ে রায় জানতে চাইলে শের খাঁ-র চালাকিতে তিনি ফেঁসে গেলেন, স্বীকার করলেন যে, হুমায়ূনের অবস্থা খারাপ ছিল এবং যুদ্ধটাই আফগানদের জন্য লাভপ্রদ। আব্বাসের মতে, এই পরামর্শের পর শের খাঁ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। জওহর ও আব্বাসের মতে, হুমায়ূন শায়খ খলিলকে শের খাঁ-র কাছে পাঠান। ফিরিশতা, নিজামউদ্দীন আহমদ ও বদায়ূনীর মতে, শের খাঁ শায়খ খলিলকে পাঠান (জওহর, স্টুয়ার্ট, ২৩ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৭ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬৮; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫১)। জওহর সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আব্বাস এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এঁর কথা সত্য বলে প্রতীত হয়। ড. ত্রপাঠি, (রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ৯৫) লিখেছেন, মোগলদের অবস্থা ভাল ছিল এবং সন্ধিবার্তা শের খাঁ শুরু করেছিলেন।

১. তারিখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭১।

২. বদায়ূনী, (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫১)-এর মতে, শের খাঁ কুরআনের শপথ নিয়ে এসব শর্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জওহর (স্টুয়ার্ট, পৃ. ২৩) এর মতে, সন্ধি হয়ে গেল। ফিরিশতার মতে, দুই দলই শপথ করে সন্ধি স্বীকার করে নেন (ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৭) তবকাতে আকবরী দে, ২, ৬৯)-তে কেবল এতটা লেখা হয়েছে যে, সন্ধি নিশ্চিত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করানোর জন্য মোগলদের শিবিরে আগমনকারী খাদ্যশস্য আনা নেয়ার পথে বাধা দেয়া বন্ধ করে দিলেন। হুমায়ূনও নদী পার হওয়ার জন্য পুল বানানোর আদেশ দিয়ে দিলেন। শের খাঁ ইতিমধ্যে খাওয়াস খাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন। খাওয়াস খাঁও ৩০ মে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছে গেলেন। খাওয়াস খাঁর পৌঁছানোর পর শের খাঁ প্রচার করে দিলেন যে, ঝাড়খণ্ডের চেরুহ দলপতি বা জমিদাররা তাঁর উপর আক্রমণ করতে আসছে। তিনি তাঁর সৈনিকদের প্রস্তুত করিয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে প্রায় আট মাইল এগিয়ে গেলেন। তারপর চেরুহ দলপতি এখনো অনেক দূরে—এই কথা বলে পুনরায় ফিরে এলেন এবং পরদিনও এইভাবে গিয়ে আবারো এই কথা বলে ফিরে এলেন। পাঁচ ছ'দিন ধরে শের খাঁ এইভাবে যুদ্ধাভ্যাস করতে থাকলেন।[১] এর ফলে, মোগলদের বিশ্বাস জন্মে গেল যে, শের খাঁ চেরুহ দলপতির উপর আক্রমণ করছেন। এইভাবে শের খাঁর সৈনিকদের যুদ্ধাভ্যাসও হয়ে গেল এবং রাতের বেলা কোনো প্রকারের হই-হট্টগোল ছাড়াই আক্রমণ করার অভ্যাসও তৈরি হয়ে গেল।

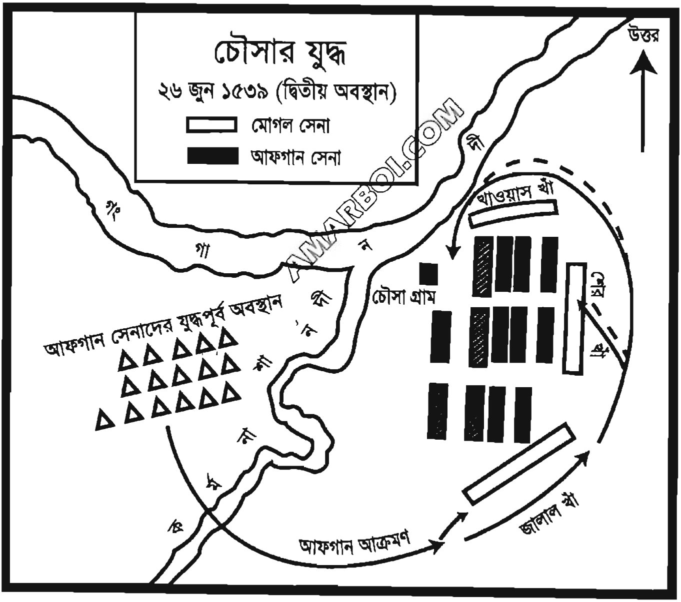

১. মখজানে আফাগেনার মতে, পাঁচ-ছ'দিন যাবত ; আব্বাসের মতে কেবল দুই দিনই তিনি এইভাবে যুদ্ধাভ্যাস করলেন (ডর্ন, পৃ. ১২০ ; ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭২)। শের খাঁ যে দলপতির উপর আক্রমণ চালান, তার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৪৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে পানি বাড়তে বাড়তে কর্মনাশা নদীর জলস্তরও বেড়ে গেল। চেরুহ দলপতির উপর শের খাঁর আক্রমণের খবর পেয়ে হুমায়ূন ঐ যুদ্ধের ফলে নিজেকে তটস্থ রাখার কথাও ঘোষণ করলেন। হুমায়ূনের এই চিন্তাধারা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে প্রতীত হয়, বিশেষত, এই কারণে যে, তিনি এখানেও ঐ প্রকারের আচরণ করলেন যেমনটি গুজরাত অভিযানের সময়ে চিতোর সম্পর্কে করেছিলেন।

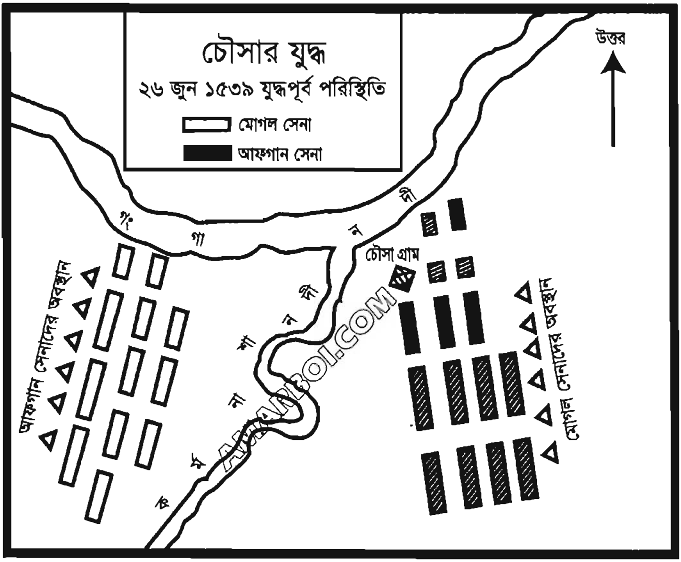

সপ্তম দিনে শের খাঁ ঐ রকমেরই যুদ্ধাভ্যাস করলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন সকালে শের খাঁ খাওয়াস খাঁকে একদল নির্বাচিত সৈনিককে দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন, যেন তিনি চেরুহ দলপতিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। শেখ খলীল পত্র মারফত হুমায়ূনকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, খাওয়াস খাঁ সসৈন্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন, সেজন্য সম্রাটকে সতর্ক থাকা উচিত। যাতে তিনি তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে না দেন।[১] কিন্তু হুমায়ূন এদিকে মনোযোগ দিলেন না এবং ঐ রাতে মোগল সম্রাট নিশ্চিন্ত থাকলেন।

রাত্রে শের খাঁ তাঁর সৈন্যদের একত্রিত করে মোগল সৈন্যদের অন্য দিক থেকে নীরবে রওনা হয়ে গেলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি তাঁর প্রধান

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ২৪ ; কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ১৯২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপতিদের নিয়ে একটি সভা করলেন। সকালে প্রস্থানকারী খাওয়াস খাঁ তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন। শের খাঁ মোগল সম্রাটের ধোঁকাবাজি, আফগানদের প্রতি তাঁর মনোভাব, তাঁর আনুগত্য ইত্যাদির বর্ণনা করে অবশেষে বললেন, যুদ্ধ ছাড়া আফগানদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। সমস্ত সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা মোগলদের পরাজিত করার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত।[১] আরো কিছু দূর যাওয়ার পর উৎসাহিত আফগান সৈন্যরা মোগল শিবিরের দিকে ফিরতে শুরু করল (২৬ জুন ১৫৩৯ খ্রি.)।[২]

মোগল সৈন্যরা শের খাঁর গতিবিধি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। আফগানদের চেরুহ সরদারের সাথে যুদ্ধব্যস্ততা ও সন্ধি হয়ে যাওয়ার নিশ্চিন্ততায় মোগল সৈন্যরা সুখ নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। রাতের বেলা পাহারার দায়িত্ব ছিল মুহম্মদ জামান মির্জার উপর। এমন সংকটকালে এমন ব্যক্তিকে, যিনি সিংহাসনারোহণের পর নিরন্তর হুমায়ূনের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন, এমন ব্যক্তির উপর এই দায়িত্ব দেয়া হুমায়ূনের অদূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রমাণ।

আফগানরা তাদের সৈন্যদের তিনভাগে বিভাজিত করল। প্রথম দল শের খাঁর পুত্র জালাল খাঁর, দ্বিতীয় দল শের খাঁর ও তৃতীয় দল খাওয়াস খাঁর নেতৃত্বে ছিল।[৩] আফগানরা কর্মনাশা নদী পার হয়ে মোগলদের উপরে আক্রমণ চালাল। তারা নদীর পুল অধিকার করে নিল। জালাল খাঁ কর্মনাশা নদীর দিককার অংশে, শের খাঁ তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে মোগল সৈন্যদের মধ্যভাগে এবং খাওয়াস খাঁ গঙ্গানদীর নিকটস্থ অংশে আক্রমণ চালালেন। তাঁদের দুই দিকে ছিল নদী এবং অন্য দিকে আফগান সৈন্যরা।

মোগল সৈন্যরা এতটা বেখবর ছিল এবং আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, মোগলরা ঘোড়ার জীন কসার এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার মতোও সময় পেল না।[৪] আক্রমণের খবর পেয়ে হুমায়ূন প্রস্তুত হয়ে বাইরে এলেন। মোগল সৈন্যদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল এবং তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। হুমায়ূন শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি নদীর পুল ভেঙে দেয়ার আদেশ দিলেন। এর পরিণাম খুবই ভয়ঙ্কর হল, কেননা, পরাজিত

AMARBOI.COM

---

১. শের খাঁর ভাষণ ইত্যাদির জন্য দেখুন, তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭৩-৭৪।

২. চৌসার যুদ্ধ কোন দিন হয়েছিল এ বিষয়ে ড. কানুনগো (শেরশাহ, পৃ. ১৯৪) ২৭ জুন ; ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, ১, পৃ. ২২৮) ; ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন, পৃ. ১৩৪) ও ড. যদুনাথ সরকার (মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, পৃ. ৬৩) ২৬ জুন বলে স্বীকার করেন। বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫২)-এই ঘটনাকে ৯৪৬ হিজরি এবং এর তারিখের জন্য এই শ্লোক লিখেছেন : 'সলামত কুঅদ বাদশাহ কসে।' জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ.আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৯ এ এর তারিখ ৯ সফর, ৯৪৬ হি. (২৬ জুন ১৫৩৯ খ্রি.) দিয়েছেন। বেভারিজ আকবরনামার ইংরেজি অনুবাদের ৭ জুন ১৫৩৯ খ্রি. দিয়েছেন, যা সঠিক নয়।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৯।

৪. ঐ, পৃ. ১৫৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে হুমায়ূন যখন পালাতে চাচ্ছিলেন, এই পুল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে, তাঁর পক্ষে পালানো এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

হুমায়ূন মোগল সৈন্যদের, আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু মাত্র ৩০০র মতো সৈনিক তাঁর নাকাড়ার আওয়াজ শুনে তাঁর কাছে আসতে পারল। এই সৈনিকদের বলেই হুমায়ূন শের খাঁর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে আফগানদের এক হাতি ঘায়েল করে দিলেন, নিজেও বড় রকমের চোট পেলেন।[১] হুমায়ূন যুদ্ধ করে তাঁর ভাগ্য নির্ণয় করে নিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর কিছু বুদ্ধিমান সাথী দেখলেন যে, এ এক ধরনের আত্মহনন, তখন তাঁরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁকে রণক্ষেত্রের বাইরে বের করে আনলেন। অনেক কষ্টে হুমায়ূন নদী তীর পর্যন্ত পৌঁছালেন। কিন্তু পুল ভেঙে দেওয়াতে নদী পার হওয়া সহজ ছিল না। হুমায়ূন তাঁর ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিলেন কিন্তু নদী এতই খরস্রোতা ছিল যে, তাঁর জন্য নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে নিজাম নামক ভিশতির মশকের সহায়তায় হুমায়ূন নদীর অপর তীরে গিয়ে পৌঁছালেন।[২] যে সময়ে হুমায়ূন নদী পার হচ্ছিলেন, এই কঠিন পরাজয়ের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তাঁর দার্শনিক মস্তিষ্ক শান্ত ছিল। তিনি ঐ ভিশতির নাম জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, তার নাম নিজাম ভিশতি। তখন তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন যে, তার নাম নিজামউদ্দীন আউলিয়াই[৩] হবে। হুমায়ূন নিজামকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে,

AMARBOI.COM

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২৫।

২. হুমায়ূনের নিজামের দ্বারা সাহায্য লাভের ঘটনার বিবরণে সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। জওহরের মতে, হুমায়ূন নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যান। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি মশক ফুলিয়ে তাঁকে দেখিয়ে বলে যে, 'হে বাদশাহ মশক ধরে তীরে উঠে আসুন।' তারই সাহায্যে হুমায়ূন নদী পার হন। জওহর তার নাম জিজ্ঞাসা ও তাকে সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন। (স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ২৫-২৬)। নিজামউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, সম্রাট তাঁর ঘোড়াকে নদীতে নামিয়ে দেন এবং অর্ধেকটা ডুবে যেতেই তিনি এক ভিশতির সহায়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং পানি থেকে উঠে আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে যান (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬৯১)। আবুল ফজলের মতে, হুমায়ূন পুলের নিকট পৌঁছান। সেখানে পুল ভাঙা ছিল। তিনি ঘোড়াসহ নদীতে লাফিয়ে পড়েন। তিনি ঘোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নিজাম ভিশতির মশকের সহায়তায় নদী পার হন। তিনি ভিশতির নাম জিজ্ঞাসা ও সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯৫)।

৩. হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লির সুলতানী আমলের প্রসিদ্ধ সাধকদের অন্যতম ছিলেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন। দিল্লিতে তাঁর মাজার রয়েছে যে এলাকাটি তাঁরই নামে নিজামউদ্দীন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এঁর জীবনীর জন্য দেখুন, হাবিব হযরত আমীর খসরু অব দেহলী, পৃ. ২৯-৪০ ; এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম এ, পৃ. ৯৩২ ; বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস, ড. খলীক আহমদ নিজামীর লেখা 'হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া' নামক জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি রাজসিংহাসনে বসলে তাঁকে অর্ধেক দিনের বাদশাহ বানিয়ে দেবেন।[১] নদী পার হওয়ার পর হুমায়ূন আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

চৌসার যুদ্ধের ফলাফল

চৌসার এ ভাগ্য-নির্ধারক যুদ্ধ শের খাঁকে শক্তির চরমোৎকর্ষে পৌঁছে দিল। এই যুদ্ধে হুমায়ূন পরাজিত হলেন এবং তাঁর সৈন্যরা ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এর ফলে মোগলদের সুনামও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। বাবুরের আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে এটাই ছিল মোগলদের প্রথম পরাজয়।

এই যুদ্ধে কিছু প্রধান আমীর নিহত হন। মুহম্মদ জামান মির্জা, যিনি হুমায়ূনের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করেছিলেন, পালানোর চেষ্টা করেন কিন্তু নদীতে ডুবে মারা যান। এছাড়া প্রধান আমীরদের মধ্যে মওলানা মুহম্মদ পরগলী, মওলানা কাসিম আলী সদর ও থাট্টার মওলানা জালালও ছিলেন।[২] বাবা বেগ জলায়র ও কুচ বেগকে হুমায়ূন তাঁর রানী বেগা বেগমকে নিরাপদে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বেগমের শিবিরের কাছে এঁরা সবাই নিহত হন। এঁদের ছাড়াও প্রায় আট হাজার মোগল সৈন্য এ যুদ্ধে নিহত হয়।[৩]

কয়েকজন মহিলাও এই যুদ্ধে হয় মারা যান নয় পানিতে ডুবে যান নতুবা নিখোঁজ হয়ে যান। গুলবদন বেগম এঁদের মধ্যেকার কয়েকজন মহিলার নাম দিয়েছেন। হুমায়ূনের দুই পত্নী— চাঁদ বিবি ও শাদ বিবি—হুমায়ূনের প্রথম বেগম বেগা বেগমের কন্যা আকিকা ও সুলতান হুসেন বাইকরার কন্যা আয়েশা বেগম এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই নিখোঁজ মহিলাদের অতিরিক্ত শের খাঁ হুমায়ূনের প্রধানা পত্নী বেগা বেগমকে বন্দি করলেন। শের খাঁ যুদ্ধের সময়েও বেগা বেগমকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং হুকুম জারি করেন যে, কোনো অবস্থাতেই যেন মোগল নারী-শিশুদের হত্যা ও অসম্মান করা না হয় এবং যাঁদেরই পাওয়া যাবে তাঁদের যেন বেগা বেগমের শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় চার হাজার মহিলা জমা হয়ে গেলেন।[৪]

যে সময়ে হুমায়ূন বেগা বেগমের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ পান, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সন্ধানের জন্য চারজন প্রধান আমীরকে পাঠিয়ে দেন কিন্তু ঐ যুদ্ধে তরদী বেগ ছাড়া আর সমস্ত আমীর নিহত হন এবং তরদী বেগ ফিরে এসে পরিস্থিতির খবর দেন। পরে শের খাঁ বেগমকে হুমায়ূনের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, তাঁদের কোনো অমর্যাদা করা হয় নি। বেগা বেগম পরে হাজী বেগম নামে প্রসিদ্ধ হন। সম্রাট আকবর

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৫৯।
২. ঐ।
৩. ফিরিশতা, ব্রিগস ২, পৃ. ৮৮।
৪. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭৫-৭৬ ও পৃ. ৩৭৪ এর প্রথম পাদটীকা ; চৌসায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ও মৃত মোগল মহিলাদের জন্য দেখুন, গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৬-৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে বড়ই সম্মান করতেন এবং হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তিনি আকবরের রাজত্ব কালে দিল্লিতে হুমায়ূনের মকবরা নির্মাণ করিয়ে দেন।

এই যুদ্ধ শের খাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা ও বিহারের অধিপতি বানিয়ে দেয়। এ ছিল মোগলদের সাথে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। পূর্বের আশঙ্কা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি যে কোনো মুহূর্তে মোগলদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করতে পারতেন। অজেয় মোগলদের পরাজয় আফগানদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং শের খাঁর নেতৃত্বে তারা কঠিন হতেও কঠিনতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।[২]

চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনের পরাজয়ের কারণ

চৌসার যুদ্ধে মোগলরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। তাদের বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক হয় মারা গেল নতুবা বন্দি হল। যারা বেঁচে-বর্তে গিয়েছিল তারা এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। মোগল আমীর ও মহিলাদেরও পূর্ণরূপে বাঁচানো গেল না। স্বয়ং মোগল সম্রাট অনেক কষ্টে কয়েকজন সাথীকে নিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। আফগানরা মোগলদের শক্তি এমনভাবে চূর্ণ করে দিল যে, যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রইল না।

নিজের সৈন্যদের অব্যবস্থাই ছিল হুমায়ূনের পরাজয়ের প্রথম কারণ। বহু সংখ্যক ঘোড়া মারা গিয়েছিল নতুবা অসুস্থ ছিল। বাংলায় দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে সৈনিকদের মধ্যে শিথিলতা এসে গিয়েছিল। তাদের পানাহারের ব্যবস্থাও ঠিক ছিল না। এইভাবে যুদ্ধের সময়ে যে ধরনের ঝারঝরে শারীরিক-মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়, তা তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ছিল না।

চৌসার ময়দানে তিন মাস অবস্থান করে হুমায়ূন শের খাঁকে তাঁর সৈন্য সংগঠনের সুবর্ণ সুযোগ দান করেছিলেন। এই তিন মাস সেখানে অবস্থান করাটা মোগলদের জন্য মোটেও লাভজনক ছিল না। আগ্রা থেকে কোনো সাহায্য আসতে পারল না। এর বিপরীতে কামরান ও আসকারির আগ্রার কাছে অবস্থান করার ফলে হুমায়ূন ও তাঁর অনুগত আমীরদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এর বিপরীতে হুমায়ূন পথ বদল করে নদী পেরিয়ে আফগানদের কাছে তাঁর হীনাবস্থার কথা জানার সুযোগ করে দিয়ে নিজের সৈন্যদের সংকটের মধ্যে ফেলে দেন।

সন্ধির বাতাবরণ ও এই বিশ্বাস যে, শের খাঁর সাথে তাঁর আর যুদ্ধ করতে হবে না। মোগলদের এমনভাবে নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে, তাঁরা রাত্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করলেন না। আফগানদের আক্রমণের সময়ে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তা এটাই ছিল যে, হুমায়ূন ঐ রাত্রির নিরাপত্তার দায়িত্ব মুহম্মদ জামান মির্জার উপরে অর্পণ করেছিলেন ; তা-ও এমন ব্যক্তিকে, যিনি হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের পর বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেছিলেন, এমন

২. কানুনগো শেরশাহ, পৃ. ১৯৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা কোনো দিক দিয়েই ঠিক ছিল না। হুমায়ূনের ভাগ্যের সাথে মুহম্মদ জামান মির্জার কীসের প্রয়োজন ছিল? আফগানদের আক্রমণের সময়ে তিনি একেবারেই বে-খবর ছিলেন।

চৌসার পরাজয় শের খাঁর প্রথম শ্রেণীর সেনাপতির গুণাবলী প্রদর্শন করে। তিনি সর্বদিক দিয়েই নিজের বাহিনীকে প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যদের ধৈর্য ও সাহস চূড়ান্ত অবস্থায় বিরাজিত ছিল এবং রসদ সামগ্রীরও অভাব ছিল না। শের খাঁ তাঁর সৈন্যদের রাত্রি বেলায় আক্রমণ করার প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন, 'যুদ্ধে মানুষদের নয়' ; বরং 'মানুষ'-এর গুরুত্ব রয়েছে। শের খাঁ এই যুদ্ধে এই বাক্যকে সর্বাংশে সার্থক করে তুলেছিলেন।

এ কথা বলা যে, শের খাঁর প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার কারণে হুমায়ূন পরাজিত হন[১] একথা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। হুমায়ূন স্বয়ং সন্ধি-বার্তা ভঙ্গ করে মনের থেকে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। গুজরাত অভিযানে দুর্গে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এখন শের খাঁও যদি তাঁর সাথে ঐ ধরনের ব্যবহার করেন তাহলে এতে আশ্চর্য বা দুঃখের কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। শত্রুর প্রতি সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত। চৌসার রণক্ষেত্রে মোগলরা যে ধরনের নিশ্চিন্ততা প্রদর্শন করে, তা পরিস্থিতির প্রতি তাঁদের উদাসীনতার প্রমাণ।

AMARBOI.COM

চৌসা থেকে আগ্রা

নিজাম ভিশতির মশকের সাহায্যে হুমায়ূন গঙ্গানদী পেরিয়ে অপর তীরে বীরপুরের কাছে পৌঁছালেন। সেখান থেকে চুনার এলেন।[২] এখানে তিনদিন থাকার পর অগ্রসর হলেন। এখানে গহোরের শাসক রাজা বীরভান তাঁর সাথে আরাইলের[৩] কাছে সাক্ষাত করলেন। তিনি হুমায়ূনকে বড়ই সাহায্য করলেন। হুমায়ূনের সাথীরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। রাজা তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর ব্যবস্থা করলেন। হুমায়ূন পাঁচ ছ' দিন এখানে অবস্থান করলেন। খবর এল যে, আফগান সৈন্যরা হুমায়ূনের পিছু ধরে তাঁর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। তখন বীরভান তাঁর পাঁচ ছ' হাজার সৈন্য দিয়ে আফগান সৈন্যদের পথ রোধ করলেন। এরফলে, হুমায়ূন অগ্রসর হওয়ার আরো সুবিধা পেয়ে গেলেন।

---

১. "But to these causes of victory we must also add his utter lack or scruples. He felt no qualms of conscience in breaking his word and sanctioning arrangements which were contrary to his declared intentions" (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৩৬)

২. হুমায়ূন চৌসা থেকে চুনার এসেছিলেন কি-না একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেবল গুলবদন বেগমই লিখেছেন যে, তিনি চুনারে তিন দিন অবস্থান করেন (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৫)। পথিমধ্যে, হুমায়ূন সারনাথে চৌখণ্ডী স্তূপের কাছে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানকার এক শিলালিপি থেকে একথা প্রমাণিত হয়। (বাংলা পাস্ট অ্যান্ড প্রোজেক্ট, খণ্ড ৬৩, পৃ. ১১-১৭)।

৩. আরাইল এলাহাবাদ জেলার করছানা তহশিলে, এলাহাবাদ দুর্গের অপর দিকে, যমুনা নদীর ডান কিনারে নৈনী স্টেশনের কাছে অবস্থিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাইল থেকে হুমায়ূন কড়া পৌঁছালেন। কনৌজের নিকটবর্তী গঙ্গা নদীর তটবর্তী এলাকা আফগানরা অধিকার করে নিয়েছিল। এজন্য এ পথ সুরক্ষিত ছিল না। গঙ্গাতট ছেড়ে হুমায়ূন যমুনা তটের পথ ধরে কালপি হয়ে আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁর সৈনিকরা তাঁকে ছেড়ে একে একে পালিয়ে যাচ্ছিল। যে আমীর ও সৈনিকেরা তাঁর সাথে ছিলেন তাদের হৃদয়ের সেই সততা, সহানুভূতি ও আনুগত্য আর ছিল না ঐ মুহূর্তে যার প্রয়োজন হুমায়ূনের খুব বেশি ছিল। কালপিতে কাসিম করাচার পুত্র হুমায়ূনের জন্য অত্যধিক উপহার (উপঢৌকন)-এর ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তাঁর পিতা, যিনি হুমায়ূনের সাথেই আসছিলেন, তাতে বাধ সাধলেন। এই কারণে কেবল নামমাত্র উপহার সামগ্রী হুমায়ূনের সামনে পেশ করা হল। হুমায়ূন একথা জেনে ফেলেছিলেন, সেজন্য তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি সেই উপহার-সামগ্রী থেকে কেবল মাত্র একটি সোনার জড়োয়া লাগানো জীন— তাও আবার কামরানকে দেয়ার জন্যই গ্রহণ করলেন, আর কোনো বস্তু নিতে তিনি অস্বীকার করলেন।[১]

আগ্রায়

হুমায়ূনের আগ্রা পৌঁছানোর[২] খবর কারো জানা ছিল না। সবার আগে তাঁর সাক্ষাৎ হল কামরানের সাথে। একে অন্যকে দেখামাত্রই দুই ভাই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন।[৩] ঐ দিন হুমায়ূন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন ; এঁদের মধ্যে গুলবদন বেগমও ছিলেন। তিনি গুলবদন বেগমকে বললেন, বাংলা অভিযানের সময়ে তো চিন্তা করছিলাম তোমাকে সাথে নিয়ে গেলে ভাল হত, কিন্তু সেখানকার অবস্থা দৃষ্টে মনে হল আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে, তোমাকে নিয়ে যাই নি। হিন্দালের মা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে হুমায়ূন হিন্দালকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে আলোয়ার থেকে ডেকে পাঠানো হল এবং অতীতের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে সংকটকালে ঐক্য স্থাপিত হল। কামরান ও আসকারি তো সেখানে ছিলেনই, মুহম্মদ সুলতান মির্জা তাঁর পুত্রদের নিয়ে আগ্রায় পৌঁছালেন। তাঁকেও ক্ষমা করে দেয়া হল। এইভাবে আগ্রার সমস্ত প্রধান আমীর ও মহিলারাও উপস্থিত হয়ে গেলেন। হুমায়ূনও শের খাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসমাগ্রী একত্রিত করার কাজে নেমে পড়লেন।

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ২৭।

২. চৌসা থেকে আগ্রায় পৌঁছাতে হুমায়ূন বেশি সময় লাগান নি। হায়দার মির্জার মতে, হুমায়ূন সফর ৯৪৬ হি.তে (১৮ জুন ১৫৩৯ খ্রি. থেকে ১৭ জুলাই ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়) আগ্রায় পৌঁছান। তারীখে রশীদী (ইলিয়াস ও রাস পৃ. ৪৭১)। ড. কানুনগোর মতে, আগ্রা পৌঁছাতে তিনি ১৩ দিন সময় লাগান, অর্থাৎ তিনি ১০ জুলাই আগ্রা পৌঁছান (শেরশাহ পৃ. ১৯৭ টিপ্পনী)। হুমায়ূন পথে তিন দিন চুনার ও পাঁচ দিন আরাইলে অবস্থান করেন। হুমায়ূন কী মাত্র পাঁচ দিনেই এই যাত্রা সম্পন্ন করেন ? এ সম্ভব বলে প্রতীত হয় না। তাঁর এর চেয়ে বেশি সময় লেগে থাকবে।

৩. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৭০ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজাম ভিশতি

হুমায়ূনের আগ্রা পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে নিজাম ভিশতিও এসে পৌঁছালেন। হুমায়ূন তাঁকে আধা দিনের জন্য রাজসিংহাসনে বসতে দিলেন। শাসন সংক্রান্ত কিছু আদেশ দেওয়ার অধিকারও তাঁকে দেওয়া হল এবং তিনি যে সমস্ত আদেশ দিলেন তা পালন করতে দেওয়া হল।[১] আমীর ও অন্যান্য লোকেরা তাকে অভিবাদন জানাল। কামরান অসুস্থতার ভান করে দরবারে গেলেন না। হুমায়ূন এতে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি হুমায়ূনকে বলে পাঠালেন, শের খাঁ যেখানে নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছেছিল সেখানে এই ধরনের কাজ মোটেও উচিত ছিল না। ভিশতিকে অধিক হতেও অধিকতর পুরস্কার ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারত কিন্তু তাঁকে সিংহাসনে বসানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।[২] কামরানের কথায় অনেক যুক্তি ছিল। নিজাম একজন খুবই সাধারণ এবং নিম্ন স্তরের ব্যক্তি ছিলেন। এমন ব্যক্তিকে মোগল সিংহাসনে বসানো এবং আমীরদের দ্বারা তাঁর অভিবাদন করানোর ফলে মোগল সিংহাসনের মর্যাদা হানি হয়। হুমায়ূনের এ কাজ একটি হাস্য-পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হল। এ ছিল একটি আবেগ-প্রসূত কাজ। যে ব্যক্তি হুমায়ূনের জীবন বাঁচিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে তিনি আবদ্ধ ও ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিলেন। হুমায়ূনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে আদর্শ বলে অভিহিত করা যেতে পারে কিন্তু প্রশাসনিক দৃষ্টিতে তা উচিত ছিল না।

AMARBOI.COM

বিচার-বিবেচনা

হুমায়ূন ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আগ্রায় পৌঁছালেন। এই সময় থেকে নিয়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে পুনরাক্রমণের সময় (মে, ১৫৪০ খ্রি.) পর্যন্ত হুমায়ূন প্রায় দশ মাস আগ্রায় থাকলেন। এই সময়টি তিনি যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও শের খাঁর বিরুদ্ধে সংযুক্ত মোর্চা গঠনের পেছনে ব্যয় করলেন। এই সময়টি কী ব্যর্থ চিন্তাভাবনা করে বরবাদ করা উচিত ছিল ? যদি তাই না হয়, তাহলে হুমায়ূন এই সময়টিতে কী করলেন ?

চৌসা থেকে ফেরার পর হুমায়ূন স্বয়ং চল্লিশ দিন অসুস্থ ছিলেন।[৩] সম্ভবত, চৌসার যুদ্ধ তাঁকে মানসিকভাবে এমনই বিধ্বস্ত করে তোলে যে, তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। চৌসার যুদ্ধে তিনি কিছু আঘাতও পেয়েছিলেন, যার ফলে, তাঁর কষ্ট আরো বেড়ে গিয়েছিল। এইভাবে আরো কিছু দিন কেটে গেল।

---

১. আবুল ফজল 'নীম রোজ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬০)। গুলবদন বেগমের বর্ণনা আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে ভিন্ন। গুলবদনের মতে, নিজাম দু'দিন যাবত সিংহাসনে আসীন থাকেন এবং যা তিনি চাচ্ছিলেন তা তাঁকে দিতে দেয়া হল। আমীরদের তাঁকে অভিবাদন করতে হত (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪০)। জওহরের মতে (স্টুয়ার্ট, পৃ. ২৭) তাঁকে কেবল দু'ঘণ্টার জন্যই সিংহাসনে বসানো হয়।

২. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪০।

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৩৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরানের বাহিনীতে কুড়ি হাজার দক্ষ সৈন্য ছিল। তিনি যদি এই বাহিনী নিয়ে হুমায়ূনের সেবায় উপস্থিত হতেন তাহলে আশা করা যায় যে, হুমায়ূন আফগানদের উপর চৌসার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু কামরান তাঁর সৈন্যদের হুমায়ূনের সাহায্যার্থে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ চাইলেন। হুমায়ূন এ আদেশ দিলেন না এবং বললেন, 'শের খাঁ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সেজন্য তার প্রতিশোধ আমি নেবো।' এইভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা হতে পারল না।[১]

হুমায়ূন কামরানের আক্রমণের বিরোধিতা কেন করলেন ? হুমায়ূনের রাজত্বকালের শুরুতে কামরানের ব্যবহার ভাল ছিল না। হুমায়ূন তাঁকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। হুমায়ূনের এত তাড়াতাড়ি বাংলা থেকে ফেরার অন্যতম কারণও ছিল রাজধানীতে কামরানের উপস্থিতি। হুমায়ূনের ভয় ছিল কামরান শের খাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ হলে তাঁর শক্তি বেড়ে যাবে এবং তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। ঐ সময়ে তিনি হুমায়ূনের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতি উপস্থিত করতে পারতেন। এছাড়া কামরানকে পাঠালে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যেত এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টিতে হুমায়ূন এক শক্তিহীন মানুষ বলে প্রতিপন্ন হতেন। হুমায়ূনের স্বয়ং যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে তাঁর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখা যায়। বাস্তবে এ হুমায়ূনের প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ছিল।[২] কামরান তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের বাহিনীকে হুমায়ূনের নেতৃত্বে দিতে রাজি ছিলেন না। হুমায়ূনের পরাজয়ের পর কামরান তাঁকে অযোগ্য বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁর ধারণা ছিল হুমায়ূন শের খাঁকে পরাজিত করতে পারবেন না। হুমায়ূনের নিজাম ভিশতিকে সিংহাসনে বসানোর কারণেও কামরান খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই কাজের জন্য হুমায়ূনকে তিনি ক্ষমা করেন নি। এছাড়া কামরানের পরামর্শদাতা খ্বাজা কলাঁ কোনো অবস্থাতেই গাঙ্গেয় অঞ্চলে অভিযান চালানোর রায় দেন নি এবং একথা কামরানও স্বীকার করে নেন। বাস্তবিকই, দুই ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্‌ভাবনার অভাব ছিল। এমন পরিস্থিতিতে কামরানের আশঙ্কা ছিল হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবহার

১. আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে এমনও প্রতীত হয় যে, প্রারম্ভে, কামরান শের খাঁর বিরুদ্ধে নিজের নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একথা হুমায়ূনের কাছে গৃহীত না হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সৈন্যদের দিলেন না এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লাহোর চলে গেলেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬১-১৬২)। জওহর এ বিষয়ে কিছু লেখেন নি। বদায়ূনী (খণ্ড ১, পৃ. ৩৫৩-৫৪) ও লিখেছেন যে, কামরান নিজের নেতৃত্বে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন। তা অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি পঞ্জাব চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নিজামউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বের প্রশ্নের বর্ণনা দেন নি। ফিরিশতার বর্ণনাও নিজামউদ্দীনের সমান।

২. ড. ত্রিপাঠীর মত ভিন্ন। তাঁর মতে : "Humayun had an experience of the Strength and resourcefulness of Sher Khan. He did not therefore, encourage Kamran to invite a conflict with him untill full preparations were completed. Moreover, it was not wise to stake the troops of Kamran which appeared to be the only effective force then available." (রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ৯৭)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারেন। এছাড়া কামরানের নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও সেনাবাহিনীর আবশ্যকতা ছিল। ইরানী সৈন্যরা কিছুকাল পূর্বেই দু'বার কান্দাহার আক্রমণ করেছিল। তাঁর নির্বাচিত সৈনিকদের দলটি নিঃশেষ হয়ে গেলে এই অঞ্চল অধিকারে রাখা সহজ ছিল না। কামরানের কাবুলে অনুপস্থিতির সময়ে মধ্য এশিয়ার উজবেক নেতা উবাইদুল্লাহ খাঁ মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১] তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতার অভাবে সেখানে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল। কামরান সম্ভবত, নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে মধ্য এশিয়ার উপর নজর রাখতে চাচ্ছিলেন। এছাড়া উবাইদুল্লা খাঁর কারণে কামরানের সীমান্তে ইরানী আক্রমণের ভয় ছিল।

হুমায়ূনের বাংলা নিবাসের সময়ে কামরান আগ্রায় এসেছিলেন কিন্তু তিনি মীর ফখর আলীর সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি হিন্দালকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সমর্থ হন এবং হুমায়ূনের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এরকম কাজ তিনি করেন নি। তিনি চাইলে ২০,০০০ সৈনিকের সাহায্যে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করার চেষ্টা করতে পারতেন কিন্তু তিনি তেমন কিছুই করেন নি। তা সত্ত্বেও তিনি কেন হুমায়ূনের সামরিক সাহায্য দিলেন না ? সম্ভবত, নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাঁর মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি পালিয়ে পঞ্জাব চলে যেতে চাচ্ছিলেন, যাতে নিজের ভূ-ভাগ তিনি নিজেই রক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া দুই ভাইয়ের বিরোধের মূল কারণ ছিল কামরানের সৈন্য ব্যবহার করা নয় ; বরং নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।

ইতিমধ্যে, কামরান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভারতের জলবায়ু তাঁর জন্য খুব অনুকূল ছিল না। দু'টি মাস অসুস্থ থাকার ফলে তিনি তাঁর হাত-পা ঠিকমতো নাড়াচাড়াও করতে পারতেন না।[২] তাঁর রোগ এতটা বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি এতটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে চেনাও যেত না এবং তাঁর বেঁচে থাকার আশাও খুব কম ছিল।[৩] প্রসিদ্ধ হাকিম আবুল বকার চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সামলে উঠলেন। অসুস্থতার ফলে তাঁর মনে এ সন্দেহও জেগে উঠল যে, হুমায়ূন ও তাঁর বিমাতারা মিলে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর এ সন্দেহের কথা জানতে পেরে হুমায়ূন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে শপথ করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলেন যে, তাঁর এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। তবুও কামরানের একথা বিশ্বাস হল না। তিনি লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হুমায়ূনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ঐ পরিস্থিতিতে হুমায়ূন শুধু তাঁকে অনুমতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; বরং তিনি তাঁর

---

১. আহসানাত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ২৯৪-৩০৩।

২. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও রাস, পৃ. ৪৭২। ফিরিশতার মতে, তাঁর অসুস্থতার কারণ ছিল পানাহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি। যার কারণে তিনি পেচিস (রক্তাতিসার) রোগে আক্রান্ত হল (ব্রিগস, ২. পৃ. ৮৯)। নিজামউদ্দীন আহমদ তাঁর রোগ সম্পর্কে 'আমরাজে মুতাজাদা' অর্থাৎ, একে অন্যের বিরুদ্ধে রোগ বলে অভিহিত করেছেন। (তবকাতে আকবরী, ফা, পৃ. ৪৪)।

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪০-৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনায় মনোযোগই দিলেন না। কিন্তু কামরান যাওয়ার জন্য বারবারই জিদ করতে থাকলেন। কামরান হায়দার মির্জাকে তাঁর পক্ষ টেনে নিলেন এবং সমস্ত রাজকার্য তাঁর উপর অর্পণ করলেন। তিনি হায়দার মির্জাকে লাহোর যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন "এমন পরিস্থিতিতে, যখন শত্রুরা আমার রাজ্যের উপরে এবং রোগ আমার শত্রুর উপরে প্রভূত্ব স্থাপন করে নিয়েছে আর আমি রুগ্ন হয়ে গেছি, ভ্রাতৃভাবের হাত আমার দিকে বাড়াবেন না এবং এই দুই মহা সংকট থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমাকে লাহোর পৌঁছে দিন।"[১] হুমায়ূন যখন এ খবর পেলেন তখন খুবই চিন্তিত হলেন। অত্যন্ত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কামরানকে বললেন, "শের খাঁ ও মোগল সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। এই যুদ্ধের উপর বাবুরের সাম্রাজ্য ও তাঁর পুত্রদের ভাগ্য নির্ভর করছে। হায়দার মির্জা লাহোর চলে গেলে তো তিনি সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে যাবেন এবং বেঁচে যাবেন কিন্তু বাকি সবাই মারা পড়ে যাবে। হুমায়ূনের পরাজয়ের পর লাহোরের পতন খুব বেশি দেরি হবে না।" তিনি হায়দার মির্জাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর দায়িত্ব শুধু কামরানের প্রতি নয় ; বরং সবার প্রতি রয়েছে। তিনি যদি এইভাবে চলে যান তাহলে সবাই বলবে যে, হায়দার মির্জা কঠিন সময়ে বাবুরের বংশধরদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন নি।[২]

হুমায়ূনের অনুরোধে হায়দার মির্জা থেমে গেলেন কিন্তু এতে কামরান খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি লাহোর যাওয়ার পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর জিদ দেখে হুমায়ূন তাঁর প্রতি অনুরোধ করলেন, তিনি যদি যেতেই চান তাহলে যান তবে তাঁর সৈন্যদের রেখে যান। কামরান এর জন্যও প্রস্তুত হলেন না। তিনি প্রথমে খ্বাজা কলাঁকে লাহোর পাঠিয়ে দিলেন এবং নামমাত্র কিছু সৈন্য রেখে[৩] নিজেও চলে গেলেন। সওদাগর ও অন্য লোকেরা নিজেদের পরিবার-পরিজন প্রভৃতিদেরও কামরানের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। কামরান গুলবদনকেও লাহোরে যাওয়ার জন্য বললেন। প্রথমে তিনি রাজি হন নি কিন্তু পরে হুমায়ূনের কথায় তিনিও তাঁর সাথে চলে গেলেন।[৪] কামরানের এইভাবে হুমায়ূনকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রেখে চলে যাওয়ার ফলে মোগলদের মানসিক অবস্থা ও সাহসের উপর অত্যন্ত মন্দ প্রভাব পড়ল। সবচেয়ে

AMARBOI.COM

---

১. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও রাস, পৃ. ৪৭২-৭৩।

২. ঐ পৃ. ৪৭৩-৭৪ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬২।

৩. হায়দার মির্জার মতে, কামরান ইস্কান্দার সুলতানের নেতৃত্বে এক হাজার সৈনিক রেখে গিয়েছিলেন (তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭৪)। ফিরিশতা এ কথা সমর্থন করেছেন (ব্রিগস, ২. ৮৯)। আবুল ফজলের মতে, কামরান তিন হাজার লোক মির্জা আবদুল্লাহ মোগলের নেতৃত্বে রেখে গেলেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬২)। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, প্রারম্ভে তিনি তো নিজের সৈন্যদের রেখে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু মাত্র দু'হাজার সৈনিক আগ্রায় রেখে সৈন্যদের নিয়ে লাহোর চলে গেলেন (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৭১)।

৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪১-৪২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় দুর্ভাগ্যের কথা হল, যে সময়ে কামরান রওনা হয়ে গেলেন সে সময়ে শের খাঁর অগ্রগামিতার ভয়ংকর খবর এলো। হায়দার মির্জা, যিনি ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, স্পষ্টা লিখেছেন যে, কামরান মির্জার প্রস্থানের সাথে সাথেই শের খাঁর সৌভাগ্যের উন্নতি ও চুগতাইদের শক্তির অবনতি শুরু হয়ে গেলে।[১] আবুল ফজলও কামরানের এই কাজের নিন্দা করেছেন।[২] তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ তো এটা ছিল যে, তিনি নিজে শুধু গেলেন না ; বরং অন্য ব্যক্তিদের হুমায়ূনের কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তাঁর লাহোর চলে যাওয়ার প্রভাব এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লোকেরা পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল। শের খাঁর আতঙ্ক এত বেশি ছিল যে, তাঁর কাছে কেউ গেল না। ভয় ও আতঙ্ক যুদ্ধের প্রথম পরাজয় সূচিত করে। মোগলদের হতোৎসাহ তাদের পরাজয়ের সংকেত দিচ্ছিল।

এইভাবে হুমায়ূন প্রায় দশ মাস সময় নষ্ট করলেন। তিনি তাইমুর বংশীয়দের, বিশেষত, তাঁর নিজের ভাইদের আপন পক্ষে টেনে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ; কিন্তু তিনি সফল হতে পারলেন না। পারস্পরিক মতভেদ, তাঁর অলস স্বভাব ও অসুস্থতা তাঁর আগ্রায় এত দিন থেমে থাকার প্রধান কারণ ছিল।

চৌসার যুদ্ধের পর শের খাঁর গতিবিধি

চৌসার বিজয় আফগানদের উৎসাহ ও খ্যাতি আকাশে পর্যন্ত পৌঁছে দিল। শের খাঁ তা সত্ত্বেও নিজের সময় বরবাদ করলেন না। চৌসার যুদ্ধের পর তিনি খাওয়াস খাঁকে বিহার অভিমুখে চেরুহ দলপতির বিরুদ্ধে ও জালাল খাঁ বিন জালু ও হাজী খাঁ বটনীকে বাংলার দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং হুমায়ূনের পিছু ধাওয়া করে অগ্রসর হয়ে গেলেন।[৩] তিনি গঙ্গা নদী পেরিয়ে কনৌজ পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করে নিলেন। চৌসার বিজয়ের পর তিনি বরমজীদ গৌড়কে[৪] সসৈন্যে হুমায়ূনের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। শের খাঁ সম্ভবত হুমায়ূনকে বন্দি করতে চাচ্ছিলেন না। এই কারণে তিনি তাঁর পিছু ধাওয়া করতে ততটা সক্রিয়তা দেখালেন না কিন্তু গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী ভূ-ভাগে তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

শের খাঁর সেনানায়করা (হাজী খাঁ বটনী ও জালাল খাঁ বিন জালু) গৌড় অবরোধ করলেন। মোগল সেনাপতি জাহাঙ্গীর কুলি বেগ তা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু আফগান সৈন্যদের আধিক্য থাকায় এবং আগ্রা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায় তিনি দুর্গ খালি করে দিলেন। তিনি আগ্রা অভিমুখে রওনা

১. তারীখে, রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭২।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬১-৬২।
৩. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৩৭ ; ডর্ন, হিস্ট্রি অব দি আফগানস, পৃ. ১২৩।
৪. বরমজীদ গৌড় এক আফগান মুসলমান ছিলেন। ড. কানুনগোর এই মত যে, তিনি রাজপুত ও তার নাম ব্রহ্মাজিত বা ব্রহ্মাদিত্য ছিল (শেরশাহ, পৃ. ২২৫, ৩৬৯) সঠিক নয়। দেখুন, হোদীওয়ালা, ১, পৃ. ৪৫৭-৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ নাশ করা হবে না— আফগানদের এই আশ্বাসে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। এই সময়ে বিহারে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে শের খাঁও গৌড় পৌঁছে গেলেন। আফগানরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না এবং পাঁচ হাজার মোগল সৈনিকসহ, আগ্রা প্রত্যাবর্তনের সময়ে হুমায়ূন যাঁদের রেখে এসেছিলেন, শের খাঁর আদেশে তাদের হত্যা করা হল।[১] খানে খানান ইউসুফ খায়েলকেও, আফগানরা মুঙ্গেরে যাঁকে বন্দি করে রেখেছিল, হত্যা করা হল। খাওয়াস খাঁও চেরুহ সরদারকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য নষ্টভ্রষ্ট করে দিলেন।

এইভাবে শের খাঁ বাস্তবে এক বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনি শুধু আফগানদের নেতাই রয়ে গিয়েছিলেন এবং বিধিসম্মত স্থান তখনো তিনি পান নি। তিনি গৌড়ে 'আল সুলতান উল আদিল' উপাধি ধারণ করলেন, তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং তাঁর নামে খুতবা পড়ানো হল। এইভাবে তিনি রাজত্ব গ্রহণ করলেন এবং শের খাঁ থেকে শেরশাহ হয়ে গেলেন।[২]

পূর্ণরূপে সুলতান হওয়ার জন্য তাঁর আগ্রা অধিকার করা আবশ্যক ছিল। খিজির খাঁকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে শের শাহ হুমায়ূনের সাথে শেষ যুদ্ধটি করার জন্য ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে বাংলা থেকে রওনা হয়ে গেলেন। ইলাহাবাদের কাছে পৌঁছে তিনি তাঁর পুত্র কুতুব খাঁকে, মালবের জায়গীরদার ও আগ্রা এবং দিল্লিতে বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করতে মাণ্ডু পাঠালেন। তিনি স্বয়ং কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। মালব, সারঙ্গপুর ও মাণ্ডুর শাসক মল্লু খাঁ রায়সীন ও চান্দেরির শাসক পুরণমল ও অন্য কিছু জায়গীরদার, সম্ভবত ঈসা খাঁকে সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কুতুব খাঁর চান্দেরি অভিমুখে প্রস্থানের খবর পেয়েই হুমায়ূন ইয়াদগার নাসির মির্জা, কাসিম হুসেন খাঁ উজবেক ও ইস্কান্দার সুলতানকে এক বাহিনীসহ তাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন।[৩] মালবের দলপতিরা মোগলদের আগমনের খবর পেয়ে কুতুব খাঁকে সাহায্য করলেন না। কুতুব খাঁ সূর মোগলদের কাছে পরাজিত ও নিহত হলেন। শের খাঁ তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে খুবই শোকাহত হলেন। তিনি মালবের দলপতিদের, যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেন নি, তাদের কখনোই ক্ষমা করেন নি এবং পরে তিনি এর প্রতিশোধ নিলেন। কুতুব খাঁর পরাজয়ের ফলে মোগলদের উৎসাহ কিছুটা বেড়ে গেল।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬০ ; তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৭৮।

২. শের খাঁ কোথায় নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। এর বিবেচনার জন্য দেখুন, কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২০০-২০৮।

৩. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ আব্বাসের বর্ণনার ভিত্তিতে লিখেছেন যে, আসকারি ও হিন্দালকে পাঠানো হল (হুমায়ূন, পৃ. ১৪২), বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫৪), নিজামউদ্দীন আহমদ (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৬২), ফিরিশতা (ব্রিগস, ২, পৃ. ৮৯)। আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬১)-এর মতে, ইয়াদগার নাসির মির্জা, কাসিম হুসেন সুলতান ও ইস্কান্দার সুলতানকে পাঠানো হয়। একথা সত্য বলে প্রতীত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের আগ্রা থেকে প্রস্থান

শের খাঁর কনৌজ অভিমুখে প্রস্থানের খবর পেয়ে হুমায়ূন আগ্রা থেকে রওনা হলেন (মে, ১৫৪০ খ্রি.)। তিনি অবশ্যই সেনা একত্রিত করলেন কিন্তু তাড়াতাড়ির কারণে সৈন্যদের সংগঠিত করতে পারলেন না। এর বিপরীতে কামরান ও অন্য কিছু আমীর চলে যাওয়াতে নিরাশার বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। বীরভান (যিনি আরাইল থেকে হুমায়ূনের সাথে আগ্রা এসেছিলেন) তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শের খাঁর সাথে যুদ্ধ করার স্থলে মোগল সেনাদের পন্না রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে ঠিকমতো প্রশিক্ষিত করে নেওয়ার পরই শের খাঁর উপর আক্রমণ চালানো হোক। হুমায়ূন এ পরামর্শ স্বীকার করলেন না। বীরভানের পরামর্শের অনেকটাই বিবেচনাযোগ্য ছিল কিন্তু শের খাঁর নিরন্তর অগ্রগামী শক্তির সামনে আগ্রা ছেড়ে যাওয়ার অর্থই ছিল বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা। হুমায়ূন এ কারণে শের খাঁর সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। বীরভানের পরামর্শ থেকে আমরা মোগল সৈন্যদের বাস্তব অবস্থার অনুমান করতে পারি।

আগ্রা থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন কনৌজের কাছে ভোজপুর[১] নামক স্থানে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। গঙ্গার অপর পারে শের খাঁ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। মোগলরা গঙ্গানদী পেরিয়ে গঙ্গার ঘাটের উপর এক পুল নির্মাণ করলেন। আফগানরা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। ছোট একটা সংঘর্ষও হল।[২] হুমায়ূনের সৈন্যরা নদী পার হল না এবং নদীর কিনারা ধরে আরো অগ্রসর হয়ে কনৌজের কাছে শিবির স্থাপন করল। আফগানরা নৌকায় করে মোগলদের ধাওয়া করে চলেছিল। মোগলদের তাদের উপর কামান চালাতে হল। আফগানরা এবার আর ভয়ভীত ছিল না এবং তারা যুদ্ধের জন্য বড়ই লালায়িত ছিল। মোগলদের কনৌজে পৌঁছানোর ফলে দু'দল সৈন্য পরস্পর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গেল।

হুমায়ূন গঙ্গাতীরে পৌঁছাতেই শের খাঁ এক দূত মারফত বলে পাঠালেন যেহেতু উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেহেতু দু'পক্ষেরই নদীর একটি পারে চলে যাওয়া উচিত। তিনি বলে পাঠালেন, হুমায়ূন নদী পার না হলে আমরা পার হতে প্রস্তুত। নদী পেরুনোর সময়ে অন্য পক্ষের সৈন্যরা কয়েক মাইল পিছিয়ে যাবে, যার ফলে আক্রমণের ভয় আর না থাকে। হুমায়ূন শের খাঁর এই কথাকে এক প্রকারের সতর্ক

---

১. ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, ভোজপুর কনৌজ থেকে ৩১ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল (হুমায়ূন, পৃ. ১৪৩) ; ড. ব্যানার্জির (হুমায়ূন, ১, পৃ. ২৪০, পাদটীকা) মতে ২৩ মাইল।

২. আবুল ফজল লিখেছেন, ১৫০ জন মোগল সৈনিক আফগানদের বড় একটা সেনাদলকে পরাজিত করে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলো। তারপর, আফগানরা গর্দবাজ নামক হাতি দিয়ে পুল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল এবং তার স্তম্ভগুলো ভেঙে দিল। ঐ সময়ে মোগলরা কামান দাগল, যার ফলে হাতির পা কেটে গেল এবং শত্রুরা পরাজিত হল (আকবরনামা, ১, পৃ, ১৬৩)। সম্ভবত, এ নির্ণায়ক যুদ্ধ ছিল না এবং পুল ভেঙে আফগানরা মোগলদের নদী পার হতে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী বলে মনে করলেন এবং নিজেই নদী পার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হুমায়ূনের নদী পেরুনোর সময় শের খাঁ দশ বারো মাইল পিছিয়ে গেলেন। হুমায়ূনের নদী পেরুনোর সময়ে শের খাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে ঐ সময়ে আক্রমণের কথা বললে তিনি তার জবাবে বললেন, এটা করা উচিত হবে না। এই কথা থেকে শের শাহের বীরত্ব ও মহত্ত্বের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

হুমায়ূনের নদী পেরুনোটা তাঁর রণনীতির জন্য খুব একটা সহায়ক বলে প্রতীত হয় না। নদী পেরুনোর সময়ে মোগলদের বাস্তব অবস্থার একটা ধারণা আফগানরা লাভ করল। এর অতিরিক্ত নদী পেরুনোর পর যে স্থানে মোগলরা তাদের শিবির স্থাপন করল সেখানকার ভূমি ছিল নিচু, যার ফলে বর্ষা শুরু হওয়ার পর তাঁরা বড়ই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। হুমায়ূন নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মূলত আবেগের বশে, যাতে আফগানরা তাঁদের কাপুরুষ মনে না করে। এর অতিরিক্ত ঐ সময়ে হুমায়ূনের বাহিনী থেকে তাঁর সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে যুদ্ধ পিছিয়ে দেয়াটা আরো কঠিন বলে মনে হচ্ছিল।[১]

কনৌজের যুদ্ধ

দু'পক্ষের সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কনৌজের[২] কাছে প্রায় এক মাস ডেটে দাঁড়িয়ে রইল। শেরশাহের এতদিন প্রতীক্ষা করার দুটি প্রধান কারণ ছিল। তিনি খাওয়াস খাঁকে চেরুহ দলপতিকে দমন করার জন্য ঝাড়খণ্ডের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি খাওয়াস খাঁর বিজয়ের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বর্ষারও আশা ছিল যার ফলে মোগল শিবির কাদাপানিতে পূর্ণ হয়ে ওঠারও সম্ভাবনা ছিল। হুমায়ূন সম্ভবত এ যুদ্ধ এই কারণেই শুরু করেন নি যে, তাঁর কামানগুলোর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি চাচ্ছিলেন যে, যুদ্ধ শেরশাহই শুরু করেন যাতে মোগল সৈন্যরা তাদের তোপখানার সাহায্যে আফগানদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন। তাঁর সৈন্যরা অসংগঠিত ছিল। সম্ভবত, তিনি একটু সময় নিয়ে সৈন্যদের সুসংগঠিত করে নিতে চাচ্ছিলেন।

আফগান ও মোগল সৈন্যদের বাস্তবিক সংখ্যা কী ছিল, এ নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, হুমায়ূনের সৈন্যসংখ্যা আফগান সৈন্যদের

---

১. তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ২৭৪-৭৫।

২. ড. কানুনগো এই যুদ্ধকে বিলগ্রামের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন এবং যুদ্ধস্থল হরদোঈ জেলার বিলগ্রামের কাছে বলে নিশ্চিত করেছেন। ড. ব্যানার্জি (হুমায়ূন, পৃ. ২৪৩) এবং ড. ঈশ্বরী প্রসাদ একে কনৌজের যুদ্ধ বলেছেন। এ যুদ্ধ শেরগড় ও নানামাউ ঘাটের মধ্যবর্তী স্থলে নদী তটের অপর প্রান্তে উঁচু ভূমিতে হয়েছিল। শের শাহ এই বিজয় উপলক্ষে মুদ্রা প্রচলন করেন যাতে শেরগড় ওরফে কনৌজ অঙ্কিত রয়েছে। দেখুন, ড. ঈশ্বর প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৫০-৫১ ; কাননগো, শেরশাহ, পৃ, ২১৬ এবং ২১৯-২২০ পাদটীকা। মির্জা হায়দার একে গঙ্গার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন, কেননা, এ যুদ্ধ গঙ্গাতটে সংঘটিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিগুণ ছিল।[১] কিন্তু মোগল সৈন্যরা সংগঠিত ছিল না। মোগলদের তোপখানা শক্তিশালী ছিল। এতে সাত শ' তোপগাড়ি (গরদুন) ছিল, যেগুলোর প্রত্যেকটি চারটি করে গরু টেনে নিয়ে যেত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি করে ছোট

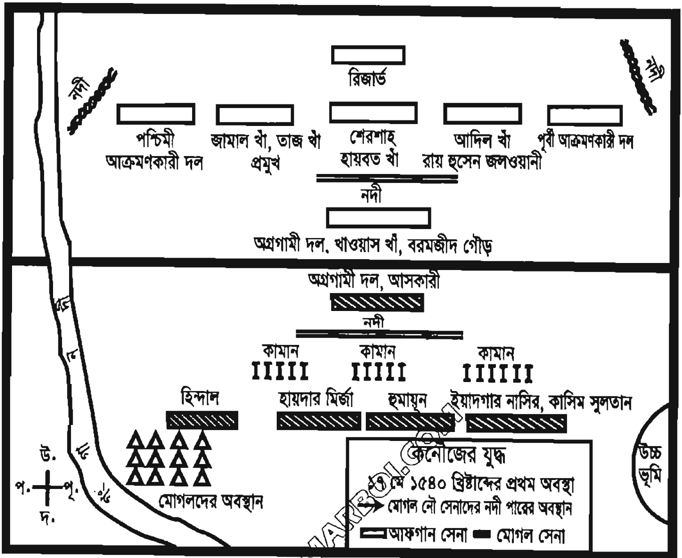

কামান চাপানো ছিল যা দিয়ে পাঁচ শ' মিস্কাল ওজনের গোলা নিক্ষেপ করা যেত এবং তাদের নিশানা থাকত অব্যর্থ। একুশটি গাড়ি এমন ছিল যেগুলো টানতে আট জোড়া করে গরু জুড়তে হত। এগুলোতে পাথরের গোলার স্থলে পাঁচ হাজার

১. কনৌজের যুদ্ধে দু'পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল, একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। জওহরের মতে, আগ্রা থেকে প্রস্থানের সময়ে হুমায়ূনের সাথে ৯০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। বদায়ূনী, নিজামউদ্দীন আহমদ ও ফিরিশতা হুমায়ূনের সৈন্য সংখ্যা এক লাখ বলেছেন এবং হায়দার মির্জা দু'পক্ষের সৈন্য সংখ্যা লিখেছেন দু'লাখ এবং যুদ্ধে আফগান সৈন্য ১৫,০০০ এবং মোগল সৈন্য ৪০,০০০ ছিল। নিজামউদ্দীন আহমদ ও ফিরিশতার মতে, শের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, বদায়ূনীর মতে, পাঁচ হাজার এবং কিছু হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে পঞ্চাশ হাজার আছে, যা অত্যধিক বলে প্রতীত হয়। (জওহর স্টুয়ার্ট পৃ. ২৯, ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ৯০ ; তবকাতে আকবরী দে. পৃ. ৭২-৭৩, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫৪, তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭২-৭৭, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ১৩১)। ড. কানুনগো শের খাঁ-র সৈন্য সংখ্যা কেবল ১৩,০০০ স্বীকার করেন, যা অসম্ভব প্রতীত হয়। কেননা, আব্বাসের মতে, শের খাঁ সমস্ত সুস্থ ও সবল সৈন্য ভর্তি করেছিলেন। ড. ব্যানার্জি হায়দার মির্জার সংখ্যাকে উল্টো করে স্বীকার করেন, অর্থাৎ, মোগল সৈন্য ১৫,০০০ ও আফগান সৈন্য ৪০,০০০ (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ৪২-৪৩ ; কানুনগো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিস্কালের গলানো পিতলের গোলা চাপানো যেত এবং এগুলোর মূল্য ছিল দু'শ মিস্কাল রুপোর মূল্যের সমতুল্য। এক ফারসাখ দূরত্বের দৃষ্টিগোচর যে কোনো বস্তুই তা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া যেত।[১]

শের খাঁ তাঁর সৈন্যদের সাত ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।[২] অগ্রণী দলের নেতৃত্বে ছিলেন খাওয়াস খাঁ ও বরমজীদ গৌড়। মধ্য ভাগে শের শাহের নেতৃত্বে আজম হুমায়ূন

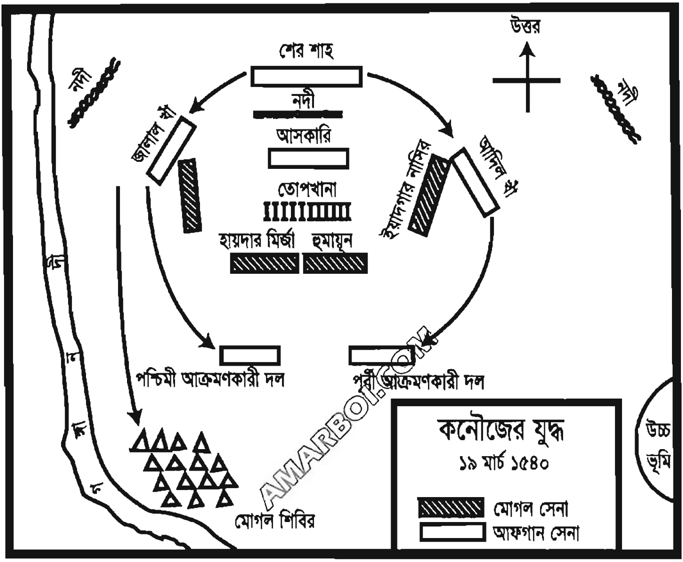

সরওয়ানী (যাঁকে হায়বাত খাঁ নিয়াজী উপাধি দেয়া হয়েছিল), ঈসা খাঁ সরওয়ানী, সরমস্ত খাঁ, কুতুব খাঁ লোদী, বিজলি খাঁ, সঈফ খাঁ সরওয়ানী প্রমুখ ছিলেন। তাঁর

শেরশাহ, পৃ. ২২২)। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫. হায়দার মির্জা প্রদত্ত সংখ্যা স্বীকার করেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, হুমায়ূনের সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ-চল্লিশ হাজার (হুমায়ূন, পৃ. ১৪৪)।

১. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ১৩১-৩২ ; ইলিয়াস ও রাস কর্তৃক অনূদিত পৃ. ৪৭৪ ; আরউইন, আর্মি অব দি ইন্ডিয়ান মোগলস, পৃ. ১১৫।

২. আব্বাস খাঁ তাঁর ডান, বাম এবং মধ্য (অর্থাৎ তিন) ভাগের দলগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৮১)। সম্ভবত, তিনি দুটি আক্রমণকারী দল (ফ্লেকিং ডিভিশন) ও অগ্রণী দলের বিবরণ দেন নি। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন, পৃ. ১৪৩) কেবল দু'টি দলের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু যুদ্ধের পরিকল্পনায় রিজার্ভ ও অগ্রণী দলকে নিয়ে সাতটি হয়। হায়দার মির্জার মতে, শের শাহের সৈন্যরা ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। তিনি রিজার্ভ বাহিনীর কথা উল্লেখ করেন নি। (তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫. পৃ. ১৩৩-৩৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনে জালাল খাঁর নেতৃত্বে তাজ খাঁ জালোই ও নিয়াজী আফগান প্রমুখ[১] এবং বাম দিকে আদিল খাঁ সূর, রায় হুসেন জলওয়ানী ও কিরানি আফগানরা ছিলেন।

ডান এবং বাম দলের দু'দিকে আক্রমণকারী দল ছিল এবং সবার পেছনে ছিল সংরক্ষিত সৈন্য (রিজার্ভ ফোর্স)। শের খাঁ এইভাবে ডাইনে এবং বামে তাঁর পুত্রদের (জালাল খাঁ ও আদিল খাঁ) রেখে যুদ্ধে তাঁর অবস্থান মজবুত করে নিলেন। পূর্ব এবং পশ্চিমে দুটি পরিখা খনন করে আফগান সৈন্যদের আরো মজবুত করে নেওয়া হল।

মোগল সৈন্যরা আফগান সৈন্যদের ন্যায় কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিল। সৈন্যদের মধ্য ভাগে হায়দার মির্জা ও হুমায়ূন ছিলেন। হায়দার মির্জা হুমায়ূনের বাম দিকে ছিলেন। এইভাবে তাঁর ডান বাহু হুমায়ূনের বাম বাহুর দিকে ছিল। হায়দার মির্জার সমস্ত সৈন্য তাঁর বাম দিকে নিযুক্ত ছিল। এবং তাঁর সাথে চারশ' খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের যুদ্ধ বা রণক্ষেত্রের পূর্ণ জ্ঞান ছিল।[২] হায়দার মির্জার বাম দিকে হিন্দাল এবং হুমায়ূনের ডান দিকে ইয়াদগার নাসির ও কাসিম হুসেন সুলতান ছিলেন।[৩] এই সৈন্যদের সামনে তোপখানা ছিল। তোপখানার আগে পরিখা এবং তাঁর সামনে অগ্রণী দল ছিল। তোপখানার নেতৃত্বে ছিলেন মুহম্মদ খাঁ রুমী, উস্তাদ আহমদ রুমী ও হুসেন খলীফা।

এক মাস অবধি দু'পক্ষের সেনাদল একে অন্যের সামনে ডেটে রইল, ছিটে-ফোঁটা লড়াইও হতে থাকল। ইতিমধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে গেল। আফগানরা যুদ্ধের জন্য অনুকূল সময় বিবেচনা করে আক্রমণ চালিয়ে দিল। শেরশাহের পরিকল্পনা ছিল নদীর দিক ব্যতীত বাকি তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা। বাবুর পানিপথের যুদ্ধের যে তুলগমা নীতি অবলম্বন করেছিলেন, সেই নীতিই শের খাঁ এখানে অবলম্বন করলেন। যুদ্ধের আগে শেরশাহ আফগানদের উদ্দেশে এক উদ্দীপক ভাষণ দিয়ে তাদের উদ্দীপিত করলেন।[৪] আফগানি সৈন্যদের দুটি আক্রমণকারী দর অগ্রসর হয়ে মোগল সৈন্যদের অবরুদ্ধ করে ফেলার প্রয়াস চালাল। যুদ্ধের প্রারম্ভে হিন্দাল ও জালাল খাঁ সূরের মধ্যে যুদ্ধ হল। জালাল খাঁ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেঁসে গেলেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। তাঁর সৈন্যদের পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাঁর চার সহকারী জালাল খাঁ জলোই, মিয়া আইয়ুব কলকপুর,

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩০৬, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৪, ডর্ন, পৃ. ১২৬ ; ইলিয়ট ও ডাসন, পৃ. ৩৮০।

২. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ১৩৩।

৩. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ (হুমায়ূন, পৃ. ১৪৬) এর মতে, ইয়াদগার নাসির হায়দার মির্জার বামে এবং আসকারি হুমায়ূনের ডান দিকে ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন যে, জালাল খাঁ প্রমুখ মির্জা হিন্দালের সামনে ও মুবারিজ খাঁ, বাহাদুর খাঁ প্রমুখ ইয়াদগার নাসির মির্জা ও হুসেন খাঁর সামনে সামনে পৌঁছালেন। খাওয়াস খাঁ, বরমজীদ এবং অন্যরা মির্জা আসকারির মোকাবিলায় এসে গেলেন (আকবরনামা, ১, পৃ, ১৬৪-৬৫)। খাওয়াস খাঁ অগ্রণী দলে ছিলেন, এজন্য আসকারির অগ্রবর্তী মোগল দলে এবং হায়দার মির্জার বামে থাকাটা অধিকতররূপে সঠিক বলে মনে হয়। ড. ব্যানার্জি, এই মত স্বীকার করেন।

৪. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ শুকবুর ও গাজী মুকবিল সিলাহদার[১] অত্যন্ত শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, ফলে হিন্দালের সৈন্যদের দাপট কমে গেল। জালালের দলের এই অবস্থা দেখে শের শাহ স্বয়ং তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কুতুব খাঁ লোদী তাঁকে বোঝালেন যে, এটা উচিত হবে না, কেননা, তিনি সরে গেলে আফগান সেন্যরা মনে করবে যে, কেন্দ্রও ভেঙে পড়েছে। শের খাঁ তাঁর পরামর্শ মেনে নিলেন এবং অন্য কমান্ডারদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

অগ্রবর্তী দলগুলোর মধ্যেও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। খাওয়াস খাঁ অগ্রসর হয়ে আসকারির দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভারটি পড়ল ইয়াদগার নাসির ও কাসিম হুসেনের উপর। আদিল খাঁ ও সরমস্ত খাঁ এঁদের দু'জনকে পিছু হটিয়ে দিলেন। ডান দিককার ডিভিসনের সৈন্যরা পালিয়ে মাঝখানে চলে গেল, যারা হুমায়ূনের নেতৃত্বে ছিল।[২] এদের আগমনের ফলে এই অংশে হই-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। এর ফলে, আফগানদের আক্রমণকারী দলও সুযোগ পেয়ে গেল এবং মোগল সৈন্যদের ডান অংশে আক্রমণ চালিয়ে দিল এবং অন্য একটি দল মোগলদের পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য পৌঁছে গেল। এইভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে মোগলদের মধ্যে আরো বিচ্ছৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। মোগল আমীরদের অধীনে বহুসংখ্যক দাস ছিল। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত আমীর, যাঁদের কাছে এক শ' জন করে সৈনিক, পাঁচ শ' করে সেবক ও দাস ছিল,[৩] এরা বড়ই গোলমাল শুরু করে দিল। তারা আতঙ্কিত হয়ে নিজ নিজ প্রভুদের ত্যাগ করে পৃথক হয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। বর্ষার কারণে মোগল শিবির, যা নিচু জমিতে অবস্থিত ছিল, পানিতে ভরে গেল। হায়দার মির্জা উঁচু ভূমিতে সৈন্যদের নিয়ে যেতে চাইলেন। হই-হুল্লোড়, বর্ষা ও কাদাপানিতে আরো বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তো এটাই যে, মোগলদের এত বড় বড় কামান থাকা সত্ত্বেও তা তাঁরা প্রয়োগও করতে পারল না। আফগানরা মোগলদের মার কাট শুরু করে দিল।

এসব এত দ্রুত ঘটে গেল যে, মোগলরা তাদের যুদ্ধ কৌশল দেখানোর সুযোগই পেল না। হায়দার মির্জা, যিনি এই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, লিখেছেন, চুগতাই লোকেরা কোনো আঘাত ছাড়াই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে লাগল। একটা কামানও চালানো গেল না। আফগানরা পলায়নপর মোগলদের চার মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করল। মোগলরা পালিয়ে নদীর দিকে গেল এবং পলানোর পথ না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে হাজারে হাজারে মারা পড়ল।

হুমায়ূন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং যুদ্ধস্থলে ডেটে রইলেন। এই সময়ে এক আফগান হুমায়ূনের ঘোড়ার উপরে আক্রমণ চালাল। যার ফলে তাঁর ঘোড়া বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। বড় কষ্টে আসকারি, ইয়াদগার নাসির ও অন্য কিছু ব্যক্তিকে একত্রিত করে তিনি নদী তীরে চলে এলেন। ঐ সময়ে একটি হাতি

---

১. তারীখে শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৮১-৮২।
২. তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস ৪৭৬, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৫, জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩০।
৩. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ১৩৪-৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা গেল। তিনি সেই হাতির পিঠে চড়ে নদী পার হতে চাইলেন, কিন্তু ঐ হাতির উদ্দেশ্য ভাল ছিল না, এজন্য তাকে হত্যা করা হল।[১] তিনি নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দিলেন এবং তা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। শামসুদ্দীন মুহম্মদ গজনবী তাঁকে সাহায্য করলেন, যার ফলে অনেক কষ্টে তিনি নদী পার হয়ে গেলেন।[২]

কনৌজের যুদ্ধ থেকে পলায়ন

কনৌজ থেকে হুমায়ূন আগ্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে ভোগাঁও[৩]-এর কৃষকরা তাঁর বিরোধিতা করল। তারা বাজার বন্ধ করে দিল এবং তিন হাজার অশ্বারোহীসহ তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। হুমায়ূন আসকারিকে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে বললেন। তিনি দেরি করে ফেলায় অসন্তুষ্ট হয়ে হুমায়ূন তাঁকে বললেন, "তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের কারণেই আজ অবস্থা এখানে এসে ঠেকেছে। তা সত্ত্বেও তোমরা সাবধান হলে না।" অবশেষে হিন্দাল ও ইয়াদগার নাসির মির্জা বঘার যুদ্ধে তাদের পরাজিত করলেন।[৪] এখান থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন আগ্রায় পৌঁছালেন। পরাজয় তাঁকে এতটা নিরাশ করে দিয়েছিল যে, তিনি তাঁর মহলে গেলেন না, প্রসিদ্ধ সাধক রফিউদ্দীন সফভির বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আশপাশের প্রদেশগুলোতে অব্যবস্থা ছিল এবং উপদ্রব ছড়িয়ে পড়েছিল। কনৌজের যুদ্ধের পর শেরশাহ বরমজীদ গৌড়কে হুমায়ূনের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠালেন। তিনি তাঁকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে কেবল তাঁদের পিছু ধাওয়া করেন।

আফগান সৈন্যদের এই আগমন থেকে হুমায়ূন দেখলেন যে, আগ্রা সুরক্ষিত নয়। এক রাত আগ্রায় থেকে তিনি তাঁর পরিবার ও যতটা কোষ সঙ্গে নেয়া সম্ভব তা নিয়ে তিনি পঞ্জাব অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

কনৌজের যুদ্ধের ফলাফল

কনৌজের যুদ্ধ মধ্যযুগের এক পরিবর্তন-বিন্দু। এ যুদ্ধ মোগলদের ক্ষমতাকে শেষ করে দিয়ে আফগানদের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করল। চৌসার যুদ্ধে শুরু হওয়া ক্ষমতা-পরিবর্তনের কাজকে এই যুদ্ধ পূর্ণতা দান করল। মোগল সম্রাট হুমায়ূন কনৌজের যুদ্ধের পর নিজের সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন এবং ১৫ বছর অবধি পথে-পথে টক্কর খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ালেন।

---

১. জওহর স্ট্যুয়ার্ট পৃ. ৩১-৩২ ; জওহরের মতে, সাফা বেঁধে তাঁকে নদী পার করতে হল।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৬-৬৭, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫৫। এই শামসুদ্দীন আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম আংগার স্বামী ছিলেন।

৩. উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলার একটি পরগনা এবং তহসিল। ভোগাঁও ১৭°১৭′ উত্তর ও ৭৯°১৪′ পূর্ব। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, জৈনপুরী খণ্ড ১০, পৃ. ১৯৬।

৪. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৩৩, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৬-৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানিপথের যুদ্ধে আফগানদের পরাজয়ের ফলে তাদের শক্তি ও যশের যে ক্ষতি হয়েছিল, এই যুদ্ধ তাকে পুনঃস্থাপিত করে দিল। শুধু তাই নয়, যে যুদ্ধ কৌশলে মোগলরা পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল ঠিক ঐ যুদ্ধকৌশলেই তারা মোগলদের পরাজিত করল। এ যুদ্ধ ছিল আফগানদের যুদ্ধকৌশলের প্রতীক।

হুমায়ূনের তুলনায় শেরশাহ অধিক কুশল শাসক ছিলেন। মোগলদের বিতাড়িত করে তিনি এক সংগঠিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন, যার ভিত্তিতে আকবর ও তাঁর পরবর্তীকালের শাসকরা শাসনকার্য চালান। এইভাবে হুমায়ূনের পরাজয় জনগণের ও শাসনের দৃষ্টিতেও তা আশির্বাদ বনে গেল।

যুদ্ধে মোগলদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। তাঁদের অনেক আমীর নিহত হলেন। দাস এবং সৈনিকদের মধ্যে যারা সেখানে উপস্থিতে ছিল তারা সবাই মারা পড়ল।[১] মোগলদের পরিত্যক্ত সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র আফগানদের হস্তগত হল।

মোগলদের খ্যাতি গভীরভাবে আহত হল। হুমায়ূনকে তখন সাধারণ মানুষও সাহায্য করতে ভয় পেত। এই কারণে কনৌজ থেকে আগ্রার পথে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল।

হুমায়ূনের পরাজয়ের কারণ

আগ্রা থেকে কনৌজ যাত্রার সময়ে হুমায়ূনের সৈন্যদের এমন কিছু অবস্থা ছিল যার ফলে তাঁর নিজেরও যুদ্ধের সাফল্যের আশা ছিল না। খুব দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তারা প্রশিক্ষিত ছিল না। কামরানের লাহোর গমন এবং অন্য আমীরদের পালিয়ে যাওয়ার ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়েছিল, হায়দার মির্জার মতে, হুমায়ূনের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল এবং যুদ্ধস্থল থেকে কত-ই-না মানুষ পালিয়ে গেল। এই পলায়নকারীদের মধ্যে মুহম্মদ সুলতান মির্জা ও তাঁর পুত্ররাও ছিলেন। যুদ্ধভূমিতে হুমায়ূনের দুই ভাই, ইয়াদগার নাসির মির্জা, কাসিম হুসেন সুলতান ও হায়দার মির্জা ছাড়া অন্য কোনো প্রধান সেনানায়ক ছিলেন না। বাবুরের আমলের সেনানায়করা এখন আর ছিলেন না। এই রকমই মোগল সৈন্যদের মধ্যে অভিজ্ঞ সেনাপতিরও অভাব ছিল। স্বয়ং হুমায়ূনের মধ্যে সেই আবেগ ও অর্জিত যশ আর ছিল না যা এই অনিয়ন্ত্রিত সৈন্যদের মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারত। এর বিপরীতে চৌসার পরাজয়ের পর হুমায়ূনের যশ ও মানসিক অবস্থা উভয়ই প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল।[২]

---

১. তারীখে রশীদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ১৩৪। হায়দার মির্জা লিখেছেন যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র আটজন বাঁচল, এ থেকে এই যুদ্ধে মোগলদের ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে।

২. আব্বাস লিখেছেন, হুমায়ূন যুদ্ধের পর রফিউদ্দীন সফভিকে বলেন যে, তিনি কয়েকজন দরবেশকে মোগলদের ঘোড়া মারতে দেখেছিলেন (ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৩৮২)। ড. ব্যানার্জি এর ভিত্তিতে লিখেছেন যে, হুমায়ূনের মন-মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না। (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ১, পৃ. ২৪৮)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে আফগান সৈন্যরা সংগঠিত ছিল। জাতীয় জাগরণের চেতনা ও চৌসার বিজয় আফগানদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে কয়েকজন তো অল্পকালমধ্যেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের নাম যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের নেতা শের শাহ একজন যোগ্য সৈনিক ছিলেন এক নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠা লাভের কারণে তিনি প্রত্যেকটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি আফগানদের বড়ই প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য তারা নিজেদের জীবন দেওয়াটাকেও সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। শের শাহ যুদ্ধকৌশলে সুনিপুণ ছিলেন। কনৌজ যুদ্ধের বিজয় তাঁর যুদ্ধকলার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। তিনি মোগলদের দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিলেন এবং তা থেকে পূর্ণরূপে লাভবান হয়েছিলেন। তাঁর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ভাষণ আফগানদের উৎসাহে জোয়ার এনে দিয়েছিল।

গঙ্গানদী পার হয়ে হুমায়ূন এক নতুন মুসিবতে ফেঁসে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন তা ঠিক ছিল না। তা নিচে, নদীতটে এবং আফগানদের কাছে ছিল। শুধু তাই নয়, যুদ্ধস্থল ও তাঁর শিবির একই ছিল। এর ফলে, যুদ্ধের সময়ে তাঁর শিবিরের দাস, চাকর ও অন্যান্য কর্মচারীরাও হইচই বাঁধিয়ে দেয়। হুমায়ূন জানতেন যে, বর্ষা সমাগত এবং তাঁর শিবির নদীতটের নিচু ভূমিতে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ শুরু না করে রণক্ষেত্রে অযথা সময় কাটালেন। এইভাবে তিনি রক্ষণাত্মক নীতি অবলম্বন করলেন এবং শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলেন।[১]

বর্ষা মোগলদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর করে তোলে। হায়দার মির্জার উঁচু স্থানে যাওয়ার আদেশ মোগল সৈন্যদের অবস্থা আরো খারাপ করে তোলে এবং আফগানদের আক্রমণের সুবিধা করে দেয়। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তো এটাই যে, হুমায়ূন যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিজে না রেখে তা হায়দার মির্জার উপর অর্পণ করেছিলেন। চৌসার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা (যেমন তিনি জামান মির্জাকে রাতের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন) তিনি কাজে লাগান নি। শুধু তাই নয়, শেরশাহের নিরন্তর উন্নতির কারণে হুমায়ূনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে হয়েছিল। এ কারণে তিনি পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি।

---

১. "This Battle proved that the army that cannot take the offensive is doomed and purely passive defence is futile. (সরকার, মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়
নির্বাসন—পঞ্জাব ও সিন্ধুতে

আগ্রায় অধিক দিন অবস্থান করা অথবা সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করা হুমায়ূনের জন্য অসম্ভব ছিল। আসকারি, হিন্দাল ও অন্য প্রধান আমীরগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ভয় ও নিরাশা মোগলদের সক্রিয়তা ও কর্মশীলতাকে প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আফগান সৈন্যরা মোগলদের পিছু ধাওয়া করেছিল এবং জনগণ মোগল-বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূনের নিজের মহলেও যাওয়ার সাহস হল না এবং তিনি শায়খ মুবারকের গুরু বিখ্যাত সাধক সৈয়দ রফিউদ্দীনের ওখানে অবস্থান করাটাই ন্যায়সম্মত বলে মনে করলেন। সাধক তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন যে, তিনি পুনরায় রাজ্য লাভ করবেন। তিনি তাঁকে রুটি ও খরবুজা খেতে দিলেন এবং তাঁকে আগ্রা থেকে লাহোর চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সাথে যত কোষ নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা সাথে নিয়ে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত সেবকদের নিয়ে হুমায়ূন আগ্রা থেকে রওনা হয়ে গেলেন।[১]

AMARBOI.COM

আগ্রা থেকে লাহোর

হুমায়ূনের মানসিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, তিনি বড়ই দুঃখের সাথে বললেন, মহিলাদের সাথে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। চৌসার যুদ্ধে আকীকা বিবি (আট বর্ষীয়) নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে হুমায়ূন শুধু এই বলে কপাল চাপড়ালেন যে, তিনি তাঁকে নিজ হাতে হত্যা কেন করেন নি ? হিন্দাল বড়ই ভীত হয়ে উঠলেন যে, না জানি কখন হুমায়ূন মহিলাদের হত্যা করে বসেন। তিনি বললেন, আমার জীবন দিয়ে হলেও মহিলাদের রক্ষা করব। তিনি তাঁর মা এবং প্রধান মহিলাদের সাথে করে নিলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর জায়গীর আলোয়ার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।[২]

আগ্রা থেকে হুমায়ূন সিকরি গ্রাম অভিমুখে প্রস্থান করলেন। তিনি সিকরিতে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করলেন। ঐ সময়ে একটি তীর এসে পড়ল। তার খোঁজ

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৭।
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ূন, বেভারিজ, পৃ. ১৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়ার জন্য যাঁকে পাঠানো হল সে আহত হল।[১] স্পষ্ট ছিল যে, শত্রুরা কাছেই ছিল অথবা সেখানকার অধিবাসীরা মোগল-বিরোধী ছিল। সেখানে অবস্থান করাটা উচিত ছিল না। হুমায়ূন সেখান থেকে বজৌনা গ্রামে গিয়ে পৌঁছালেন।[২] এখানে খবর পেলেন যে, বরমজীদ গৌড় হুমায়ূনকে ধাওয়া করতে এগিয়ে আসছেন। জওহর, যিনি সে সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন, তিনি লিখেছেন যে, এ খবরে সৈনিকদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। কেউ যেন কাউকে চেনেই না, এরকম একটা ভাব নিয়ে সবাই নিজ নিজ জিনিসপত্র লুকিয়ে নিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। হুমায়ূন এখানে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এবং বললেন যে, ধৈর্যের সাথে কাজ করা উচিত এবং তিনি সান্ত্বনা দিলেন যে, মৃত্যু যদি আসে তাহলে আমাদের তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদের চার ভাগে ভাগ করে দিলেন। ডাইনে মির্জা হিন্দাল, বামে ইয়াদগার নাসির মির্জা, মধ্যে হুমায়ূন ও কিছু আমীর তার পেছনে রওনা হলেন।[৩] এতে লোকেদের মধ্যে কিছুটা সাহস সঞ্চার হল। এখান থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন দিল্লি পৌঁছালেন (২৫ মে ১৫৪৪ খ্রি.)। এখানে কাসিম হুসেন সুলতান ও অন্য আমীরগণ তাঁর সাথে মিলিত হলেন। এখানেও অবস্থান করাও ঠিক ছিল না। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে হুমায়ূন রোহতক পৌঁছালেন।

হিন্দাল ও আসকারিকে হুমায়ূন আলোয়ার ও সম্ভল থেকে ধনসম্পদ ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মহিলাদের রক্ষা করতে করতে হিন্দাল সেখান থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে কিছু লোক তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। এরফলে, একটা তীর তাঁর ঘোড়াকেও বিদ্ধ করল। ভীষণ যুদ্ধের পর হিন্দাল তাঁদের রক্ষা করলেন।[৪] আসকারি, হিন্দাল ও হায়দার মির্জা রোহতকে এসে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হলেন।[৫] মোগলদের মান-সম্মান এত হ্রাস পেয়েছিল যে, রোহতকের দুর্গবাসীরা তাঁদের পৌঁছানো মাত্রই নগরদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। যুদ্ধ করে মোগলদের তা অধিকার করে নিতে হল। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে হুমায়ূন সেরহিন্দ পৌঁছালেন (২৪ জুন ১৫৪৯ খ্রি.)। আফগানরা মোগলদের পিছু ধাওয়া করছিল। তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার কথা বিবেচনা করে হুমায়ূন

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৩৪।
২. সাম্রাজ্য হারানোর পরও রাজসিক নিয়ম-কানুনের প্রতি হুমায়ূনের খুবই মনোযোগ ছিল। চলার সময়ে ফখর আলী হুমায়ূনের আগে বেরিয়ে গেলেন। যিনি এসব রাজসিক নিয়মাবলীর বিপক্ষে ছিলেন। হুমায়ূন এতে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিনি ফখর আলীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ধমক দিলেন। ফখর আলীর আনুগত্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি ভুল স্বীকার করলেন এবং পিছু চলতে লাগলেন, জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৩৪-৩৫।
৩. জওহর (স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৩৬) তিন ভাগ লিখেছেন, কিন্তু পরের দলটিও মেনে নিলে চার ভাগ হয়।
৪. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৩।
৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দালকে সেরহিন্দে যাত্রা-বিরতির আদেশ দিলেন। হুমায়ূন মাছিওয়াড়ায় সতলজ নদী পেরুনো মাত্রই খবর পেলেন যে, শেরশাহ দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। বরমজীদ গৌড় ও কুতুব খাঁ হিন্দালকেও পিছ হটতে বাধ্য করলেন।[১] হিন্দাল ও অন্য মোগলরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লাহোর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। হুমায়ূন হিন্দালকে পুনরায় জলন্ধরে যাত্রা-বিরতি করার আদেশ দিলেন। হুমায়ূনের অগ্রসর হওয়ার পরই আফগানরা সতলজ পার হয়ে হিন্দালকে জলন্ধরে অবরুদ্ধ করে ফেলল।[২]

লাহোরে ঐক্য-প্রচেষ্টা

কয়েক দিন পরই হায়দার মির্জা ও অন্য লোকেদের সাথে হুমায়ূন লাহোর পৌঁছালেন। সেখানে দৌলত খাঁ সরায়ের কাছে কামরান তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং খ্বাজা দোস্ত মুহম্মদ মুনশির বাগে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান ছিল, সেখানে তাঁর নিবাসের ব্যবস্থা করা হল।[৩] কয়েক দিন পরই মুজফফর তুর্কমানের সসৈন্যে পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথেই মির্জা হিন্দাল জলন্ধর ত্যাগ করে সকুশলে লাহোর পৌঁছে গেলেন। জলন্ধর আফগানদের অধিকারে চলে গেল। ধীরে ধীরে আসকারিও অন্য সমস্ত আমীর সেখানে পৌঁছে গেলেন (জুলাই ১৫৪০ খ্রি.)। কেবল মুহম্মদ সুলতান মির্জা ও উলুগ মির্জা এদিক-ওদিক লুট তরাজের কাজে ব্যস্ত রইলেন।[৪]

প্রায় তিন মাস অবধি হুমায়ূন লাহোরে অবস্থান করলেন (জুলাই থেকে অক্টোবর ১৫৪০ খ্রি.)। এই সময়কালে এক দিকে তিনি মোগলদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করলেন এবং অন্যদিকে শেরশাহের সাথে সন্ধি করারও চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐক্য স্থাপনের জন্য লাহোরে উপস্থিত সমস্ত মোগল আমীরকে তিনি একটি পরামর্শ সভায় আহ্বান করলেন (৭ জুলাই ১৫৪০ খ্রি.)।[৫] উপস্থিত লোকেরা ঐক্য স্থাপন সম্পর্কে একটি প্রতিজ্ঞা-পত্রে (তাজকিরা) স্বাক্ষর করলেন। এরপর একটি পরামর্শ সভা গঠিত হল।

হুমায়ূন তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ঐক্যের গুরুত্ব বোঝালেন। সুলতান হুসেন মির্জার মৃত্যুর পর তাঁর ১৮ জন পুত্র, পারস্পরিক শত্রুতার কারণে কীভাবে খুরাসান হারিয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, বাবুর অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদি পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে এই সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে বুদ্ধিমান লোকেরা

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩৬।
২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩৬।
৩. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৬৭।
৪. তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭৮।
৫. ঐ, পৃ. ৪৭৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৭৪-৭৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইকে নিন্দা করবে। তিনি আবেদন জানালেন, সমস্ত প্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, যার ফলে তিনি সম্মানিত হতে পারেন।[১]

পরামর্শ সভায় তিন ব্যক্তি বিশেষভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করলেন। কামরান পরামর্শ দিলেন, লাহোরে অবস্থান করাটা ঠিক হবে না ; হুমায়ূন মির্জা ও সৈন্যদের সাথে নিয়ে কিছুদিন পার্বত্যাঞ্চলে অতিবাহিত করুন ; কামরান মোগলদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে কাবুলে সংরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসবেন। হিন্দাল এর বিরোধিতা করে প্রস্তাব রাখলেন, সবাই ভক্করে চলে যাক এবং সেখান থেকে গুজরাত আক্রমণ করা হোক ; দুই রাজ্য অধিকার করার পর আফগানদের কবল থেকে মোগল সাম্রাজ্য পুনরাধিকার করা কঠিন হবে না। হিন্দাল মির্জার এ কথার সমর্থন ইয়াদগার নাসির মির্জাও করলেন। তৃতীয় পরামর্শ দিলেন হায়দার মির্জা। তিনি বললেন, মোগলরা সেরহিন্দও রাওয়ালপিণ্ডির পার্বত্যাঞ্চলে চলে যান এবং ঐগুলো অধিকার করে নিন। তিনি স্বয়ং কিছু সৈন্য নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে দু'মাসের মধ্যে তা অধিকার করে নেবেন। সেটি সংরক্ষিত স্থান। মোগলরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের সেখানে পৌঁছে দিন। শেরশাহের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তাঁর বড় বড় কামান। কামানগুলো নিয়ে পাহাড়ে ওঠা আফগানদের জন্য বেশ কঠিন হবে। তাঁর বিশাল বাহিনী সেখানে খাদ্যাভাবে নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[২] এইভাবে মোগলরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সফল হবে না। কামরান হায়দার মির্জার এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, পরিবার-পরিজনের সংখ্যা অনেক বেশি। এঁদের সবাইকে পাহাড় পাঠানোর অর্থ সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এই তর্ক-বিতর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না। এইভাবে, এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও মোগলদের মধ্যে কোনো ঐক্য স্থাপিত হল না।

ঐক্য প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার জন্য কে দায়ী ছিল ? আবুল ফজল ও মির্জা হায়দার এজন্য মির্জা কামরানকে দায়ী করেছেন।[৩] আবুল ফজল লিখেছেন, মির্জা কামরান তাঁর নিজের স্বার্থে চাচ্ছিলেন যে, সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক, যাতে তিনি কাবুলে গিয়ে সেখানে বিলাসী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। হায়দার মির্জার মতে, কামরান কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেন নি। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও কামরানের এই স্বার্থপরতার সমালোচনা করেছেন।[৪]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কামরানের ব্যবহারে সহৃদয়তার কোনো ছাপ ছিল না। ঐ সংকটকালে চোখ বন্ধ করে হুমায়ূনকে সহযোগিতা করা উচিত ছিল।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৯ ; মাসীরে রহীমী, ১, পৃ. ৫৪০ ; তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস, পৃ. ৪৭৯-৮০।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৮-৬৯ ; তারীখে রশীদী, পৃ. ৪৮১।

৪. আর্সকিন, ২, পৃ. ১৯৭, ২০৩ ; ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ১৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কামরানের পক্ষে একটি কথাই বলা যেতে পারে যে, তাঁর মধ্যে ছিল একমাত্র তাঁর জায়গীর বাঁচানোর চিন্তা। তিনি দেখলেন যে, হুমায়ূন, আসকারি ও হিন্দাল তো তাঁদের ভূ-খণ্ড হারিয়েছেনই, এবার তাঁরা তাঁর প্রদেশটিও অধিকার করতে চাচ্ছেন। পঞ্জাব অধিকার করে রাখা সহজ ছিল না, কাবুল ও আফগানিস্তানের এত আয় ছিল না যে, সবার খরচ চলতে পারে। এই কারণে তিনি হুমায়ূনকে ছেড়ে কাবুল চলে যেতে চাচ্ছিলেন। তাঁর ভুল কেবল এতটাই ছিল যে, তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, তিনি একা শেরশাহের কবল থেকে কাবুলকে বাঁচাতে পারবেন না। এ ছাড়া কেবল কামরানই নন ; বরং অন্য আমীররাও এতটা ভীতত্রস্ত ছিলেন যে, তাঁরা পুনরায় শেরশাহের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সময়ে মোগলদের সাধ্যও সীমিত ছিল। এ কারণে হুমায়ূনকে বাদ দিয়ে সবাই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, শেরশাহের সাথে এখন আর যুদ্ধ নয়।

যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তাতে কোনো-না-কোনো দোষ অবশ্যই ছিল। হিন্দালের পরামর্শানুসারে ভক্কড়ে এত অধিককাল ধরে এত লোকের সাথে মোগলদের অবস্থান করাটা কঠিন ব্যাপার ছিল, তা সত্ত্বেও এ পরামর্শ খুব অনুপযুক্ত ছিল না। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর গুজরাতে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। উত্তরাধিকার সমস্যা ও অন্যান্য কঠিন সমস্যাও সেখানকার শান্তি বিনষ্ট করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে তা অধিকার করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। মালবের উপর তখনও শেরশাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ জন্য আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেটি একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। কামরানের প্রস্তাব ছিল তাঁর নিজেকে বাঁচানোর জন্য। তিনি যে কোনো প্রকার কাবুলকে হুমায়ূন ও শেরশাহ থেকে সুরক্ষিত রাখতে চাচ্ছিলেন। এর অতিরিক্ত মোগল আমীরদের পরিবার-পরিজনকে নিজের অধিকারে কাবুলে রেখে তিনি এক প্রকার অধিকাংশ লোককে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছিলেন। হায়দার মির্জা তাঁর পরিকল্পনা মতে একথা বলেন নি যে, সবাই মিলে কাশ্মীর জয় করা হোক ; বরং তিনি বিজয়ের জন্য নিজেই যেতেন এবং অন্য মোগলরা তাঁর প্রতীক্ষা করতেন। মোগল পরিবারের লোকজনদের এর মধ্যেকার পার্বত্য ভূমিতে রাখাটাও নিরাপদ ছিল না। মোগলদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এটাই ছিল যে, তাঁরা নিজ নিজ প্রস্তাবকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করতেন এবং ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এইভাবে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ল।

শেরশাহের সাথে সন্ধি-বার্তা

কনৌজের যুদ্ধের পর শেরশাহ গঙ্গানদী পার হলেন এবং হুমায়ূনকে ধাওয়া করার জন্য তিনি বরমজীদ গৌড়কে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন হুমায়ূনের সাথে যুদ্ধ না করেন। তিনি অন্য এক বাহিনীকে সম্ভলের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। হুমায়ূনের আগ্রা থেকে চলে যাওয়ার পর বরমজীদ গৌড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে বসবাসরত বহু সংখ্যক মোগলকে তিনি হত্যা করলেন। এই মোগলরা সৈনিক ছিল না এবং এদের হত্যা করারও কোনো কারণ ছিল না। কয়েকদিন পর আগ্রায় পৌঁছানোর পর শেরশাহ বরমজীদকে তার এই কাজের জন্য ভর্ৎসনা করলেন কিন্তু তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। এখান থেকে তিনি খাওয়াস খাঁ ও বরমজীদকে হুমায়ূনের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদের ভয়ে হুমায়ূন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লাহোর অভিমুখে পালিয়ে গেলেন। কয়েক দিন আগ্রায় কাটিয়ে শেরশাহ দিল্লি গেলেন। তিনি হাজী খাঁ বটনবীকে মেওয়াতের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। দিল্লির সমুচিত ব্যবস্থা করার পর তিনি সেখান থেকে পঞ্জাব অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে কামরান তাঁর সদর কাজী আবদুল্লাহকে গোপনে শেরশাহের কাছে দিল্লি পাঠালেন। কামরান শেরশাহকে এই আশ্বাস দিলেন যে, আগের মতোই পঞ্জাব তাঁর অধীনে থাকতে দিলে তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁকে যোগ্য সেবা দিতে সক্ষম হবেন।[১] তাঁর অভিপ্রায় ছিল হুমায়ূনকে হত্যা করানো কিংবা বন্দি করে শেরশাহের কাছে সমর্পণ করা। শেরশাহ কামরানের দূতকে স্বাগত জানালেন। তিনি একথা জেনে সন্তোষ লাভ করলেন যে, পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি। শেরশাহ কামরানকে হুমায়ূন থেকে তো পৃথক করতে চাচ্ছিলেনই কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁর আসল লড়াই হুমায়ূনের সাথে। পরিস্থিতি ঠিকমতো বুঝে নেওয়ার জন্য তিনি সদরের সাথে তাঁর একটি দূতও লাহোর পাঠালেন। কামরান শেরশাহের দূতকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর জন্য একটি জশন-এর আয়োজন করলেন, যাতে হুমায়ূনকেও আমন্ত্রণ জানালেন[২] এবং সম্রাট এতে অংশগ্রহণও করলেন। কামরান এইভাবে তাঁর মহত্ত্ব দেখাতে চাচ্ছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি হুমায়ূনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই জশনে হুমায়ূনের অংশগ্রহণ করাটা উচিত ছিল না।

লাহোরে শেরশাহের একটি দূত হুমায়ূনের সাথেও সাক্ষাৎ করলেন। হুমায়ূনও তাঁকে স্বাগত জানাতে এক দাওয়াত দিলেন। কামরান সতর্ক ও সশঙ্ক ছিলেন। তিনি হুমায়ূনের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁকেও ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হোক এবং তিনি হুমায়ূনের কাছেই বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৩] কামরানের এই প্রার্থনা আসকারি ও হিন্দালের চেয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়াতে এবং হুমায়ূন ও শেরশাহের দূতের বার্তা-লাপের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য করেছিলেন। দাওয়াতের পর হুমায়ূন শেরশাহের কাছে একটি কবিতা পাঠালেন, যার অর্থ ছিল তিনি

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৬৯, আবুল ফজলের ভাষা এরকম— 'ওয়া মজমুনে মকুতব চুনাঁ নবিশ্তকি অগর পঞ্জাব বদস্তুর সাবিক বরমন মুকর্র দারন্দ দর অন্দক জমান কারাহারে শায়েস্তা ব তকদীম রসানম।'

২. ঐ, পৃ. ১৭০।

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৪-৪৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেরশাহকে নিজের মিত্র বলে মনে করতেন কিন্তু তাঁর ব্যবহারে তিনি বড়ই নিরাশ হয়েছেন।[১] শেরশাহ হুমায়ূনের এই কবিতার কোনো উত্তর দিলেন না।

হুমায়ূন পুনরায় কামরানের সদর কাজী আবদুল্লাহর সাথে মুজাফফর বেগকে শেরশাহের কাছে এই কথা লিখে পাঠালেন যে, তিনি পুরো হিঁদুস্তান তাঁর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, এবার সেরহিন্দ দুই রাজ্যের সীমা হয়ে যাক। শেরশাহ জানতেন যে, মোগলরা শক্তিহীন। তিনি ঐ ভাষতেই এর উত্তর দিলেন—"আমি কাবুল ছেড়ে দিয়েছি। আপনি ওখানেই চলে যান।"[২]

শেরশাহের এ কথায় হুমায়ূন বড়ই নিরাশ হলেন এবং সন্ধি-বার্তা শেষ হয়ে গেল।

হুমায়ূন ও কামরান দু'জনেই শেরশাহের সাথে পৃথক পৃথক সন্ধি-বার্তা চালাচ্ছিলেন। এই কারণে প্রশ্ন ওঠে যে, বিধিসম্মতভাবে পঞ্জাব ও কাবুলের উপর কার অধিকার ছিল ? কনৌজের পরাজয়ের পর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর পৌঁছানোর পর হুমায়ূন মনে করতেন যে, তাঁর সাম্রাজ্য ছোট হয়ে বাদাখশান থেকে সেরহিন্দ পর্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে। এই কারণে তিনি সেরহিন্দকে মোগল ও আফগান রাজ্যের সীমা নির্ধারণের জন্য বলেছিলেন। মুদ্রা এবং খুতবা পাঠ তখনো পর্যন্ত হুমায়ূনের নামে চলছিল।[৩] কামরান স্বতন্ত্ররূপে সন্ধি-বার্তা অবশ্যই চালাচ্ছিলেন কিন্তু হুমায়ূনের বৈধতা সম্পর্কে তিনি তখনো পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন তোলেননি। এইভাবে বৈধানিক দৃষ্টিতে তো এখানকার শাসক হুমায়ূন ছিলেন কিন্তু বাস্তবে এ অংশটি ছিল কামরানের। দুই ভাই-ই শেরশাহকে পৃথক-পৃথকভাবে খুশি করে নিজ নিজ পক্ষে টেনে নেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ দেখে যে, পঞ্জাব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন কামরান বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর এই মানসিক অবস্থায় তিনি হুমায়ূনের পতন নিশ্চিত করার জন্য শেরশাহের কাছে পত্র লেখেন, যাতে তাঁর ভাগ্যের শত্রু চিরতরে নিপাত হয়ে যান।

---

১. কবিতাটি ছিল এরকম :

দর আইনা গরচে খুদ নুমাই বাশদ
পৈবস্তা জ খেশতন জুদাই বাশদ।
খুদ রা ব মিসলে গোর দীদন অজব অস্ত ;
ইঁ বুল অজবো কারে খুদাই বাশদ।

অর্থাৎ, 'যদিও দর্পণে আপন চেহারা দেখা যায় তা সত্ত্বেও তা পৃথক থাকে। নিজে নিজেকে অন্যরূপে দেখা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, এ ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ।' গুলবদন, হুমায়ূননামা, পৃ. ৪৮।

২. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৪।

৩. ক্যাটালগ অব কয়েনস, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতা, নং ৪ ; ক্যাটালগ অব কয়েনস, প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়াম, লখনউ নং ৩ ; লাহোর থেকে ৯৪৬ হিজরি পর্যন্ত সময়কালের হুমায়ূনের মুদ্রা পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোগলদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা শেরশাহের জানা ছিল। তাঁদের মতভেদ ও তাঁদের বার্তার বিফলতায় তিনি প্রসন্ন হলেন। কামরান ও হুমায়ূনের সন্ধিবার্তা মোগলদের দুর্বলতা আরো স্পষ্ট করে দিল। এই পরিস্থিতিতে তাদের পরাজিত করা এবং পঞ্জাব থেকে তাদের বের করে দেওয়া কঠিন ছিল না। শেরশাহ হুমায়ূনকে যে কঠোর উত্তর পাঠান, তা তাঁর মোগলদের দুর্বলতা থেকে লাভ ওঠানোর একটি প্রমাণ।

শেরশাহ জানতেন যে, পঞ্জাবে কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা বা ক্ষেত্র নেই। যদি সেরহিন্দকে সীমানা গণ্য করা হত তাহলে মোগল ও আফগানদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ জারি থাকত। মোগলদের মধ্যে একতারও অভাব ছিল। এই সময়ে তাঁদের যে কোনো শর্ত মানাতে বাধ্য করা যেত। এই দৃষ্টিতে শেরশাহের প্রস্তাব পূর্ণরূপে ব্যবহারিক ছিল। এর অতিরিক্ত, পানিপথের পূর্বে যে অংশটি মোগলদের অধিকারে ছিল শেরশাহ তাঁদের ঐ অবধি সীমিত রাখতে চাচ্ছিলেন এবং ইব্রাহীম লোদীর সাম্রাজ্যের সীমাকে তিনি আফগান ও মোগলদের সীমা বলে মনে করতেন।

শেরশাহ মোগলদের আফগানিস্তানের উপর অধিকারকে কেন স্বীকৃতি দিলেন? এ তো তাঁর এবং তার জাতির লোকেদের পিতৃভূমি ছিল। আফগান সৈনিকদের ভর্তি করানোর এটাই ছিল মূল কেন্দ্র এবং এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে মোগলদের ঐ অংশ থেকে বের করে দেওয়ার কল্পনাও ছিল অবাস্তব। বাস্তবিকই শেরশাহের এ সিদ্ধান্ত হুমায়ূনের প্রতি সদ্ভাবনজাত কারণে ছিল না[1]; বরঞ্চ এ ছিল তাঁর বিচক্ষণতার পরিণাম। শেরশাহ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে আফগানিস্তানের প্রতি তাঁর ভালবাসা মোগল অথবা অন্য আফগানদের মতো ছিল না। তিনি স্বয়ং তাঁর জায়গীর বিভাজনের প্রশ্নে বলেছিলেন যে, রোহ (আফগানিস্তান)-এর আইন এখানে চলবে না। তিনি এও মনে করতেন যে, এ সমস্ত অংশ অধিকার করলে নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকবে, কেননা, মোগলদের বাদাখশান ও মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ চালানো সহজ হবে। শেরশাহ নিজেকে লোদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন, এই কারণে তাঁর সীমা পর্যন্ত নিজেকে সীমিত রাখতেন চাইতেন। তা সত্ত্বেও শেরশাহ সতর্ক ছিলেন এবং মোগলরা যাতে তাঁদের বাহিনীতে আফগানদের ভর্তি করাতে না পারেন সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছিলেন। এজন্য তিনি আফগানিস্তান থেকে আগত আফগানদের পারিতোষিক ও ধন দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে রাখতেন। আফগান জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা থেকেও তিনি এতে লাভবান হলেন।

---

১. "The abstention from an attack on the Mughals at Kabul and a free permission to them to settle there. must be pronounced a generious on the part of the Afghan King." (ব্যানার্জি, হুমায়ূন. পৃ. ১২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোগলদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। হুমায়ূনের ঐক্য প্রচেষ্টার সমস্তটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। কামরানের ব্যবহার ছিল স্বার্থপরতায় পূর্ণ ও নিরাশাজনক। তাঁর দৃষ্টি এত সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, শেরশাহ সামান্যতম প্রশ্রয় দিলেই তিনি হুমায়ূনকে গ্রেফতার করিয়ে আফগানদের হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু শেরশাহ কামরানের কাছে এ ধরনের কোনো দাবি করেন নি। শেরশাহ কী একে অত্যন্ত নিচ-কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন ? না কি তিনি কামরানকে বিশ্বাস করতেন না ? মোগল সম্রাটকে বন্দি করে রাখলে বা তাঁকে হত্যা করলে কী তাঁর কোনো বিদ্রোহ ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ভয় ছিল ? নিশ্চিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

লাহোর থেকে বিদায়

শেরশাহ মোগলদের মতভেদ থেকে লাভবান হলেন। এবার মোগলদের পঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করার জন্য কোনো প্রকারের সংঘর্ষের আর ভয় ছিল না। তিনি অগ্রসর হয়ে সেরহিন্দ অধিকার করে নিলেন এবং ঐ মাসে সতলজ নদী পেরিয়ে তিনি সুলতানপুরে[১] প্রবেশ করলেন। শেরশাহর এত কাছে পৌঁছানোর খবর মোগলদের কাঁপিয়ে দিল। কখন যে লাহোর আক্রান্ত হবে তা বলা সম্ভব ছিল না।

কামরান দেখলেন পঞ্জাব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এজন্য তিনি হুমায়ূনকে দায়ী বলে মনে করতেন। সম্রাটের উপর থেকে তাঁর বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। কাবুল ও কান্দাহার বাঁচানোর ঔৎসুক্যও তাঁর বৃদ্ধি পেল। তিনি বারবার আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য জোর করতে লাগলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া ছাড়া হুমায়ূনের আর গত্যন্তর ছিল না। তিনি কামরানকে আশীর্বাদ দিয়ে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।[২] হায়দার মির্জা কাশ্মীর যাওয়ার জন্য উৎসুক ছিলেন। যে সৈনিকরা তাঁর সাথে যেতে চাচ্ছিলেন, তাদের নিয়ে তাঁকে কাশ্মীর আক্রমণের অনুমতিও হুমায়ূন দিয়ে দিলেন।

হুমায়ূনের সামনে এবার তিনটি পথ অবশিষ্ট ছিল—বাদাখশান, কাশ্মীর বা সিন্ধু অভিমুখে তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য ও আমীরদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া। বাদাখশান যেতে দুটি প্রধান বাধা ছিল। প্রথমত, কামরান তাঁকে আফগানিস্তানের পথ ধরে যেতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, দ্বিতীয়ত, বাবুর বাদাখশান সুলেমান মির্জাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ ব্যতীত তা অধিকার করা অসম্ভব ছিল। হুমায়ূনের কাছে না ছিল যুদ্ধের সাধন আর না ছিল কোনো কেন্দ্র যেখান থেকে তিনি এই অভিযান নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এইভাবে হুমায়ূন বাদাখশান যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। কাশ্মীর তখনো বিজয় হয় নি। ওদিকে গেলে হুমায়ূনের একটি

---

১. কাপুরথালা কসবা থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণে, ৩০°১৩′ উত্তর ও ৭৫°১৫′ পূর্বে।
২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৩৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীনহীন ও অবিকশিত দেশে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কাবুল যাওয়া এবং তাকে আফগান-বিরোধী কেন্দ্র বানানোর তো প্রশ্নই ছিল না। কেননা, কামরান কোনো অবস্থাতেই কাবুল ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বারবার বলছিলেন "বাবুর বাদশাহ কাবুল আমার মাকে (গুলরুখ বেগম) দিয়ে গিয়েছেন। হুমায়ূনের কাবুল যাওয়া উচিত নয়।" হুমায়ূন এর উত্তরে বললেন, বাবুর বাদশাহ কাবুল সম্পর্কে বারবার বলতেন, "আমি কাবুল কাউকে দেব না। আমার পুত্রদের কাবুল নিয়ে কোনো লোভ করা উচিত নয়, আল্লাহ আমার সব কটি পুত্র কাবুলে দিয়েছেন আর অধিকাংশ বিজয় কাবুলে বসে হয়েছে।"[১] এর দ্বারা হুমায়ূন এটাই দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, কাবুলে সব ভাইয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। এতে কামরানও সশঙ্ক হলেন।

লাহোর ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে হুমায়ূন রাভি নদী পেরিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে গেলেন (৩১ অক্টোবর ১৫৪০ খ্রি.)।[২]

গুলবদন বেগম মোগলদের ঐ সময়কার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, হুমায়ূনের প্রস্থানের খবর পাওয়ামাত্রই যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। লোকেরা যার যা কিছু যে অবস্থায় ছিল ঐভাবে ফেলে রেখে নগদ সহায়-সম্পদ যতটা যা নেয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।[৩]

হুমায়ূনের যাত্রা-পথের নির্দিষ্ট ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তিনি হায়দার মির্জাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কাশ্মীরে তিনি প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করলে তিনি ঐ দিকেই প্রস্থান করবেন।[৪] এখান থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন চেনাব নদীর তটে হাজারায় পৌঁছালেন। কামরান তখনো হুমায়ূনের সাথে সাথে আসছিলেন যদিও তিনি কাবুল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে হুমায়ূনও বাদাখশান যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কামরান তাঁকে ওদিকে যেতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে হুমায়ূনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরান ভীরা চলে গেলেন। শেরশাহর নিরন্তর অগ্রসরতায় ভয়ভীত হয়ে খ্বাজা কলাঁ সিয়ালকোট থেকে পালিয়ে ভীরা এসে গিয়েছিলেন। খ্বাজা কলাঁ হুমায়ূনের সঙ্গ নিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কামরান তাঁর বাড়িতেই বন্দি করে তাঁকে অধিকার করে নিলেন। এরপর হুমায়ূনও সেখানে পৌঁছালেন। কামরানের এই ব্যবহারে হুমায়ূনের সঙ্গী সাথীদের মধ্যে রোষ ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁদের মধ্য থেকে জব্বার কুলি কুরচি কামরানকে হত্যা করতে চাইলেন কিন্তু হুমায়ূন এতে অনুমতি দিলেন না।[৫]

---

১. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৪।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭০।
৩. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৪।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭১ ; তারীখে রশীদী, পৃ. ৪৮১।
৫. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা খুশাব পৌঁছালেন। এখান থেকে ৬ ক্রোশ চলার পর তাঁরা এমন একটা পথে গিয়ে পড়লেন যেখানে দু'জন সৈন্যের পক্ষে পাশাপাশি চলা সম্ভব ছিল না। এখান থেকে দুটি পথ দুই দিকে চলে গিয়েছিল, একটি কাবুলের দিকে ও অন্যটি মুলতানের দিকে। এই পাহাড়ি পথে পৌঁছে কামরান প্রথমে সেখানে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূন সম্রাট হওয়ার ফলে এর বিরোধিতা করলেন, কেননা, একজন বাদশাহ হিসেবে তাঁরই প্রথম যাওয়া উচিত ছিল। দরবারিরাও পরম্পরাগতভাবে হুমায়ূনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। আবুল বকা নামক এক সম্মানীয় আমীরের প্রচেষ্টায় কামরান শান্ত হলেন এবং হুমায়ূনের কথা তিনি মেনে নিলেন।[১] কিন্তু পাহাড়ি পথ পেরিয়ে হুমায়ূনকে সেখানেই ত্যাগ করে কামরান আসকারি, খ্বাজা কলাঁ ও অন্য কিছু আমীরকে সাথে নিয়ে কাবুলের পথ ধরলেন। সিন্ধু নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় মুহম্মদ সুলতান মির্জা ও তাঁর দুই পুত্র মুলতানের আশপাশে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা কামরানের সঙ্গ নিলেন এবং তাঁরাও কাবুলের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

কামরানের পলায়নের ফলে হুমায়ূনের দলে নিরাশা ছেয়ে গেল এবং তাঁদের সংখ্যাও কমে গেল। কামরানের জীবনের এ এমনই একটি রেখা যেখান থেকে তাঁর হুমায়ূন-বিরোধী কার্যকলাপ স্পষ্ট হয়ে গেল। হুমায়ূন এখান থেকে মুলতান পৌঁছালেন। কয়েক দিন মুলতানে অবস্থানের পর তিনি উছ্ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

হিন্দাল কামরানের ব্যবহারের বিরোধিতা করেন এবং কামরানের প্রতি হুমায়ূনের দয়ালুতায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সিন্ধু ও গুজরাত অভিমুখে চলে যেতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূনের সিদ্ধান্তহীনতা দেখে তিনি স্বয়ং ইয়াদগার নাসির মির্জা, কাসিম হুসেন ও অন্য কিছু ব্যক্তির সাথে সিন্ধু অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।[২] এইভাবে সকল ভাইয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হুমায়ূন তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈনিককে সাথে নিয়ে ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীর হয়ে ৩১ ডিসেম্বর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে উছ্ -এ পৌঁছালেন।[৩] পথে তাঁকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। খাদ্য ও পানির অভাব ছিল। এক সের বজরার জন্য এক আশরাফি খরচ করেও খাদ্য পাওয়া কঠিন ছিল।[৪]

---

১. ঐ, পৃ. ৪০-৪১।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭১।

৩. ঐ, পৃ. ১৭২। উছ্ ২৯°১৪′ উত্তর ও ৭১°৪′ পূর্বে মাওলপুরের দক্ষিণ-পূর্বে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪. বদায়ূনী, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৫ দ্র. ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উছ্-এ

হিন্দাল হুমায়ূনকে ত্যাগ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্য পেলেন না। কুড়ি দিন অবধি খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই এদিক ওদিক বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন। হুমায়ূনের উছ্ পৌঁছানোর কিছুদিন আগেই তিনি হুমায়ূনের দলের সাথে এসে মিলিত হলেন। দুই ভাই পুনরায় মিলে গেলেন। দুজনেই উছ্-এ পৌঁছালেন এবং এখান থেকে পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু হল।[১]

উছ্-এ বখশু লংগার কাছ থেকে হুমায়ূনের কিছু সাহায্যের আশা ছিল। তিনি সেই বিলোচ বংশোদ্ভূত ছিলেন যাঁরা ১৫২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে মুলতানে রাজত্ব করতেন। কিন্তু ঐ বছর মির্জা শাহ হুসেন আরগুন পরাজিত হয়ে ঐ উছ্-এর দিকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সাহায্য পাওয়ার আশায় হুমায়ূন তাঁর কাছে খিলআত পাঠালেন এবং তাঁকে খানেজাহাঁ উপাধি, ঝাণ্ডা এবং নাকাড়া প্রদানের আশ্বাস দিলেন। হুমায়ূনের সংবাদ পেয়ে বখশু বিশেষ উৎসাহিত হলেন না। তিনি জানতেন যে, এক নির্বাসিত, শক্তিহীন ভূতপূর্ব সম্রাটের কাছ থেকে এ সম্মান লাভের কোনো অর্থ হয় না। তা সত্ত্বেও হুমায়ূনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা পূর্তির জন্য পানাহার সামগ্রী দিয়ে তিনি তাঁকে সাহায্য করলেন এবং বণিকদের তাঁর শিবিরে পানাহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে উপস্থিত হলেন না। এইভাবে হুমায়ূন খাদ্যসামগ্রীতে পূর্ণ একশ' নৌকা পেলেন। নৌকাগুলোর সাহায্যে তিনি চেনাব নদী পেরিয়ে ভক্কড় পৌঁছালেন (২৬ জানুয়ারি, ১৫৪১ খ্রি.)।[২]

খুশাব-এ শেরশাহ খাওয়াস খাঁ ও অন্য আফগান দলপতিদের, হুমায়ূনকে পঞ্জাব থেকে বিতাড়নের জন্য নিয়োগ করেন। হুমায়ূনের সাহায্যকারীদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, খাওয়াস খাঁ চাইলে হুমায়ূনকে গ্রেফতার করতে পারতেন, কিন্তু এমনও প্রতীত হয় যে, আফগানদের লক্ষ্য ছিল হুমায়ূনকে পঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করা, বন্দি করা নয়।[৩]

সিন্ধুতে

পঞ্জাব পার হয়ে হুমায়ূন সিন্ধু নদের পূর্ব তটে অবস্থিত রোহরীতে গিয়ে পৌঁছালেন। এটি ভক্কড়ের একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এখানে হুমায়ূন চারবাগ নামক উদ্যানে অবস্থান করলেন। তাঁর অন্যান্য সহযোগিরাও সেখানে এসে যাত্রা-বিরতি করলেন,

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭১-৭২।
২. ঐ, পৃ. ১৭২ ; গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৮। ভক্কড় সিন্ধু নদের একটি দ্বীপ। এটি ২৭°৪৩′ উত্তর ও ৬৮°৫৬′ পূর্বে সককর ও রোহরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।
৩. আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭২) লিখেছেন, মোগলদের সৈন্য কম থাকা সত্ত্বেও খাওয়াস খাঁ ও আফগানদের যুদ্ধ করার সাহস হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সকলের অবস্থানের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় হিন্দাল তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে চার-পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে যাত্রা-বিরতি করলেন। পরে নদী পেরিয়ে তিনি নদীর অপর পারে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন।[১]

উত্তরে পঞ্জাব, পূর্বে রাজপুতানা, দক্ষিণ-পূর্বে গুজরাত ও পশ্চিমে বেলুচিস্তান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল ঘিরে থাকার কারণে মধ্যযুগে সিন্ধুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সিন্ধুর শাসক শাহ হুসেন মোগলদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি বাবুরের নামে খুতবা পড়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে নিয়েছিলেন।[২] গুজরাত অভিযানের সময় হুমায়ূনের অনুরোধে শাহ হুসেন উত্তরের দিক থেকে গুজরাত ঐ সময় আক্রমণ করেন যে সময়ে হুমায়ূন অন্য দিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন। শাহ হুসেন রাদনপুরের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে পাটন অবরোধ করেন। তাঁর এক সেনাপতি সুলতান মাহমুদ মাহমুদাবাদ অবধি অগ্রসর হয়ে, ঐ অবধি অংশ নষ্ট করে দিলেন। আরগুন সুলতানের আক্রমণের কোনো ফলাফল পাওয়া গেল না, কেননা, সিন্ধুর আমীর এই অভিযানের পক্ষপাতী ছিলেন না।[৩]

শাহ হুসেন বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্য সদা সতর্ক ছিলেন। এই কারণে, যখন তিনি তাঁর এক দূত, মীর খলীফা আরগুনকে হুমায়ূনের কাছ থেকে বাংলা বিজয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে গৌড় পাঠান তখন তাঁর সাথে তিনি মীর খুশ মুহম্মদ আরগুনকে, কামরানের কাছে তাঁর কান্দাহার বিজয়ের জন্য সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আগ্রা পাঠান।[৪] বাস্তবে, দুই দূতকে মোগলদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। চৌসার যুদ্ধের পরই তিনি আশঙ্কিত হন এই ভেবে যে, মোগলরা সিন্ধুতে আসতে পারেন, এ কারণে তিনি উছ্ থেকে ভক্কড় পর্যন্ত নদীর দু'দিকের কৃষিক্ষেত্রগুলোকে বরবাদ করে দেওয়ার আদেশ দেন।[৫] কনৌজের যুদ্ধের পর তিনি আরো সতর্ক হয়ে যান। তিনি ভক্কড়ের দুর্গে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র একত্রিত করেন এবং নিকটবর্তী স্থানগুলো ধ্বংস করে দেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছিলেন।

এ সময়ে ভক্কড়ের গভর্নর ছিলেন সুলতান মাহমুদ। হুমায়ূনের সৈন্যদের পৌঁছানো মাত্রই মাহমুদ একে আক্রমণ বলে মনে করলেন এবং মোগলদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রোহরী দুর্গ তিনি নষ্টভ্রষ্ট করে দিলেন এবং নিজে ভক্কড়ের দ্বীপ দুর্গে সসৈন্যে চলে গেলেন। তিনি তাঁর সাথে পাঁচটি

---

১. আবুল ফজল, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭২-৭৩ ; রোহরী গ্রাম, ২৭°৪১´, উত্তর ও ৬৮°৫৬। পূর্বে সিন্ধু নদের তটে অবস্থিত।
২. তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৪২।
৩. ঐ, পৃ. ১৬২-৬৪।
৪. তারীখে মাসুমী, ১৬৫।
৫. ঐ, পৃ. ১৬৬ ; ইলয়ট ও ডাসন, ১, পৃ. ৩১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকাও নিয়ে গেলেন যাতে হুমায়ূন তা অধিকার করতে না পারেন। হুমায়ূন তাঁকে দুর্গ সমর্পণ করতে এবং তাঁকে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখলেন। সুলতান মাহমুদ তাঁর মালিক শাহ হুসেন ও আরগুনের আদেশ ব্যতীত দুর্গ সমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি হুমায়ূনের সাথে সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুরাজি বাজার-কর্মকর্তা মেহতর আশরাফের নেতৃত্বে হুমায়ূনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[১]

ড. ব্যানার্জি লিখেছেন, ভক্করের গভর্নর হুমায়ূন ও শাহ হুসেনের পত্র-ব্যবহারের কথা জানতেন না। এজন্য তিনি সম্রাটের বিরোধিতা করলেন।[২]

পণ্ডিত লেখকের এ মন্তব্য ঠিক বলে প্রতীত হয় না। শাহ হুসেনের নিজ রাজ্য ও দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থা করা, যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং পরেও হুসেনের দুর্গ সমর্পণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, গভর্নরের তাঁর মালিকের ইচ্ছার কথা জানা ছিল না। তাছাড়া পত্র-ব্যবহারকালে হুমায়ূনের দুর্গ আক্রমণ করাটা উচিত ছিল না।

ভক্করের দুর্গ অধিকারে ব্যর্থ হয়ে হুমায়ূন দুই প্রতিনিধি, আমীর তাহির ও আমীর সমন্দরকে, শাহ হুসেনের কাছে বার্তা নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। এতে তিনি বিনানুমতিতে প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সিন্ধু অধিকার করতে চান না, কেবল পরিস্থিতিবশত তাঁর রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি শাহ হুসেন আরগুনের কাছে তার জন্য গুজরাত আক্রমণে সহায়তা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।[৩]

হুমায়ূনের আমীররা কোনো সংরক্ষিত স্থানের জন্য চিন্তিত ছিলেন। যেখানে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপদে রাখতে পারেন। তাঁদের কথা মনে রেখে হুমায়ূন সিন্ধুর শাসকের কাছে নিম্নলিখিত শর্তগুলো দূত মারফত পাঠালেন :[৪]

১. শাহ হুসেন মোগলদের অধীনতা স্বীকার করুন।
২. তিনি স্বয়ং হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত হোন।
৩. গুজরাত বিজয়ে শাহ হুসেন মোগলদের সাহায্য করুন।
৪. কিছুকালের জন্য শাহ হুসেন ভক্কড় দুর্গকে মোগলদের সমর্পণ করুন, যাতে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপদে রাখতে পারেন।

এই সময়ে দরিজা এবং সাফিয়ানি সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক হুমায়ূনের সেনাদলে ভর্তি হয়ে গেল, যার ফলে, সৈন্য ও সহায়কদের সংখ্যা অনেক বেড়ে

১. তারীখে মাসুমী পৃ. ১৬৫। ৫০০ পাঠার বহন পরিমাণ আনাজ এবং খাদ্যসামগ্রী পাঠান।
২. ব্যানার্জি হুমায়ূন, ২, পৃ. ২৬।
৩. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ, ১৪৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৭৭।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৩ ; গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ, ১৪৮-৪৯ ; তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল।[১] খাদ্যশস্যের অভাবের কারণে খাদ্যবস্তুর মূল্য অনেক বেড়ে গেল। সহায়কদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে হুমায়ূনের মনে আশার সঞ্চার হল যে, প্রয়োজন পড়লে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেও এ সমস্ত ভূ-ভাগ অধিকার করে নিতে পারবেন। শুক্রবারের নামাজে রোহরীর মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পড়ানো হল।[২] আকাল থেকে বাঁচার জন্য ইয়াদগার নাসির মির্জাকে নদীর অপর তীরে এবং হিন্দালকে সেহ্ওয়ানের কাছে পাতর[৩]-এ শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হল।

শাহ হুসেন হুমায়ূনের দূতকে স্বাগত জানালেন। তিনি তাঁর উত্তরে হুমায়ূনের সাথে গুজরাত অভিযানে সহায়তা দেওয়া ও স্বয়ং উপস্থিতে হওয়ার কথা বললেন কিন্তু তিনি রোহরীর দুর্গ মোগলদের কাছে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মোগলদের রোহরী ছেড়ে হাজকান[৪] যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কেননা, সেখানে খাদ্যশস্যের আধিক্য ছিল এবং হুসেনের সেখানে উপস্থিত হওয়ার সুবিধা ছিল।[৫]

শাহ হুসেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করলেন না। তিনি জানতেন যে, হুমায়ূনকে সাহায্য দেওয়ার অর্থ শেরশাহকে আমন্ত্রণ জানানো। হুমায়ূন এক নির্বাসিত শাসক ছিলেন। আফগানদের সাথে তাঁর যুদ্ধ করার মতো শক্তি, সাধন, যশ কিছুই ছিল না। সুবিধা পেলে সিন্ধুতেই তাঁদের রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল এবং এইভাবে হুসেনের রাজ্যপাটও শেষ হয়ে যেত। এই পরিস্থিতিতে শাহ হুসেন মোগল সম্রাটকে খাদ্যসামগ্রী ও মিষ্টি কথায় তুষ্ট তো করলেনই, কিন্তু তিনি যে কোনো প্রকারে তাঁকে তাঁর রাজ্যের বাইরে বের করে দিতে চাচ্ছিলেন। এই কারণে হুমায়ূন কর্তৃক প্রেরিত দূত তাঁর স্বীকৃতিতেই থেমে রইলেন এবং হুমায়ূনকে স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে তিনি তাঁকে কয়েক মাস ভুলিয়ে রাখলেন। রোহরী দুর্গ রক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি করলেন, যদিও হুমায়ূনের স্বভাব তাঁর জানা ছিল এবং তিনি মনে করতেন যে, হুমায়ূন যে উদ্যানে অবস্থান করছেন, তার শান্তি ও সৌন্দর্য ত্যাগ করে তিনি রোহরী আক্রমণ করবেন না।[৬] রোহরী দুর্গের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তিনি স্বয়ং সিবিস্তান আক্রমণের জন্য রওনা হয়ে গেলেন।

---

১. তারীখে মাসুমী, (পৃ. ১৭০)-এর মতে, দু'লাখ। সম্ভবত, এ সংখ্যা অতিশোয়োক্তিপূর্ণ।

২. ঐ, পৃ. ১৭০। জওহর ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি তার উল্লেখ করেন নি।

৩. আধুনিক 'প্যত কুবনা' গ্রামের কাছে। আঈনে আকবরী, ২, পৃ. ৩৪২ এর মতে, এটি মুলতান সুবার সিবিস্তান সরকারের অধীনে ছিল। দেখুন, মেজর জেনারেল এম, আর বেগ, দি ইন্ডস ডেল্টা কান্ট্রি, পৃ. ৯১ ; বেভারিজ কৃত আকবরনামার ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ৩৬২, টিপ্পনী ২।

৪. বর্নস, ন্যারেটিভ অব সিন্ধ্, আঈনে আকবরী, ২, পৃ. ৩৪১। হাজকান, জাজকান বা চাচকান, থাট্টার পূর্বে, রানের পশ্চিমে সিন্ধু শাখায় অবস্থিত ছিল। আকবরের আমলে এটি মুলতান সুবার সরকারের অধীনে ছিল। এতে ১১টি মহল ছিল। যেগুলোর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১, ১৭, ৮৪, ৫৮৬ দাম।

৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৩-৭৪।

৬. তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোহরী উদ্যানে কিছুদিন অবস্থানের পড় হুমায়ূন তাঁর মীরে মাল (কোষাধ্যক্ষ) আবদুল গফুরকে শাহ হুসেনকে ডাকার জন্য পাঠালেন। শাহ হুসেন উত্তর দিলেন যে, "তাঁর কন্যার (মাহচুক) সাথে কামরানের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে এবং তিনি বিয়ের ব্যবস্থা-কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে উপস্থিত হতে অসমর্থ।"[১]

শাহ হুসেনের উত্তরের পর এবার তাঁর সাথে সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনো পথ রইল না। হুমায়ূন ইতিমধ্যে বার্তালাপে কয়েক মাস ব্যর্থ সময় কাটিয়ে দিয়েছিলেন, যা ছিল একেবারেই নিষ্ফল। ইতিমধ্যে হিন্দালের কান্দাহার যাওয়ার খবর এসে পৌঁছাল।[২] মোগল দলের অধিকাংশ আমীর তাঁকে ত্যাগ করে চলেই গিয়েছিলেন। হিন্দাল চলে গেলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ত। অতএব, হুমায়ূন এতে বড়ই চিন্তিত হলেন। হিন্দালের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বোঝানো প্রয়োজন ছিল, একথা ভেবে তিনি পাতর পৌঁছালেন। তিনি হিন্দালকে তাঁর কান্দাহার যাওয়া বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। হিন্দাল তা ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করায় হুমায়ূন বড়ই প্রসন্ন হলেন।

হামিদা বানুর সাথে বিবাহ

WWW.AMARBOI.COM

হুমায়ূন পাতর-এ কিছুদিন অবস্থান করলেন। ইতিমধ্যে একদিন তিনি হিন্দালের মা দিলদার বেগমের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। এখানে সমস্ত মহিলাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও স্বাগত জানাতে এলেন। এই মহিলাদের মধ্যে এক চতুর্দশ বর্ষীয়া তরুণীর উপর তাঁর দৃষ্টি নিপতিত হল। হুমায়ূন তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। হিন্দাল বললেন. উনি তাঁর শিক্ষক বাবা দোস্ত[৩] এর কন্যা হামিদা বানু। একথা জেনে যে, তাঁর বাগ্‌দান তখনো হয় নি, তখন হুমায়ূন তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা হামিদা বানুর ভাই খাজা মুআজ্জমকে বললেন, "এ ছেলে আমার নিজেরই আত্মীয়" এবং হামিদা বানুকেও বললেন "ইনিও আমার আত্মীয়া।"[৩] পর দিন হুমায়ূন দিলদার বেগমের কাছে হামিদা বানুকে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হিন্দাল হুমায়ূনের একথা শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিনি বললেন, "আপনি

---

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৪৯।

২. মীর বাবা দোস্ত ইরানের অধিবাসী ছিলেন এবং হুমায়ূনের আমলে তিনি সদর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। (তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৭১-এর মতে, তাঁর নাম ছিল শায়খ আলী আকবর জামী। এর বিবেচনার জন্য দেখুন, গুলবদন বেগমের হুমায়ূননামার ইংরেজি অনুবাদে বেভারিজের টিপ্পনী, পৃ. ২৩৭-৪১) পরে ইনি আকবরের আমলে তিন হাজার এর মনসবদার পদে নিযুক্ত হন। জওহর বাবা দোস্তকে হিন্দালের আখুন্দ বলেছেন, আখুন্দ শব্দের অর্থ শিক্ষক বা ধর্ম প্রচারক।

৩. হুমায়ূন সম্ভবত একথা এই কারণেই বলেন, কেননা, তাঁর মা মাহম বেগমও শায়খ আহমদ জাম জিন্দাপীরের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। যার সাথে হামিদা বানুর পরিবারও ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে আসেন নি ; বরং নিজের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে এসেছেন। আপনি যদি এই ধরনের চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আমি আপনাকে ছেড়ে এখান থেকে চলে যাব।"[১] মির্জা হিন্দাল আরো বললেন যে, তিনি হামিদা বানুকে নিজের বোন ও মেয়ের মতো দেখেন। হুমায়ূন বাদশাহ ছিলেন এবং দু'জনের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।[২] হুমায়ূন এতে বড়ই অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

হুমায়ূনের এ আচরণ অনুচিত ছিল। নির্বাসনের কঠিন পরিস্থিতিতে, তাঁর চেয়ে ১৯ বছরের ছোট এক কন্যার সাথে, প্রথম দর্শনেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার দ্যোতক ছিল। এ সময়ে হুমায়ূনের বয়স ছিল প্রায় ৩৩ বছর এবং হামিদা বানুর ১৪ বছর। দেখতেও দু'জনের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। এ সময়ে হুমায়ূনের কয়েকজন পত্নী ছিলেন। গুলবদন বেগম তাঁর ৬ পত্নীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] যাঁদের মধ্যে সম্ভবত, ৪ জন ঐ সময়ে তাঁর সাথেই ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে একটি মেয়েকে দেখে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করার প্রস্তাব ছিল উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রতীক। হিন্দাল হামিদা বানুকে নিজের বোন বলে মনে করতেন এবং তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে তাঁকে নিজের মেয়ের মতো মনে করতেন। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূনের এই প্রস্তাবে তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল।

হুমায়ূনের ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাওয়াতে দিলদার বেগম বড়ই দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁর পুত্র হিন্দালকে তাঁর এই ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং তাঁকে বললেন বাদশাহর সামনে তাঁর এই ধরনের ব্যবহার করা উচিত নয়। এই সমস্যাটি দিলদার বেগম স্বয়ং তাঁর নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং হুমায়ূনকে একটি পত্র লিখলেন যাতে তিনি তাঁর ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাওয়াতে যুগপৎ দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, হামিদা বানু বেগমের মা এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে শুরু করেছেন এবং তিনি কন্যার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সচেষ্ট।[৪] হুমায়ূন এতে বড়ই প্রসন্ন হলেন। এতে কিছুটা আশা জাগল যে, তাঁর মনোস্কামনা পূর্ণ হবে। তিনি দিলদার বেগমকে লিখলেন, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকেই তিনি স্বীকার করে নেবেন। অবশেষে, তিনি লিখলেন তিনি পথ চেয়ে বসে আছেন।[৫]

দিলদার বেগম হিন্দালকে বুঝিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিবাহের স্বীকৃতি নিয়ে নিলেন। হুমায়ূনের মন বুঝে তিনি তাঁর সম্মানে এক মজলিসের আয়োজন

---

১. জওহর, রিজভী, মুগল কালীন ভারত, হুমায়ূন, খণ্ড ১, পৃ. ৬২৪।

২. হুমায়ূননামা, পৃ. ৫২। "হযরত পাদশাহ অন্দ মবার্দা মআশে নেক ন শবেদ" তা বায়সে কুলফত শবদ।

৩. হুমায়ূনের পত্নীদের জন্য এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায় দেখুন।

৪. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫০।

৫. ঐ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। বাদশাহ দিলদার বেগমের সাথে সাক্ষাতের অবসরে হামিদা বানুর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হামিদা বানুকে ডাকা হল কিন্তু তিনি এলেন না। তারপর সুবহান কুলিকে তাঁকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হল। কিন্তু হামিদা বানু তা সত্ত্বেও আসতে রাজি হলেন না। তিনি বারবার বলতে লাগলেন "বাদশাহর সামনে যাওয়া একবারই জায়েজ, দ্বিতীয় বার নামহরম (যাঁর সামনে মহিলাদের যাওয়া উচিত নয়)। আমি যাব না।" চল্লিশ দিন অবধি হামিদা বানুকে বোঝানোর প্রয়াস জারি রইল। একদিন দিলদার বেগম বললেন "বিয়ে তো তুমি করবে অবশ্যই কিন্তু বাদশাহর চেয়ে ভাল আর কে হবে ?" হামিদা বানু উত্তর দিলেন "আমি কাউকে বিয়েতো অবশ্যই করব, কিন্তু সে এমন একজন মানুষ হবে যার দরিদ্রতা আমার হাত স্পর্শ করবে, তবে এমন কাউকে নয়, যার সীমানাও আমি স্পর্শ করতে পারব না।"[১] অর্থাৎ, দু'জনের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব এত বেশি ছিল যে, এ বিয়ে উচিতই ছিল না। দিলদার বেগম তাঁকে অনেক বোঝালেন, অবশেষে অনেক কষ্টে হামিদা বানুকে বিয়েতে রাজি করানো গেল।[২]

২৯ আগস্ট ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে দু'জনের বিয়ে সম্পন্ন হল। হুমায়ূন, যিনি স্বয়ং জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞাতা ছিলেন, দিনক্ষণ নিশ্চিত করলেন। নিশ্চিত সময় অতিক্রান্ত হতে দেখে হুমায়ূন মীর আবুল বকাকে অনতিবিলম্বেই বিয়ে সম্পন্ন করতে বললেন। বিয়ের পর মীর আবুল বকাকে দু'লক্ষ মুদ্রা 'নিকাহানা' রূপে দেওয়া হল।[৩]

---

১. গুলবদনের ভাষা এই প্রকার : আরে ব কসে খাহম রসিদ কী দস্তে মন ব গরেবানে উ বরসদ ন আকি ওয়া কসে বেরসম কি দস্তে মন নীদানম ব দামনে উ রসদ (হুমায়ূননামা, ফা. ৫৩)। ড. ব্যানার্জি (খণ্ড, ২, পৃ. ৩৪)-এর অর্থ করেছেন, হুমায়ুন খুব লম্বা ছিলেন আর হামিদা বানু উচ্চতায় তাঁর চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। এ অর্থ ঠিক নয়। এ বাক্য আলঙ্কারিক এবং এ থেকে হুমায়ূনের সাথে তাঁর সামাজিক স্তরের দূরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হামিদা বানুর এইভাবে হুমায়ূনের উচ্চতার প্রতি ইঙ্গিত করাটা অসম্ভব প্রতীত হয়। এর আক্ষরিক অর্থ এই হলে গুলবদন বেগম কথাটি এভাবে লিখতেন না। কেননা, এর দ্বারা হামিদা বানুর লজ্জাহীনতা প্রকাশ পেত।

২. হামিদা বানু হুমায়ূনের সাথে বিয়েতে কেন অস্বীকৃতি জানালেন, এ বিষয়ে ড. ভিনসেন্ট স্মিথ ও স্যার রিচার্ড বর্ন (স্মিথ, আকবর, পৃ. ১৩ ; কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৪, পৃ. ৩৮)-এর এই মত যে, তিনি অন্য কাউকে ভালবাসতেন এবং অন্য কোথাও বাগ্‌দান হয়েছিল, একথা সত্য নয়, কেননা, সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনায় এর সমর্থন মেলে না। কেবল জওহর লিখেছেন, বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। বাগদান হয়ে গিয়েছিল কিংবা অন্য কারো প্রতি হামিদা বানুর দুর্বলতা ছিল— এ কথা সমকালীন ঐতিহাসিকেরা কেউ লেখেন নি। গুলবদন বেগম স্পষ্ট ভাষায় এ বিয়েতে হামিদা বানুর অস্বীকৃতির কারণ উল্লেখ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মূল কারণ। উপর্যুক্ত দুই লেখকের মন্তব্য এ দৃষ্টিতে কাল্পনিক। মিসেস বেভারিজের মতে, হামিদা বানুর অস্বীকৃতির কারণ ছিল হুমায়ূনের কয়েকজন পত্নী থাকাটাই। (হুমায়ূননামার ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৫০, টীকা-১)।

৩. ঐ সময়ে দু'লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা দেয়াটা হুমায়ূনের জন্য অসম্ভব প্রতীত হয়। সম্ভবত, দু'লক্ষ টাকা নয় ; বরং দু'লক্ষ দাম (পাঁচ হাজার টাকা) তাঁকে দেওয়া হয়। (ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন ও হামিদা বানুর বিয়ে কয়েকটি দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছিল একটি শিয়া-সুন্নীর বিয়ে। ঐ সময়ে যখন শিয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক রেষারেষি চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল, তখন এই বিয়ে ছিল হুমায়ূনের উদার মনোভাবের দ্যোতক। এই বিয়ের ১৪ মাস পরে হামিদা বানুর গর্ভে আকবরের জন্ম হয়, যিনি শুধু ভারত নন ; বরং সমগ্র বিশ্বের একজন মহান শাসক রূপে বিখ্যাত হন। দু'জনের বয়সের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের হয়েছিল। এরফলে, এ বিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

হিন্দালের পলায়ন

হুমায়ূনের গতিবিধি ও মরুভূমির সীমাহীন কষ্ট-যন্ত্রণায় হিন্দাল তো অস্থির হয়ে তো উঠেছিলেনই, এই সময়ে কান্দাহারের গভর্নর করাচা খাঁ তাঁকে কান্দাহারে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।[১] হিন্দাল তার প্রতি আকৃষ্টও হলেন কিন্তু হুমায়ূনকে ত্যাগ করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারছিলেন না। হামিদা বানুর সাথে হুমায়ূনের বিয়ে হওয়ার পর তিনি তাঁর বিরোধিতা প্রদর্শন করার বাহানায় এখান থেকে কান্দাহার যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। হুমায়ূনের বিয়ের পরই তিনি তাঁকে ছেড়ে কান্দাহার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

হুমায়ূনের ভাইদের মধ্যে শুধু হিন্দালই তাঁর সাথে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার ফলে মোগলরা আরো নিরাশ হলেন। হুমায়ূনের ভাইদের মধ্যে হিন্দাল তাঁর সাথে অবশ্যই থাকতে চাচ্ছিলেন কিন্তু এমনটি সম্ভব হচ্ছিল না, তিনি কিছুদিন পর পরই পালিয়ে যেতেন। এবারও তাই হল। বাস্তবে হিন্দালের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। একদিকে হুমায়ূনের সাথে সহযোগিতা করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, অন্যদিকে সমকালীন পরিস্থিতি ও তাঁর নিজের ভাইদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনিও হুমায়ূনের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর দ্বিতীয় প্রবৃত্তি জয়লাভ করল এবং তিনি হুমায়ূনকে ত্যাগ করলেন। যে পরিস্থিতিতে হুমায়ূন ছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁকে ফেলে যাওয়াটা মোগলদের সীমাহীন দুর্বলতার কারণ বনে গেল।

পৃ. ৩৭, টাকা ৩) বিয়ের দিনক্ষণ বিষয়ে আবুল ফজল কেবল ৯৪৮ হিজরি লিখেছেন। গুলবদন বেগম কেবল এতটা লিখেছেন যে, ৯৪৮ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসের সোমবারে তাঁর বিয়ে হয়, কোন তারিখে হয়েছিল একথা লেখেন নি। ড. ব্যানার্জি এ থেকে প্রথম সপ্তাহ (২৯ আগস্ট) নিশ্চিত করেন এবং ড. ঈশ্বরী প্রসাদ মিসেস বেভারিজের মত স্বীকার করেন (সেপ্টেম্বর, ১৫৪১ খ্রি.)। (ব্যানার্জি ২, পৃ. ৩৭ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫১ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২০৭)।

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল বকার মৃত্যু

হুমায়ূনের চাচাত ভাই ইয়াদগার নাসির মির্জা হিন্দালের অনেক কাছে ছিলেন। কান্দাহার যাওয়ার সময়ে হিন্দাল তাঁকেও সঙ্গে যাওয়ার কথা বললেন। এতে হুমায়ূন খুবই চিন্তিত হলেন। সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। যদি নাসির মির্জাও চলে যেতেন তাহলে হুমায়ূনের শক্তিতে খুব বড় আঘাত লাগত। হামিদা বানুর সাথে বিয়ের তিনদিন পরই তিনি পাতর থেকে রোহরী এলেন। শাহ হুসেন আরগুনের শর্তাবলী অস্বীকার করার পর এবার শক্তি প্রয়োগ করে ভক্কড় দুর্গ অধিকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। এজন্য পারস্পরিক ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। হুমায়ূন এ কারণে ইয়াদগার নাসিরকে বোঝানোর জন্য আবুল বকাকে পাঠালেন। তিনি বাবুরের আমলের এক প্রধান আমীর ছিলেন। তিনিই হুমায়ূনের অসুস্থতার সময়ে বাবুরকে কোনো বহুমূল্য বস্তু উৎসর্গ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১] মোগলদের কাছে তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন।

মীর আবুল বকা নাসির মির্জার সাথে পরামর্শ করে নিম্নলিখিত শর্তে তাঁকে হুমায়ূনকে সাহায্য করার জন্য রাজি করালেন :[২]

১. ইয়াদগার নাসির সিন্ধু নদ পার হয়ে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হবেন এবং হুমায়ূনের অধীনে থেকে তাঁকে সাহায্য করবেন।
২. হিঁদুস্তান বিজয়ের পর হুমায়ূন নাসিরকে তাঁর সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ দেবেন।
৩. হিঁদুস্তান বিজয়ের পূর্বে হুমায়ূন কাবুল অধিকার করলে ইয়াদগার নাসিরকে গজনী, চির্খ ও লোহাগড়ের[৩] অংশ প্রদান করা হবে। এই স্থানটি বাবুর তাঁর ছোট ভাই নাসির মির্জার পত্নী, অর্থাৎ, ইয়াদগার নাসিরের মাকে দিয়েছিলেন।

এই প্রকারে, এক রকম সাম্রাজ্য বিভাজনের শর্ত স্বীকৃত হয়ে গেল। হুমায়ূনের এ সমস্ত শর্ত স্বীকার করার উপর আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তাঁর এই পরিস্থিতি বিচার করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কোনো ভুল করেন নি। আর ইয়াদগার নাসির মির্জার সাহায্য লাভের জন্য এই সন্ধি ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১১৬ ও ১১৮।
২. ঐ, পৃ. ১৭৪-৭৫।
৩. লোহাগড় এখন লোগর নামে পরিচিত এবং এটি এখন গজনী জেলায় অবস্থিত। বাবুরের মতে, এটি কাবুলের এক তুমান পরগনা ছিল। চির্খ লোহাগড় পরগনার একটি গ্রাম। আঈনে আকবরী, ২, পৃ. ৪১০ ; বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ২১৭ তে চির্খের বর্ণনা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্কড় দুর্গে বসবাসকারীদের হিন্দালের কান্দাহার যাওয়ার ও ইয়াদগার নাসিরের তাঁর সাথে যাওয়ায় খবের জানা ছিল। এতে তারা খুবই খুশি হয়েছিল, কেননা, এর ফলে, মোগলদের আক্রমণ করার শক্তি কমে যেত।

ইয়াদগার নাসির মির্জার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে ভক্কড় দুর্গের রক্ষকরা খুবই নিরাশ হল। তারা মনে করল এ সবেরই মূলে রয়েছেন আবুল বকা। মীর ১৮ জামাদিউল আউয়াল ৯৪৮হি.তে[১] ইয়াদগার নাসিরের সাথে সাক্ষাৎ করে পরদিন ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে, ভক্কড়ের দুর্গরক্ষকরা তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। তিনি আহত হলেন এবং পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল।[২] হুমায়ূন এতে খুবই দুঃখ পেলেন,কেননা, তাঁরই সাহায্যের জন্য আবুল বকা প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই সময়ে যখন সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন এমন উপযোগী ব্যক্তি তাঁর সাথে আর কেউই ছিলেন না।

সেহওয়ান আক্রমণ

পাতর থেকে ভক্কড় ফেরার পর শাহ হুসেন আরগুনের দূত শায়খ মীরক হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। শাহ হুসেন অন্য সব শর্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সামনে তিনি উপস্থিত হতে রাজি ছিলেন না। বাস্তবে তিনি হুমায়ূনকে ধোঁকায় ফেলে রাখতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূন দূতকে বিদায় দিলেন এবং হুসেনকে সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বললেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও শাহ হুসেন এলেন না। এখন আর যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইল না।

ইয়াদগার নাসির নদী পার হয়ে হুমায়ূনের সাথে এসে মিলিত হয়েছিলেন। শলা-পরামর্শের পর ইয়াদগার নাসিরকে ভক্কড় দুর্গ অভিযানের জন্য রেখে হুমায়ূন থাট্টা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। (সেপ্টেম্বর ১৫৪১ খ্রি, ১ জমাদিউল আখির ৯৪৮ হিজরি)। পথিমধ্যে সিন্ধিদের একটি দল হুমায়ূনের দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল কিন্তু হুমায়ূনের দল তাদের মেরে তাড়িয়ে দিল। ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর (১৭ রজব, ৯৪৮হিজরি) সেহওয়ানে[৩] পৌঁছালেন এবং তিনি দুর্গ অবরোধ শুরু করলেন।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৪। হিজরি বর্ষকে সবাই স্বীকার করেন কিন্তু এর দিন ও ইংরেজি তারিখের বিষয়ে মতভেদ আছে। ড. ব্যানার্জির মতে, ১৮ জমাডিল আউয়াল ৯৪৮ হি. তে শুক্রবার ৯ সেপ্টেম্বর ১৫৪১ খ্রি. ছিল। কিছু সমকালীন ঐতিহাসিকেরা ঐ দিনটি মঙ্গলবার বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৪৩, টীকা ২।

২. আকবরনামা, পৃ. ১৭৫ ; আর্সকিন ২, পৃ. ২২২ ; মিসেস বেভারিজ (হুমায়ূনামা, পৃ. ৫১) লেখেন ; তাঁকে সুলতান ভক্কাড়ির কাছে পাঠানো হয়, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর এ বর্ণনা সঠিক নয়।

৩. সেহওয়ান ২৬°২৬′ উত্তর এবং ৬৭°৫৪′ পূর্বে অবস্থিত ছিল (তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৭৯, টীকা ২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিন যাবত অবরোধ জারি রইল। শাহ হুসেন ভক্কড়ের দুর্গে আবশ্যকীয় রসদসামগ্রী একত্রিত করলেন এবং তিনি স্বয়ং ভক্কড়ের মধ্যবর্তী স্থলে চক্কর দিতে লাগলেন, যাতে মোগলরা প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী পেতে না পারেন এবং তাঁর দুর্গরক্ষকদের কোনো কিছুরই অভাব না থাকে। এরই মধ্যে মোগলরা কিছুটা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেলেন। পানাহার ও যুদ্ধসামগ্রীর অভাব এবং রোগব্যাধির অতিরিক্ত বন্যা মোগলদের কষ্টযন্ত্রণা অচিরেই বাড়িয়ে দিল। এই পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক আমীর ও সৈনিক হুমায়ূনকে ত্যাগ করে পালাতে লাগল। শাহ হুসেন এমন ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে তাদের ধনসম্পদ ও পদ দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নিতে লাগলেন। মীর তাহির সদর ও খাজা গিয়াসউদ্দীন জামীর ন্যায় ব্যক্তিরা হুমায়ূনকে ত্যাগ করে শাহ হুসেনের সাথে যোগ দিলেন। এরকমই মীর বরকা, মির্জা হাসান, জাফর আলী, ও খ্বাজা আলী বখশী হুমায়ূনকে ত্যাগ করে ভক্কড়ে গিয়ে ইয়াদগার নাসিরের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।[১] ইতিমধ্যে হুমায়ূন জানতে পারলেন যে, মুনিম খাঁ, ফজীল বেগ ও আরো কিছু লোকও পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন। হুমায়ূন এ পলায়ন রোধ করার জন্য পলায়নকারীদের নেতা মুনিম খাঁকে বন্দি করলেন।

অন্যদিকে, ইয়াদগার নাসির মির্জা রোহরীতে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। এইভাবে মোগল সৈন্যরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সিন্ধিরা ইয়াদগার নাসিরের উপর তিনবার আক্রমণ চালাল। অন্তিম আক্রমণে মোগলরা বহুসংখ্যক শত্রুকে হত্যা করল। এইভাবে ইয়াদগার নাসিরকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে শাহ হুসেন এক নতুন ষড়যন্ত্র রচনা করলেন।

সেহওয়ানে দিনের পর দিন হুমায়ূনের অবস্থান অবনতি হচ্ছিল। অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে পড়ল যে, শাহ হুসেনের শিবিরে আক্রমণের জন্য আলী বেগ জলায়েরর পাঁচ শ' সৈন্যেরও ব্যবস্থা করতে পারলেন না।[২] এই দুরবস্থায় হুমায়ূন ইয়াদগার নাসিরের সহায়তা চাইলেন। ইয়াদগার নাসির তরদী বেগ ও কাসিম বেগকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে হুমায়ূনকে সাহায্য করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। শাহ হুসেন এ থেকে সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি ইয়াদগার নাসিরকে ফুসলে নিয়ে নিজের পক্ষে টানার পরিকল্পনা করলেন। তিনি বাবুর কুলিকে ইয়াদগার নাসিরের কাছে বলে পাঠালেন যে, তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই এবং ইয়াদগার নাসিরের সাথে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে রাজ্য অর্পণ করতে চাচ্ছেন।[৩] শুধু তাই নয়, তিনি এ আশ্বাসও দিলেন যে, তাঁরা দু'জনে সহজেই গুজরাত অধিকার করে নিতে পারবেন। ইয়াদগার নাসির এই কুচক্রে ফেঁসে গেলেন। তিনি হুমায়ূনের সাহায্য প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ তো দিলেনই না

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৬।

২. জওহর স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪৬।

৩. তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৭৪ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৭ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আগে যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তা তিনি প্রত্যাহার করলেন। সেহওয়ান অবরুদ্ধ রাখা অসম্ভব ছিল। হুমায়ূনকে বাধ্য হয়ে সেহওয়ানের অবরোধ তুলে নিতে হল। অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিনি ভক্কড় অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

পথিমধ্যে হুমায়ূনের অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে হাতে পায়ে বড় আঘাত পেলেন। একবার সিন্ধি সৈন্যরা অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে দিলে মোগল মহিলাদের খালি পায়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে হয়।[১] ইংরেজি অনুবাদে মহিলাদের অর্ধনগ্ন অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। বাধ্য হয়ে মুনিম খাঁকে মোগলদের সাথে সদাচার করার জন্য বলে পাঠালেন। শাহ হুসেন তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করলেন কিন্তু হুমায়ূনকে বেশি উত্যক্ত করলেন না।

ভক্কড় পৌঁছে হুমায়ূন আরো নিরাশ হলেন। এখানে ইয়াদগার নাসির নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাতের বেলায় তিনি সিন্ধিদের নৌকা সরিয়ে নিতে বললেন এবং তিনি সকালে হুমায়ূনের কাছে এই বলে ক্ষমা চেয়ে নিলেন যে, রাতের বেলা শত্রুরা নৌকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।[২] এই সময়ে স্থানীয় দুই জমিদার- হালা ও গনজমের—সহায়তায় হুমায়ূন সিন্ধু নদ পার হলেন। হুমায়ূনের নদী পার হতে দেওয়ার খবর পেয়ে ইয়াদগার নাসির জমিদারদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কিছু আরগুন সৈন্যকে হত্যা করে তিনি তাদের মাথাগুলো সাথে নিয়ে হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত হলেন যাতে তাঁর প্রতি হুমায়ূনের আর কোনো সন্দেহ না থাকে। হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। শাহ হুসেনের কথামতো ইয়াদগার নাসির হুমায়ূনের শিবিরে শাহ হুসেনের ভয়ে পালিয়ে থাকা দুই জমিদারকে ধরে এনে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। শাহ হুসেন তাঁদের হত্যা করলেন।[৩] এইভাবে হুমায়ূনের হঠকারিতায় তাঁর আপৎকালের দুই সাহায্যকারী নির্মমভাবে নিহত হলেন।

ইয়াদগার নাসির হুমায়ূনের লোকেদের ভড়কাতে লাগলেন আর হুমায়ূনের শিবির থেকে তাঁদের পলায়ন এত সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠল যে, তাঁদের আটকানোর জন্য হুমায়ূনকে সারা রাত জেগে থাকতে হল। তিনি তাঁকে রোহরিতে শিবির গড়তে দিতেও রাজি হলেন না। শুধু তাই নয় একবার তিনি হুমায়ূনের উপর আক্রমণ চালাতেও উদ্যোগী[৪] হলে অনেক কষ্টে তাঁকে রোধ করা সম্ভব হল। হুমায়ূনের আপৎকালে এ সমস্ত কাঠিন্য বড়ই অসহনীয় ছিল। মোগল শিবিরে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছিল। কাউকেই বিশ্বাস করার মতো অবস্থা ছিল না। এই সীমাহীন

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৪৭।
২. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮২।
৩. আকবরনামা, পৃ, ১৭৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৮২-৮৩।
৪. আকবারনামা, ১, পৃ, ১৭৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, ৮২-৮৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিক-কষ্টযন্ত্রণায় অস্থির ও হতাশ হুমায়ূন এবার সন্ন্যাস গ্রহণের চিন্তা করলেন এবং রাজ্যপাট ত্যাগ করে মক্কায় যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যোধপুর যাওয়ার চিন্তা করলেন। সেখানকার শাসক মালদেব কিছুদিন পূর্বে তাঁকে যোধপুরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

মালদেব ও হুমায়ূন

রাজপুতানার ইতিহাসে রাঠোর বংশের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানকার শাসক ছিলেন জয়চাঁদ (১১৭০-৯৪খ্রি.)। মুহম্মদ ঘুরির বিরুদ্ধে চন্দরায়ের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এই বংশের শক্তি এক ভীষণ ধাক্কা খায়, কিন্তু এ বংশের পতন হয় নি। এখান থেকে পালিয়ে লোকেরা যোধপুর চলে যায়, যা পরে এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে যোধপুরে মালদেব রাজত্ব করতেন। রাও মালদেব রাওগাঙ্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গাঙ্গা ছিলেন খুবই ভদ্র এবং নম্র। তিনি তাঁর রাজত্বের সীমা বাড়ানোর কোনো চেষ্টা করেন নি। এর বিপরীতে মালদেব ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উগ্র। এই কারণে তিনি তাঁর পিতার বিরোধিতা করতেন। একদিন গাঙ্গা যখন আফিম খেয়ে প্রাসাদের উপর তলায় ঝারোকায় বসে ছিলেন, তখন মালদেব পেছন থেকে গিয়ে তাঁকে তুলে নিচে ফেলে দেন। যাতে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল।[১] পিতাকে হত্যা করে যে সময়ে মালদেব সিংহাসনে বসেন ঐ সময়ে কেবল সোজাত ও যোধপুর পরগনাটিই তাঁর অধিকারে ছিল মাত্র। শুরুতে বাহাদুর শাহের উত্থানের ফলে তিনি কঠিন সংকটে পড়েন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নিকটস্থ রাজ্যগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগে কয়েক বছরের মধ্যে আশপাশের অনেক রাজ্য অধিকার করে তিনি যোধপুরে সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেন। হুমায়ূন ও শের খাঁর মধ্যে কনৌজের যুদ্ধের সময়ে নাগৌর, মেরতা, বিকানির ও জয়সলমীর তো মালদেবের অধিকারে ছিলই, সেই সাথে জয়পুরের কিছু অংশও তাঁর অধিকারে ছিল। এর অতিরিক্ত তিনি মেবারও আক্রমণ করেছিলেন।[২] রাজপুতানায় তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন। আজমীর ও নাগৌর বিজয়ের পর তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা মোগল সাম্রাজ্যের (পরে শেরশাহের) সীমা সংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল। আজমীর ও নাগৌর দিল্লির অধীনস্ত হয়ে গিয়েছিল। মালদেবের রাজ্য দিল্লি সংলগ্ন ছিল এবং তাঁর প্রায়

---

১. ওঝা, জয়পুর কা ইতিহাস, ১, পৃ. ২৮০-৮১ ; রেউ, মারওয়াড় কা ইতিহাস, ১, পৃ. ১১৫ ; কবিরাজ শ্যামলদাস, বীরবিনোদ, ২. পৃ. ৮০৮।

২. শ্রীরাম শর্মা, স্টাডিজ ইন মেডিভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, অধ্যায় ১১, হুমায়ূন ও মালদেব, পৃ. ১৬৬ ; নিজামউদ্দীনের আহমদেরও মতে, ঐসময়ে তাঁর ন্যায় সামরিক শক্তিধর আর কোনো ব্যক্তি হিঁদুদের মধ্যে ছিল না। তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮৩-৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০,০০০ শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।[১] তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সময়ে দিল্লির শাসকের সাথে সংঘর্ষ বেধে যাওয়াটা অসম্ভব ছিল না।

মালদেবের নিমন্ত্রণ

সিন্ধুতে অবস্থানকালে হুমায়ূন মালদেবের নিমন্ত্রণ পান।[২] যাতে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, হুমায়ূন যোধপুর এলে তাঁকে সাহায্য করা হবে। মালদেবের এই নিমন্ত্রণের কী কারণ ছিল? মোগল-আফগান সংঘর্ষে যোধপুরের জন্য তটস্থ থাকা অধিক উপযুক্ত ছিল। কিন্তু মালদেব নিঃশঙ্ক ও বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ভীতত্রস্ত হতেন না। এই পরিস্থিতিতে শক্তি সংহত করার একটা উপযুক্ত সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন। এমন কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটল যা থেকে সিদ্ধান্ত পাকা করাটা তাঁর পক্ষে সহজ হল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মালদেব তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে কুপার নেতৃত্বে একটি বাহিনী বিকানির অভিমুখে প্রেরণ করলেন।[৩] আক্রমণের খবর পেয়ে বিকানিরের শাসক জাইতসি তাঁর মন্ত্রী নাগরাজের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে শেরশাহের কাছে সাহায্যের জন্য পাঠালেন।[৪] নগরাজ ও কল্যাণ মলের ফেরার আগেই মালদেব বিকানির আক্রমণ করে জাইতসিকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য অধিকার করে নিলেন।[৫] বিকানির কর্তৃক শেরশাহের আমন্ত্রণের খবর পেয়েই মালদেব হুমায়ূনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এমনও মনে হয় তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তিনি শেরশাহের কবল থেকে বিকানির রক্ষা করতে পারবেন না। এই কারণে হুমায়ূনের যোধপুর রাজ্যে প্রবেশ করার পরই তিনি তাঁকে বিকানির দেওয়ার আশ্বাস দেন।[৬] হুমায়ূনকে আমন্ত্রণ জানানোর পর শেরশাহের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। মালদেব এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। হুমায়ূনের নির্বাসনকে তিনি অস্থায়ী বলে মনে

AMARBOI.COM

---

১. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২৬৭; রঘুবীর সিংহ, পূর্ব আধুনিক রাজস্থান, পৃ. ৩০; রাজপুত, ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮০,০০০।

২. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮৪ অনুসারে মালদেব তাঁকে কয়েকবার যোধপুর আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবুল ফজলও লিখেছেন যে, তিনি কয়েকবার তাঁকে পত্র পাঠিয়ে আনুগত্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ১৭৯; ড. কানুনগোর মতে (শেরশাহ, পৃ. ২৬৬-৬৭) মালদেবের নিমন্ত্রণ তিনি ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে পেয়ে থাকবেন।

৩. যোধপুর রাজ্য কী খ্যাতি-১, পৃ. ৬৯; ওঝা, যোধপুর কা ইতিহাস-১, উদ্ধৃত পৃ. ২৯২।

৪. জয়সোম কা কর্মচন্দ বংশোত কীর্ত্তন কাব্যম; ওঝা, জয়পুর কা ইতিহাস-১, পৃ. ২৯২।

৫. রেউ, মারওয়াড় কা ইতিহাস, ১, পৃ. ১২৫-১২৬; এ ঘটনা ১৫৯৮ বিক্রমী (১৫৪১-৪২ খ্রি.) সংবত-এর। ওঝা যোধপুর কা ইতিহাস-১, পৃ. ২৯২-৯৩।

৬. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন। মোগল সম্রাটকে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে তিনি উত্তর ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।[১] মালদেবের এ আমন্ত্রণ হুমায়ূনের রাজপুত প্রীতির কারণে ছিল না।[২] প্রথম দুই মোগল সম্রাট কখনোই রাজপুতদের সাহায্য করেন নি, যা থেকে একথা প্রমাণিত হতে পারে। বাস্তবে এ মালদেবের আত্মরক্ষা ও নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ছিল। মালদেব বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নিমন্ত্রণপত্র পাঠানোর আগে তিনি তাঁর লাভ ক্ষতির হিসেব-নিকেষও করে থাকবেন, কেননা, এতে তাঁর অসফলতার অর্থই ছিল তাঁর পতন।[৩] পরিস্থিতিও মালদেবের পক্ষে ছিল। শেরশাহ তখনও তাঁর শাসন ও সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করে তুলতে পারেন নি। বাংলার খিজির খাঁর বিদ্রোহের পরিণাম স্বরূপ শেরশাহ তাঁর সৈন্যদের বিরাট একটা অংশকে পূর্ব অভিযানে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রায় ৫০,০০০ আফগান সেনা গকখরের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত ছিল। এইভাবে শেরশাহের সৈন্যদের প্রধান দুটি অংশ সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত ব্যস্ত ছিল। দু'অংশের সৈন্যদের একত্রিত করতেও অনেক সময় লেগে যেত। গোয়ালিয়রে তখনও তিনি অবরোধ জারি রেখেছিলেন। মালবের গোত্রপতিরা শেরশাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। রাজপুত সৈন্যরা স্থায়ী ছিল না ; বরং প্রয়োজনে তাঁদের একত্রিত করা হত। মালদেবের সৈন্যরা সে সময়ে তাঁর সাথেই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে হুমায়ূন ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে যোধপুর এসে গেলে হয়ত এমনও সম্ভব হত যে, মালদেব সাহায্য করে তাঁকে পুনরায় দিল্লির সিংহাসনে বসাতে সফল হতেন। কিন্তু এই সময়ে হুমায়ূন সিন্ধুর পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন এবং সিন্ধু বিজয়ে লিপ্ত রইলেন, যা অধিকার করাকে তিনি অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন। সিন্ধুর কঠিনতা, হিন্দালের পলায়ন, ইয়াদগার নাসিরের বিদ্রোহ এবং সিন্ধু বিজয় অসম্ভব দেখে হুমায়ূনের যোধপুরের নিমন্ত্রণের কথা স্মরণে এলো।

হুমায়ূনের যোধপুর যাত্রা

চারদিক থেকে নিরাশ হয়ে হুমায়ূন যোধপুর যাওয়ার চিন্তা করলেন। তিনি ইয়াদগার নাসিরকে ঐ প্রদেশ সমর্পণ করে দিলেন এবং তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে, শাহ হুসেন আরগুন তাকে ভক্কড় অধিকার করতে দেবেন না। ভক্কড় ছেড়ে হুমায়ূন উছ্ এলেন (মে, ১৫৪২ খ্রি.)। পথিমধ্যে তাঁর পানি, খাদ্যসামগ্রী ও পশুখাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিল। উছ্ এ তিনি বখশু লংগার কাছে সাহায্য চাইলেন কিন্তু তিনি এবার আর সাহায্য দিলেন না। পথিমধ্যে মোগলদের উপর

১. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২১০।

২. Probably, he also considered Humayur personally a friend of the Rajputs and was aware of his relations with the Sisodias of Mewer.". ব্যানার্জি, হুমায়ূন ২, পৃ. ৫৯এর এ মত সত্য নয়।

৩. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ চালিয়ে লোকেরা তাঁদের লুটও করে নিত। পরিস্থিতির এত অবনতি হল যে, লোকেদের কুল ও এই প্রকারের জংলী ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হল।[১] এইভাবে হুমায়ূনকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। উছ্ থেকে দিলাওয়ারা, ওয়াসিলপুর হয়ে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ৩১জুলাই বিকানির থেকে ১২ ক্রোশ দূরে হুমায়ূন শিবির ফেললেন। পথিমধ্যে আলী বেগ পরামর্শ দিলেন যে, দিলাওয়ারা দুর্গ অধিকার করে নেওয়া হোক কিন্তু হামায়ূন একথা বলে তা অস্বীকার করলেন যে, এতে মালদেব অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।[২]

মালদেবের রাজ্যে পৌছানোর পর হুমায়ূন এমন আভাস পেলেন যে, মালদেব সম্ভবত তাঁকে সহযোগিতা করবেন না। আবুল ফজল লিখেছেন যে, হুমায়ূন ও তাঁর সাথীদের মধ্যে মালদেবের প্রতারণার আশঙ্কা জাগল এবং তাঁরা তাকে সতর্ক থাকার জন্য বললেন। হুমায়ূন দূত রূপে মীর সমন্দরকে মালদেবের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এসে মীর সমন্দর জানালেন, যদিও মালদেব আনুগত্যের কথা বলছেন কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভের আশা নেই এবং তাঁর মনোভাবও ভাল নয়।[৩]

এই সময়ে মোগলদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। খাদ্যাভাব ও পানির অভাবে তাঁদের খুব কষ্ট ভোগ করতে হল।[৪] হুমায়ূনের সৈন্যরা ফলৌদি পরগনায় পৌছালেন। সেখানে তাঁরা প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী লাভ করলেন। মালদেবও শুকনো ফলমূল ও আশরাফি বোঝাই উট, কবচ এবং একটি পত্র পাঠালেন, যাতে হুমায়ূনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লেখেন, "আমি আপনাকে বিকানির দিচ্ছি।"[৫] ইতিমধ্যে হুমায়ূনের এক দরওয়ান রাজু পালিয়ে মালদেবের কাছে চলে আসে। সেখানে সে মালদেবকে জানায় যে, হুমায়ূনের কাছে অনেক বহুমূল্য হীরে জহরত রয়েছে। ঐ খবরই জান মুহম্মদ ইশাক আকার কাছেও পৌছাল। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মালদেব নাগৌরের সনকাই নামক এক বিশ্বস্ত সেবককে বণিকের বেশে হুমায়ূনের কাছে পাঠালেন। সে জানাল যে, সে হুমায়ূনের কাছ থেকে হীরে কিনতে চায়। হুমায়ূন তাকে জানালেন, এরকম অমূল্য হীরে কেনা যায় না। এ হয়

---

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৫২-৫৩।

২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৫৩। হুমায়ূন উত্তর দিলেন—"এই দুর্গ অধিকার করে নিলে আমি দুনিয়ার বাদশাহ হয়ে যাব না, তবে, মালদেব অবশ্যই অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

৩. আকবারনামা, ১, পৃ. ১৭১-৮০।

৪. জওহর লিখেছেন, পথিমধ্যে হুমায়ূনের সাথে এক মোগলের সাক্ষাৎ হল, যার কাছ থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। পিপাসার কারণে তিনি মরণাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। হুমায়ূন তাকে বললেন, "তুমি যে ঋণ আমার কাছে পাবে তা মাফ করে দিলে আমি তোমাকে পানি খাওয়াতে পারি।" মোগল তা মেনে নিল। হুমায়ূন কিছু লোককে সাক্ষী মানলেন এবং মোগলকে পানি দিলেন (জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৫৪)। এ থেকে হুমায়ূনের চরিত্র, পানির অভাব এবং হুমায়ূনের ধনের অভাব প্রমাণিত হয়।

৫. গুলবদন, গুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৪ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরবারির মাধ্যমে লাভ করতে হয় নতুবা কোনো সম্রাটের দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়।[১] এ সমস্ত কথাবার্তা এবং মালদেবের ছদ্মবেশী বণিকের আগমন হুমায়ূনকে সশঙ্ক করে তুলল।

হুমায়ূন রায়মল সোনি নামে অন্য এক দূতকে মালদেবের কাছে পাঠালেন। সন্দেহ এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, তাকে বলা হল পরিস্থিতির খবর লিখে জানানো সম্ভব না হলে সংকেত দ্বারা জানাবে। সংকেতের জন্য নিশ্চিত হল একটি হাতের পাঁচ আঙুল মুড়ে নিলে অনুমান করতে হবে যে, মালদেব বিশ্বস্ত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ধোঁকা বা প্রতারণার আশঙ্কা থাকলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি চেপে ইশারা করবে।[২]

রায়মল সোনিকে পাঠানোর পর হুমায়ূন ফলৌদি থেকে অগ্রসর হয়ে কূলায়ে যোগি (বা যোগি পুকুর) নামক স্থানে তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। রায়মলের পাঠানো বার্তাবাহক এখানে উপস্থিত হল। সে তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি বন্ধ করল, যা থেকে মালদেবের ধোঁকা-প্রতারণার সংকেত পাওয়া গেল। এর ফলে, হুমায়ূনের মোগল দল বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন নিরাশ হলেন না। তাঁর আশা ছিল যে, মালদেব তাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। এছাড়া পথের কঠিনতা এবং অন্য কোনো সহায়ক না থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় মালদেবের মনোভাব জানার প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি তৃতীয় বারের মাথায় আতকা খাঁকে মালদেবের কাছে পাঠালেন।

AMARBOI.COM

শেরশাহ্ ও মালদেব

শেরশাহের পঞ্জাব বিজয় ও তাঁর মোগলদের সাথে সন্ধি-বার্তার বর্ণনা আমরা উপরে করে এসেছি। শেরশাহ মোগলদের পঞ্জাব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি খাওয়াস খাঁকে হুমায়ূনের এবং কুতুব খাঁকে কামরানের পিছু ধাওয়া করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কামরানকে সিন্ধু নদ পার করে দিয়ে কুতুব খাঁ সিন্ধু নদের তটে ফিরে আসেন। খাওয়াস খাঁও হুমায়ূনের সিন্ধু প্রবেশের পর পঞ্চনদ থেকে ফিরে আসেন।[৩] শেরশাহ কিছুদিন খুশাবে শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা পাকা করার জন্য সেখানে অবস্থান করলেন। বিলোচদের অধীনস্ত রাখার জন্য তিনি রোহতাস নামক দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। হায়দার মির্জা কাশ্মীর অধিকার করে নিয়েছিলেন। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব শাসক কাজী চককে সহায়তা দিয়ে শেরশাহ হায়দার মির্জাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। এই সময়ে বাংলা থেকে খিজির খাঁর বিদ্রোহের খবর এসে পৌছায়। হায়বাত খাঁ নিয়াজী,

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮০।
২. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২৩১।
৩. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়াস খাঁ ও অন্য দলপতিদের ৫০,০০০ সৈন্য দিয়ে তাঁদের গকখর প্রদেশে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাংলার অভিমুখে প্রস্থান করেন (মার্চ, ১৫৪১খ্রি.)।

বাংলায় শান্তি স্থাপন করে সেখানকার শাসনব্যবস্থা পাকা করে শেরশাহ মালব আক্রমণ করেন। এই সময়ে তিনজন স্বাধীন দলপতি মালব শাসন করতেন। মাণ্ডু, উজ্জৈন ও সারঙ্গপুরে মল্লু খাঁ, রায়সীনে পূরণমল এবং হিন্দিয়া ও সেবাসে মুঈন খাঁ। শেরশাহের পৌছানো মাত্রই হুমায়ূন কর্তৃক নিযুক্ত মুহম্মদ কাসিম গোয়ালিয়র দুর্গ তাকে সমর্পণ করলেন। গাগরোনে রায়সীনের রাজা প্রতাপ শাহের শক্তিশালী সহায়ক পূরণমল তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। কাদির শাহও শেরশাহের অধীনতা স্বীকার করলেন কিন্তু একদিন রাতে তিনি পালিয়ে গুজরাতে চলে গেলেন। মুঈন খাঁও অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। কাদিরের পলায়নের অনুভব শেরশাহের ছিল। তিনি মুঈন খাঁকে বন্দি করলেন এবং তাঁর রাজ্য অধিকার করে নিলেন।[১] বিনা রক্তপাতে পুরো মালব শেরশাহের অধিকারে এসে গেল। শাসন ব্যবস্থার জন্য সেখানে তাঁর অধিকারী নিযুক্ত করে শেরশাহ্ রণথম্ভোর অভিমুখে প্রস্থান করলেন। দুর্গরক্ষক উসমান খাঁ বিনা যুদ্ধে তাঁকে দুর্গ সমর্পণ করলেন। সেখানে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে শেরশাহ আগ্রা ফিরে এলেন। এদিকে শেরশাহ বেলুচিস্তান থেকে বাংলা এবং মালবে যে সময়ে শান্তি স্থাপন করেন এবং শত্রুদের পরাজিত করেন সে সময়ে হুমায়ূন সিন্ধুতে কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করতে থাকেন। এ থেকে দু'জনের শক্তি ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

আগ্রা পৌছানোর কয়েক দিন পরেই শেরশাহ হুমায়ূনের যোধপুর যাত্রার খবর পেলেন। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, শেরশাহ মোগলদের হিঁদুস্তানের ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছিলেন। তিনি মালদেবের শক্তির কথা জানতেন। যোধপুর দিল্লি থেকে অধিক দূরে ছিল না। রণথম্ভোর ও মালব অধিকার করার পর নিরাপত্তার দৃষ্টিতে আগ্রার অবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঝজ্জর[২] মালদেবের অধিকারে ছিল। এ দিল্লি থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

হুমায়ূনের আগমন সংবাদে শেরশাহের আশঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ব্যর্থ কূটনৈতিক পত্র ব্যবহারের অবসর ছিল না। শেরশাহ তাৎক্ষণিক এবং ব্যবহারিক ঢঙে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আগ্রা হতে নাগৌর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি মালদেবের কাছে তাঁর এক দূত পাঠালেন। তিনি মালদেবকে জানিয়ে দিলেন, হয় আপনি হুমায়ূনকে যোধপুর থেকে বিতাড়িত করুন নতুবা এটা করতে আপনার পক্ষে অসুবিধা হলে সে কাজটি আফগানদের করার সুযোগ করে দিন। অর্থ স্পষ্ট ছিল, হুমায়ূন যোধপুরে প্রবেশ করলে অন্যদিক দিয়ে

১. শেরশাহের মালব বিজয়ের জন্য দেখুন কানুনগো, শেরশাহ, পৃ, ২৪৯-৬২ ; আশির্বাদীলাল শ্রীবাস্তব, শেরশাহ অ্যান্ড হিজ সাকসেসার্স, পৃ. ৪২-৪৩।

২. ২৮°৩৫ অক্ষাংশ ও ৭৮°৪৩ দেশান্তরে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফগানরা সেখানে প্রবেশ করে মোগলদের সেখান থেকে বের করে দেবে। শেরশাহ নাগৌর ও যোধপুর সংলগ্ন এলাকাটি অধিকার করে নিয়েছিলেন। যোধপুর পৌছাতে তাঁর বেশি সময় লাগত না। শেরশাহ ঐ সময়ে মালদেবের সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন না, এই কারণে তিনি লিখলেন যে, মালদেব হুমায়ূনকে বিতাড়িত করলে নাগৌরে তাঁর অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং আলোয়ারসহ অন্য যে কোনো স্থান তিনি চাইলে তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে।[১]

যোধপুর থেকে হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তন

আতকা খাঁর মালদেবের দরবারে পৌছানোর সাথে সাথে শেরশাহের দূতও সেখানে পৌছান। মালদেবের জন্য এ ছিল বড়ই কঠিন পরিস্থিত। তিনি হুমায়ূন ও শেরশাহ উভয়ের কবল থেকেই আত্মরক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। মোগল পক্ষ অবলম্বনের অর্থই ছিল শেরশাহের যোধপুর আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া। মালদেব যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। তাঁর সৈন্যরাও প্রস্তুত ছিল না। মোগলদেরও এমন অবস্থা ছিল না যাতে আফগানদের কবল থেকে তাঁরা মালদেবকে রক্ষা করতে পারত। মালদেব শেরশাহের দূতকে লোকদেখানোভাবে কিছু সৈনিককে মোগল শিবিরের দিকে পাঠালেন, যাতে আফগান দূতের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে যায় যে, মালদেব শেরশাহের পত্রানুসারে কাজ করতে প্রস্তুত, সেই সাথে তিনি আতকা খাঁকেও আটক করলেন, যাতে তিনিও দেখে নিতে পারেন যে, সৈন্য পাঠানো হচ্ছে— একথা হুমায়ূনকে জানিয়ে দেন। আতকা খাঁ রাজপুত সৈন্যদের যেতে দেখলেন।[২] মালদেব সম্পর্কে তাঁর মনে প্রথম থেকে তো সংশয় ছিলই, এবার তাঁর বিশ্বাস জন্মে গেল যে, মালদেবের মনোভাব মোগলদের আক্রমণ করা। অনুমতি ছাড়াই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হুমায়ূনের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক মোল্লা সুর্খ সে সময়ে মালদেবের অধীনে ছিলেন। তিনিও হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন আর অগ্রসর না হন এবং তিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই যেন ফিরে যান, মালদেব তাঁকে (হুমায়ূনকে) বন্দি করতে চাচ্ছেন, মোগলরা যেন তাঁকে বিশ্বাস না কর। তিনি তাঁর ভূতপূর্ব সম্রাটকে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, আফগান নেতা মালদেবের কাছে এই বলে দূত পাঠিয়েছেন যে, হুমায়ূনকে যেন যে কোনো ভাবে গ্রেপ্তার করে তাঁর কাছে অর্পণ করা হয় এবং তিনি তাঁকে এর বিনিময়ে নাগৌরে ও আলোয়ার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৩] আতকা খাঁ মালদেবের বিনানুমতিতেই ফিরে এলেন এবং তিনি হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন আর থেমে থাকার

---

১. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৪।

২. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮৫। বাস্তবে মালদেবের হুমায়ূনের উপর আক্রমণ করে তাঁকে বন্দি করার মনোভাব থাকলে তিনি আতকা খাঁকে বান্দি করতেন অথবা তাঁকে গোপন করে সৈন্য পাঠাতেন।

৩. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা বেভারিজ, পৃ. ১৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় নেই। মোগল শিবিরে হইচই পড়ে গেল। সেই সাথে পালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

মোগলরা শিবির উঠিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় চালাচ্ছিল, ঐ সময়ে দুই গুপ্তচরকে বন্দি করে সেখানে নিয়ে আসা হল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে একজন মাহমুদ গির্দবাজের কোমর থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে তাঁর উপরেই আক্রমণ চালিয়ে দিল। তারপর সে বাকি গোয়ালিয়রীকে আক্রমণ করল। দ্বিতীয় গুপ্তচরটি একজনের কোমর থেকে কটার ছিনিয়ে নিয়ে কয়েকজন লোককে ঘায়েল করে দিল এবং হুমায়ূনের ঘোড়াটিকেও হত্যা করল। অনেক কষ্টে এ দু'জনকে হত্যা করা সম্ভব হল।[১] এ সময়ে মালদেব এসে গেছে বলে হইচই শুরু হলে গেল। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মোগল আমীররা যার যার স্বার্থে মগ্ন ছিলেন এবং হুমায়ূনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, তা গুলবদনের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই হইচইয়ের সময়ে এমন কোনো ঘোড়া পাওয়া গেল না, যাতে সওয়ার হয়ে গর্ভবতী হামিদা বেগম পালাতে পারতেন। হুমায়ূন তরদী বেগকে ঘোড়া দেওয়ার কথা বললে তিনি অস্বীকার করলেন। হুমায়ূন তাঁর ঘোড়াটি দেওয়ার এবং স্বয়ং জওহরের উটে চড়ে যাত্রা করার কথা ব্যক্ত করলেন। সৌভাগ্যবশত, মাহম আংগার স্বামী নাদিম বেগ তাঁর মায়ের ঘোড়াটি বেগমকে দিলেন এবং স্বয়ং উটে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন।[২]

জোনি পুকুর থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন ফলৌদা পৌঁছালেন। রাজপুতরা মোগলদের পিছু ধাওয়া করছিল। তরদী বেগ ও মুনিম খাঁকে কিছু সৈন্যসহ মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করে হুমায়ূন অগ্রসর হলেন। ফলৌদি থেকে হুমায়ূন সাতলমীর পৌঁছালেন।[৩] পথিমধ্যে রাজপুত দলের সাথে মোগলদের যুদ্ধ হল।[৪] মোগল সৈন্যদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও রাজপুতরা তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হল

১. ঐ। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই ঘটনার বিষয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। আবুল ফজল, (আকবরনামা, ১, ১৮০) এর মতে, হীরা কেনার বাহানায় এই লোকেরা মোগল শিবিরে প্রবেশ করে। নিজামউদ্দীন (তবকাতে আকবরী, দে, ৮৬) লিখেছেন, দুই গুপ্তচরকে ধরে ফেলা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলতে চলতেই তারা আক্রমণ চালিয়ে দেয়। বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪০) এর মতে, দুই গুপ্তচর শিবিরের কাছে ধরা পড়ে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঐ সময়ে একজন আক্রমণ করে দেয়। জওহর (স্টুয়ার্ট, পৃ. ৫৫-৫৬)-এর মতে, পথ-প্রদর্শনে জন্য দু'জন উট চালককে ধরা হল। এদের উটগুলোকে রাজকীয় উটগুলোর সাথে বাঁধার আদেশ দেওয়া হল এবং হুমায়ূন আদেশ দিলেন, এদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে ওদের বন্দি করা হোক। ঐ সময়ে তাঁরা আক্রমণ করে।

২. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৩. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২,পৃ. ৬৯।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮১ ; গুলবদন, হুমায়ূন, বেভারিজ, পৃ. ১৫৫-৫৬ ; নিজামউদ্দীনের মতে, শায়খ আলী বেগের নেতৃত্বে ২২ মোগল এক বড় সংখ্যক রাজপুত দলকে পরাজিত করেন। (তবকাতে আকবরী, কে, ২ পৃ. ৮৪) বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪০)-এর বর্ণনাও নিজামউদ্দীনের অনুরূপ। জওহরের মতেও মোগল সৈন্যদের সংখ্য কম ছিল (স্টুয়ার্ট, পৃ. ৫৭)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। সম্ভবত, এরা মোগলদের সাথে যুদ্ধ করে হুমায়ূনকে বন্দি করতে চায়নি। পথের কষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। গরম হাওয়া বইছিল। ঘোড়া ও চতুষ্পদ প্রাণীদের হাঁটু পর্যন্ত গরম বালিতে দেবে যাচ্ছিল। অধিকাংশ নারী ও পুরুষ পায়ে হেঁটে চলেছিল। সবচেয়ে বড় কষ্ট ছিল খাবার পানির। তিনদিন যাবত তাঁরা এক ফোঁটা পানিও পান নি। পানির জন্য পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যেত। ডোল কুঁয়ো থেকে তোলামাত্রই লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যার ফলে দড়ি ছিঁড়ে ডোল কুয়োতে পড়ে যেত। অনেক মানুষ পিপাসায় মারা গেল আর অনেক চতুষ্পদ প্রাণী নষ্ট হয়ে গেল।[১] একরম কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হুমায়ূন জয়সলমীরে পৌঁছালেন (১৩ আগস্ট ১৫৪২খ্রি.)।

জয়সলমীর রাজ্যে গো হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। হুমায়ূনের লোকেরা এখানে কয়েকটি গরু জবাই করে বসলেন। এতে এখানকার শাসক রাওল লোনকরণ খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মোগল সম্রাটের কাছে তাঁর এক দূত পাঠিয়ে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন এবং এর প্রতিকার দাবি করলেন। মোগলরা এজন্য ক্ষমা না চেয়ে বরং দূতকে বন্দি করল। রাওল লোনকরণ তাঁর লোকেদের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে মোগলরা পানি না পেতে পারে। রাওলের পুত্র মালদেব মোগলদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের কিছু লোককে আহত করে তাদের বন্দিকে ছাড়িয়ে নিল।[২]

এখান থেকে হামায়ূন অমরকোট (উমরকোট) যাওয়ার চিন্তা করলেন। অমরকোটের রাণার পিতাকে শাহ হুসেন আরগুন হত্যা করিয়েছিলেন।[৩] হুমায়ূনের আশা ছিল যে, তাঁর সহায়তায় তিনি সিন্ধু বিজয়ে সফল হবেন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট হুমায়ূন কেবল সাত অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে অমরকোট পৌঁছালেন।[৪] এখানে অমরকোটের রাণা বীরসাল[৫] হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন। তাঁকে দুর্গের অভ্যন্তরে স্থান দেওয়া হল এবং মোগলদের সর্বপ্রকারের আবশ্যকীয় বস্তুর ব্যবস্থা করা হল।

AMARBOI.COM

মালদেব কী বিশ্বাসঘাতক ছিলেন ?

সমকালীন এবং আধুনিক ঐতিহাসিকেরা হুমায়ূনের প্রতি মালদেবের আচরণের সমালোচনা করেছেন। মোগল ঐতিহাসিকেরা মালদেবকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক বলে অভিহিত করেছেন, যিনি হুমায়ূনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে বন্দি

---

১. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৫-৫৭।
২. আকবরনামা, ১,পৃ. ১৮১-১৮২ ; জওহর স্টুয়ার্ট পৃ. ৫৮-৫৯।
৩. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, ১৫৭ ।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮২।
৫. আবুল ফজলের মতে (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮৭) রাণার নাম ছিল রাণা পরসাদ। তারীখে মাসুমী (পৃ.১৭৭) বীরশাল লিখেছেন, যা সঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার প্রয়াস চালান। আবুল ফজল লিখেছেন, কিছু লোক একথাও বলতেন যে, প্রথম দিনে হুমায়ূনের প্রতি মালদেবের মনোভাব পবিত্র ছিল এবং তিনি তাঁকে সহযোগিতাও করতে চাচ্ছিলেন। পরে, হয় হুমায়ূনের সৈন্যদের দুর্দশা এবং কম সংখ্যক দেখে নতুবা শেরশাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ক্রমবর্ধমান শক্তির কারণে মালদেবের মনোভাব বদলে গিয়েছিল। সম্ভবত, এর কারণ ছিল শেরশাহের ভয়। যাই হোক, মালদেব হুমায়ূনের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। অধিকাংশ লোক এ মতও পোষণ করেন যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মালদেবের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং এ সম্পর্কে হুমায়ূনকে পত্র পাঠানোটা ছিল কপটতাপূর্ণ।[১] জওহর মালদেবের হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত না হওয়া এবং তাঁর সেবা-সৎকার না করার জন্য তাঁর উপর দোষারোপ করেছেন এবং তিনি লিখেছেন যে, মালদেবের উদ্দেশ্যই ছিল হুমায়ূনকে কষ্ট দেওয়া।[২] গুলবদন বেগম মোল্লা সুর্খ কর্তৃক হুমায়ূনকে জানিয়ে দেওয়া এবং হুমায়ূনের শিবিরে দুই গুপ্তচরকে ধরে ফেলার বর্ণনা দিয়েছেন, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মালদেবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোগলদের সন্দেহ ছিল।[৩] বদায়ূনীর মতে, শেরশাহের সতর্কবার্তা পাওয়ার পর মালদেব এক বিশাল বাহিনীকে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে বাদশাহ হুমায়ূনকে স্বাগত জানানোর বাহানায় তাঁকে বন্দি করার জন্য পাঠালেন।[৪] তারীখে মাসুমীর মতে, হুমায়ূন গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর পেলেন যে, মালদেব শেরশাহের ধৃষ্টতাপূর্ণ আশ্বাস এবং তাঁর প্রভুত্ব দেখে একটি বাহিনী এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তারা যেন শাহী সৈন্যদের পথ রোধ করে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়।[৫] ফিরিশতা লিখেছেন, মালদেব হুমায়ূনের সৈন্যদের অব্যবস্থাপনা ও দুদর্শা দেখে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন এবং তাঁকে বন্দি করে আফগানদের কাছে পাঠিয়ে নিজের আনুগত্য প্রদর্শনের প্রমাণ পাঠানোর প্রয়াস চালালেন।[৬] নিজামউদ্দীন আহমদ বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক। তিনি লিখেছেন, রায় মালদেব হুমায়ূনের পৌছানোর খবর পেয়ে এবং তাঁর কাছে স্বল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য থাকার কথা জানতে পেরে খুবই চিন্তিত হলেন। কারণ তিনি শেরশাহকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি পাচ্ছিলেন না। শেরশাহও মালদেবের কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যধিক আশ্বাস এবং হুমকি দিয়েছিলেন। রায় মালদেব অত্যধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, সম্ভব হলে হুমায়ূনকে বন্দি করে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে চাচ্ছিলেন, কেননা, নাগৌর রাজ্য ও তার সংলগ্ন স্থান শের খাঁর

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮০।
২. জওহর স্টুয়ার্ট, পৃ. ৫৫।
৩. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৪-১৫৫।
৪. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪০।
৫. তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৭৬।
৬. ফিরিশতা, ব্রিগস, ১ পৃ. ৯৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে এসে গিয়েছিল, অতএব, তাঁর শের খাঁর ক্রোধের ভাগী হওয়ার ভয় ছিল। এই উদ্দেশ্যে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে তিনি একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। আতকা খাঁকে যাওয়ার অনুমতি এই কারণে দেয়া হয় নি, যাতে তিনি হুমায়ূনকে সাবধান না করে দেন। আতকা খাঁ তাঁর ব্যবহারে তাঁর মনোভাব বুঝে নেন এবং তাঁর বিনানুমতিতেই তিনি ফিরে যান। হুমায়ূনের এক গ্রন্থাগারিক, যিনি তাঁর পরাজয়ের পর দিল্লি থেকে মালদেবের কাছে চলে গিয়েছিলেন, একটি প্রার্থনাপত্র তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, মালদেব বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর রাজ্য থেকে চলে যাওয়াটা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আতকা খাঁর প্রচেষ্টা এবং গ্রন্থাগারিকের পত্রের কারণে হুমায়ূন তৎক্ষণাৎ অমরকোট অভিমুখে প্রস্থান করলেন।[১]

মারওয়াড়ের হস্তলিখিত পুস্তকাবলীতে এই ঘটনা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে বাদশাহ হুমায়ূন যখন মালদেব জী-র কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য যোধপুরের কাছে এসে থামলেন, তখন রাওজী তাঁর বড়ই আদর-সৎকার করলেন। এরপর হুমায়ূন যোধপুরের কাছে অবস্থান করা অনুচিত বলে বিবেচনা করে ফলৌদিতে গিয়ে অবস্থান নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একথাও তিনি সহর্ষে স্বীকার করে নিলেন। এই অনুসারে তিনি দেইঝট থেকে ফলৌদি অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু শাহী লস্করদের এতে উল্টো সন্দেহ উপস্থিত হল যে, সম্ভবত, এরা আমাদের হত্যা করে শাহী রাজকোষ লুট করে নেওয়ার জন্য পিছু ধরেছে।

এরপর আরো একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। যে সময়ে হুমায়ূন ফলৌদিতে পৌছালেন ঐ সময়ে তাঁর কিছু সৈনিক মিলে একটি গরু জবাই করল। এর ফলে, রাওজীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। এ দেখে হুমায়ূনের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল এবং তিনি ফলৌদি ছেড়ে সিন্ধু অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু রাওজীর সৈনারা মনে করল হিঁদু ধর্মের অবমাননার জন্য গরু জবাই করা হয়েছে। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং শাহী সৈন্যদের পিছু ধরল। সাতেলমীরে পৌছাতে পৌছাতেই দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু অবশেষে, নিজের লোকেদের ভুলের আধিক্য হেতু হুমায়ূন আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন এবং জয়সলমীর হয়ে অমরকোট গিয়ে পৌছালেন।"[২]

মোগল ঐতিহাসকিদের বর্ণনা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বেরিয়ে আসে—

১. মালদেব হুমায়ূনকে আমন্ত্রণ জানান।
২. হুমায়ূন আমন্ত্রণের কয়েক মাস পরে যোধপুরে এসে পৌছান।

---

১. তবকাতে আকবরী, কে, ২, পৃ. ৮৫-৮৬।
২. রেউ, মারওয়াড় কা ইতিহাস, ১, পৃ. ১২৭ ; বীর বিনোদ, ২. পৃ. ৮০৯-এ কবিরাজ শ্যামলদাস লিখেছেন, বাদশাহর সঙ্গী-সাথীরা গরু জবাই করল যার ফলে মালদেব নারাজ হলেন। তাঁর নারাজ হওয়ার খবর পেয়ে হুমায়ূন আশঙ্কিত হয়ে অমরকোট চলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. হুমায়ূনের যোধপুর পৌঁছানো মাত্রই শেরশাহ মালদেবের রাজ্যে পৌঁছে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিলেন।

৪. হুমায়ূনের যোধপুরে প্রবেশ করার প্রারম্ভে মালদেব তাঁকে আশ্বাস দিলেন কিন্তু তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন না।

৫. মোগল দূত আতকা খাঁ ও শেরশাহের দূত একসাথে মালদেবের দরবারে পৌঁছান।

৬. মালদেব হুমায়ূনের পিছু ধরে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের সৈন্য সংখ্যা মোগলদের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল, তা সত্ত্বেও মোগলদের বন্দি করা হল না, যদিও একটি সাধারণ যুদ্ধ হল।

৭. মালদেব হুমায়ূনের শিবিরে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাঁর অবস্থা অবগত হওয়ার প্রয়াস চালান।

উপর্যুক্ত বর্ণনা ও ঘটনার অধ্যয়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মালদেব হুমায়ূনকে যে সময়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—ঐ সময়ের চেয়ে হুমায়ূনের আগমনের সময়কালীন অবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল। শেরশাহ বাংলা থেকে ফিরে এসেছিলেন, মালব তাঁর অধীনে এসে গিয়েছিল এবং তিনি যোধপুর রাজ্যে প্রবেশ করে সসৈন্যে তার উপর আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সম্ভবত, মালদেবেরও সামরিক প্রস্তুতি ছিল না। মোগল সৈন্য নামমাত্র ছিল। আফগান সৈন্যদের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। এইভাবে হুমায়ূনের আগমনকালে মারওয়াড়ের পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে মালদেব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিলে শেরশাহ তো যোধপুর আক্রমণ করতেনই, মোগলরা তো পালাতই, সেই সাথে মালদেবও পদদলিত হতেন। হুমায়ূনের প্রধান ভুলটাই ছিল আমন্ত্রণের সাথে সাথে না এসে কয়েক মাস পরে আসা। এতে মালদেবের কোনো দোষ ছিল না। তিনি হুমায়ূনের প্রতি কোনো কঠোরতা দেখান নি। তাঁর ব্যবহারে তাঁর অসামঞ্জস্যতা ও নিরুপায় অবস্থাটিই প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি চাইলে হুমায়ূনকে বন্দি করতে পারতেন কিন্তু তিনি এটা চাননি। তিনি চাচ্ছিলেন, হুমায়ূন যে কোনো প্রকারে যোধপুর থেকে চলে যান। এ আচরণ শুধু মালদেবের পক্ষেই নয় ; বরং এ হুমায়ূনের পক্ষেও ঠিক ছিল। এমনও মনে হয় যে, মালদেবের শক্তি সম্পর্কে হুমায়ূনের কোনো সঠিক অনুমান ছিল না। যেভাবে হুমায়ূন তাঁর গুপ্তচর পাঠিয়ে মালদেবের মনোভাব জানতে চাচ্ছিলেন, মালদেবও তেমনি গুপ্তচর পাঠিয়ে হুমায়ূনের প্রকৃত অবস্থা জানতে চাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এ গুপ্তচররা ধরে পড়ে যায় এবং এতে হুমায়ূন সশঙ্ক হয়ে ওঠেন। মারওয়াড়ের সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ সবই ছিল পরসম্পরের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষময় পরিণাম। মালদেবের এতে কোনো দোষ ছিল না। আবুল ফজল ও নিজামউদ্দীন আহমদের বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরাও পূর্ণরূপে মালদেবকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেন না। শেরশাহের প্রভাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে স্পষ্ট উল্লেখ তাঁরা করেছেন, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তাঁর সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বাস্তবিকই ঐ কঠিন পরিস্থিতিতে মালদেব আমাদের পূর্ণ সহানুভূতির পাত্র। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই ওঠে না।[১]

অমরকোটে

হুমায়ূন বড় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় অমরকোটে পৌঁছালেন। তাঁর কাছে না ছিল ধন না আর ছিল বস্ত্র। সাথী, সৈনিক এবং সহযোগীদের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা কয়েক মাস যাবত বেতন পান নি। যার ফলে, তাঁরা হইচই শুরু করে দিয়েছিল।[২] হুমায়ূন তরদী বেগের কাছ থেকে কুড়ি শতাংশ সুদে ৮০,০০০ আশরফি ঋণ গ্রহণ করলেন।[৩] জওহরের বর্ণনানুসারে প্রত্যেকের কাছে তালাশ করা হল এবং যার কাছে যত ধন ছিল তা একত্রিত করা হল এবং তা থেকে অর্ধেকটা গ্রহণ করে বাকি অর্ধেক ফিরিয়ে দিয়ে ঐ ধন তাঁর সেবক ও তাঁর সাথীদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হল।[৪] কেবল ধনই নয় ; বরং সেই সাথে অর্ধেক অর্ধেক বস্ত্রও গ্রহণ করা হল, যা হুমায়ূন নিজের জন্য রেখে দিলেন। এইভাবে ধন একত্রিত করে হুমায়ূন সৈন্যদের দিয়ে দিলেন যা দিয়ে তাঁরা ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু ক্রয় করে নিল।

অমরকোটে হুমায়ূন প্রায় দু'মাস রইলেন (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট থেকে ১১ অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময়)। এখানে তিনি রাণা ও মোগলদের সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে শাহ হুসেন আরগুনের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। রাণাও শাহ হুসেনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি তাঁর উপর তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি দু'হাজার সৈন্য তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এবং পাঁচ হাজার সৈন্য[৫] তাঁর মিত্রদের কাছ থেকে নিয়ে হুমায়ূনকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এতে হুমায়ূন বড়ই আশান্বিত হলেন। নিজের পরিবার-পরিজনকে অমরকোট দুর্গে রেখে এঁরা জূন[৬] -এর বিরুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন (রজব ১. ৯৪৯ হি.)।

---

১. কানুনগো, শেরশাহ, পৃ. ২৭৬ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২১১ ; ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ১০৫।

২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ২৬২ ; হুমায়ূন, বেভারিজ, পৃ. ১৫৭।

৩. গুলবদন, হুমায়ূননামা বেভারিজ, পৃ. ১৫৭।

৪. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৬৩-৬৪।

৫. ঐ, পৃ. ৬২। গুলবদন বেগম (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৭) দু'তিন হাজার দক্ষ সৈন্য লিখেছেন।

৬. আবুল ফজলের মতে, জূন জাজকান সরকারের এক মহাল ছিল এবং এর রাজস্ব ছিল ৩১. ৬৫, ৪১৮ দাম। (আঈনে আকবরী, ২. পৃ. ৩৪১)। এ খুবই উর্বর মহাল ছিল। সম্ভবত, এটি থাট্টা ও শেহওয়ানের মধ্যবর্তী সিন্ধুর পূর্বতটে অবস্থিত ছিল। হেগ এর মতে, সিন্ধুর ডেল্টা প্রদেশে অমরকোট থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ও থাট্টা থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে রাণের বাম তটে (মেজর জেনারেল এস. আর. হেগ, দি ইন্ডস ডেল্টা কান্ট্রি, পৃ. ৯২-৯৩)। জূন নগরটি ঐ সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাণা ও মোগল সৈন্যরা ১৫ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ঐ সময়ে তরদী বেগ হুমায়ূনের কাছে হামিদা বানুর পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়ার খবর নিয়ে পৌঁছালেন। হুমায়ূনের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। ঐ মরুভূমিতে উৎসব করার এবং নিয়মানুসারে আমীর ও অন্যান্য লোকেদের পুরস্কার দেওয়ার মতো ধন তাঁর কাছে ছিল না। হুমায়ূন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বিতরণ করার মতো বস্তুর অভাবের ফলে তিনি জওহরের কাছ থেকে কস্তুরি আনিয়ে নিয়ে, তা ভেঙে আমীরদের মধ্যে বিতরণ করতে করতে বললেন, "আল্লাহ এই পুত্রের নাম ও যশ যেন এই কস্তুরির সুগন্ধের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে দেন।"[১] এইভাবে বিশ্বের এক মহান সম্রাট আকবরের জন্মোৎসব পালন করা হল। এই শুভ সংবাদের উপহারস্বরূপ তরদী বেগের অতীতের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হল।[২]

আকবরের জন্মতিথি

আকবরের জন্মতিথির বিষয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবুল ফজলের মতে, আকবরের জন্মতিথি, রবিবার, ৫ রজব ৯৪৯ হিজরি অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর ১৫৪২ খ্রি.। এই তিথি সমকালীন অন্য ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন।[৩] এর বিপরীতে জওহর লিখেছেন, আকবর ৯৪৯ হিজরির ১৪ শাবান শনিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] কিছু লেখক[৫] জওহরের তারিখকে সঠিক বলে বিবেচনা করেন। এঁদের মধ্যে ড. ভিনসেন্ট স্মিথ অন্যতম। তিনি লিখেছেন আবুল ফজল জেনে-বুঝে আকবরের জন্মতিথি বদলে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিকদের মত হল, জন্মের সময়ে জওহর সেখানে উপস্থিত ছিলেন যে জন্য তার লেখা তিথি অধিক বিশ্বস্ত। জওহরের ভুল তিথি লেখার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আকবরের আসল জন্মতিথি পরে জাদুটোনার কবল থেকে রক্ষার জন্য পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, মোগলদের ভয় ছিল যে,

AMARBOI.COM

সিন্ধুর প্রসিদ্ধ নগরগুলোর অন্যতম ছিল। আজ এখানে কেবলমাত্র ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে যা আধুনিক টান্ডা গোলাম হায়দরের দক্ষিণ-পূর্বে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাজকুমার দারা শিকোহ কিছু কালের জন্য পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী নাদিরা বেগম এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৬৬।

২. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৮।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৮৯-৯০ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ (পৃ. ৪৪১-৪২) ও ফিরিশতা (ব্রিগস ২, পৃ. ৯৫) এর মতে আকবর ৯৪৯ হিজরির ৫ রজব রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গুলবদন বেগমের (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৭) -এর মতে, আকবর ৪ঠা রজব রবিবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৬৫।

৫. জাফর শরীফ, ইসলাম ইন ইন্ডিয়া, কবিরাজ শ্যামলদাস, বার্থ ডেট অব আকবর, জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৮৬, পৃ. ৮০-৮৮। ভিনসেন্ট স্মিথ, বার্থ অব আকবর, ইন্ডিয়ান এন্টিকয়ারি, ১৯১৫, পৃ. ২৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবরের সঠিক জন্মতিথির খবর ছড়িয়ে পড়লে জাদুটোনার মাধ্যমে তাঁর কোনো ক্ষতি করা হতে পারে। রজব মাসের পঞ্চম দিনকে এই জ্ঞানে চয়ন করা হয় যে, ঐ দিন মুহম্মদ (সা.) সাহেব মাতৃগর্ভে এসেছিলেন। রবিবার দিনটি চয়ন করার কারণ হল ইরানীদের মধ্যে এটিকে বিশেষ দিন বলে মান্য করায় রেওয়াজ আছে।

এই পণ্ডিতদের মত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা খণ্ডন করেছেন।[১] বর্তমান এ মত সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, আবুল ফজল প্রদত্ত তারিখটিই সঠিক। জওহরের স্মৃতিকথা আবুল ফজলের আকবরনামার জন্য লেখা হয়েছিল। আবুল ফজল জেনে-বুঝে তারিখ পরিবর্তন করলে জওহরের তারিখ তিনি সহজে পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।[২] এছাড়া নিজের স্মৃতিকথা লেখার সময়ে জওহরের কাছে কোনো লিখিত তথ্য ছিল না। এইভাবে তাঁকে স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখতে হয়। তিনি অধিক লেখাপড়া জানতেন না এবং লেখার সময়ে তিনি বৃদ্ধও হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, তাঁর প্রদত্ত জন্মতিথি বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এই কারণে তাঁর তিথি ও দিনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। ১৪ শাবান শনিবার নয় ; বরং বৃহস্পতিবারের দিন ছিল। তাঁর স্মৃতিকথায় লেখক কেবল তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে তিনটি তিথিই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। গুলবদন বেগম তাঁর স্মৃতিকথায় ঐ তিথিই লিপিবদ্ধ করেছেন যা আবুল ফজল মেনে নিয়েছিলেন। গুলবদন বেগম মহিলা ছিলেন এবং হামিদা বানুর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মা হওয়ার ফলে আকবরের জন্মতিথি নিশ্চয়ই হামিদা বানুর স্মরণে থেকে থাকবে। এই রকমই সঠিক তারিখ জানার জন্য তিনি সঠিক অবস্থানে ছিলেন। আবুল ফজল, জওহর, গুলবদন বেগম প্রমুখের তিথি অধ্যয়ন করার পর তিনি আকবরের জন্মতিথির উল্লেখ করেছেন। সন-তারিখ উল্লেখের দৃষ্টিতে আবুল ফজল খুবই বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক। একথা যদি স্বীকারও করে নেওয়া হয় যে, আকবরের জন্মতিথি অন্ধবিশ্বাসের কারণে বদলে দেওয়া হয়েছে তাহলে মোগলদের অন্য রাজকুমারদের জন্মতিথি বদলানো হয় নি কেন ? এর অতিরিক্ত যে দান-ধ্যান জন্মদিনে করা হয় তাহলে তো সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। যদি মোগলরা এতটা অন্ধবিশ্বাসী হতেন তাহলে এই ধরনের ভুল কেন করত যাতে তাঁরা কোনো পুণ্যলাভ থেকে বঞ্চিত হত ? তাছাড়া আবুল ফজলের আকবরনামা রচনার সময়ে তো আকবর বালক ছিলেন না ; বরঞ্চ প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছিলেন। ঐ সময়ে জাদুটোনার ভয়ও ততটা ছিল না। এ সমস্ত বিষয় থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আকবর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং আবুল ফজল প্রদত্ত তারিখই সঠিক।

---

১. ব্যানার্জি, দি বার্থ অব আকবর, প্রোসিডিংস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১০০২-১২ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৭৫-৮৬। ড. আর্শিবাদীলাল শ্রীবাস্তব, দি ডেট অব আকবরস বার্থ, হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিক্যাল সাইন্স জার্নাল, আগ্রা কলেজ, আগ্রা খণ্ড, ২, সংখ্যা পৃ. ১২-১৩। এই পুস্তকের লেখকের প্রবন্ধ— সম্রাট আকবর কী জন্মতিথি, সরস্বতী, ইলাহাবাদ, এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রি.।

২. তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৯০-৯১, পাদটীকা ১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জূন-এ

পুত্র-জন্মের আনন্দোৎসবের জন্য না ছিল সময় না ছিল সুবিধা। হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের সাথে পাঁচ দিন চলার পর জূন নগরের কাছে পৌঁছালেন। এখানে আরগুনের গভর্নর জানী বেগ মোগলদের মোকাবিলা করার জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত ছিলেন। হুমায়ূন শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পিছু হটিয়ে দিলেন। এখান থেকে হুমায়ূন জূন নগরে প্রবেশ করে বাগে আঙ্গিনায় অবস্থান নিলেন। তিনি এখানকার বিজিত গ্রামগুলো আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। কিছুদিন পরে অমরকোটের মহিলাদের সেখানে আনিয়ে নেওয়া হল। হামিদা বানু ও আকবর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জূন-এ এসে পৌঁছালেন।[১]

কাবুল ও বাদাখশানের অবস্থা

কামরান মির্জার ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের হুমায়ূনকে ত্যাগ করার বর্ণনা আমরা আগেই করে এসেছি। কামরান সিন্ধু নদ পেরিয়ে কাবুল ও কান্দাহার চলে যান।

নিজের শক্তি সুদৃঢ় করার জন্য কামরান বাদাখশানের উপরেও তাঁর শক্তি কায়েম করতে চাচ্ছিলেন। তিনি মির্জা সুলেমানকে তাঁর নামে খুতবা পড়ানোর জন্য লেখেন, সুলেমান তা অস্বীকার করলে তিনি বাদাখশান আক্রমণ করেন। যুদ্ধ হয়, মোকাবিলা অসম্ভব বুঝে মির্জা সুলেমান আত্মসমর্পণ করেন এবং কামরানের নামে খুতবা পড়িয়ে এবং মুদ্রা চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কামরান তাঁর অধীনতা স্বীকার করিয়ে নেন। সুলেমানের কিছু প্রদেশ নিয়ে নিজের লোকেদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে কামরান কাবুলে ফিরে যান।[২]

এ অবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকে নি। কামরানের অসাবধানতার সুযোগে সুলেমান মির্জা বদোখশানের ঐ অংশগুলোর উপর, যা কামরান কেড়ে নিয়েছিলেন, পুনরাধিকার কায়েম করেন। কামরান তাঁর উপর পুনরায় আক্রমণ চালান। সুলেমান তখন কিলায়ে জাফরে আশ্রয় নেন। খাদ্যসামগ্রীর অনটন দেখা দেয়। তাঁর অধিকাংশ আমীর কামরানের অধীনতা স্বীকার করে নেন। বাধ্য হয়ে সুলেমানকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কামরান শাসনব্যবস্থার জন্য সেখানে নিজের লোক নিযুক্ত করেন এবং সুলেমান মির্জা ও তাঁর পুত্র ইব্রাহীমকে বন্দিগৃহে আটক করে দেন। (৮ অক্টোবর ১৫৪১ খ্রি. ; ১৭ জামাদিউসসানী, ৯৪৮ হি.)।[৩]

কামরান করাচা বেগকে কান্দাহারে নিযুক্ত করেছিলেন। করাচা বেগ হিন্দালের মিত্র ছিলেন। সিন্ধু থেকে হুমায়ূনকে ত্যাগ করে করাচা বেগের আমন্ত্রণে হিন্দাল

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৬৭ ; গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৮ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮৪-৮৫।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২০০।

৩. ঐ, পৃ. ২০০-২০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দাহার চলে যান এবং নিজের মিত্রের সহায়তায় তিনি কান্দাহার অধিকার করে নেন।[১] কামরান, হিন্দালের লাহোরের পত্র-ব্যবহার থেকে তো অসন্তুষ্ট ছিলেনই এবার এই খবর তাঁকে আরো ক্রুদ্ধ করে তোলে। শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে তিনি কান্দাহার আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে ইয়াদগার নাসির মির্জাও সিন্ধু থেকে নিরাশ হয়ে কান্দাহার এসে পৌঁছান। হুমায়ূনের যোধপুর চলে যাওয়ার পর ইয়াদগার নাসির আশা করেছিলেন যে, শাহ হুসেনের সাথে তাঁর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হয়। দু'মাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিন্ধুর শাসকের কাছ থেকে তিনি কোনো সহায়তাই পাবেন না। হুমায়ূনের কাছে ফিরে যেতে তাঁর বড় লজ্জা অনুভূত হয়। অন্য পথ না দেখে তিনি কান্দাহারে গিয়ে পৌঁছান। সে সময়ে কামরান কান্দাহার অবরোধ করে রেখেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই হিন্দাল দুর্গ সমর্পণ করে দেন। কামরান হিন্দালকে বন্দি করে ইয়াদগার নাসির সহ কাবুলে ফিরে আসেন। আসকারি তখনো পর্যন্ত গজনীর গভর্নর ছিলেন। কান্দাহারের দুর্গ ও নগরে কামরান আসকারিকে নিযুক্ত করেন। প্রারম্ভে কামরান হিন্দালের সাথে কঠোর ব্যবহার করেন কিন্তু পরে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তাঁকে জুয়ে শাহী[২]র জায়গীর দেওয়া হয়।

সিন্ধুতে শেষ দিন

ইয়াদগার নাসিরের সিন্ধু থেকে চলে যাওয়ার পর শাহ হুসেন দম নেওয়ার অবসর পান। মোগলদের সিন্ধু থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁর দুর্গ মেরামত করান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। এই সময়ে তিনি হুমায়ূনের পুনরাগমন, জানী বেগের পরাজয় এবং হুমায়ূনের জূন-এ বসবাসের খবর পেলেন। মোগলদের মোকাবিলা করার জন্য তিনি নতুন উদ্যমে থাট্টা এলেন এবং সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে জূন থেকে আট মাইল দূরে শিবির ফেললেন।[৩]

জূন-এ হুমায়ূন নিকটবর্তী শাসকদের সহযোগিতা লাভের প্রয়াস চালালেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'সূদা' এবং 'সমীচা' ও 'কচ্ছ' এবং 'জাম'-এর জমিদাররা পনেরা-ষোল হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।[৪] এ থেকে হুমায়ূনের মনে বড় আশা জাগল।

---

১. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৬০। আকবরনামা, ১. পৃ. ২০১।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২০০। জুয়ে শাহী আধুনিক জালালাবাদ। বদায়ূনীর মতে, তাঁকে গজনী দেওয়া হয় (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪২) ; গুলবদনের মতে, কামরান গজনী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু পরে লামগানাত এবং তনগীহার তাঁকে দেওয়া হয়। (গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৬২)।

৩. তারীখে মাসুমী, পৃ. ১৭৮-১৭৯ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৮।

৪. জওহর,স্ট্যুয়ার্ট,৬৭-৬৮ ; গুলবদন (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৮)-র মতে, তাদের আগমনের ফলে সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০ এ পৌঁছে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জূন-এ হুমায়ূনকে বড় কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। সুলতান মাহমুদ ভক্কাড়ীর নেতৃত্বে সিন্ধিরা বারবার মোগলদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। এই আক্রমণের ফলেই একদিন শায়খ আলী বেগ মৃত্যু বরণ করেন।[১] এতে হুমায়ূন খুব দুঃখ পেলেন, কেননা, ঐ সময়ে তিনি তাঁর বড় সাহায্যকারী ছিলেন। শাহ হুসেন আরগুন হুমায়ূনের সঙ্গী-সাথীদের নিজের পক্ষে টেনে নেওয়ার প্রয়াস চালালেন এবং তিনি কিছু লোককে নিজের পক্ষে টেনেও নিলেন। এঁদের মধ্যে বাবুরের প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দীন খলীফার পুত্র খালিদ বেগ প্রমুখ ছিলেন।

বৈরাম খাঁর আগমন

কনৌজের পরাজয়ের পর বৈরাম খাঁ হুমায়ূন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আফগানদের উত্তর ভারত অধিকার করার পর বৈরাম খাঁ সম্ভলে মিয়াঁ আবদুল ওয়াহাব ও লখনৌর-এর রাজা মিত্রসেনের কাছে আশ্রয় নেন। ঐ অংশের বিশিষ্ট আফগান আমীর নাসির খাঁর প্রভাবে বৈরাম খাঁকে তিনি সমর্পণ দেন। ঈসা খাঁ বৈরাম খাঁর যোগ্যতার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁকে শেরশাহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি বৈরাম খাঁকে পরম আপনার করে গ্রহণ করে তাঁকে উচ্চ পদ প্রদান করেন। তা সত্ত্বেও বৈরাম খাঁ হুমায়ূনের প্রতি অনুগত থাকেন এবং একদিন সুযোগ বুঝে গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব গভর্নর আবুল কাসিমের সাথে বুরহানপুর থেকে পলায়ন করেন। পিছু ধাওয়াকারী আফগানরা তাঁদের ধরে ফেলেন। শেরশাহের আদেশ ছিল বৈরাম খাঁকে যেন হত্যা করা হয় এবং আবুল কাসিমকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। পিছু ধাওয়াকারী আফগানরা বৈরাম খাঁকে চিনত না। ধরা পড়ার পর উভয়েই নিজেদের বৈরাম খাঁ বলে পরিচয় দেন। দুই বন্দির মধ্যে আবুল কাসিম ছিলেন খুবই সুন্দর। তাঁকেই বৈরাম খাঁ মনে করে শেরশাহের সামনে নিয়ে আসা হল। এইভাবে বৈরাম খাঁ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। শেরশাহ আবুল কাসিমের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি তাঁকে হত্যা করান। বৈরাম খাঁ ওখান থেকে পালিয়ে গুজরাত পৌছান এবং সেখান থেকে তিনি সিন্ধুতে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হন।[২] তাঁর আগমনের ফলে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে, সবাই যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, হুমায়ূন বড়ই খুশি হলেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন—"আমার দুঃখের সাথী এসে গেছেন।"[৩]

---

১. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৫৯ ; তবকাতে আকরবী, দে, পৃ. ৯২-৯৩ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮৫।

২. বৈরাম খাঁর সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক জীবন ও এই ঘটনার জন্য দেখুন, জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৯ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৯০-এর চতুর্থ পাদটীকা ও ইলিয়ট ও ডাসন ৫. পৃ. ২১৫ পাদটীকা ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৩. 'শরীক দর্দে মা আমদ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ্‌ হুসেনের সাথে অন্তিম সংঘর্ষ

শাহ হুসেন রাণা বীরসালকে হুমায়ূন থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চালালেন। শাহ হুসেন কর্তৃক প্রেরিত খিলআত ও কটার রাণা হুমায়ূনকে পাঠিয়ে দিলেন[১] এবং কোনো প্রলোভনেই তিনি মোগল সম্রাটকে ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। দুর্ভাগ্যবশত, কিছুকাল পরে তরদী বেগ ও খ্বাজা গাজীর[২] সাথে কোনো প্রসঙ্গে বাদ-বিবাদ হওয়ার কারণে বীরসাল অসন্তুষ্ট হলেন এবং এই কথা বলে চলে গেলেন যে, "মোগলদের সাহায্য করা সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।" বীরসালের চলে যাওয়ার পর সদা, সমীচা ও অন্য জাতির লোকেরাও চলে গেল।[৩] এদের যাওয়ার ফলে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। এইভাবে হুমায়ূনের বহুসংখ্যক সহযোগী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। তাদের চলে যাওয়ার ফলে শাহ হুসেন মোগল সৈন্যদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। জওহর লিখেছেন, মুনিম খাঁ মোগল শিবির ত্যাগ করে শাহ হুসেনের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তিনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, হুমায়ূনের শিবির খোলা ময়দানে পড়ে রয়েছে, সেখানে তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। সৌভাগ্যবশত, হুমায়ূন মুনিম খাঁর একথা জেনে ফেললেন। এ খবর পাওয়ামাত্রই হুমায়ূন পরিখা খোঁড়ার আদেশ দিলেন এবং খোঁড়ার জন্য তিনি স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে লোকেদের নিযুক্ত করলেন। তিন দিনের মাথায় নিরাপত্তা-পরিখা খনন কাজ শেষ হয়ে গেল। শাহ হুসেন এসে এ পরিখা দেখে মুনিম খাঁর উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন।[৪]

শাহ হুসেন নিরাশ হলেন না। তিনি চারিদিককার পথ অবরোধ করে মোগল শিবিরে প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রীর পৌঁছে দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলেন। হুমায়ূনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাঁর কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর মতো কামানও ছিল না আবার এত লোকও ছিল না যার সাহায্যে শত্রুর মোকাবিলা করা যেতে পারে। চারদিক থেকে পরিখা দ্বারা অবরুদ্ধ শিবির তাঁর নিজেরই জন্য একটা বন্দিগৃহে পরিণত হল। সিন্ধু বিজয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সিন্ধুতে যে কষ্ট তিনি পেলেন তেমন কষ্ট তিনি আর কখনোই পান নি। হতাশ হয়ে তিনি শাহ হুসেন আরগুনের সাথে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

---

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৮ অনুসারে একটি কুকুরকে সেই খিলআত পরিয়ে এবং কটার বেঁধে দিয়ে শাহ হুসেনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল, যাতে শাহ হুসেন বড় লজ্জিত হলেন।

২. গুলবদন (বেভারিজ, পৃ. ১৫৮) এর নাম তরদী মুহম্মদ খাঁ ও জওহর (স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৯) খ্বাজা গাজী লিখেছেন।

৩. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৯ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৬৯।

৪. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৬৯ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধু থেকে বিদায়

শাহ হুসেন হুমায়ূনের দুর্ভোগের সুযোগ নিতে চাচ্ছিলেন। একথা জেনে যে মোগলরা নিজেরাই চলে যেতে চাচ্ছে, তখন তিনি বাবুর কুলিকে সন্ধিবার্তার জন্য পাঠালেন। সন্ধির শর্তানুসারে মোগলরা সিন্ধু ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁদের চলে যাওয়ার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য শাহ হুসেন সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিশটি নৌকা, এক লক্ষ মিশকাল নগদ, ২০০০ গাধার বহনযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য, ৩০০ উট[১] ও ৩০০ ঘোড়া দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি জূন নগরের সামনে সিন্ধু নদের উপর পুল বানানোর প্রতিজ্ঞাও করলেন যাতে মোগলরা সহজে নদী পার হয়ে যেতে পারেন। সমস্ত বস্তু সামগ্রী যথাশীঘ্র পৌঁছে দেওয়া হল। হুমায়ূন সিন্ধু থেকে বিদায় নিলেন (১১ জুলাই ১৫৪৩ খ্রি. ; ৭ রবিউল আখির ৯৫০ হি.)[২] এবং সিন্ধু নদ পেরিয়ে কান্দাহার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কামরানের কাছ থেকে তো তাঁর অধিক আশা ছিল না কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, আসকারি সম্ভবত তাঁকে কান্দাহার দুর্গ সমর্পণ করে দেবেন এবং তাঁর সহযোগিতায় তিনি পুনরায় শক্তি অর্জনে সমর্থ হবেন। তাঁর অধিকাংশ আমীর তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন ; প্রধান আমীরদের মধ্যে শুধুমাত্র বৈরাম খাঁ ও তরদী বেগ তাঁর সাথে ছিলেন।

AMARBOI.COM

শাহ হুসেনের মন পরিষ্কার ছিল না। এক দিকে তিনি হুমায়ূনকে তাঁর রাজ্য থেকে চলে যেতে সুবিধা করে দিলেন অন্য দিকে কাবুলে কামরান ও কান্দাহারের গভর্নর আসকারিকে হুমায়ূনের কান্দাহার যাত্রার খবরও জানিয়ে দিলেন।[৩] যাতে কামরান ও আসকারি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং সেই সাথে হুমায়ূন তাঁদের হাতে পড়ে গেলে হুমায়ূনের দিক থেকে তাঁর আর বিপদ না থাকে।

শাহ হুসেনের এ ভয় ছিল যে, তিনি মোগলদের কোনো একটি দলকে তাঁর পক্ষে না টানতে পারলে ভবিষ্যতে তাকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে কামরান আবদুল ওয়াহাবের মাধ্যমে শাহ হুসেনের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। কামরান ও শাহ হুসেনের রাজ্য-সীমা পরস্পর-সংলগ্ন ছিল। কামরান কান্দাহার জয় করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সিন্ধুর শাসক কামরানের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সততা দেখানোর জন্য তিনি বাবুরের সৎ-বোন শহরবানু বেগমকে পাঠিয়ে দিলেন।

---

১. গুলবদনের মতে, ১০০০ উট। এ সমস্ত উটও জংলী ছিল এবং ২০০ পালিয়ে যায়। হুমায়ূননামা (বেভারিজ, পৃ. ১৬৩) তবকাতে আকবরী (দে, ২, পৃ. ৯৩) অনুসারে ৩০০ উট।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৮৯।

৩. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্ধু থেকে ইরান

যে সময়ে হুমায়ূন কান্দাহার অভিমুখে এগিয়ে চলেছিলেন, সে সময়ে পর্বতমধ্যে কামরানের দূত আবদুল ওয়াহাবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এর কাছ থেকে তিনি সিবি (সিবিস্তান), যা আবদুল ওয়াহাবের অধীন ছিল, লাভ করার প্রয়াস চালালেন কিন্তু সফল হলেন না। হুমায়ূন বোলান গিরিপথ দিয়ে শাল-এ পৌঁছালেন।[১] আসকারি এ সময়ে কামরানের সহায়ক ছিলেন। কামরান আসকারিকে হুমায়ূনকে বন্দি করার আদেশ দিয়েছিলেন। আসকারি হুমায়ূনের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হুমায়ূন আসকারির এ মনোভাবের খবর পেয়ে গেলেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি কান্দাহার আক্রমণ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে ঘুরে মশতঙ্গ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে ডাকাতদল তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড শীতেও তাঁকে খুব কষ্ট পেতে হল, কেননা, তাঁর সাথীদের কাছে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বস্ত্রাদি ছিল না। এই সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে হুমায়ূন মশতঙ্গে পৌঁছালেন।[২]

এখান থেকে তিনি আসকারিকে স্নেহময় ও উপদেশপূর্ণ একটি পত্র পাঠালেন। আসকারির কিছু আমীর তাঁকে হুমায়ূনের পক্ষাবলম্বনের পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না এবং হুমায়ূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলেন।

আসকারি দু'হাজার সৈনিক নিয়ে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে রওনা হলেন। পথ না চেনার কারণে তিনি জয়বাহাদুর[৩] নামে এক উজবেককে সাথে নিয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি এক সময় হুমায়ূনের সেনাবাহিনীতে ছিল। সে রাত্রে গিয়ে বৈরাম খাঁকে আসকারির মনোভাবের কথা জানিয়ে দিয়ে এল। এ খবর পেয়ে প্রথমে তো হুমায়ূন চিন্তিত হলেন না, কেননা, তখনও তাঁর প্রতি হুমায়ূনের পূর্ণ অবিশ্বাস ছিল না। তিনি তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু পুনরায় পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তিনি ভীতত্রস্ত হলেন। তিনি বুঝে গেলেন যে, বাঁচতে হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইরান হয়ে তিনি মক্কা চলে

---

১. আধুনিক কোয়েটা (আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯০) গুলবদন (বেভারিজ, পৃ. ১৬৫) এই স্থানকে শাল মস্তান বলে উল্লেখ করেছেন এবং নিজামউদ্দীন আহমদ (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৪)-এর কিছু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে শাল জমীস্তান এবং কিছুতে শাল ও মস্তান লেখা আছে।

২. মশতঙ্গ কোয়েটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩২ মাইল দূরে কোয়েটা খিলাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

৩. জওহর তাকে জোবি বাহাদুর লিখেছেন. আবুল ফজল, আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯০ জয়বাহাদুর বা জী বাহাদুর উজবেক লিখেছেন। ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ২১৫, তে তাঁর নাম হাওয়ালি বা জাওয়ানি লিখেছেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, হোদীওয়ালা, স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি. ১, পৃ. ৫১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবেন। আসকারির কোনো পুত্রসন্তান ছিল না এবং তাঁর আশা ছিল যে, আসকারি তাঁর পুত্র আকবরকে পুত্রবৎ লালন পালন করবেন। এইভাবে, শিশু আকবরকে দুই দাঈয়ের সাথে ওখানেই রেখে, হামিদা বানু বেগম ও কয়েকজন সাথীকে নিয়ে হুমায়ূন ওখান থেকে ইরান অভিমুখে অগ্রসর হলেন।[১]

হুমায়ূনের রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আসকারি এসে পৌঁছালেন। হুমায়ূন পালিয়ে যাওয়াতে তিনি নিরাশ হলেন। আকবরকে শিবিরে রেখে গিয়েছেন শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে অধিকার করে নিলেন। তিনি আকবর ও অন্যান্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করলেন।[২] আকবর, তাঁর দুই দাঈ ও হুমায়ূনের ফেলে যাওয়া অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী নিয়ে তিনি কান্দাহারে ফিরে গেলেন (১৫ ডিসেম্বর ১৫৪৩ খ্রি.)। তিনি তাঁর মহলের পাশে আকবরের থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন তাঁর স্ত্রী সুলতানা বেগমের উপর। সুলতানা বেগম আকবরের সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ও সহৃদয় ব্যবহার করেন। আসকারি এ দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। আকবরের সাথে মাত্র দু'বার দেখা সাক্ষাতের কথা আমরা জানতে পারি। দাঈদের কথায় কু-নজর থেকে আকবরকে রক্ষার জন্য একবার তিনি তাঁকে মাথায় পাগড়ি দিয়ে মারেন এবং দ্বিতীয় বার তিনি হাসান আবদালের দরগায় আকবরের মস্তক মুন্ডনের জন্য নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন।[৩]

হুমায়ূন মুশতঙ্গ থেকে শিস্তান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথীদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক ছিল না, যাদের মধ্যে দু'জন মাত্র মহিলা[৪] ছিলেন হামিদা বানু ও হাসান আলী ইশাক আগার বিলোচ পত্নী। মুশতঙ্গ থেকে হুমায়ূন গরমশীর পৌঁছালেন। পথিমধ্যে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁদের প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হল। আসকারির পিছু পিছু আসার ভয় তাঁকে তাড়িয়ে ফিরছিল। একবার তাঁদের রাতভর বরফের মধ্যে থাকতে হয়। অসহনীয় ঠাণ্ডা ছিল। কাছে না ছিল জ্বালানি আর না ছিল খাদ্য। প্রচণ্ড ক্ষুধায় সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে, একটি ঘোড়া জবাই করা হল। রান্নার জন্য কোনো পাত্র ছিলনা। বাধ্য হয়ে ঢাল ও শিরস্ত্রাণে করে রান্না করে খেতে

১. ঘোড়ার অভাব ছিল। হুমায়ূন তরদী বেগের কাছে ঘোড়া চাইলে তিনি আপত্তি করলেন। কোনো উপায় না দেখে হামিদা বানু ও হুমায়ূন একই ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হলেন। জওহর, স্টুয়ার্ট ৭৬ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৫ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯১।

২. গুলবদন হুমায়ূননামা, বেভারিজ,পৃ. ১৬৫-৬৬ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৫ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯৩ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৭৭ অনুসারে, যখন তাঁর কাছে আকবরকে সমর্পণ করা হল তখন তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ১৯৪-৯৫। তুর্কিদের মধ্যে প্রথা ছিল, পুত্রসন্তান সবে হাঁটতে শুরু করলে পিতা, বড় ভাই বা ঐ স্থানীয় কোনো ব্যক্তি তার মাথার পাগড়ি খুলে তা দিয়ে মারত আর শিশুটি তার আঘাতে পড়ে যেত।

৪. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৫ অনুসারে তাঁর সাথে কেবল ২২ ব্যক্তি ছিলেন। ফিরিশতা ও বদায়ূনী এ মত সমর্থন করেন। গুলবদন (বেভারিজ, পৃ. ১৬৬) ত্রিশ ব্যক্তির কথা লিখেছেন। জওহর স্টুয়ার্ট, (পৃ. ৭৬) ৪০ নারী-পুরুষের কথা লিখেছেন।

৫. গুলবদন, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৬৬-৬৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল।[৫] বিলোচ প্রদেশের কিছু লোক হুমায়ূনকে বন্দি করে আসকারির হাতে তুলে দিতে চাচ্ছিল। ঐ সময়ে আলী ইশাক আগার বিলোচ স্ত্রী তাদের ভাষায় কথা বলে হুমায়ূনকে সাহায্য করলেন। কামরান বিলোচ দলপতি মালিক হাতীকে একটি ফরমান দ্বারা হুমায়ূনকে বন্দি করে তাঁর কাছে পাঠানোর কথা লিখেছিলেন এবং এজন্য তিনি তাঁকে অনেক পারিতাষিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাতের পর দলপতির মনোভাব বদলে গেল। তিনি হুমায়ূনের সাথে উদারতার পরিচয় দিলেন। তিনি হুমায়ূনকে নিজের শিবিরে নিয়ে এলেন এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী দিলেন।[১] এখান থেকে হুমায়ূন রওনা হলে বিলোচ দলপতি তাঁকে গরমশীর পৌঁছে দিলেন। এখানকার প্রধান অধিকারী মীর আবদুল হাই, আসকারি কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর মালিকের ভয়ে নিজে তো উপস্থিত হলেন না কিন্তু হুমায়ূনের জন্য তিনি কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন। আসকারির রাজস্ব আধিকারিক খ্বাজা জালালউদ্দীন মাহমুদ[২] বাবা হাজীর দুর্গে রাজস্ব আদায়ের জন্য এসেছিলেন। হুমায়ূন ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর সেবা ও ধন হুমায়ূনকে অর্পণ করলেন। আপতকালে এ খুব বড় সহায়তা ছিল। হুমায়ূন তাঁর প্রাপ্ত বস্তু তাঁর সহায়কদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং তিনি খ্বাজা জালালউদ্দীন মাহমুদকে 'বাদশাহর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীক্ষক' নিযুক্ত করলেন।[৩]

সীমাহীন দুঃখকষ্টযন্ত্রণার মধ্যে হুমায়ূন পুনরায় সংসারবিরাগী হওয়ার চিন্তা ব্যক্ত করলেন কিন্তু তাঁর বিপদের দিনের সাথীদের বোঝানোর ফলে তিনি এ চিন্তা স্থগিত করে দিলেন। ভাইদের সাহায্যের কোনো আশা ছিল না। এর বিপরীতে কামরানের প্রদেশে অধিক দিন কাটালে সংঘর্ষের ভয় ছিল। কেবল একটি মাত্র পথ ছিল ইরানের শাহের সাহায়তা লাভ করা। হুমায়ূন ইরানের শাহ তাহমাস্পকে গভীর নিষ্ঠার সাথে এক পত্র লিখলেন (২৮ ডিসেম্বর ১৫৪৩ খ্রি.)। সে পত্রে তিনি ইরানে প্রবেশ ও শাহের সাথে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালেন। এ পত্র জয় বাহাদুরের মাধ্যমে পাঠানো হল।

উত্তর পাওয়া পর্যন্ত হুমায়ূনের চিন্তা ছিল গরমশীরে অবস্থান করা। এমন সময় খবর এল আসকারি তাঁর পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে আসছেন। থেমে থাকার কিংবা চিন্তা করার সময় ছিল না। হুমায়ূন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই হেলমন্দ নদী পেরিয়ে ইরানের শিস্তান প্রদেশে প্রবেশ করলেন।[৪]

---

১. ঐ, পৃ. ১৬৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২০২।

২. আঈনে আকবরী, ১, পৃ. ৩৮৪। পরে এই ব্যক্তি আকবরের দীওয়ান হন এবং এঁকে আড়াই হাজারের মনসবদার নিযুক্ত করে গজনী পাঠানো হয়। পরে আকবরের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে মুনিম খাঁ এঁকে হত্যা করান। মা'আসিরুল উমরা, খণ্ড ১, পৃ. ৬১৫-১৮।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২০২।

৪. ঐ, পৃ. ২০৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়
ইরান যাত্রা ও ভাইদের সাথে সংঘর্ষ

অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে হুমায়ূন ইরানের শিস্তান প্রদেশে প্রবেশ করলেন। তখনো পর্যন্ত শাহ তাঁর প্রার্থনা-পত্রের উত্তরও দেন নি।[১] ঔপচারিক দৃষ্টিতে হুমায়ূনের শাহের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু এজন্য কোনো সময় তাঁর ছিল না। শিস্তান প্রদেশের গভর্নর আহমদ সুলতান শামসু সম্ভবত হুমায়ূনের প্রার্থনা-পত্রের খবর জানতেন। তিনি নির্বাসিত মোগল সম্রাটকে উপযুক্ত স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করলেন। হুমায়ূনের শিস্তান প্রদেশে প্রবেশ মাত্রই শামসু তাঁর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠালেন। নগর থেকে তিন-চার মাইল পৌঁছানোর পর তিনি তাঁর বিশিষ্ট আমীরদের সাথে নিয়ে সম্রাটকে স্বাগত জানালেন। নগরের গভর্নর তার পুরো ভবনটি হুমায়ূনের থাকার জন্য দিলেন এবং তাঁর স্ত্রী, মা ও অন্যা মহিলাদের হামিদা বানুকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠালেন। হুমায়ূনকে উপহারও দেওয়া হল। আহমদ সুলতান শামসুর ভাই হুসেন কুলি মির্জা হুমায়ূনকে কিছু বই উপহার দিলেন এবং শিয়া-সুন্নী মতবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল, যাতে হুমায়ূন বড় খুশি হলেন। রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভের সাথে সাথে বহুদিন পর হুমায়ূন একটু স্বস্তি ও শান্তি পেলেন।[২]

হুমায়ূনকে স্বাগত জানানোর পরই আহমদ সুলতান শামসু, শাহের পুত্র হিরাতের গভর্নর সুলতান মুহম্মদ মির্জাকে হুমায়ূনের আগমন-সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন এবং হুমায়ূনকে হিরাতের পথ ধরে দরবারে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ প্রার্থনা করলেন।[৩]

এই সময় দুই মোগল আমীর হাজী মুহম্মদ ও হাসান কোকা, আসকারিকে ত্যাগ করে হুমায়ূনের সাথে এসে মিলিত হলেন। তাঁরা হুমায়ূনকে পুনরায় ফিরে

---

১. জওহরের বর্ণনানুসারে, হুমায়ূন ইরানের শাহের কাছে শিস্তান থেকে পত্র লেখেন (স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৮০) ; আবুল ফজল (আকবরনামা, ১. পৃ. ২০৩) এর বর্ণনানুসারে, গরমশির থেকে পত্র লেখেন। জওহর ও আবুল ফজল প্রদত্ত পত্রের বিষয়বস্তু একই। সম্ভবত, হুমায়ূন শিস্তানে প্রবেশ করার পর দ্বিতীয় পত্রটিও লেখেন। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রটির প্রতিলিপি আমরা পাইনি, রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া পৃ. ৭-৮।

২. আকবরনামা, পৃ. ২০৪ ; জওহর ; স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৭৯। বায়েজিদ বিয়াত, তাজকিরায়ে, হুমায়ূন ওয়া আকবর, পৃ. ৮ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৯৬।

৩. আকবরনামা, পৃ. ২০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে কান্দাহার অধিকারের পরামর্শ দিলেন। তাঁরা সেখানকার অন্য আমীরদের কাছ থেকে সহায়তা লাভেরও আশ্বাস দিলেন, কিন্তু হুমায়ূন এতে রাজি হলেন না এবং বৈরাম খাঁর এই পরামর্শ তিনি মেনে নিলেন যে, ইরানের শাহের সাথে সাক্ষাতের পরই পরবর্তী কার্যক্রম নিশ্চিত করা উচিত।[১]

হুমায়ূনের পত্র ও শরণার্থী সম্রাটের শিস্তান প্রদেশে প্রবেশের খবর শুনে শাহ তাহমাস্প বড়ই প্রসন্ন হলেন। এই উপলক্ষে কজবীনে তিনদিন যাবত নাকড়া বাজিয়ে আনন্দোৎসব করা হল। শাহ হুমায়ূনের দূতকে বিদায় জানালেন এবং গভর্নর ও আধিকারিকদের খবর পাঠিয়ে দিলেন যেন হুমায়ূনকে যেন রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর যেন যথার্থ ব্যবস্থা করা হয়।[২] আদেশপত্র থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুমায়ূনকে অত্যন্ত শানদার অভ্যর্থনা জানানো হয়।

কয়েকদিন শিস্তানে অতিবাহিত করার পর হুমায়ূন হিরাত রওনা হলেন। পথিমধ্যে ফারাহ[৩]-এর নিকট শাহের কাছে হুমায়ূনের পাঠানো দূত, যিনি হুমায়ূনের পত্রের জবাব নিয়ে শাহের দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন, তাঁর দূত জয়বাহাদুর (চুলি বাহাদুর)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। হুমায়ূন এখানে শাহের পত্র লাভ করলেন, যাতে তিনি হুমায়ূনের ইরানে আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে অনতিবিলম্বেই মিলিত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছিলেন।[৪]

---

১. আকবরনামা, পৃ. ২০৪।

২. খুরাসানের হাকিমের নামে যে পত্র পাঠানো হয়েছিল তা থেকে অন্য পত্রের অনুমান করা যেতে পারে। শাহের এই পত্রের জন্য দেখুন আকবরনামা, পৃ. ২০৬-১৩। শাহের পত্রে হুমায়ূনকে অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেকটি বিষয় বৃহৎ রূপে উল্লেখ রয়েছে। কতজন ব্যক্তি তাঁকে স্বাগত জানাবেন, কী আহার দেয়া হবে, কীসের শরবত দেয়া হবে ইত্যাদিরও উল্লেখ রয়েছে। পত্রে বলা হয়েছে, শাহী ভোজনের জন্য ১২০০ থালি প্রতিদিন বাদশাহের দরবারে পেশ করতে হবে। যখন হুমায়ূন শিবির ফেলবেন তখন গোলাবের শরবত এবং সুস্বাদু লেবুর রস প্রস্তুত রাখতে হবে এবং তা বরফ দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। শরবতের পরে মাশহাদের সুগন্ধি আপেল, তরমুজ এবং আঙুর ইত্যাদি সাদা রুটির সাথে পরিবেশন করতে হবে। সাদা রুটি ঘি এবং দুধের সাথে ছেনে খামির করে বানাতে হবে যাতে পোস্তা ও বাজিয়ানা (এক প্রকারের ছোট ছোট বীজ) থাকবে। আহারের পরে মিঠাই এবং ফালুদা, যা মিছরি এবং উত্তমভাবে পরিশ্রুত চিনি দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে, বিভিন্ন প্রকারের মোরব্বা, গোলাব ইত্যাদি সুগন্ধি মিশ্রিত সেমাই ইত্যাদি দিতে হবে। দরবারে স্বাগত জানানোর দিন প্রত্যেক আমীরকে উপহার স্বরূপ দিতে হবে যেগুলোর তিনটি হবে বাদশাহের জন্য, একটি আমীরে মুআমুন বৈরাম খাঁর জন্য এবং পাঁচটি অন্য প্রতিষ্ঠিত আমীরের জন্য। নগরে পৌঁছানোর একদিন আগে ঈদগাহ ময়দানের সামনে এমন তাঁবুর আয়োজন করার আদেশ হল যার ভিতর লাল আতলাস, মাঝখানে রেশমের মলমল এবং উপরে ইস্পাহানী মলমল লাগানো থাকতে হবে।

৩. ৩২°২৬′ উত্তর ও ৬২°৮′ পূর্বে হিরাতের দক্ষিণে ১৬৪ মাইল এ নগর এখন ধ্বংস প্রাপ্ত।

৪. এই পত্রের ফারসি প্রতিলিপির জন্য দেখুন, রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৬৭-৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরাতে

শিস্তান থেকে হুমায়ূন হিরাত প্রদেশে প্রবেশ করলেন। পথিমধ্যে যেখানেই হুমায়ূনের শিবির পড়ত সেখানেই কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর ব্যবস্থা করতেন। গভর্নর মুহম্মদ খাঁ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে নগরের তিন-চার মাইল বাইরে তাঁকে স্বাগত জানালেন। নগরে প্রবেশ করার সময় হিরাতের যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত বয়সের মানুষ দুই কাতারে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। হিরাতের সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ মনজিল-ই-বেগমে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করা হল। তিনদিন পর মুহম্মদ খাঁ জাহানআরা বাগে তাঁকে স্বাগত জানালেন। এতে নগরের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন, যার ফলে সমস্ত ময়দান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যেন ঈদ ও নওরোজ উৎসব পালিত হচ্ছিল। হুমায়ূনের শুভেচ্ছায় কবিতা পড়া হল যা শুনে তিনি অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন।

হুমায়ূন কিছুদিন হিরাতে যাত্রা-বিরতি করলেন।[১] প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি শাহ কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছা-বার্তা পেতে থাকলেন। এখানে হুমায়ূন নওরোজ দেখলেন যা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হত। এই জলসায় হুমায়ূনকে রাজসিংহাসনে বসানো হল। তাঁর ডানদিকে রাজকুমার মুহম্মদ মির্জা ও বামদিকে সদর মীর মুহম্মদ ইউসুফকে বসানো হল। গান এবং বিনোদন হল এবং হুমায়ূন প্রচুর পরিমাণে বস্তুসামগ্রী উপহার স্বরূপ পেলেন।

হিরাতে সময় বড় আনন্দে অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক দিনই কোনো-না-কোনো স্থান ভ্রমণে যাওয়া পড়ত। হুমায়ূন হিরাতের প্রধান প্রধান স্থান, পীর-আউলিয়াদের মকবরা ও বাগিচা দর্শন করেন। এই সময়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হত। ভোগ-বিলাস ও আনন্দের সমস্ত উপকরণ এখানে প্রস্তুত থাকত।[২]

হিরাত থেকে কজবীন

হিরাত থেকে হুমায়ূন মশহাদ যাওয়ার জন্য শাহের কাছে এক পত্র লিখলেন। শাহ হুমায়ূনকে মশহাদ যাওয়ার অনুমতি দিয়ে পত্রের উত্তর পাঠালেন।[৩] হিরাত থেকে

---

১. হিরাতে হুমায়ূন কতদিন অবস্থান করেন, এ বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকেরা একমত নন। আবুল ফজলের মতে, হুমায়ূন ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পৌঁছান (আকবরনামা, পৃ. ২১৪) ; জওহরের মতে, হুমায়ূন সেখান এক মাস থাকেন (জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৮৬)। তিনি ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকেন এবং নওরোজ উৎসবও পালন করা হয়, যা ২১ মার্চে পড়ে, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি এরপর রওনা হন অর্থাৎ, দেড়-দু'মাস সেখানে থাকেন।

২. আকবরনামা, পৃ. ২১৪ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৬৯।

৩. এই দুই পত্রের জন্য দেখুন, রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ১৫-১৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন মশহাদ অভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি জাম-এ পৌঁছালেন। সেখানে তিনি কয়েকটি ধর্মীয় স্থান দর্শন ও প্রার্থনা করলেন যেগুলোর মধ্যে শিহাবউদ্দীন আহমদ আল-জামীর মাজারও ছিল।[১] আহমদ আল-জামী হুমায়ূনের মা মাহম বেগম ও তাঁর পত্নী হামিদা বানু বেগমের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

জাম-এ কিছুদিন অবস্থানের পর হুমায়ূন মশহাদ পৌঁছালেন (১৫ মুহররম ৯৫০ হি. ৮ এপ্রিল ১৫৪৪ খ্রি.)। এখানেও তাঁকে স্বাগত জানানো হল। এবং তাঁকে খুবই সুন্দর স্থান, চাহারবাগে নিবাসের ব্যবস্থা করা হল। মশহাদে তিনি চল্লিশ দিন অবস্থান করলেন। এখানে তিনি কখনো কখনো সারারাত ধরে উপাসনা করে কাটিয়ে দিতেন। এখান থেকে তিনি ইমাম আলীর মাজারে যাত্রা করলেন এবং সেখানকার নিয়মানুযায়ী তিনি ইবাদত করলেন এবং প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ধনুকটি লটকানোর জন্য দিলেন।[২] মশহাদে হুমায়ূন শাহের একটি পত্র পেলেন যাতে তিনি হুমায়ূনকে কজবীন আসার জন্য লিখেছিলেন।

মশহাদ থেকে হুমায়ূন নিশাপুর, সজবার,[৩] দামগান বিস্তাম, সামনাম ও সুফিয়াবাদ হয়ে দর্শ পৌঁছালেন। এখান থেকে হুমায়ূন শাহের কাছে বৈরাম খাঁকে তাঁর দূত রূপে পাঠিয়ে দিলেন। শাহ তহমাস্প কজবীনে ছিলেন।[৪] বৈরাম খাঁ-র উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাঁকে শিয়াদের মতো চুল কেটে ইরানী টুপি (তাজ)

---

১. জাম-এর মাজারে এক শিলালিপি আছে, যেটি হুমায়ূনের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য লেখা হয়েছিল। হুমায়ূন এখানে একটি কবিতাও স্বহস্তে আহমদ জামের মকবরায় শ্বেত পাথরে লিখেছিলেন। মাসীরে রহীমীর লেখক আবুল বাকী ১৬১১ খিস্ট্রাব্দে এখানে এসেছিলেন এবং তিনি হুমায়ূনের এই কবিতা পড়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর পুস্তকে তিনি এ কবিতাটি লিপিবদ্ধ করেন নি। হুমায়ূন জাম-এ কবিতাটি কবে লিখেছিলেন, এর তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। কিছু লেখকের মতে, হুমায়ূন এখানে দ্বিতীয় বার এসেছিলেন। রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ১৮-১৯।

২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৮৭-৮৮।

৩. নিশাপুর ৩৬°১২′ উত্তর ও ২৮°৪০′ পূর্বে অবস্থিত। এটি খুরাসানের চার প্রধান নগরীর অন্যতম ছিল। সজবার নিশাপুরের পশ্চিমে ৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪. আবুল ফজলের মতে, বৈরাম খাঁ শাহের সাথে সুলতানিয়া ও সূরলীকের মধ্যবর্তী স্থানে সাক্ষাৎ করেন এবং কজবীনে ফিরে আসেন। মাসীরে রহীমী থেকে এমনও প্রতীত হয় যে, শাহের দরবারে বৈরাম খাঁকে শানদার অভ্যর্থনা জানানো হয়। বায়েজিদ-এর বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে বৈরাম খাঁ কজবীন থেকে হুমায়ূনের পত্র নিয়ে জনজাম-এ গিয়ে মিলিত হন এবং ফিরে আসেন। নিজামউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, বৈরাম খাঁকে কজবীনে পাঠানো হয়। তিনি সুরলীক-এ শাহের সাথে মিলিত হন এবং তাঁর উত্তর নিয়ে হুমায়ূনের কাছে ফিরে আসেন। শাহ হুমায়ূনের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বদায়ূনী ও ফিরিশতার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। জওহর কৃত বর্ণনা সবার চেয়ে ভিন্ন যা এখানে দেয়া হয়েছে। সফভি ঐতিহাসিকদের দ্বারা শাহ বিরোধী বর্ণনা না থাকাই স্বাভাবিক। জওহরের বর্ণনা সঠিক। আকবরনামা, পৃ. ২১৬ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ৯৮-৯৯ ; বদায়ূনী মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪৪ ; বায়েজিদ, পৃ. ৩২ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৪-৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরার কথা বললেন। বৈরাম খাঁ নিজেকে অন্য এক সম্রাটের সেবক পরিচয় দিয়ে তাঁর বিনানুমতিতে তিনি এ কাজ করতে অপারাগতা প্রকাশ করলেন। শাহ তহমাস্প এতে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে বললেন, বৈরাম খাঁর যা ইচ্ছা তাই করুন। তাঁকে ভীত-ত্রস্ত করার জন্য শাহ কিছু বন্দিকে,[১] তাদের সুন্নী বলে ফাঁসি দেয়ার আদেশ দিলেন। শাহ হুমায়ূনকে পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন তিনি যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন এবং বুবক বেগকে পাঠিয়ে দিন।

বুবক বেগ শাহের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করলেন, যার ফলে, শাহ হুমায়ূনকে কজবীন আসার অনুমতি দিলেন। দুর্গ থেকে প্রস্থান করে হুমায়ূন কজবীন এলেন। এখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করলেন। বৈরাম খাঁ ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। শাহ ইতিমধ্যে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কাটানোর জন্য কজবীন থেকে সুলতানিয়া চলে গিয়েছিলেন। শাহের সাথে সাক্ষাতের জন্য হুমায়ূন এখান থেকে চতুর্থ দিনে সুলতানিয়া অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

শাহ তহমাস্প-এর সাথে সাক্ষাৎ

আবোহর ও সুলতানিয়ার পথে শাহ তহমাস্পের সাথে হুমায়ূনের সাক্ষাৎ হল।[২] শাহের শিবির পর্যন্ত পৌঁছাতে যখন হুমায়ূনের দু'দিনের পথ বাকি রয়ে গিয়েছিল তখন শাহের উজির কাজী শাহী কজবীনী ও অন্যান্য আমীররা অগ্রসর হয়ে হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন। আরো কিছু পথ চলার পর রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গ, শাহের ভাই শাহ মির্জা ও বাহরাম মির্জা এবং অন্য লোকেরা মোগল সম্রাটকে স্বাগত জানালেন এবং উপহার পেশ করলেন।[৩] এখান থেকে শাহের ভাইদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হুমায়ূন অগ্রসর হলেন।

AMARBOI.COM

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৯০-৯১, এই বন্দিদের চিরাগকুল বলা হত।

২. দুই সম্রাটের মধ্যে মিলন কোথায় হয়েছিল, এ নিয়ে মতভেদ আছে। আকবরনামা, ১, পৃ. ২১৬-র মতে, অবোহর ও সুলতানিয়ার মধ্যবর্তী স্থলে, বায়েজিদের মতে, এঁরা জনজাম (সুলতানিয়া থেকে ২১ মাইল)-এ মিলিত হন। বদায়ূনীর মতে, সুরলীক ইলাক ; নিজামউদ্দীনের মতে, চিলকে মুরলীক ; ফিরিশতার মতে, অবোহর ও সুলতানিয়ার মধ্যবর্তী বীলকে কদার-এ ; এবং তারীখে রহীমীর মতে, সুলতানিয়ায়। বায়েজিদ পৃ. ৩২ ; বদায়ূনী, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪৪ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৪-৫৫ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৯।

৩. বাহরাম মির্জা হুমায়ূনকে একটি ঘোড়া, বস্ত্র ও শিয়া টুপি দেন। হুমায়ূন একটি বস্ত্র তো পরে নেন কিন্তু শিয়া টুপি পরেন নি। জওহর লিখেছেন, যে ঘোড়া তাঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় তা সাধারণ ছিল না এবং সেটি হুমায়ূনের ঘোড়ার চড়ার দক্ষতা জানার জন্য দেওয়া হয়েছিল। জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ৯৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাতের সময় শাহ অগ্রসর হয়ে হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন।[১] এবং হুমায়ূনের সাথে মুসাফাহ-আলিঙ্গনের পর তিনি তাঁর কালীনের উপর তাঁর ডান দিকে তাঁকে বসতে দিলেন। তিনি হুমায়ূনের স্বাস্থ্য ও যাত্রা-পথ সংক্রান্ত কুশলাদি বিনিময় করলেন। শাহ এর পরে হুমায়ূনকে ইরানী তাজ পরার জন্য বললেন। হুমায়ূন তা স্বীকার করলেন এবং বললেন যে, এ উচ্চ মর্যাদার প্রতীক এবং তিনি তা স্বেচ্ছায় পরবেন। শাহ তহমাস্প স্বহস্তে হুমায়ূনের মাথায় ইরানী টুপি পরিয়ে দিলেন। শাহের সাথে সাক্ষাতের পর হুমায়ূনকে বাহরাম মির্জার প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করা হল। এখানে শিয়াদের মতো করে হুমায়ূনের চুলও কেটে দেওয়া হল।[২]

হুমায়ূনের ইরান নিবাসকে আমরা তিনটি কালে বিভক্তি করতে পারি— (১) প্রারম্ভে শাহ হুমায়ূনকে শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালান ; এরপর (২) প্রায় দু'মাস পর্যন্ত দুই শাসকের মধ্যে মতভেদ বিরাজ করে এবং ইতিমধ্যে দু'জনের না সাক্ষাৎ হয় আর না কোনো পত্র বিনিময় হয়। (৩) অবশেষে, দু'জনের মতভেদ দূর হয়ে যায় এবং শাহ হুমায়ূনকে সামরিক সাহায্য দিয়ে বিদায় করেন।

শাহের সাথে মতভেদ

ইরানে হুমায়ূনকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল এবং স্বয়ং শাহ তাঁর প্রতি আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। দু'জনের মিলনও মধুর ছিল কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। হুমায়ূনের অভ্যর্থনার পরদিন সকালে শাহ সুলতানিয়া যাচ্ছিলেন। হুমায়ূন শাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শাহ তাঁর কথার কোনো উত্তর দেন নি। এতে হুমায়ূন খুব দুঃখ পান। দুই শাসক সুলতানিয়া অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। শাহ হুমায়ূনের কাছে খবর পাঠালেন তিনি শিয়া মতবাদ গ্রহণ করলে তাঁকে সর্বপ্রকারের সাহায্যের জন্য তিনি প্রস্তুত এবং তিনি তা না করলে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। হুমায়ূন এর উত্তর দিলেন, তাঁর রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি মক্কা যাওয়ার জন্য শাহের কাছ থেকে কেবল ইরানের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি চান। তারপর, শাহ তাঁকে দ্বিতীয় বার বার্তা পাঠালেন যে, তিনি সুন্নীদের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাচ্ছেন এবং সৌভাগ্যবশত একজন সুন্নী সম্রাট তাঁর অধিকারে এসে গেছেন। এরপর, শাহ কাজী জাহাঁকে হুমায়ূনের কাছে পাঠালেন। কাজী জাহাঁ হুমায়ূনকে বোঝালেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে সমমনোভাব ব্যক্ত করাটাই যুক্তিসঙ্গত। হুমায়ূন কাজী

১. আবুল ফজলের মতে, দুই শাসকের মিলন তিথি ছিল জমাদিউল আউয়াল, ৮৫১ হি.। (২১ জুলাই এবং ১৯ আগস্ট ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)। মি. রায়ের মতে, আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। দেখুন, রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ২৬।

২. জওহর, স্টুয়োর্ট, পৃ. ৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাঁকে সমস্ত কথা লিখিতরূপে পেশ করতে বললেন। কাজী জাহাঁ শাহ তহমাস্পের স্বীকৃতিতে তিনটি কাগজ তাঁর সামনে পেশ করলেন। হুমায়ূন দুটিকে স্বীকার করে নিলেন কিন্তু তৃতীয়টিকে স্বীকার করতে তিনি আপত্তি করলেন। কাজী জাহাঁ তাঁকে বোঝালেন যে, তৃতীয়টিকেও তাঁর মেনে নেওয়া উচিত। ধর্মমতের উপর জবরদস্তি হওয়া উচিত নয়—একথা বলে,বাধ্য হয়ে তৃতীয় মতটিতেও স্বাক্ষর করলেন।[১]

শাহ ও তাঁর আমীররা হুমায়ূনের এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেন। শাহ এর পর শিকারের ব্যবস্থা করলেন এবং হুমায়ূনকে কয়েকটি স্থানে শিকার করাার জন্য নিয়ে গেলেন। হুমায়ূন তাঁর তীরন্দাজির অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন।

হুমায়ূন শাহকে বহুসংখ্যক হীরে ও লাল পাথর উপহার দিলেন। এর মধ্যেকার একটি ছিল খুব বড় সম্ভবত এটি কোহিনূর ছিল।[২] এ দেখে শাহ খুব প্রভাবিত হলেন এবং তিনি বৈরাম বেগকে 'খাঁ' উপাধিতে বিভূষিত করলেন। এইভাবে অন্যের সেবককে উপাধি দেওয়ার নিয়ম ছিল না। এ থেকে হুমায়ূনের হীনাবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈরাম, যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, শাহের পক্ষ থেকে শিয়া টুপি পরার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু তাঁর মালিকেরই বাধ্য হয়ে শিয়া মত স্বীকার করে নেয়ার কথা জানার পরে নিজেও 'খাঁ' উপাধি স্বীকার করে নিলেন।

মতভেদের কারণ

ইরানে প্রবেশ করার পর হুমায়ূনকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তাঁর শিয়া মতের ঔপচারিকতা স্বীকার করার পর দুয়ের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। এর বিপরীত দু'জনের মধ্যে মতভেদ কেন সৃষ্টি হল ? বাস্তবে কয়েকটি কারণ মিলে মিশে এই সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

হুমায়ূনের কিছু আমীর, যেমন রোশন বেগ কোকা, খ্বাজা গাজী দীওয়ান মুহম্মদ নেজাবাজ, যাঁরা কামরানের সেবক ছিলেন, হজ্ব থেকে ফিরে এসে এখানেই ছিলেন। এঁরা শাহের কাছে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে কানভাঙানি দিতেন[৩] এবং বিশ্বাস করাতে চাইতেন যে, নিজের দুর্ব্যবহারের কারণেই হুমায়ূনকে আজ

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৯৫-৯৬। জওহরের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই ঘটনার বর্ণনায় কোথাও কোথাও ভিন্নতা রয়েছে। দেখুন, রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ২৮-২৯ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ২৮৬।

২. এইচ, বেভারিজ, 'বাবুরস ডায়মন্ড' এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নিবন্ধ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৭৩, পাদটীকা ১ ; শাহ এটি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে নিজাম শাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। ব্যানার্জি হুমায়ূন, ২, পৃ. ১২০, পাদটীকা ১ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২১৭ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ৯৯-১০০।

৩. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৭৩-৭৪ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১০০, ১০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছে। এঁরা বলতেন যে, কিছু সৈন্য পেলে কান্দাহার জয় করে তাঁরা তাকে শাহের হাতে তুলে দেবেন। কান্দাহার লাভের স্বপ্ন শাহের জন্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কিছু কিজিলবাশ ও কিছু তুর্কি, সম্ভবত, কামরানের কাছ থেকে ধন লাভ করে শাহকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিলেন, তারা শাহকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলেন যে, তিনি হুমায়ূনকে সহযোগিতা করলে হুমায়ূনও তাঁর পিতার মতো ইরানী সৈন্যদের ধ্বংস করে দেবেন, যেমন, শাহ ইসমাঈল সফভির সাহায্য পেয়ে বাবুর বোগ উজির ও তাঁর ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে, তাঁকে সাহায্যের জন্য যাদের দেওয়া হয়েছিল, তাদের তিনি নষ্টভ্রষ্ট করে দিয়েছিলেন।[১]

গুজরাত অভিযানে সাফল্য লাভের পর হুমায়ূন ১২টি উত্তম বাণে তাঁর নাম এবং ১১টি সাধারণ বাণে শাহ তহমাস্পের নাম লিখেছিলেন। এইভাবে তিনি সফভি শাসককে নিচে স্থান দিয়েছিলেন। শাহ এবার হুমায়ূনকে এমনটি করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হুমায়ূন উত্তর দিলেন হিঁদুস্তানের ক্ষেত্রফল সফভি শাসকের দেশের চেয়ে বড়। শাহ বললেন, এই অহঙ্কারেরই পরিণাম হল, একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়ে এই অবস্থায় পতিত হওয়া। হুমায়ূন এর উত্তর দিলেন সবই আল্লাহর মহিমা। এছাড়া আরো একটি মনোরঞ্জক ঘটনা ঘটে। ফিরিশতা লিখেছেন, শাহ হুমায়ূনকে একদিন তাঁর পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হুমায়ূন এর জবাবে তাঁর ভাইদের বিরোধের পরিণামের কথা বললেন। শাহ বললেন— "আপনার ভাইদের সাথে আপনার আচরণ ঠিক ছিল না।" ঐ সময়ে ভোজনপর্বের আয়োজন চলছিল। বাহরাম মির্জা চাকরের মতো হাত ধোওয়ার জন্য সুরাহি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শাহ সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইদের সাথে এইরকম ব্যবহার করা উচিত। বাহরাম মির্জা এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাঁর সাথীদের ভয় দেখিয়ে বললেন যে, হুমায়ূনের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে শাহ তাঁদের হত্যা করবেন।[২]

এই সমস্ত কারণ ছাড়া বাস্তবিক কারণ ছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতা সে সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিরাজ করছিল। ইরানের শাহ তহমাস্প একজন কট্টর শিয়া ছিলেন এবং তিনি শিয়া মতবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। হুমায়ূন সুন্নী ছিলেন এবং তাঁর

---

১. বাবুরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৩৬১ ; ' জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১০১।

২. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৫-৫৬ ; নিজামউদ্দীনও (তবকাতে আকবরী, ২, পৃ. ৯৯) এর সমর্থন করেছেন যদিও তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৪৪) এর মতে তাঁর পরাজয়ের কারণ হিসেবে তাঁর ভাইদের কথা উল্লেখ করাতে বাহরাম অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন। তিনি বাবুরকে সাহায্য দেয়ার দুষ্পরিণামেরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। আবুল ফজলও (আকবরনামা, ২, পৃ. ২১৬-১৭) লিখেছেন, শাহ হুমায়ূনের দুর্ভাগ্যের কারণ রূপে তাঁর ভাইদের কথা বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকাংশ সাথীও সুন্নী ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দুই শাসকের মধ্যে ধর্মীয় কারণে মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। বৈরাম খাঁ ও হুমায়ূনের সাথে শাহের ব্যবহার থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। ধর্মীয় কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণও ছিল। মোগল ও সফভি রাজ্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। শাহ ইসমাঈল বাবুরকে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুরো করেন নি। বদায়ূনী ও ফিরিশতা দুই বংশের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

দুই শাসকের মধ্যে বোঝাপড়া

দুই মাস পর্যন্ত দুই শাসকের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ রইল না। এমনও প্রচলিত আছে যে, শাহ তহমাস্প হুমায়ূনকে হত্যা করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর বোন সুলতানা বেগম[১] তাঁকে বোঝান যে, এমনটি করা ঠিক নয় এবং একজন শরণার্থী সম্রাটকে সাহায্য করা সম্রাটের ধর্ম, শাহ তাকে সাহায্য করতে অসমর্থ হলে তাঁকে চলে যেতে দিন। এ ছাড়া মন্ত্রী কাজী জাহাঁ কজবীনী ও নূরুদ্দীন হাকিমও মিত্রতা স্থাপনে সাহায্য করেন।[২]

শাহ তাঁর বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন হুমায়ূন কী শিয়া মত অবলম্বন করতে এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে প্রচার করতে রাজি আছেন? এতে রাজি থাকলে শাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। সুলতানা বেগম এ বিষয়ে হুমায়ূনের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। হুমায়ূন উত্তর দিলেন, তিনি আজন্ম হযরত মুহম্মদ[৩] এর বংশের প্রতি নিষ্ঠাবান। চুগতাই আমীর ও কামরানের বিরোধিতাও এর অন্যতম কারণ ছিল। সুলতানা বেগম শাহকে হুমায়ূনের এ কথার খবর জানিয়ে দিলেন এবং হুমায়ূনের লেখা একটি রুবাইও পাঠ করলেন যাতে হুমায়ূন নিজেকে নাফে আলী'র সম্মানকারী বলে অভিহিত করেন[৪] শাহ এতে কিছুটা প্রসন্ন হলেন। তিনি বৈরাম খাঁর সাথে একান্তে আলাপালোচনা করলেন এবং শেষে হুমায়ূনকে সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সাহায্য দেয়ার শর্ত স্বরূপ নির্ধারিত হল যে, শাহ হুমায়ূনকে ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈনিক দেবেন। এই সৈন্যরা হুমায়ূনকে জমীনদাওয়ার, কান্দাহার, কাবুল ও গজনী বিজয়ে সাহায্য করবে।[৫] সৈনিকদের সাথে শাহের বালক রাজপুত্র মুরাদও যাবেন। এই সাহায্যের ফলশ্রুতি স্বরূপ শাহ কান্দাহার লাভ করবেন যেটি

---

১. সুলতানা বেগম বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি শাসন সংক্রান্ত পরামর্শ দিতেন। তিনি পর্দা করতেন না এবং শাহের সাথে তিনি শিকারে যেতেন।

২. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৬, তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৯৯-১৯৯।

৩. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৪. ঐ, ১, পৃ. ১৫৬, শিয়ারা নাফে আলী জপ করে। এতে হযরত আলীর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা থাকে।

৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩৯ ও জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, ১০৬ এর মতে, ১২,০০০ অশ্বারোহী। আবুল ফজল, আকবরনামা, ১, পৃ. ২১৮-১৯তে এ সেনাদলে নিযুক্ত ২৬ বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন রাজকুমার মুরাদকে অর্পণ করবেন। হুমায়ূন শাহের ভাগ্নিকে (শাহের বোন ও মাসুম বেগের কন্যা) বিয়ে করবেন।[১] সম্ভবত, এ বিয়ে সম্পন্ন হয় নি। শাহ সৈন্যদের তালিকা হুমায়ূনকে দিলেন। তিনি তাঁর পুত্র সুলতান মুহম্মদ মির্জাকে খুরাসান থেকে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদানের আদেশ দিলেন। শাহ হুমায়ূনকে ৩,০০০ তুমান নগদ এবং ঘোড়া, ইরানী বস্ত্র, রাজসিক তাঁবু ইত্যাদি বস্তু দিলেন যে সবের মূল্য ছিল প্রায় ২০,০০০ তুমান।[২] সিদ্ধান্ত হল যে, হুমায়ূনের সাহায্যের জন্য প্রদত্ত সৈন্যরা শিস্তানে তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় থাকবে।

শাহ হতে বিদায়

উৎসব ও দাওয়াতের পরদিন সকালে হুমায়ূন শাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি ভাঁজ করা একটি ছোট কারপেটে শাহ বসেছিলেন। হুমায়ূনের জন্য ঐ সময়ে বসার কোনো স্থান ছিল না। শাহ একইভাবে বসে রইলেন। কোনো স্থান না দেখে হুমায়ূন ভূমিতে বসতে সংকোচ বোধ করছিলেন। সৌভাগ্যবশত, সেখানে হাজী মুহম্মদ কুশকা নামক এক মোগল উপস্থিত ছিলেন। পরিস্থিতি দেখে তিনি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিলেন এবং তিনি তাঁর কোমরবন্ধটি ফেড়ে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন যাতে হুমায়ূন আসন গ্রহণ করলেন।[৩] শাহের এই ব্যবহার ছিল বিস্ময়কর। একদিকে অভ্যর্থনা উৎসব আর অন্য দিকে সাধারণ শিষ্টাচার না দেখানো, এ এক অদ্ভুত ব্যাপারও বটে।

দুই শাসক তখ্‌তে সুলেমানী (যেখানে তাঁরা বসে ছিলেন) থেকে অগ্রসর হয়ে আট মাইল দূরে যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে শাহ হুমায়ূনের সম্মানে পুনরায় একটি দাওয়াতের আয়োজন করলেন। এতে হিঁদুস্তানী ভোজনও তৈরি হল। এবং তিনি এর প্রশংসাও করলেন।[৪] এখান থেকে দুই শাসক মিয়ানায় এলেন। বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি হচ্ছিল। ঔপচারিকতা অনুসারে শাহ দু'টি আপেল এবং চাকু নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "হুমায়ূন বাদশাহ, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনি এটি গ্রহণ করুন।" হুমায়ূন অন্তিম উপহার গ্রহণ করলেন। শাহ ফাতিহা পাঠ করলেন এবং দু'জনে বিদায় নিলেন।

রয়েছে। বায়েজিদ, পৃ,. ৩৫-৩৬-এ ১৮র নাম দিয়েছেন। নিজামউদ্দীন আহমদ ও ফিরিশতা (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ৪৪৫) ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ২৫৬তে ১০,০০০ রয়েছে। বদায়ূনীও ১০,০০০ লিখেছেন, যদিও এক হস্তলিপিতে ১২,০০০ রয়েছে।

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১১০।

২. তুমান ছিল এক মুদ্রার নাম, যা মঙ্গোল, ইরানী ও তুর্কিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এক তুমান ১৫½ ডলারের সমান ছিল। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৭৭, পাদটীকা ২।

৩. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১০৭।

৪. ঐ, পৃ. ১০৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন কী শিয়া মত গ্রহণ করেছিলেন ?

হুমায়ূনের ইরান নিবাস কালের ঘটনাবলীর তথ্য খুব স্পষ্ট নয়। মোগল ঐতিহাসিকেরা, বিশেষত, আবুল ফজল, একথা স্মরণে রাখা সত্ত্বেও যে, হুমায়ূন একজন শরণার্থী রূপে ইরানে এসেছিলেন, এমনকিছু কথা বর্ণনা করতে চান নি যাতে মোগল বংশের হীনতা প্রদর্শিত হয়। এজন্য হুমায়ূনের শিয়া মত গ্রহণ করা অথবা শাহের আদেশ নিরুপায় হয়ে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি মৌনতা অবলম্বন করেছেন। এজন্য হুমায়ূন শিয়া মত গ্রহণ করেছিলেন কি-না তা নিশ্চিতভাবে বলা বেশ সুকঠিন। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের বর্ণিত ঘটনাবলীর নিরিখে আমরা বাস্তব অবস্থার একটা অনুমান করতে পারি।

যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, হুমায়ূন শিয়া টুপি পরেন, শিয়াদের মতো চুল কাটান এবং কাজী জাহাঁর প্রভাবে হোক কিংবা শাহের ক্রোধের ভয়েই হোক, তিনি যে তিনটি পত্রে স্বাক্ষর করেন তা শিয়া মত সম্পর্কিত ছিল। কট্টর সুন্নী মুসলমান বদায়ূনীর বর্ণনা এ বিষয়ে উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন, দুই সম্রাটের পুনরায় মিল হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় শিকার ও উৎসবের ধারা শুরু হয়ে গেল। এরপর শাহ হুমায়ূনকে শিয়া মত স্বীকার করতে এবং তবর্রা (এই ধর্মের পরের অনুসারী যারা কিছু সম্মানিত সাহাবীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে) বলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হুমায়ূন তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে একটি কাগজে এসব কথা লিখে আনার জন্য বলেন। এঁরা নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার কথা লিখে এনে পেশ করেন। বাদশাহ তা পড়েন এবং তাঁর খুতবায় ১২ ইমামের উল্লেখ করেন।[১] ইরানে হুমায়ূন শিয়াদের তীর্থস্থানগুলো ভ্রমণ করেন এবং হযরত আলী-র মাজারে যান। এইভাবে তিনি বাহ্যিকভাবে শিয়া মত গ্রহণ করার মতো ব্যবহার করেন।[২] সম্ভবত, তাঁর এ সমস্ত কাজে তাঁর স্ত্রী হামিদা বানু ও বৈরাম খাঁর প্রভাব ছিল।

হুমায়ূন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদারতার কারণে তিনি শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ মেনে চলতেন না, যেমনটি ইরানের শাহ করতেন। ইরানে অবস্থান কালে হুমায়ূন বহু শিয়া তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেন এবং শিয়া মতের প্রতি সহৃদয়তারও পরিচয় দেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শাসনকার্যে এমন

---

৩. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৫।

৪. Humayun acted as any other man would have done in similar Circumstances. He adopted the Shia creed under duress and protested to the Shah that Compulsion in religions matters was forbidden by the Prophet of Islam. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৩৮।

"Not only Humayun was converted to the Shia faith but, it seems his folowers also were converted." রায়, হুমায়ূন হন পার্শিয়া, পৃ. ৩৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন যাঁরা শিয়া ছিলেন। তাঁর কবিতাবলী পাঠেও প্রতীত হয় যে, তাঁর মনে হযরত আলী ও শিয়া মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। ভারত বিজয়ের অনতিকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়, ফলে তাঁর শিয়া মত-দর্শনের পূর্ণ প্রভাব আমাদের নজরে পড়ে না।

হুমায়ূন ইরানে প্রবেশ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক রয়ে গেছেন। তিনি স্বয়ং ইরানের শাহকে মোগল সম্রাটের চেয়ে ছোট বলে মনে করতেন। হীনাবস্থায় এক শরণার্থী রূপে সেখানে যেতে তিনি খুবই লজ্জা অনুভব করছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, ইরান একটি শিয়া রাজ্য। শাহের কট্টরতা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল। বাবুর কোন অবস্থায় শিয়া মত অবলম্বন করেছিলেন তিনি তা-ও ভুলে যান নি। শিয়া মত মেনে নেওয়ার কারণেই বাবুরকে শেষবারের মতো সমরকন্দ হারাতে হয়।[১] তাঁর অধিকাংশ আমীর সুন্নী ছিলেন। শিয়া হয়ে গেলে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হয়ে যেত। তাছাড়া কাবুল, খুরাসান ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নী ছিলেন। শিয়া মত স্বীকার করার পর তাদের উপর শাসন করা সুকঠিন হয়ে পড়ত। এ সমস্ত কঠিনতার কথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে নিরুপায় হয়ে ইরানে যেতে হয় এবং তাই-ই করতে হয়, যে ভয় তাঁর ছিল। শুরুতে তিনি আপত্তি করেছিলেন কিন্তু শেষে তা মেনে নেন।

হুমায়ূনের এ ধর্মমত পরিবর্তন সাচ্চা অন্তর থেকে ছিল না। এ ছিল তাঁর রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও পরিস্থিতির পরিণাম। তিনি একে বাস্তবিকরূপে ধর্ম পরিবর্তনের মতো করে গ্রহণ করেন নি। বদায়ূনী লিখেছেন, একবার শায়খ হামিদ হুমায়ূনের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাঁর সৈনিকদের অধিকাংশেরই নামের সাথে আলী থাকে।[২] এর অর্থ ছিল যে, এরা সবাই শিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। হুমায়ূন এতে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বলেন, তাঁর পিতামহের নাম উমর শায়খ ছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইরান থেকে ফেরার পর তিনি শিয়া মত গ্রহণ করতে

---

১. ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে ইরানের শাহ শায়বানী খাঁ উজবেককে পরাজিত করেন। শায়বানী মারা যান। শাহ ইসমাঈল বাবুরের বিধবা বোন খানজাদা বেগমকে, যিনি শায়বানীর স্ত্রী ছিলেন, বাবুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। শাহ বাবুরকে এই শর্তে সমরকন্দ প্রদান করেন যে, তিনি নিজে শিয়া মত গ্রহণ ও প্রচার করবেন। শাহের নামে খুতবা পড়াবেন এবং মুদ্রা চালু করবেন। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে বাবুর সমরকন্দে প্রবেশ করেন। সেখানকার অধিবাসীদের আশা ছিল যে, সমরকন্দ অধিকার হয়ে যাওয়ার পর তিনি শিয়া মতের নাম নিশানা পর্যন্ত রাখবেন না। বাবুরের তা না করাতে তাঁর আমীর ও জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বাবুরকে ওখান থেকে পালাতে হল। ইরানী সৈন্যরা পরাজিত হল এবং তাদের নেতা মারা গেল। ইরানী ঐতিহাসিকেরা তাঁদের সৈন্যদের পরাজয়ের দায় বাবুরের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, উইলিয়ামস, অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার, পৃ. ১০০-১০৯।

২. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। মৃত্যুর সময়ে তিনি পূর্ণরূপে শিয়া না সুন্নী ছিলেন— এ কথা বলা খুবই কঠিন।[১] তবে, এতটা নিশ্চিত যে, তিনি সমকালীন কট্টরতার তুলনায় উদার ছিলেন।

ইরান নিবাসের সময় হুমায়ূনের বিশিষ্ট সহযোগী

ইরানে বৈরাম খাঁ হুমায়ূনকে বড় সাহায্য করেন। তিনিই হুমায়ূনকে ইরানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বৈরাম খাঁ স্বয়ং শিয়া ছিলেন এবং তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ইরানের শাসক ছিলেন। ইরানে বৈরাম খাঁ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হন কিন্তু তাঁর এটাই ছিল গৌরবের বিষয় যে, তিনি হুমায়ূনের সাথে রয়েছেন। শাহ তহমাস্প বৈরাম খাঁকে নিজের সেবায় রাখতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি তাঁকে দিয়ারবকর ও আজারবাইজানের জায়গীর দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু বৈরাম খাঁ তা গ্রহণ করেন নি। শুধু তাই নয়, শিয়া হওয়া সত্ত্বেও ইরানী টুপি পরতে অস্বীকার করেন এবং ইরান ত্যাগ করে তিনি হুমায়ূনের সাথে সাথেই থাকেন। তিনি আগে হুমায়ূনের সেবক পরে ছিলেন শিয়া। হুমায়ূনের দূত ও পরামর্শদাতারূপে বৈরাম খাঁ ইরানে তাঁর জন্য খুব বড় শক্তি বলে প্রমাণিত হলেন। ইরানের শাহ বাহরাম মির্জা যখন হুমায়ূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেন তখন বৈরাম খাঁ হুমায়ূনকে তাঁর বিরুদ্ধে ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন। কান্দাহার বিজয় এবং এর পরেও তাঁর আনুগত্য থেকে হুমায়ূন শক্তি লাভ করেন। বৈরাম খাঁ ছাড়াও হুমায়ূনের পত্নী হামিদা বানুও তাঁকে বড় সাহায্য করেন। তিনি শাহের বোনকে নিজের স্বভাব ও কথাবার্তা দ্বারা প্রভাবিত করেন। যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, শাহের বোনই তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করে তাঁকে হুমায়ূনের সাহায্যের জন্য তৎপর করে তোলেন।

ইরান থেকে বিদায়

শাহ হতে বিদায় নিয়ে হুমায়ূন বাহরাম মির্জার সাথে তবরেজ অভিমুখে প্রস্থান করলেন। মিয়ানা অবধি দু'জন এক সাথে এলেন। বিদায়ের ক্ষণে হুমায়ূন বাহরামকে একটি হীরের আংটি দিলেন যেটি ছিল হুমায়ূনের মায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। শুভ কামনার সাথে দু'জনে বিদায় হয়ে গেলেন।

তবরেজের গভর্নর নগরের বাইরে গিয়ে হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন। শাহ তহমাস্পের নির্দেশ অনুসারে পুরো নগর হুমায়ূনকে স্বাগত জানানোর জন্য

১. We cannot say whether he formally abandoned the Shiah creed and died as a Sunni. Apparently therefore. it seems that Humayun died as Shiah. yet this much can be said that he was never a sincere convert to the Shiah faith." রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজানো হয়েছিল। এখানে আবদুস সামাদ নামক এক চিত্রকরের সাথে হুমায়ূনের সাক্ষাৎ হয়।[১] কিছুদিন পরে তিনি হুমায়ূনের সেবায় আগমন করেন এবং তিনিই মোগল চিত্রকলার পিতৃপুরুষ হয়ে যান। হুমায়ূন তাঁকে তাঁর সেবায় আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি ছিলেন না। এছাড়া ঐতিহাসিক বায়েজিদও এখান থেকেই তাঁর সাথী হয়ে যান। তবরেজ-এ, জওহরের মতে, পাঁচ দিন ছিলেন। এখানে তাঁকে তবরেজের প্রসিদ্ধ খেলা— ভেড়াদৌড় ও পায়ে হাঁটা চৌগান খেলা— দেখানো হয়। হুমায়ূন এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নগরের প্রধান ভবনগুলো দর্শন করেন।

তবরেজ থেকে চারদিন যাত্রার পর হুমায়ূন আর্দবেল-এর কাছে পৌঁছালেন। আর্দবেল-এর গভর্নর ও প্রধান আমীররগণ হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন। তিনি এখানে এক সপ্তাহ কাটালেন। এখানে তিনি সফভি বংশের শায়খ শফীউদ্দীন ও শাহ ইসমাঈলের মাজারও দর্শন করলেন এবং সেখানে তিনি কিছু উপহারও দিলেন।[২] পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি এখানে শাহের ভাগ্নিকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন, যা সম্ভবত, সম্পন্ন হতে পারে নি।[৩] এখান থেকে হুমায়ূন লাল সাগর[৪] অভিমুখে রওনা হলেন কিন্তু অত্যন্ত ঘন কুয়াশার কারণে পুনরায় আর্দবেল-এ ফিরে এলেন এবং এখান থেকে কজবীন অভিমুখে ফিরে গেলেন।

হুমায়ূনের কজবীন পৌঁছানোর সময়েই শাহ তহমাস্পও ওখানে এসে পৌঁছালেন। হুমায়ূনও ওখানেই আছেন শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি আদেশ দিলেন হুমায়ূন যেন অনতিবিলম্বেই কজবীন থেকে চলে যান। এইভাবে বাধ্য হয়ে হুমায়ূনকে শাহের আদেশে কজবীন ত্যাগ করতে হল।[৫]

এখান থেকে হুমায়ূন দর্স হয়ে সবজবার-এ পৌঁছালেন। দর্স-এ হামিদা বানু এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন।[৬] এখান থেকে হুমায়ূন মশহাদ পৌঁছালেন। এখানকার গভর্নর ও আমীররা হুমায়ূনকে স্বাগত জানালেন। ইমাম আলী ও অন্যান্য মকবরা পুনরায় দর্শন করলেন। মশহাদ থেকে জাম (২৯ ডিসেম্বর ১৫৪৪

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২২০।

২. মোরিয়ার তাঁর, এ জার্নি থ্রু পার্শিয়া, আরমিনিয়া অ্যান্ড এশিয়া মাইনর টু কনস্টান্টিনোপল (খণ্ড ২, পৃ. ২৫৪-৫৫)-তে লিখেছেন, শাহ ইসমাঈলের কবরে হুমায়ূন কর্তৃক প্রদত্ত খুব সুন্দর হাতির দাঁত, মোজাইক, কচ্ছপের খোল ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত ও চড়ানো একটি সোনালী সুরাহি রয়েছে। রায় হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৪২, টীকা ৫ দ্বারা উদ্ধৃত।

৩. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১১০ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ২৯৫ ; রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৪২।

৪. জওহর একে 'দরিয়ায়ে কুলজুম' লিখেছেন, যার অর্থ হয়, 'লোহিত সাগর'। সম্ভবত, তিনি কাস্পিয়ান সাগার বুঝিয়েছেন, কেননা, লাল সাগর বা লোহিত সাগর এখান থেকে অনেক দূরে। জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১১০।

৫. এ হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার কজবীন যাত্রা ছিল। এর বর্ণনা শুধুমাত্র জওহর ও মাসীরে রহীমীতে পাওয়া যায়। রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৪৪।

৬. বায়েজিদ, পৃ. ৩৯-৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রি.) হয়ে শিস্তান পৌঁছালেন। এখানে তিনি প্রায় ১৫ দিন অবধি যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে হুমায়ূন শাহাজাদা মুরাদের নেতৃত্বে মোগল সম্রাটের সাহায্যার্থে প্রেরিত ইরানী সৈন্যদের নিরীক্ষণ করলেন। এই বাহিনীতে ১২,০০০ ঘোড়সওয়ার ও শাহের দেহরক্ষী দলের ৩০০ সৈনিকও ছিল। শাহজাদা মুরাদ তখনো বালক ছিলেন। এইভাবে, বাস্তবিক রূপে ইরানী সেনাদলের অভিভাবক ছিলেন বুদাগ খাঁ।

কান্দাহার বিজয়

শিস্তান থেকে হুমায়ূন ইরানের শাহের সাম্রাজ্য ত্যাগ করে কামরানের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। হুমায়ূন ইরানী সৈন্যদের বুস্ত দুর্গ অধিকার করতে বললে প্রারম্ভে তারা এই বলে অস্বীকার করল যে, এ শাহের আদেশ-বিরোধী কাজ। হুমায়ূন তাদের আশ্বাস দিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে শাহের আদেশ নিয়ে নেবেন। এখান থেকে হুমায়ূন গরমশির প্রবেশ করলেন। এখানে মীর আবদুল হাই লকি দুর্গ হুমায়ূনের কাছে সমর্পণ করে দিলেন।

ইরানী সৈন্যরা বুস্ত দুর্গ অবরোধ করল। এ দুর্গ কামরানের অধিকারে ছিল। দুর্গ রক্ষকরা যুদ্ধ করল কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে দুর্গ সমর্পণ করে দিল।

এই সময়ে খবর পাওয়া গেল যে, মির্জা আসকারি কান্দাহারের রাজকোষ নিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ূন তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের সাথে ৫,০০০ ইরানী সৈন্য কান্দাহারে পাঠালেন যাতে তারা আসকারিকে রুখে দিতে পারে।[১] হুমায়ূনের আক্রমণের খবর পেয়ে আসকারি কামরানকে সাহায্যের জন্য লিখলেন। কামরান কাসিম হুসেনের সাথে কিছু সৈন্য পাঠালেন এবং আদেশ দিলেন হুমায়ূনের মোকাবিলা করতে এবং দুর্গ সমর্পণ না করতে।

বালক আকবর এ সময়ে কান্দাহারে ছিলেন। কামরান কাবুল থেকে কুরবান করাবল বেগীকে পাঠালেন আকবরকে নিয়ে আসার জন্য। আসকারির কিছু আমীর পরামর্শ দিলেন বালককে হুমায়ূনের কাছে সমর্পণ করার জন্য, কিন্তু আসকারি আকবরকে কাবুল পাঠানোই ঠিক বলে মনে করলেন এবং শীত, বরফ ও বর্ষা ঋতু চলা সত্ত্বেও তাঁকে কাবুলে পাঠিয়ে দিলেন। বালকের সাথে তাঁর দাঈ, মাহম আনগা,জীজী আনগা, আতকা খাঁ ও অন্য আমীরদেরও পাঠানো হল।[২]

কান্দাহারের নিকট মির্জা আসকারির সৈন্য ও হুমায়ূন কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হল, যাতে বহুসংখ্যক ইরানী নিহত হল। কিন্তু ইরানীরা আসকারি ও তাঁর সৈন্যদের দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চের কাছাকাছি সময়ে হুমায়ূনও দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২২৮ ; বায়োজিদ, পৃ. ৪০।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২২৪-২৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দাহার দুর্গ

মধ্যযুগে কান্দাহার দুর্গের অবস্থান ও শক্তির কারণে তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। এই দুর্গটি ভারত থেকে আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যেকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ বলে বিবেচিত হত।[১]

ইরানের শাহ ও মোগল সম্রাটদের মধ্যে কান্দাহারের জন্য নিরন্তর সংঘর্ষ জারি থাকত। বাবুরের মৃত্যুর পর সাম মির্জা বেশ কয়েক বার কান্দাহার বিজয়ের প্রয়াস চালান কিন্তু ব্যর্থ হন।[২] এর পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত থাকে। হুমায়ূনের ইরানে প্রবেশ করার পর কান্দাহার দুর্গ লাভের আশ্বাসে শাহ তাঁকে সাহায্য দেয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন।

বৈরাম খাঁর কাবুল যাত্রা

শক্তি প্রয়োগ করে কান্দাহার অধিকার করার কাঠিন্যের কথা অনুভব করে হুমায়ূন বৈরাম খাঁকে দূতরূপে কামরানের কাছে কাবুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।[৩] এ ছিল কূটনৈতিক যাত্রা। বৈরাম খাঁর লক্ষ্য কেবল কামরানের সাথে সাক্ষাৎই ছিল না ; বরং আসকারি, হিন্দাল ও অন্যান্য মোগল আমীরদের সাথে সাক্ষাৎ করে হুমায়ূনের পক্ষে আনার প্রয়াসও ছিল। এছাড়া কামরানের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধেও ধারণা নেয়ারও প্রয়োজন ছিল। বালক আকবরের বিষয়েও হুমায়ূন ও হামিদার মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল। বৈরাম খাঁ সাথে করে কামরান ও সুলেমান মির্জার নামে শাহের পত্রও নিয়ে গিয়েছিলেন।

কাবুল পৌঁছানোর পর কামরান বৈরাম খাঁকে স্বাগত জানালেন কিন্তু সেই সাথে তাঁর উপর লক্ষ্যও রাখা হল। তিনদিন পর বৈরাম খাঁর সাথে কামরানের

---

১. আবুল ফজল (আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩১) লিখেছেন, কান্দাহার দুর্গ কালো মাটি দিয়ে নির্মিত ছিল। যার ফলে তা ভাঙা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল এবং তার প্রাচীর ছিল ষাট গজ প্রশস্ত। ষাট গজ সম্ভবত ভুল। আবুল ফজল 'শস্ত' (৬০) নয়; বরং 'শশ' (৬) লিখে থাকবেন।

"In an age when Kabul was part of Delhi Empire Qandhar was our indispensable first line of defence." সরকার, শর্ট হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব, পৃ. ২১-২২।

২. ইসলামিক কালচার (১৯৩৪ খ্র.) পৃ. ৪৬৪ এই পুস্তকের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে হুমায়ূনের শাসনকালের শুরুতে ইরানের কান্দাহার আক্রমণের বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. নিজামউদ্দীন আহমদ (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১০১) ও বদায়ূনীর (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৬) মতে বৈরাম খাঁকে কান্দাহার অবরোধের তিন মাস পরে পাঠানো হয়েছিল। ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৭-অনুসারে ৬ মাস দুর্গ অবরোধের পর পাঠানো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎ হল।[১] দু'জনের মধ্যে চার ঘণ্টা যাবত আলাপালোচনা হল। এরপর তিনি সুলেমান মির্জা ও হিন্দালের সাথেও সাক্ষাৎ করলেন। এঁরা দু'জন কামরানের অধীনে বন্দিরূপে অবস্থান করছিলেন। কামরান বৈরাম খাঁকে এদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি তো দিলেন কিন্তু সেই সাথে তাঁর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও পাঠালেন যাতে তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের গোপন কথাবার্তা হতে না পারে। বৈরাম খাঁ ইয়াদগার নাসির মির্জার সাথেও সাক্ষাৎ করলেন এবং বালক আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। এইভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বৈরাম খাঁ কান্দাহারে ফিরে এলেন।

বৈরাম খাঁর কাবুল যাত্রা সফল হয়। কামরান আশঙ্কা করলেন যে, হুমায়ূন এবার অবশ্যই সফল হবেন। তিনি সন্ধি-বার্তার জন্য খানজাদা বেগমকে কান্দাহার পাঠালেন এবং হিন্দালকে মুক্ত করে দিলেন। সুলেমান মির্জাকেও মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে বাদাখশান প্রদেশ ফিরিয়ে দেওয়া হল।[২] এইভাবে কামরান নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতা লাভের প্রয়াস চালালেন কিন্তু সফল হলেন না। হিন্দাল ও বহুসংখ্যক আমীর হুমায়ূনের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। সুলেমান মির্জা ও ইয়াদগার নাসির মির্জা বাদাখশানে চলে গেলেন।

এদিকে কান্দাহার অবরোধ জারি রইল। হুমায়ূন আরো কঠোরভাবে শক্তি প্রয়োগ করে দুর্গের চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করলেন কিন্তু আসকারি আত্মসমর্পণ করলেন না। বৈরাম খাঁর কাবুল থেকে ফিরে আসায় এবং বহু সংখ্যক আমীরের কাবুল থেকে পালিয়ে হুমায়ূনের সৈন্যদলে এসে মিলিত হওয়ায় আসকারি আরো নিরাশ হলেন। এই সময়ে একদিন রাতে মোগলরা 'কিলা চহার-দর'-এর দিকে একটি কামান বসাল। দ্বিতীয় দিন সকালে ইরানী সৈন্যরা ঐ দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে আসকারি সন্ধির জন্য মীর তাহিরকে দূতরূপে পাঠালেন এবং হুমায়ূনের কাছে খানজাদা বেগমের পৌঁছানো পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার জন্য প্রার্থনা জানালেন। বাস্তবে, এ ছিল মির্জা আসকারির একটি চাল মাত্র। কামরান আসকারিকে লিখেছিলেন যে, তিনি সাহায্যের জন্য আসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তিনি দুর্গ সমর্পণ না করেন। আসকারি এইভাবে নিজের শক্তিকে সংগঠিত করে নেওয়ার জন্য সময় চাচ্ছিলেন।

---

১. বায়েজিদ, পৃ. ৪৪-৪৭ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ১০১-২) আবুল ফজল লিখেছেন, বৈরাম খার সন্দেহ ছিল যে, কোনো ফরমানই কামরান উঠে স্বীকার করবেন না এবং বসেই থাকবেন। সেজন্য তিনি সাথে করে একটি কুরআন শরীফও উপহার স্বরূপ নিয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন দেখে কামরান সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। বৈরাম খাঁ তার দাঁড়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে এই ফরমানগুলো প্রস্তুত করলেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩০।

২. বায়েজিদ, পৃ. ৪৭-৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দাহার অধিকার

ইতিমধ্যে, এতদিন যাবৎ দুর্গ অবরোধ করে রাখা সৈন্যরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সেজন্য তারা ফিরে যেতে চাচ্ছিল। আক্রমণের সময়ে তাদের আশা ছিল যে, হুমায়ূনের পৌছানো মাত্রই আসকারি, হিন্দাল ও কামরানের বহুসংখ্যক আমীর এবং সৈন্য সদলবলে হুমায়ূনের কাছে চলে আসবেন এবং অনতিবিলম্বেই তারা সাফল্য লাভ করবে। এতদিন দুর্গ অবরোধ তাদের নিরাশ করে দেয়। এই সময়ে কামরানের কান্দাহারে আসার খবর এলো, ফলে, তারা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যবশত, বৈরাম খাঁর কূটনৈতিক দৌত্যের ফলস্বরূপ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আমীর (যেমন উলুগ মির্জা, কাসিম হুসেন সুলতান প্রমুখ) কামরানের পক্ষ ত্যাগ করে হুমায়ূনের পক্ষে এসে গেলেন। কামরান কান্দাহারে সাহায্যের জন্য আসতে পারলেন না। আসকারির সহযোগীরাও তাঁকে ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। নিরাশ হয়ে, অবশেষে, সাড়ে পাঁচ মাস অবরোধের পর আসকারি তাঁকে দুর্গ সমর্পণ করে দিলেন (৩ সেপ্টেম্বর ১৫৪৫ খ্রি.)।[১] তিনি কাবুল চলে যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হুমায়ূন এ অনুমতি দিলেন না।

খানাজাদা বেগম জবেরি বাইরে এলেন এবং আসকারির জন্য ক্ষমা চাইলেন। আসকারির গলায় তরবারি ঝুলিয়ে হুমায়ূনের সামনে পেশ কর হল। অন্য আমীরদেরও হুমায়ূনের সামনে আনা হল। এই সময়ে আসকারিকে সেই মূল পত্রখানি দেখানো হল, যেটি হুমায়ূনের মরুভূমিতে থাকার সময়ে তিনি তাঁর বিলোচ সহকারীদের লিখেছিলেন। আসকারি এতে খুবই লজ্জিত হলেন। হুমায়ূন তাঁকে কিছুদিনের জন্য বন্দি করে রাখার আদেশ দিলেন।[২]

দুর্গের আত্মসমর্পণের পর হুমায়ূন ইরানীদের আদের্শ দিলেন যে, তারা যেন দুর্গের অধিবাসীদের চলে যাওয়ার জন্য তিনদিন সময় দেয় এবং এই সময়ে যেন তাদের কোনো প্রকারের পেরেশান করা না হয়। কান্দাহার অধিকার করার পর হুমায়ূন দুর্গকে শাহাজাদা মুরাদ, বুদাগ খাঁ ও তাঁর অন্যান্য সাথীদের সমর্পণ করে দিলেন এবং তিনি স্বয়ং চারবাগে শিবির স্থাপন করলেন। প্রারম্ভে দুর্গে প্রাপ্ত রাজকোষে হুমায়ূন তাঁর নিজের এবং বুদাগ খাঁর মোহর লাগিয়ে দিলেন। পরে তিনি সেই কোষ শাহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাহ প্রসন্ন হয়ে হুমায়ূনকে ৯ বস্ত্র এবং একটি দ্রুতগামী খচ্চর পাঠালেন। শাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হুমায়ূন খচ্চরে চড়ে পাঁ-ছ' কদম গিয়ে আবার নেমে এলেন।[৩]

---

১. রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, ৫২. টীকা ৪।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩৫-৩৬।
৩. রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসকারির পতনের পরই হুমায়ূন ও ইরানীদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়ে গেল। এ সম্পর্কে তিনটি বিষয় ছিল প্রধান। দুর্গ, দুর্গে প্রাপ্ত ধন ও আসকারির ভবিষ্যত। ইরানীরা চাচ্ছিল দুর্গের উপর তাদের অধিকার কায়েম হোক। কোষও তাদের অধিকারে রেখে আসকারিকে বন্দি করে শাহের কাছে পাঠানো হোক। হুমায়ূন তো দুর্গ সমর্পিত করে দিলেন এবং কোষও দিয়ে দিলেন কিন্তু আসকারিকে সমর্পণ করতে রাজি হলেন না।

হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চারবাগ-এ শিবির ফেলে অবস্থান করছিলেন। বুদাগ বেগ ও ইরানীরা কান্দাহার দুর্গে ছিলেন। ইতিমধ্যে কিছুটা পরিস্থিতি ও অন্য কোনো কারণের পরিণামস্বরূপ হুমায়ূন কান্দাহার অধিকার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হুমায়ূন বুদাগ বেগের কাছে খবর পাঠালেন যে,তিনি আসকারিকে দুর্গ মধ্যে বন্দি রাখতে চান। মোগলদের পরিকল্পনা ছিল আসকারির দুর্গে প্রবেশের সময় আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ অধিকার করে নেওয়া হবে। বিশিষ্ট আমীরদের এই পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। দুর্গের ইরানীদের সন্দেহ হয় এবং তারা কিছুদিন যাবত কাউকেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে দিল না। কিছু হিঁদুস্তানী ও মোগল উটের পিঠে করে ঘাস ও জ্বালানি সামগ্রী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল আবার ফিরেও গেল। একদিন রাত্রে এরা তাদের গাঠরি-বোচকাগুলোর মধ্যে করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এরা দারোয়ানদের হত্যা করে ফাটকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। হাজী মুহম্মদ ও উলুগ মির্জা মাসূর ফাটকে নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা প্রথমে প্রবেশ করলেন। বৈরাম খাঁ গনিস্তান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেন। ইরানী সৈনিকরা এই অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুর্গরক্ষা অসম্ভব দেখে বুদাগ বেগ দুর্গ ছেড়ে দিলেন এবং ইরানী সৈন্যদের সাথে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। হুমায়ূন কান্দাহার অধিকার করে বৈরাম খাঁকে সেখানকার দুর্গপতি নিযুক্ত করলেন।[১] এরপর তিনি শাহকে এক পত্র পাঠালেন, যাতে তিনি লিখলেন— "বুদানের ব্যবহার ঠিক ছিল না ; শাহজাদা মুরাদ মারা গিয়েছিলেন, এই কারণে বৈরাম খাঁকে, যিনি শাহের অনুগত সেবক, কান্দাহার জায়গীর রূপে দেওয়া হয়েছে।" শাহ হুমায়ূনের এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিলেন।[২]

হুমায়ূন কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ?

মোগল ঐতিহাসিকেরা হুমায়ূনের কান্দাহার থেকে বিতাড়িত করে তা অধিকার করাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর বিপরীতে ইরানী ঐতিহাসিকেরা হুমায়ূনের নিন্দা

---

১. হুমায়ূন কান্দাহার দুর্গ কবে অধিকার করেন এর তারিখ সমকালীন ঐতিহাসিকরা দেন নি। জওহর (স্টুয়ার্ট, পৃ. ১১৫) লিখেছেন, ইরানীদের দুর্গ দেয়ার পর হুমায়ূন এক মাস খলীজা বাগে অবস্থান করেন। ১৫৪৫ খিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর দুর্গ ইরানীদের দেয়া হয়েছিল বলে অনুমান, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি কান্দাহার পুনরাধিকার করে থাকবেন।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪-৪১ ; বায়েজিদ, পৃ. ৫০-৫১ ; রায়. হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৫৬-৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। মোগল ঐতিহাসিকদের মতে, অভিযানে দীর্ঘদিন লেগে যাওয়ার কারণে ইরানীরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কান্দাহার অধিকার করার পর বহুসংখ্যক ইরানী সৈনিক হুমায়ূনের অনুমতি ব্যতিরেকেই দেশে ফিরে গিয়েছিল।[১] শাহের সাথে যে সমঝোতা হয়েছিল সে অনুসারে তাদের কাবুল বিজয় পর্যন্ত হুমায়ূনের সেবায় থাকা উচিত ছিল। ইরানী সৈনিকদের মধ্যে হুমায়ূনের সহায়তা করার উৎসাহও ছিল না। বুদাগ বেগ ও তাঁর লোকেরা কান্দাহারের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছিল।[২] যার ফলে, জনতা আতঙ্কিত ছিল এবং তাঁরা হুমায়ূনের কাছে ন্যায় বিচারের আশা করতেন। শাহজাদা মুরাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল।[৩] কান্দাহার দুর্গ ত্যাগ করলে তা তুর্কমানদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হুমায়ূনের ছিল। কান্দাহার বিজয়ের পর হুমায়ূন কাবুল আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন। আক্রমণের পূর্বে পরিবার-পরিজনদের কোনো সুরক্ষিত স্থানে রাখার প্রয়োজন ছিল। শীত এসে গিয়েছিল, যার ফলে মোগলরা খুব কষ্টের মধ্যে ছিল। হুমায়ূন বুদাগ বেগের কাছে কিছু রসদসামগ্রী ও দুর্গে মহিলাদের থাকার জন্য স্থান দাবি করেন। বুদাগ তা অস্বীকার করেন। কাবুল অভিযানে মহিলাদের নিয়ে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। এর ফলে, হুমায়ূনের বিশিষ্ট আমীররা তাঁকে দুর্গ অধিকার করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।[৪] জওহরের মতে, কান্দাহার পুনরাধিকার করার অন্যতম কারণ ছিল ইরানীদের আসকারীকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার দাবি এবং হুমায়ূনের শিবিরে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার পথে নানা বাধা-বিপত্তি।[৫]

মোগল ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে ইরানী ঐতিহাসিকেরা ঐ সমস্ত দলিল অস্বীকার করেন। তাঁদের মত হল, শাহের পুত্র মুরাদের মৃত্যুও কান্দাহার বিজয়ের আগেই (দুর্গ অবরোধের সময়) হয়েছিল। এ কারণে, রাজকুমারের মৃত্যুর কারণে

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩৮।

২. ঐ, ১, পৃ. ২৩৮-৩৯ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৭-৪৮।

৩. ইরানী ঐতিহাসিকদের মতে, শাহের পুত্রের মৃত্যু কান্দাহার অভিযানের আগেই হয়ে গিয়েছিল। (আবদুর রহীম, মোগল রিলেশন উইথ পার্শিয়া, ইসলামিক কলচর, ১৯৩৪ খ্রি. পৃ. ৪৬৪-৬৫)। এর বিপরীতে মোগল ঐতিহাসিকদের মতে, বুদাগ বেগের কান্দাহার অধিকার করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। ফিরিশতার মতে, (ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৯), কান্দাহার ইরানীদের সমর্পিত করার পর হুমায়ূন কাবুল আক্রমণ করার জন্য প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে, তিনি মুরাদের মৃত্যুসংবাদ শুনে ফিরে আসেন এবং বুদাগ বেগ কর্তৃক দুর্গে প্রবেশ করতে বাধা পাওয়ায় তিনি দুর্গ পুনরায় অবরোধ করেন।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৩৯-৪০ ; বায়েজিদ পৃ. ৫০। বদায়ূনী লিখেছেন, শীত কালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি দুর্গে স্থান দাবি করেন। মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৭।

৫. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা অধিকার করা হয়েছে বলাটা ঠিক নয়। মোগলরা কামরানের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য একটি জায়গা চাচ্ছিলেন। এই কারণে বৈরাম খাঁর পরামর্শে তিনি দুর্গ অধিকার করে নেন। এ ছাড়া দুর্গের অভ্যন্তরে কিছু কিজিলবাগকে দুর্গের সুন্নীরা হত্যা করে।[১] ইরানী সৈন্যরা কান্দাহার থেকে ফিরে যায় নি এবং তাদের সাহায্যেই পরে কাবুল বিজয় হয়। কাবুল বিজয়ের পর শাহ হুমায়ূনকে এ উপলক্ষে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য এবং তাঁর কাছ থেকে কাবুল ফেরত পাওয়ার জন্য দূত পাঠান ; কিন্তু হুমায়ূন তাঁকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

দুই পক্ষের যুক্তিতর্কের অধ্যয়ন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিস্থিতির বিষমতা এবং নানাবিধ কারণে তাঁদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে যায়। মোগল ও ইরানীদের সহযোগ দু'য়েরই স্বার্থেই কারণে ঠিল। তা সত্ত্বেওও দু'পক্ষের শত্রুতার কিছু মূল কারণ ছিল। দু'য়ের মধ্যে ধার্মিক মতভেদ ছিল। স্বল্পকালীন সহযোগ থেকে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ দূর হয় নি এবং পারস্পরিক ধর্মীয় সংঘাত চলতেই থাকে।[২] কান্দাহার দুর্গের অধিবাসীদের অধিকাংশই সুন্নী ছিল, ইরানীদের দ্বারা তাঁদের উপর অত্যাচারের খবরও মোগলদের কাছে এসে যায়। এইভাবে দুই দলের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে। আসকারিকে বন্দি রূপে শাহের কাছে পাঠানোর প্রশ্নে এই মতভেদ আরো তীব্র হয়। ইরানীরা একদিকে তো মোগলদের সাহায্যকারী হওয়ার কারণে নিজেদের উচ্চ বলে মনে করত[৩] অন্যদিকে তাদের এ আশঙ্কাও তাড়া করে ফিরছিল যে, হুমায়ূনও বাবুরের মতো ধোঁকা না দেন। এইভাবে দু'দলের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাস বাড়তেই থাকে এবং একে অন্যের থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর। হুমায়ূন ও শাহের মধ্যে কোনো লিখিত সন্ধি-সমঝোতা হয়নি। সম্ভবত, ইরানী সৈনিকদের এ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ছিল না। ইতিমধ্যে মুরাদের মৃত্যু, বুদাগ বেগের মোগল পরিবারগুলোকে দুর্গে আশ্রয় দিতে আপত্তি, হুমায়ূনের সহযোগীদের কোনো সুরক্ষিত স্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া এবং শীত-ঋতুর ভয়ংকরতা ইত্যাদিতে বিবশ হয়ে হুমায়ূনকে বাধ্য হয়ে কান্দাহার পুনরাধিকার করতে হয়।[৪]

ন্যায়ের দৃষ্টিতে হুমায়ূনের কান্দাহার অধিকার করে নেওয়াটাকে উচিত বলে অভিহিত করা যায় না। হুমায়ূন শাহের কাছ থেকে এই শর্তে সাহায্য নেন যে, তিনি কান্দাহার বিজয় করে তা ইরানীদের দিয়ে দেবেন। তিনি তা করেনও।

---

১. ইসলামিক কলচর, ১৯৩৪ খ্রি. পৃ. ৪৬৫।

২. বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৮) লিখেছেন, একদিন এক ইরানী সৈনিক প্রথম তিন খলীফার বিরুদ্ধে, 'তবর্রা' শব্দটি উচ্চারণ করে, এতে ইয়াদগার নাসির মির্জা খুব ক্রুদ্ধ হন এবং বল্লমের আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

৩. ফিরিশতা লিখেছেন, ইরানীরা মোগলদের অধীনে থাকাতে খুব অসন্তুষ্ট ছিল। ব্রিগস, ২, পৃ. ১৫৮।

৪. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৪২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরানীরা কান্দাহারের জনগণের উপর অত্যাচার করে থাকলে অথবা ইরানী সেনাপতিরা হুমায়ূনকে শীতকালে দুর্গে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে থাকলে, অথবা শর্তানুসারে গজনী, কাবুল ও বাদাখশান অধিকারে হুমায়ূনকে সহযোগিতা না করে থাকলে, হুমায়ূনের উচিত ছিল শাহকে এ খবর জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁর উত্তর পাওয়ার পর কাজ করা। হুমায়ূন এ সবের কিছুই করেন নি এবং শাহকে না জানিয়েই তিনি কান্দাহার দুর্গ পুনরাধিকার করে নেন।[১]

ন্যায়ের দৃষ্টিতে যা-ই বলা হোক না কেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে হুমায়ূন বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছিলেন। তিনি বৈরাম খাঁকে কান্দাহার দুর্গ দিয়ে-ছিলেন এবং শাহকে লিখেছিলেন যে, তিনি কেবল শাহের কর্মকর্তা পরিবর্তন করেছেন মাত্র। শাহ তা স্বীকার করে নিলেন। ইরানী ঐতিহাসিকদের মতে, হুমায়ূন অন্য এক দূত কাজী জৈনুদ্দীন শায়খালিকে এই বিশ্বাস দেওয়ানোর জন্য পাঠান যে, তিনি তাঁর শক্তি সঞ্চয় করার পর কান্দাহার ফিরিয়ে দেবেন।[২] হুমায়ূনের কাবুল অধিকার করার পর শাহ এক দূত বলদ বোগকে পাঠিয়ে হুমায়ূনকে সম্বর্ধনা দেন এবং কান্দাহার সমর্পণ করার জন্য বলেন কিন্তু হুমায়ূন বাদাখশান বিজয়ের পর তা করবেন বলে আশ্বাস দেন।[৩] হিঁদুস্তান বিজয়ের পর হুমায়ূনের কী মনোভাব ছিল তা বলা কঠিন।

হুমায়ূনের ইরান নিবাসের গুরুত্ব ও পরিণাম

হুমায়ূন ইরানে আশ্রয় লাভ করেন এবং ইরানীদের সাহায্যে তিনি কান্দাহার দুর্গ অধিকার করেন। ইরানের শাহ তাঁকে আশ্রয় না দিলে সম্ভবত তিনি কামরানের হাতে পড়ে যেতেন এবং এর পরিণাম কী হত তা কেবল আমরা কল্পনাই করতে পারি। শুধু তাই নয়, ইরানের শাহ হুমায়ূনকে গ্রেফতার করলে কিংবা তাঁকে হত্যা করলে তবুও তখন এমন কোনো শক্তি ছিল না যার পক্ষে শাহের কাছে এবং কৈফিয়ত তলব করা সম্ভব হত। শাহের সাহায্য এই দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এর পরের বিজয়গুলোর সাফল্যের কৃতিত্ব হুমায়ূনের। এতে শাহ বা তাঁর সৈনিকদের কোনো বিশেষ সাহায্য তিনি লাভ করেন নি।

শাহ সাহায্য অবশ্যই দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যবহারে দয়া, ভালবাসা, সজ্জনতা, অপমান, ঘৃণা ও নিচতার সংমিশ্রণ ছিল। একদিকে তা তিনি রাজকীয় সম্বর্ধনা জানান, দাওয়াত দেন, গলা মেলান, নিজের ভাগ্নির সাথে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন, সৈনিক ও ধন দেন এবং অন্য দিকে, তিনি হুমায়ূনকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন, তাঁকে শিয়া মত গ্রহণে বাধ্য করেন এবং বিদায়ের

১. রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৬০-৬১।
২. আবদুর রহীমের প্রবন্ধ, ইসলামিক কলচর, ১৯৩৪ খ্রি, পৃ. ৪৬৫-৬৬।
৩. ঐ, পৃ. ৪৬৩ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন পর হুমায়ূন যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তিনি তাঁকে বসতেও বলেন নি। এই পরস্পরবিরোধী ব্যবহারের ফলে তাঁর সাহায্যের মূল্য অনেক কমে যায়।[১]

হুমায়ূনের ইরান নিবাসের প্রভাব স্বয়ং তাঁর উপর এবং মোগল সংস্কৃতির উপর পড়ে। এর ফলে, মোগলদের সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের রাজত্ব গ্রহণের পর, এই সম্পর্কের পরিণামে স্বরূপ বহু সংখ্যক আমীর, সৈনিক, সাহিত্য ও কলা-বিশেষজ্ঞ ইরান থেকে ভারতে আসেন এবং এইভাবে ইরানী কলা ও সাহিত্যের প্রভাব মোগল সাহিত্য-কলার উপর পড়ে। আবদুস সামাদ ও মীর সাইয়িদ আলী পরবর্তী কালে মোগল চিত্রকলার জন্ম দেন। এইভাবে মোগল বাস্তুকলার উপরও ইরানের প্রভাব পড়ে। হুমায়ূনের মকবরা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এইভাবে হুমায়ূনের ইরান নিবাস ব্যর্থ হয় নি।[২]

প্রথম কাবুল বিজয়

কান্দাহার অধিকার করার পর হুমায়ূন বিজিত অংশ তাঁর রাজ্যের উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এইভাবে উলুগ মির্জাকে তীরী প্রদেশ, হাজী মুহাম্মদ খাঁকে লহু পরগনা, ইসমাঈল বেগকে জমীনদাওয়ার, শের আফগানকে কিলাত এবং হায়দার সুলতানকে শাল প্রদান করা হল। এর অতিরিক্ত অন্য আমীরদেরও জায়গীর দেওয়া হল।[৩]

ইতিমধ্যে আসকারি হুমায়ূনের নজরবন্দি থেকে পালিয়ে এক আফগানের ঘরে গিয়ে লুকালেন। আফগান স্বয়ং এসে এর খবর জানিয়ে দিলেন। হুমায়ূন খ্বাজা অম্বর নাজিরকে তাঁকে ধরে আনার জন্য পাঠালেন। আসকারি পশমের কম্বলের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, ওখান থেকে তাঁকে ঐ অবস্থায় ধরে আনা হল।[৪]

কান্দাহার বিজয়ের পর হুমায়ূন কাবুল বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে, কিছু সওদাগর কান্দাহার থেকে যাওয়ার পথে ইরানী সৈনিকদের কাছ থেকে তাদের ঘোড়াগুলো কিনে নিয়েছিলেন এবং তারা হুমায়ূন ও তাঁর সাথীদের কাছে তা ধারে বিক্রি করে দিলেন। তারা একথাও লেখাপড়া করে নিলেন যে, তাঁরা মোগলদের হিঁদুস্তান বিজয়ের পর এর মূল্য নেবেন।[৫] হুমায়ূনের এই সওদা থেকে

---

১. স্যার, জে, ম্যালকম, হিস্ট্রি অব পার্শিয়া, ২, পৃ. ৫০৯ ; রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৫৮।

২. "The exile of Humayun in Iran though humalating and painful, was not altogether barren in its result." রায়, হুমায়ূন ইন পার্শিয়া, পৃ. ৬২।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪১।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪১।

৫. ঐ, পৃ. ২৪২। ড. ব্যানার্জির এই মত যে, এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হুমায়ূন ভারতীয় জনগণের বিশ্বাস্ত ছিলেন এবং এ থেকে তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসা প্রকট হয়। ব্যানার্জি মতে (হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৪৬, টীকা ২) এটা সত্য বলে প্রতীত হয় না। বাস্তবিকই এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ সময়ে তাঁর কাছে ধনের অভাব ছিল এবং সম্ভবত, সওদাগরদেরও আশা ছিল যে, হুমায়ুন ভারত অধিকার করে নেবেন।

নিজের সৈন্যদের প্রস্তুত করে হুমায়ূন কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করলেন। দশ দিন রোগভোগের পর তাঁর বুআ খানজাদা বেগমের মৃত্যু হয়ে গেল।[১] তাঁকে ওখানেই দাফন করা হল এবং পরে তাঁর লাশ কাবুলে আনা হল এবং বাবুরের কবরের পাশে তাঁকে স্থায়ীভাবে সমাহিত করা হল।

পথে হুমায়ূনকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। দুর্গম পথ এবং প্রচণ্ড শীতের সাথেই তাঁর শিবিরে মহামারী ছড়িয়ে পড়ল এবং বহুসংখ্যক মানুষ মারা গেল। এই সময়ে হুমায়ূনের কাছে প্রায় ২,০০০ সৈনিক ও ৭০ আধিকারিক ছিলেন।[২] তিনি শীঘ্রাতিশীঘ্র কাবুল পৌঁছে যেতে চাচ্ছিলেন। পথের কাঠিন্য দেখে হিন্দাল পরামর্শ দিলেন অভিযান স্থগিত করা হোক এবং সৈন্যরা কান্দাহারে শীত অতিবাহিত করুক। এ পরামর্শ হুমায়ূনের মনঃপূত হল না এবং তিনি হিন্দালকে বললেন, তিনি নিজে আরাম চাইলে নিজের জায়গীর জমীনদাওয়ারে শীত কাটিয়ে দিন। হিন্দাল খাঁটি অন্তরে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি হুমায়ূনের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁর সাথেই রওনা হয়ে গেলেন।

কামরান সতর্ক ছিলেন। তিনি কাবুল রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তিনি একটি বড় সেনবাহিনী একত্রিত করলেন এবং কাসিম বরলাসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠালেন খিমার গিরিপথে হুমায়ূনের পথ রোধ করার জন্য এবং মীর আতিশ কাসিম মুখলিস তুরবাতীকে সেখানে কামান মোতায়েনের আদেশ দিলেন। তাঁর আশা ছিল তিনি হুমায়ূনকে সহজে পরাজিত করবেন। কিন্তু ভাগ্য হুমায়ূনের সহায় ছিল। খ্বাজা মুআজ্জম, হাজী মুহম্মদ ও শের আফগানের নেতৃত্বে হুমায়ূনের সৈন্যরা খিমার গিরিপথ থেকে তাদের হটিয়ে দিলেন।

হুমায়ূনের নিরন্তর অগ্রগতির পরিণামস্বরূপ কামরানের বহুসংখ্যক সহযোগী তাঁকে ত্যাগ করে হুমায়ূনের সাথে এসে মিলিত হলেন। এঁদের মধ্যে কামরানের প্রধানমন্ত্রী বাবুস বেগ, মীর আতিশ তুরবাতী ও মীর আরজ সাইয়িদ আব্বাসও ছিলেন।[৩] কামরান এরফলে খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি দেখলেন সংঘর্ষ

সওদাগর ছিলেন এবং ব্যবসায় এ ধরনের সওদা চলত। তিনি স্বয়ং লিখেছেন যে, ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার মূল্য নিজেরাই নিশ্চিত করে দেয়। তাঁরা এ সমস্ত ঘোড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা বিপদ হাতে করে এসব ঘোড়া বিক্রি করেন। এই সওদাগররা কাবুলের লোক ছিলেন। হিঁদুস্তানী শব্দের প্রয়োগ এজন্য করা হয়েছে যে, কাবুলও সেই যুগে হিঁদুস্তানের একটি অংশ বলে গণ্য হত। এ ঘটনা থেকে হুমায়ূনের আর্থিক সংকটের কথা জানতে পারা যায়।

১. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৭৫-৭৬ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪২।
২. বায়েজিদ, পৃ. ৫২ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৩।
৩. বায়েজিদ, পৃ. ৫৫-৫৭ ; জওহয়, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১১৮ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৩-৪৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ,অতএব, সন্ধির সিদ্ধান্ত নিলেন। বার্তার জন্য তিনি খ্বাজা খাবন্দ মাহমুদ ও খ্বাজা আবদুল খালিককে দূত করে পাঠালেন। এঁরা হুমায়ূনের সাথে বার্তালাপ করে ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন কামরান প্রস্তুত হলে তাঁরা দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবেন।[১] হুমায়ূন কামরানকে এই শর্তে ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং এসে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কামরান এর কোনো উত্তর দিলেন না। তা সত্ত্বেও হুমায়ূনের সন্ধির আশা ছিল। এ কারণে তিনি সামরিক কার্যক্রম স্থগিত করে দিলেন।

কামরান দম নেওয়ার অবসর পেলেন। কিন্তু তাঁর সাহস শেষ হয়ে গিয়েছিল, তিনি দেখলেন যে, তাঁর নিকটস্থ কোনো ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করা যায় না। অর্ধেক রাত্রে তিনি তাঁর ১২,০০০ সিপাইকে বরখাস্ত করে দিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্র মির্জা ইব্রাহীম ও স্ত্রীকে সাথে নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে গজনী অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। হুমায়ূন হিন্দালের নেতৃত্বে ৭০০ বল্লমধারী সিপাই কামরানের পিছু ধরার জন্য পাঠালেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হয় কামরানকে গ্রেফতার করা হোক নতুবা তাকে ভাগিয়ে দেওয়া হোক। কামরান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে লাগলেন এবং পালিয়ে অবশেষে হাজারা জেলায় গিয়ে পৌঁছালেন। এখানে তিনি কন্যার বিয়ে দিলেন। এখান থেকে পালিয়ে তিনি সিন্ধু অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন, সেখানে তিনি শাহ হুসেন আরগুনের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এবং সেখানেই থাকতে লাগলেন।[২]

হুমায়ূন কামরানের পলায়নের খবর পেলেন। তিনি বাবুস বেগকে নাগরিকদের রক্ষার এবং নগর অধিকার করার জন্য পাঠালেন এবং স্বয়ং কাবুলে প্রবেশ করলেন (১৭ নভেম্বর ১৫৪৫ খ্রি)।[৩] এখানে নাগরিকরা হুমায়ূনের অভ্যর্থনায় নগর আলোকসজ্জায় সজ্জিত করলেন। হুমায়ূন সর্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করলেন এবং তাঁর সেবকদের জায়গীর প্রদান করলেন। এইভাবে হিন্দাল গজনী ও উলুগ মির্জা জমীনদাওয়ার এবং তীরনী লাভ করলেন। চৌসা এবং কনৌজের যুদ্ধে নিহতদের পরিবারবর্গকেও দান দেওয়া হল।

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১১৯-২০ ; বায়েজিদ, পৃ. ৫৭-৫৮।

২. তবকাতে আকবরী, দে, ২. ১০৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৫৭ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৯।

৩. বায়েজিদ, নিজামদ্দীন আহমদ, বদায়ূনী ও ফিরিশতার মতে, ১০ রমজান ৯৫২ হি. এবং গুলবদন বেগম ও আবুল ফজলের মতে, ১২ রমজান ৯৫২ হি. (১৭ নভেম্বর ১৫৪৫ খ্রি.) হুমায়ূন কাবুল অধিকার করেন। গুলবদন ও আবুল ফজল প্রদত্ত তারিখ সঠিক। এই তারিখ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আর্সকিন, ২, পৃ. ৩২৫, টীকা ২ ; আকবরনামা, বেভারিজ, পৃ. ৪৮০ ; টীকা ২ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৫৫-৫৬, টীকা ৬ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ১০৬ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৬০ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবরের সাথে সাক্ষাতের পর হুমায়ূনের দু'বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং দিলদার বেগম ও গুলবদন বেগমের সাথে পাঁচ বছর সাক্ষাৎ হয় নি।[১] এরপর, হুমায়ূন আকবরের খতনা সংক্রান্ত ব্যাপারে দাওয়াত ও জলসায় ব্যস্ত রইলেন।[২] এই সময়ে ইরানের শাহের দূত হুমায়ূনের কাবুল বিজয় উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে এবং কান্দাহার দুর্গ লাভের আশায় এলেন।

ইয়াদগার মির্জা কাবুল থেকে বাদাখশান চলে গিয়েছিলেন, যার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। তিনিও হুমায়ূনের কাছে ফিরে এলেন। তিনি হুমায়ূনের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেন নি, কিন্তু হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ইয়াদগার নাসির মির্জা তাঁর অভ্যাস ত্যাগ করেন নি। হুমায়ূন তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি নিশ্চিত হওয়ার পর যে, ইয়াদগার নাসির মির্জা এখনও তাঁর বিরোধিতায় লিপ্ত, তখন তিনি তাঁকে বন্দি করে নিলেন।[৩] এই সময়ে মুঈদ বেগের মৃত্যু হয়ে যায়। হুমায়ূনের জন্য তাঁকে এক দুর্ভাগ্য বলে গণ্য করা হত এবং ইরানীরা একে একটা জীবিত শয়তান বলে অভিহিত করত।

বাদাখশান বিজয়

AMARBOI.COM

কামরানের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে সুলেমান মির্জা বাদাখশান চলে গিয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর পূর্বপরুষদের রাজ্য, এ অধিকার করা তাঁর জন্য কঠিন হয় নি। তিনি তাঁর শক্তি সংগঠিত করেন এবং খুস্ত, আন্দরাব ও কুন্দুজও অধিকার করে নেন। অংশগুলো বাদাখশানের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে আসত না। মির্জা সুলেমান নিজের নামে খুতবা পড়ান এবং একজন স্বাধীন শাসকের ন্যায় প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করে দেন। হুমায়ূন কয়েকবার ফরমান পাঠিয়ে তাঁকে কাবুলে ডেকে পাঠান এবং তিনি প্রত্যেকবারই টালবাহানা করতে থাকেন এবং উপস্থিত হন নি। তাঁর কিছু সহযোগী তাঁকে ভয় দেখায় যে, তিনি কাবুলে পৌঁছানো মাত্রই হুমায়ূন বাদাখশান অধিকার করে নেবেন। এই কারণে হুমায়ূনের ফরমানের উত্তরে তিনি

১. আবুল ফজল লিখেছেন, এ সময়ে আকবরের বুদ্ধি-পরীক্ষা হয়। এক শাহানা জশন আয়োজন করা হল। সেখানে অন্তঃপুরের সমস্ত মহিলা এলেন। আকবরকে আনা হল। তিনি তাঁর মাতা হামিদা বানুকে 'অলৌকিক আলো' দ্বারা চিনে নিলেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৭)। আকবরের এ চেনা 'অলৌকিক আলো'র কারণে নয় ; বরং মাতৃস্নেহের কারণে ছিল। বালক আকবর দেখলেন যে, উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে হামিদা বানু তাঁর প্রতি অধিক স্নেহার্দ্র এবং তাঁর জন্য অধিক বিহ্বল। এ স্বাভাবিক ছিল। মা তাঁর সন্তানকে দু'বছরের অধিককাল দেখেন নি এবং আকবর তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৮-৪৯ ; বায়েজিদ, পৃ. ৬০ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৭৮-৭৯।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৪৯-৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখলেন যে, তাঁকে বাদাখশান ফিরিয়ে দেওয়ার সময় কামরান শপথ করিয়ে নেন যে, আমি যেন বিনা যুদ্ধে হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত না হই।[১] হুমায়ূনের ইচ্ছা ছিল যে, সুলেমান মির্জার রাজ্য ততটাই থাকতে দেবেন যতটা বাবুর তাঁর পিতাকে দিয়েছিলেন কিন্তু সুলেমানের পত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

ইয়াদগার নাসিরের পতন

ইয়াদগার নাসির মির্জা হুমায়ূনের ভাইদের ন্যায় তাঁকে সর্বদাই ধোঁকা দিয়ে এসেছিলেন। বাদাখশান অভিযানের সময়ে তাঁকে কাবুলে বন্দি রাখা হলে তাঁর দ্বারা কোনো না কোনো সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, তিনি পালানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করা হল এবং তাঁর উপর ত্রিশটি অপরাধ আরোপ করা হল। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এবং মুহম্মদ তগাইকে, কাবুলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাঁরা উপর অর্পিত ছিল, এ কার্যকর করার আদেশ হল, কিন্তু তিনি নিবেদন করলেন যে, তিনি জীবনে একটি চড়ুই পাখিও মারেননি, এ কাজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হুমায়ূন এ কাজ মুহম্মদ কাসিম মির্জাকে সঁপে দিলেন। ইনি তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন। পরে তাঁর লাশ কজবীনে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে তাঁকে নাসির মির্জার (বাবুরের ছোট ভাই) কবরস্থানে দাফন করা হল।[২]

AMARBOI.COM

বাদাখশান অভিযান

সুলেমান মির্জার কাছ থেকে কোনো প্রকারে সমর্পণের আশা না দেখে হুমায়ূন ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাদাখশান অভিমুখে প্রস্থান করলেন। ইরানী দূতের সাথে আসা কিছু ইরানী সৈনিক ও কূটনীতিকও হুমায়ূনের সাথেই বাদাখশান রওনা হয়ে গেলেন।[৩] প্রস্থানের পূর্বে হুমায়ূন মীর মুহম্মদ আলীকে কাবুলের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করে দিলেন এবং বন্দি আসকারিকে নিজের সাথে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি কোনো প্রকারের গোলমাল পাকাতে না পারেন।

সুলেমান জানতেন যে, হুমায়ূন তাঁর উপর আক্রমণ চালাবেন। এজন্য তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তীরগরান নামক স্থানে দু'পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে ইরানের শাহের

১. বায়েজিদ, পৃ. ৬১ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১২২ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৫১।
২. বায়েজিদ, ৬১-৬২ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ১, পৃ. ২৫১।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহরক্ষী বাহিনীর সৈনিকেরা বড়ই বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। সুলেমানও বীরত্বের সাথে লড়লেন কিন্তু হুমায়ূনের সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁর সৈনিকেরা পালাতে লাগল এবং তাঁকেও পালিয়ে খুস্ত্-এ গিয়ে আশ্রয় নিতে হল। তাঁর বহু সৈনিক হুমায়ূনের সেনাদলে প্রবেশ করল। সুলেমান খুস্ত্ থেকে পালিয়ে কুলাব চলে গেলেন।[১] হুমায়ূন অগ্রসর হয়ে খুস্ত্ অধিকার করে নিলেন। ওখান থেকে কলাগান হয়ে তিনি কিশম্ পৌঁছালেন। বাদাখশানের অধিকাংশ উচ্চ পদাধিকারী আত্মসমর্পণ করল।

কিশম্-এ হুমায়ূন বাদাখশানের অধিকৃত ভূখণ্ড তাঁর লোকেদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এইভাবে হিন্দালকে কুন্দুজ ও তার সংলগ্ন অংশ, মুনিম খাঁকে খুস্ত্ এবং বাবুসকে তালিকান প্রদান করা হল।[২] বাদাখশানের ব্যবস্থা করার পর হুমায়ূন শীত-ভর কিলা-এ-জাফর-এ অবস্থান করে বাদাখশানের অবস্থাকে পূর্ণরূপে ব্যবস্থিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কিলা-এ-জাফর অভিমুখে রওনা হলেন কিন্তু পথিমধ্যে শাখদান নামক স্থানে তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন (১৫ নভেম্বর ১৫৪৬ খ্রি.), তিনি চারদিন যাবত বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। ইতিমধ্যে তাঁর শত্রুরা গুজব রটিয়ে দিল যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। এই খবর পুনরায় রাজনৈতিক ভূকম্প এনে দিল। মির্জা সুলেমানের সমর্থকরা মাথা তুলতে লাগল। শুধু তাই নয়, মির্জা হিন্দাল ও অত্যন্ত কুৎসিত মনোভাব নিয়ে অন্য আমীরদের সঙ্গে নিয়ে কোকটা নদের তটে এসে পৌঁছালেন।[৩] মধ্যযুগে সম্রাটদের ব্যক্তিত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং শুধু তাঁর মৃত্যুর খবরেই কী গোলমালই না সৃষ্টি হতে পারত, এ সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা তা অনুমান করতে পারি। হুমায়ূনের বেহুঁশ অবস্থায় করাচা বেগ সাহস, দৃঢ়তা ও আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। গোলমাল অবস্থায় তাঁর আশঙ্কা হল আসকারি যেন পালিয়ে না যান, এই কারণে তিনি সর্বক্ষণই তাঁকে তাঁর তাঁবুতে রাখার মতো সতর্কতা অবলম্বন করলেন। পঞ্চম দিনে হুঁশ ফিরতেই হুমায়ূন সবাইকে ফেরানোর জন্য করাচা বেগকে পাঠালেন এবং ফজিল বেগকে কাবুলে রওনা করিয়ে দিলেন যাতে সেখান মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়তে না পারে।[৪]

পূর্ণরূপে সুস্থ হতে হুমায়ূনের দু'মাস লেগে গেল। তাঁর অসুস্থতার সময়ে হামিদা বানু ও মৌলানা বায়েজিদ, যাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রের উত্তম জ্ঞাতা দিলেন, তাঁর বড় সেবা করেন।

---

১. ঐ, ১৫১-৫২ ; ব্যনার্জি, ২, পৃ. ১৫৭-৫৮ ; বায়েজিদ, পৃ. ৭০।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৫৩।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৫৩।
৪. ঐ পৃ. ২৫৩ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, ১২৩-২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরানের পুনরায় কাবুল অধিকার

হুমায়ূনের অসুস্থতার সুযোগে কামরান লাভ ওঠালেন। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সিন্ধুতে শাহ আরগুনের সাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি শাহ হুসেনের কাছ থেকে এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কিলাত এলেন। তিনি কিছু আফগান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু ঘোড়া ছিনিয়ে নিলেন। গজনীর পথে তিনি আরো কিছু ঘোড়া ছিনিয়ে নিলেন এবং এইভাবে লুট করে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী একত্রিত করতে করতে তিনি গজনী পৌঁছালেন। গজনী ছিল হিন্দাল মির্জার জায়গীর কিন্তু তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। ওখানকার শাসনব্যবস্থা ছিল গভর্নর জাহিদ বেগের হাতে। তিনি দক্ষ শাসক ছিলেন না। যে সময়ে কামরান সেখানে পৌঁছান সে সময় তিনি শরাবের নেশায় বেহুঁশ হয়ে নিজের বিছানায় পড়ে ছিলেন। আবদুর রহমান কাসসারের সহায়তায় কামরানের সৈনিকেরা কমন্দ দ্বারা কেল্লায় ঢুকে পড়ল। কামরান কোনো মোকাবিলা ছাড়াই গজনী অধিকার করে নিলেন। জাহিদ বেগকে ধরে তাঁর সামনে আনা হল এবং তাঁকে হত্যা করা হল।[১]

কামরান তাঁর জামাই দৌলত সুলতানকে গজনীর শাসক নিযুক্ত করলেন এবং সেখান থেকে কাবুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। যে সময়ে তিনি কাবুলে পৌঁছান সে সময়ে কাবুলের হাকিম মুহম্মদ তগাই তাঁর স্নানাগারে ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে নাঙ্গা অবস্থায় বের করে আনা হল এবং হত্যা করা হল। কারোরই কামরানের মোকাবিলা করার সাহস হল না এবং কামরান পুনরায় কাবুল অধিকার করে নিলেন।[২]

হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার কাবুল অধিকার

অসুস্থাবস্থাতেই হুমায়ূনকে কিলা-এ-জাফর-এ আনা হল। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি কাবুল পতনের খবর পেলেন। হুমায়ূনের স্বাস্থ্য আবারো খারাপ হয়ে পড়েছিল। বাদাখশানে সুলেমানের পক্ষে বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট ছিল। কাবুল পতন তাঁকে আরো নিরাশ করে দিল। হুমায়ূন এ অবস্থায় বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলেন। তিনি দেখলেন যে, কামরান ও সুলেমান মির্জা দু'জনেই তাঁর বিরাধী। তাঁরা পরস্পরে মিলে গেলে তাঁর সমস্যা আরো তীব্রতর হবে। সেজন্য সুলেমান মির্জাকে খুশি করার পদক্ষেপ নিয়ে তিনি তাঁর সাথে সন্ধি করে নিলেন। তিনি

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৫৮ ; তবকাতে আকবরী, দে. ২, পৃ. ১০৯।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬০ ; তবকাতে আকবরী, দে. ২, পৃ. ১১০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদাখশান সুলেমান মির্জাকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ, কুন্দুজ, আন্দরাব, খুস্ত, কমহর্দ ও গুরি মির্জা হিন্দালকে দিয়ে দিলেন।[১]

১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুমায়ূন কিলা-এ-জাফর থেকে রওনা হলেন। তালিকান, কুন্দুজ হয়ে তিনি কাবুলের সন্নিকটে জমজমা ক্ষেত্রে এসে শিবির স্থাপন করলেন। এখানে তিনি তাঁর সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করে কাবুল আক্রমণ করলেন।

প্রথমে সংঘর্ষ দেহে-আফগানের কাছে শের আফগানের সাথে হল, যিনি কামরানের একটি বড় সেনাদল নিয়ে ডেটে অবস্থান করছিলেন। কামরানের সেন্যরা হিন্দালের কাছে পরাজিত হল এবং ঐ বাহিনীর নেতা শের আফগানকে বন্দি করে হুমায়ূনের কাছে আনা হল। হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করতে চাইলেন কিন্তু করাচা খাঁর আপত্তিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।[২] কাবুল নগর হুমায়ূনের অধিকারে এসে গেল এবং কামরান কাবুল দুর্গে আশ্রয় নিলেন। প্রতিদিন সংঘর্ষ হতে থাকল। একদিন কামরানের এক বিশিষ্ট সহযোগী শের আলী হুমায়ূনের সৈনিকদের দ্বারা পরাজিত হয়ে হাজারা প্রদেশে পালিয়ে গেলেন।[৩]

হুমায়ূনের আগমন ও তাঁর সক্রিয়তায় নিরাশ হয়ে কামরান দিশেহারা হয়ে পড়লেন। হুমায়ূনের সাথে আগত বহুসংখ্যক আমীর ও সৈনিকদের পরিবার-পরিজন কাবুল দুর্গে ছিলেন। কামরান তাঁদের উপর কড়া নজর রাখলেন। তিনি তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তাঁর জন্য জোর করে পত্র লেখালেন যে, হুমায়ূনের পক্ষ ত্যাগ করে কামরানের সৈন্যদের সাথে যোগ না দিলে তাঁদের জীবনের আশঙ্কা রয়েছে।[৪] কামরানের এ পদ্ধতি ব্যর্থ গেল না এবং মীর মুর্শিদ, ইস্কান্দার সুলতান, মির্জা সনজর বরলাস প্রমুখ কয়েকজন আমীর হুমায়ূনকে ত্যাগ করে কামরানের সাথে এসে মিলিত হলেন। নিজের এ পরিকল্পনার সাফল্যে কামরান আরো অত্যাচার শুরু করলেন যা বর্বরতা ও নিচতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। হুমায়ূনের অনুগত সেবক বাবুস বেগের স্ত্রীর ইজ্জত হননের জন্য বাজারের গুণ্ডাদের পাঠানো হল এবং তাঁর সাত, পাঁচ ও তিন বছরের শিশু-সন্তানদের হত্যা করে তাদের লাশ লটকিয়ে দেওয়া হল। মুহম্মদ কাসিমের স্ত্রীকে স্তন-সমেত লোহার শিক দিয়ে ফুঁড়ে দুর্গদ্বারে লটকিয়ে দেওয়া হল। এই ধরনের

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. এইভাবে সুলেমান বাদাখশান লাভ করলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর শক্তি কম হয়ে গেল।

২. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৬৬।

৩. ঐ, পৃ. ১৬৭ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৭০-৭১।

৪. গুলবদন বেগমকেও কামরান তাঁর স্বামী খিজির খ্বাজার কাছে পত্র লিখতে বলেছিলেন। হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমানুষিক-অত্যাচার নির্যাতন আরো অনেক লোকের উপরেও করা হল।[১] কামরান আতঙ্ক ছড়িয়ে দুর্গবাসীদের আপন পক্ষে টানতে চাচ্ছিলেন।

কামরানের অত্যাচার এখানেই শেষ হল না। একদিন তিনি হাভেলি থেকে দালানে যাচ্ছিলেন। ঐ সময়ে কেউ কামান দাগল। কামরান কোনোক্রমে বেঁচে গেলেন এবং এতে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বালক আকবরকে কেল্লার উপরে নিয়ে গিয়ে কেল্লার প্রাচীরের উপর বসিয়ে দিলেন। মাহম আনগা বালকের সাথে গেলেন এবং বালককে তাঁর কোলের মধ্যে করে নিয়ে কামানের গোলার দিকে তাঁর পিঠ পেতে দিলেন। হুমায়ূনের সৈন্যরা কাবুল দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল এবং তাদের কামানগুলো অগ্ন্যুদগীরণ করে চলেছিল। কামরানের এ কীর্তিকাণ্ডের খবর হুমায়ূন জানতে পারলেন এবং কামানের মুখগুলো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এর ফলে আবকরের কোনো ক্ষতি হল না।[২]

কামরানের এ কাজ ছিল বড়ই নিন্দনীয়। আবুল ফজল এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এ কোন ধরনের মানবতা ও বীরত্বের পরিচয় ? কোন হিংস্র পশু অথবা রক্ষসকুলেও কী এ ধরনের প্রথা প্রচলিত আছে ? এমন আদেশ প্রদানকারী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কেন স্তব্ধ হয় নি ? আবুল ফজলের এ ক্রোধ খুবই স্বভাবিক।

কামরান এ কাজ কেন করলেন ? তিনি চাচ্ছিলেন হুমায়ূন তাঁর গোলাগুলি বন্ধ করুন। তিনি জানতেন যে, আকবরকে কেল্লা-প্রাচীরে উপরের রাখলে হুমায়ূন গোলাগুলো বন্ধ করে দেবেন। হলও তাই। যদি আকববরকে হত্যা করাই তাঁর উদ্দেশ্য হত তাহলে অন্যভাবেই তা করতে পারতেন। গুলবদনের বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতীত হয় যে, এর খবরও কেউ গিয়ে হুমায়ূনকে জানিয়ে দিয়েছিল।[৩] ফলে, কামরানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সফল হল এবং আকবরও রক্ষা পেয়ে গেলেন।

হুমায়ূন কেল্লা অবরোধ আরো কঠিন করে দিলেন। এই সময়ে জমীনদাওয়ার থেকে উলুগ মির্জা, কিলাত থেকে কাসিম হুসেন খাঁ শাইবানি, কান্দাহার থেকে শাহ্ কুলি সুলতান ও অন্য কিছু লোক বাদাখশান থেকে হুমায়ূনের সেবায় এসে

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৪-৬৫ ; বায়েজিদ, পৃ. ৮৩ ; গুলবদন বেগম, যিনি ঐ সময়ে কাবুল দুর্গেই ছিলেন, লিখেছেন, কামরান বড়ই লুটতরাজ চালান এবং তাঁর কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও পরিজনদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করেন। হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮১।

২. গুলবদন বেগমের, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮৩ ; তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ১১২ ; আবুল ফজল আকবরের জীবন রক্ষাকে অলৌকিক শক্তির প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন, যা সত্য নয়। আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৫-৬৬ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১২৭।

৩. হুমায়ূননামা, পৃ, ৮১ ; বেভারিজ, পৃ. ১৮৩। গুলবদন ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষা এই প্রকার (আখির সরদুম ব আর্জে আকদস অশরফ রসানিদন্দ কি মির্জা মুহম্মদ আকবর রা দর রুবরু নিগাহ দাশতা অন্দ।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হলেন।[১] এ থেকে হুমায়ূন যথেষ্ট শক্তি লাভ করলেন এবং কামরানও ভীত হলেন।

সর্ব দিক থেকে নিরাশ হয়ে কামরান কঠোর নীতি ত্যাগ করেন এবং পারিতোষিকের প্রতিজ্ঞা করে আমীরদের নিজের বশে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্গের ভিতর আমীরদের নিরাশা বেড়ে গেল। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে, দুর্গ আজ না হলেও কাল নিশ্চয়ই হুমায়ূন অধিকার করে নেবেন। যদি এখন তাঁরা হুমায়ূনের সাথে মিলিত হন তাহলে তাঁরা অধিক লাভবান হবেন। এই সময়ে কামরান জানতে পারলেন যে, হুমায়ূনের সহায়তায় আরো লোক এসে গিয়েছেন এবং দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব। তখন তাঁর হাত-পা ফুলে গেল। ২৭ এপ্রিল ১৫৪৭ এর মধ্য রাতে কামরান চুপি চুপি কাবুল দুর্গের দিল্লি দরওয়াজা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন।[২] হুমায়ূন হিন্দাল এবং অন্য আমীরদের তাঁর পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠালেন। তারা কামরানকে ধরে ফেললেন। কামরানের কাছে পালানোর মতো ঘোড়াও ছিল না এবং তিনি একজন লোকের কাঁধে চড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। কামরানের দশা দেখে হিন্দালের দয়া হল ও তিনি তাঁকে একটি ঘোড়া দিয়ে তাঁকে পালানোর সুযোগ করে দিলেন। এইভাবে কর্তব্যে অবহেলা করে হিন্দাল ভ্রাতৃপ্রেমে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে পালাতে সাহায্য করলেন।[৩]

কামরানের দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর হুমায়ূন কাবুল দুর্গে প্রবেশ করলেন। পুরো রাত ব্যাপী তাঁর সৈন্যরা নগরে লুটপাট চালাল। কামরানকে সহযোগিতার কারণে হুমায়ূন দুর্গবাসীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁদের শাস্তি দিতে চাচ্ছিলেন। এর ফলে, তিনি তাঁর সৈন্যদের গণহত্যা হতে

---

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৬।

৩. বায়েজিদ (পৃ. ৮৪)-এর মতে, কামরান মির্জা হিন্দালের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন, পালানোর সময় পাহারাদাররা তাঁকে চিনতে পেরে ধরে ফেলে। কামরান তাদের ঘুষ হিসেবে এক থলি মুদ্রা দেন। পাহারাদাররা তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং তিনি পালিয়ে যান। নিজামউদ্দীনের মতে, খাজা খিজিরের দিকে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করেন এবং কামরান খালি পায়ে পালিয়ে যান (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১১৩)।

৪. আকবরনামার (খণ্ড ১, পৃ, ২৬৮) মতে হাজী মুহম্মদ খাঁ এবং অন্য লোক যাদের কামরানের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাঁর কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু কৃতঘ্নতার প্রাচীন যাদু এবং প্রভাবের কারণে তাঁকে এমনভাবে ছেড়ে দেন যেন তারা দেখতেই পান নি। জওহর এর মতে, হিন্দাল কামরানকে একটি লোকের কাঁধে উঠে পালিয়ে যেতে দেখেন এবং তিনি একটি ঘোড়া দিয়ে তাঁকে পালাতে সাহায্য করেন (স্টুয়ার্ট, পৃ. ১২৭-২৮)। নিজামউদ্দীন আহমদ ও বদায়ূনীর মতে, হুমায়ূন হাজী মুহম্মদ খাঁকে কিছু সৈন্য দিয়ে কামরানের পিছু ধরার জন্য পাঠান। হাজী মুহম্মদ খাঁ যখন কামরানের কাছে এলেন তখন তাঁকে চিনতে পেরে তিনি তুর্কি ভাষায় বললেন, "আমি কী তোমার পিতাকে হত্যা করেছি?" হাজী মুহম্মদ খাঁ উপেক্ষা করে ফিরে এলেন। বায়েজিদ, পৃ. ৮৪ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১১৩-১৪ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, পৃ. ৪৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরত করলেন না। কিছু ধার্মিক ব্যক্তিকেও কামরানের সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল।[১] হতভাগ্য নাগরিকদের প্রতি হুমায়ূনের এ ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত ছিল না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, গুজরাত অভিযানের সময়েও হুমায়ূন এই ধরনের ব্যবহার করেছিলেন। কাবুলের শান্তিপ্রিয় ও হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্য এ এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা ছিল। তাঁদের উপর কামরানও অত্যাচার করলেন এবং হুমায়ূনও।

কামরানের পলায়ন ও হুমায়ূনের সাথে সংঘর্ষ

কাবুল দুর্গ থেকে বেরিয়ে কামরান বাদাখশান যাওয়ার চিন্তা করলেন। রাতে কেবল আলী কুলি কুরচি নামক সেবকের সাথে তিনি সনজিদ এলেন। পথিমধ্যে হাজারার লোকেরা তাঁর মাল-সামান লুণ্ঠন করল। তাঁকে চিনতে পেরে লোকেরা তাঁকে জুহাক ও বামিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন। জুহাকে তাঁর পুরাতন সেবক মির্জা বেগ ও শের আলীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি কিছু সৈন্যও একত্রিত করে নিলেন এবং তাদের সহায়াতায় গুরি দুর্গের হাকিম মির্জা বেগ বরলাসকে পরাজিত করে তা অধিকার করে নিলেন।[২] শের আলীকে ওখানেই রেখে তিনি স্বয়ং মির্জা সুলেমানের সাহায্যের আশায় বাদাখশান গেলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলেন না। চারিদিক থেকে নিরাশ হয়ে তিনি উজবেকদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের চিন্তা করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে বলখ্ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

চুগতাই ও উজবেকদের পারস্পরিক সংঘর্ষ ছিল তুঙ্গে। বলখ্ ঐ সময়ে পীর মুহম্মদ খাঁর অধীনে ছিল। তিনি কামরানকে স্বাগত জানালেন। চুগতাইদের (মোগলদের) পরস্পরের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে তিনি লাভবান হতে চাচ্ছিলেন। কামরানের আর কোথাও থেকে কোনো আশা ছিল না। দু'জনের মধ্যেকার এক সন্ধি অনুসারে পীর মুহম্মদ কামরানকে বাদাখশান ও কাবুল বিজয়ে পূর্ণ সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর বদলায় কামরান এই প্রদেশগুলো অধিকার করার পর বাদাখশান উজবেকদের দেয়ার আশ্বাস দিলেন।[৩] এইভাবে পীর মুহম্মদ ও বলখের সৈন্যদের সহায়তায় কামরান পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

কাবুল অধিকার করার পর হুমায়ূন করাচা খাঁকে কামরানের বিরুদ্ধে পাঠালেন। তিনি হিন্দাল ও সুলেমান মির্জাকে এই অভিযানে করাচা খাঁকে সাহায্য দেওয়ার আদেশ দিলেন। করাচা খাঁ মির্জাদের সাথে নিয়ে গুরি দুর্গে আক্রমণ হানলেন। শের আলী প্রবল প্রতাপের সাথে তার মোকাবিলা করলেন। কিন্তু তিনি

---

১. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১২৮।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৮-৬৯।

৩. বায়েজিদ, পৃ. ৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গ অধিককাল যাবত অধিকার করে রাখতে পারলেন না এবং দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। হুমায়ূনের সৈন্যরা গুরি অধিকার করে নিল।[১] এখান থেকে সৈন্যরা কামরানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল।

উজবেকদের সহায়তায় কামরানের শক্তি বেড়ে গেল। তিনি একে-একে কিলা-এ-জাফর, বগলান, কিশম, তালিকান ইত্যাদি অধিকার করে নিলেন। হুমায়ূনের সৈন্যরা পরাজিত হল। হিন্দালকে কুন্দুজ দুর্গে আশ্রয় নিতে হল এবং সাহায্যের জন্য করাচা খাঁকে কাবুল যেতে হল।

বাদাখশানের এ দুরবস্থার খবর পেয়ে হুমায়ূন কাবুল থেকে বাদাখশান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন (জানুয়ারি ১৫৪৭ খ্রি.)। প্রচণ্ড শীত পড়ছিল। যাত্রা কঠিন ছিল, তা সত্ত্বেও হুমায়ূন সাহস হারালেন না এবং গূরবন্দ[২] পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এখানে করাচা খাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। পথিমধ্যে কবাইলিয়ারা তাঁর রসদসামগ্রী লুট করে নিয়েছিল। কাবুল গিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী একত্রিত করে পুনরায় ফিরে আসার অনুমতি নিয়ে তিনি কাবুল চলে গেলেন। হুমায়ূন গুরবন্দ থেকে অগ্রসর হয়ে গুলবাহারে করাচা খাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বরফ পড়া শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে হিন্দুকুশের পথ বন্ধ হয়ে গেল। অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে হুমায়ূনকে পুনরায় কাবুলে ফিরে আসতে হল।[৩]

কাবুলে ফেরার পর শুভদিন ও শুভ মুহূর্তে আকবরের বিদ্যারম্ভ হল (৭ শওয়াল ৯৫৪ হি. অর্থাৎ ২০ নভেম্বর ১৫৪৭ খ্রি.)। হুমায়ূন ঐ সময়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত মুল্লাজাদা মুল্লা ঈসামুদ্দীন ইব্রাহীমকে তাঁর পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। ইসামুদ্দীনের কবুতরবাজির খুব শখ ছিল। এজন্য বালকের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হতে পারল না। হুমায়ূন কিছুদিন পরেই তাঁকে পরিবর্তন করে মওলানা বায়েজিদকে এই কাজে নিযুক্ত করলেন।[৪]

কামরান শান্ত ছিলেন না। হুমায়ূনের সহযোগীদের তিনি আপন পক্ষে টানার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন। এর পরিণাম স্বরূপ প্রায় ৩,০০০ অশ্বারোহী ও কিছু অত্যন্ত বিশ্বস্ত আমীর, যেমন করাচা খাঁ[৫], বাবুস বেগ, ইসমাঈল বেগ দুলহাই

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৯।

২. কাবুল থেকে ৪০ মাইল উত্তরে।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬৯-৭০।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭০-৭১। আকবর সাক্ষর ছিলেন না নিরক্ষর ছিলেন, এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দেখুন, ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৬৯-৭১। এম. এল. রায় চৌধুরী, ওয়াজ আকবর ইললিটারেট, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি ১৯৪০, খ্রি. পৃ. ৭২৭-৩৭।

৫. করাচা খাঁ হুমায়ূনের অসুস্থতার সময়ে তাঁর বড়ই সেবা করেছিলেন। তাঁর শক্তি বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি বড়ই উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, তাঁকে ছাড়া হুমায়ূনের কোনো কার্যোদ্ধারই হবে না। তাঁর প্রতি তাৎক্ষণিক অসন্তুষ্টির কারণ ছিল তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমুখ তাঁকে ছেড়ে বাদাখশানে কামরানের কাছে গিয়ে মিলিত হলেন। এত লোকের পলায়নের ফলে হুমায়ূনের শক্তি বড় ধাক্কা খেল। তিনি করাচা খাঁর পিছু ধাওয়া করার প্রয়াস চালালেন কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না। হুমায়ূন কাবুলে থেমে রইলেন এবং জোরে-শোরে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি শুরু করলেন।

১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন হুমায়ূন কামরানের সাথে যুদ্ধের জন্য কাবুল থেকে প্রস্থান করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। হুমায়ূন কারাবাগ থেকে গুলবাহার পৌঁছালেন এবং এখান থেকে হামিদা বানু ও আকবরকে কাবুল পাঠিয়ে দিলেন।[১] কাবুল দুর্গ রক্ষার জন্য তিনি কাসিম খাঁ মৌজিকে নিযুক্ত করলেন। এখান থেকে তিনি আমীরদের সাথে হিন্দকুশ হয়ে অন্দরাব দুর্গের কাছে এসে পৌঁছালেন। কোনো কঠিন মোকাবিলা ছাড়াই এটি অধিকারে এসে গেল। এখানে হিন্দাল কুন্দুজ থেকে ফিরে এসে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হলেন এবং সাথে করে কামরানের সহযোগী শের আলীকে বন্দি রূপে নিয়ে এলেন। শের আলী সর্বদাই একজন সাচ্চা সৈনিক রূপে হুমায়ূনের সহযোগিতা করে এসেছিলেন। তিনি একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। এ কারণে হুমায়ূন তাঁকে সানন্দে স্বাগত জানালেন। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে খিলআতসহ গুরিকে জায়গীর রূপে প্রদান করলেন।[২]

কামরানও সতর্ক ছিলেন। তিনি করাচা খাঁর সহায়তায় তালিকান দুর্গ খুব ভাল করে মজবুত করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং কিশম ও কিলা-এ-জাফরের কাছে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, যাতে শত্রুদের ধারণা জন্মে যে, যুদ্ধ করার মতো শক্তি কামরানের রয়েছে।

হুমায়ূন মির্জা হিন্দালকে বেগি নদী পার হওয়ার আদেশ দিলেন। পুরো বাহিনীর নদী পেরুনোর আগেই কামরান তাঁদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন।

দীওয়ান খাজা গাজীকে ১০ তুমান সরকারি রাজকোষ থেকে নিজের নামে দেওয়ার জন্য পরোয়ানা লেখেন। নিয়মানুযায়ী না হওয়ার কারণে দীওয়ান এ ধন দিতে অস্বীকার করেন। এতে করাচা খুবই অসন্তুষ্ট হন। হুমায়ূন আকবরকে করাচা খাঁর কাছে পাঠাতে চাইলেন তাঁকে বোঝানোর জন্য কিন্তু একজন সহযোগীর কথায় যে, রাজকর্মচারীর কাছে রাজকুমারকে পাঠানো ন্যায়সঙ্গত নয়, তখন হুমায়ূন আকবরকে আর পাঠালেন না, কেননা, তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, না জানি তিনি আকবরকে বন্ধক রাখতে পারেন। অন্য এক ব্যক্তিকে করাচার খাঁর কাছে পাঠালেন। এবার করাচা শর্ত দিলেন যে, খাজা গাজীকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হোক। হুমায়ূন করাচা খাঁর কাছে অন্য এক দূত পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এক উজির, খাজা গাজী একদিন না একদিন আপনার অধীনে এসে যাবেন। এতে করাচা খাঁ সন্তুষ্ট হলেন না এবং কামরানের কাছে পালিয়ে গেলেন। জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১২৮-২৯ ; বায়েজিদ, পৃ. ৮৫-র বর্ণনা ভিন্ন ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭১ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২. পৃ. ১১৫।

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭৫।

২. ঐ, পৃ. ১৭৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ খুবই উপযুক্ত সময় ছিল, কেননা, হিন্দাল নদীর একদিকে আর হুমায়ূন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে নদীর অপর দিকে ছিলেন। হিন্দালের সৈন্যরা পরাজিত হল এবং তাঁর রসদসামগ্রী লুট হয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত, ঠিক ঐ সময়েই হুমায়ূন পৌঁছে গেলেন।[১] যদি কামরান এই বিজয়ের সুযোগে হুমায়ূনের সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতেন তাহলে খুব সম্ভব তিনি হুমায়ূনকে পরাজিত করতে সমর্থ হতেন, কিন্তু কামরান যুদ্ধের পরে তালিকান দুর্গে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তাঁর পলায়নের সময়ে ফেলে যাওয়া রসদসামগ্রী হুমায়ূনের সৈন্যরা লুটে নিল এবং তালিকান দুর্গের নিকটবর্তী ভূমিতে চিরুনি তল্লাশি চালানো হল। যাকে বন্দি করা হল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। হুমায়ূন পূর্ণ শক্তিতে তালিকান দুর্গে আক্রমণ হানলেন। পুনরায় হুমায়ূন পত্র লিখে কামরানকে যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু কামরান এ শান্তি প্রস্তাবে রাজি হলেন না।[২] তাঁর আশা ছিল যে, উজবেকদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পাবেন।

সন্ধি ও মিলন

নিরাশ হয়ে হুমায়ূন দুর্গ অবরোধ আরো কঠোর করে দিলেন। এই অবরোধের মোকাবিলা করা কামরানের জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে তিনি মীর আরব মক্কীকে, যিনি হুমায়ূনের বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, সন্ধি-বার্তার জন্য পাঠালেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত শর্তাবলীর উপর সন্ধি নিশ্চিত হল :

১. বিদ্রোহী অধিকারিদের গলায় গামছা বেঁধে হুমায়ূনের দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে।[৩]
২. হুমায়ূনের নামে খুতবা পড়াতে হবে।
৩. কামরানকে স্বয়ং গুপ্তরূপে মক্কা চলে যেতে হবে।

AMARBOI.COM

---

১. জওহর লিখেছেন, পরাজয়ের খবর পেয়ে হুমায়ূন জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পুস্তকালয়ের কী অবস্থা? তা সুরক্ষিত রয়েছে শুনে তিনি বড়ই সন্তোষ লাভ করলেন (জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৩২)

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭৮ ; বায়েজিদ, পৃ. ৯১-৯২ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৩২-৩৩ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১১৭-১৮। কামরান হুমায়ূনের সন্ধির প্রস্তাবে একটি শের পড়েন তা এই রূপ :

অরুস সে মুল্ক কসে দর কনার গীরদ চুস্ত,
কি বোসা বর লবে শমশীরে, আবদার দিহদ।

রাজ্য-রূপী নতুন বধূকে করতে পারে সে আলিঙ্গন।
তরবারিরই অধর দিয়ে করতে পারে যে চুম্বন ॥—অনুবাদক।

৩. মূল বইতে আছে 'গরদান' বাঁধকর ! আমি এর বাংলা করেছি গলায় গামছা বেঁধে। বিষয়টি একই অর্থাৎ, চরম অপমানিতা অবস্থায় এ দেশে গলবস্ত্রও বলা হয়। এ দেশেও এ রীতি আছে।—অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধি হওয়ার পর ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট[১] সদরে মওলানা আবদুল বাকী নগরে প্রবেশ করলেন এবং হুমায়ূনের নামে খুতবা পড়ানো হল। দুর্গ অবরোধ তুলে নেয়া হল যাতে তিনি মক্কায় চলে যেতে পারেন।

হুমায়ূন তালিকান দুর্গে প্রবেশ করলেন। তিনি সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করলেন। করাচা বেগকেও তাঁর সামনে আনা হল এবং তাঁকেও ক্ষমা করে দেওয়া হল। মক্কা অভিমুখে কিছু দূর যাওয়ার পর হুমায়ূন কর্তৃক সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করার সংবাদ পেয়ে কামরান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি হুমায়ূনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ফিরে এলেন।

কামরানের ইচ্ছাকে হুমায়ূন অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি আসকারিকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে হিন্দালসহ অন্যান্য আমীরদের সাথে কামরানকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠালেন। হুমায়ূন কামরানকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর আমীরদের তিনটি দলে বিভাজিত করে পাঠালেন। প্রথম দলে মুনীম খাঁ, তরদী বেগ ও অন্যান্য আমীররা ছিলেন, দ্বিতীয় দলে রাজবংশের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যেমন, কাসিম হুসেন সুলতান, শাইবানি, খিজির খ্বাজা সুলতান প্রমুখ এবং তৃতীয় দলে হিন্দাল ও আসকারি মির্জা ছিলেন।

হুমায়ূন এক দরবার বসালেন যেখানে কামরানকে উপস্থিত করা হল।[২] আবুল ফজলের মতে, এ মিলন ইশকিমিশারায় এবং গুলবদনের মতে, কিশম-এ হয়। আবুল ফজল কর্তৃক নির্ধারিত স্থানটি সঠিক মনে হয়। দরবারে আসার সময়ে এক কর্মচারীর কাছ থেকে একটি রুমাল নিয়ে তিনি নিজের গলায় বেঁধে নিলেন এবং একজন অপরাধীর মতো তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। হুমায়ূন তাঁর ডান দিকে কামরানকে বসালেন। দুই ভাই গলা মেলালেন এবং অতীত ভুলে যাওয়ার কথা বললেন। দু'জনের চোখ বেয়ে অশ্রু বিগলিত হতে লাগল যা দেখে দরবারের লোকেরাও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন। শরবতের এক পেয়ালা আনা হল যার অর্ধেক খেলেন হুমায়ূন আর বাকি অর্ধেক কামরানকে দিলেন। কামরানের সম্মানে এক দাওয়াতের ব্যবস্থা হল যেখানে বিভিন্ন প্রকারের ভোজন তৈরি করা হল। গায়কেরা সুন্দর গীত পরিবেশন করল এবং এইভাবে দু'দিন আনন্দোৎসবে কেটে গেল। গুলববদন বেগম লিখেছেন, লোকেরা আশ্চর্যজনকভাবে প্রসন্ন ছিল। ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধের কারণে আমীররা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের রক্তের পিয়াসী ছিলেন। এখন সবাই মিলে সানন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।[৩] সব ভাই মিলে বলখ অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারল না।

---

১. আবুল ফজলের মতে, ১২ রজব ৯৫৫ হিজরি ; বেভারিজের মতে, এ দিন ছিল ১২ আগস্ট ; আর্সকিন ১৭ আগস্ট লিখেছেন, যা সঠিক। ড. ব্যানার্জিও ১২ আগস্ট লিখেছেন। ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৭৬ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৭৯-৮০ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ৩৫৭।

২. এই মিলনের ঘটনার জন্য দেখুন জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৩৪-৩৫, আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮১-৮২ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮৭।

৩. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দোৎসবের পর হুমায়ূন তাঁর ভাইদের মধ্যে জায়গীর বিতরণ করলেন। কামরানকে কুলাব বা খাতলান, আসকারিকে কুরাতিগিন, হিন্দালকে কুন্দুজ, ঘোরি, কাহমর্দ, বকলান, ইশকামিশ, নারি বা নারিন এবং সুলেমান মির্জা ও ইব্রাহীম মির্জাকে কিলা-এ-জাফর, তালিকান ও আরো কিছু পরগনা দেওয়া হল। আসকারির হিন্দালের সাথে যাওয়ার আদেশ হল, কেননা, আসকারিকে সবেমাত্র মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কামরানের সাহায্যের জন্য চকর বেগকে তাঁর আমীরুল উমরা নিযুক্ত করা হল। হিন্দালের সাথে শের আলীকে তাঁর মন্ত্রী করে পাঠানো হল।[১]

কামরান এ জায়গীর পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন না এবং তিনি ফরমান পাওয়ার পর বললেন যে, তিনি তো কাবুল এবং বাদাখশানের মালিক রয়েই গিয়েছেন। কুলাব তো বাদাখশানের একটি পরগনা মাত্র। আমি এ জায়গীর কীভাবে মেনে নিতে পারি ? হুসেন কুলি যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এর জবাব দিলেন, এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এত অপরাধের পরেও তাঁকে জায়গীর দেওয়া হয়েছে অথচ তিনি তা স্বীকার করছেন না। কামরান এর অর্থ বুঝে নিলেন। পুনরায় বিদ্রোহ করার তাৎক্ষণিক সাহস তাঁর ছিল না। কিন্তু এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর মন পরিষ্কার ছিল না। পরিস্থিতি বুঝে তিনি প্রাপ্ত জায়গীর স্বীকার করে নিলেন।

জায়গীর বিভাজনের পর সমস্ত ব্যক্তিই আপন আপন জায়গীর অধিকার করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। হুমায়ূন স্বয়ং কাবুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। চার ভাই একই পেয়ালায় শরবত পান করলেন। এমনও মনে হচ্ছিল যে, এবার চার ভাইয়ের মিল-মীমাংসা হয়ে যাবে। হুমায়ূন এখান থেকে যাত্রা করে ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর কাবুল পৌঁছালেন।[২] এখানে তাঁর পুত্র আকবরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

কামরানের মন তখনও কলুষিত ছিল। তিনি চারিদিক থেকে নিরাশ হয়ে হুমায়ূনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর হজ্ব করতে যাওয়ার মনোভাবটা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ছিল না ; বরং পরিস্থিতির কারণে ছিল। হুমায়ূন যে জায়গীর দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর অসন্তোষের প্রমাণ হল তিনি এই জায়গীরকে হুমায়ূনের দয়া বলে মনে না করে মনে করলেন যে, হুমায়ূন তাঁকে অপমান করেছেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এ সময়ে হুমায়ূনের কাছে কাবুল, বাদাখশান ও ভারতের পুরাতন রাজত্ব ছিল না ; বরং তাঁর রাজ্য সীমিত

---

১. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৭৮ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ২৮৬ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৩৫ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৮৬-৮৭।

২. আবুল ফজলের মতে, কাবুল প্রবেশের তারিখ শুক্রবার, ২ রমজান ৯৫৫ হি. ছিল। বায়েজিদের মতে, ৯৫৫ হিজরির তীর মাসের ছিল। ড. ব্যানার্জি ও ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ৫ অক্টোবর ১৫৪৮ খ্রি. বলে স্বীকার করেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৪ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২., পৃ. ১৭৯ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ২৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। কামরানের জায়গীর তাঁর ভরণ পোষণের জন্য দেওয়া হয়েছিল, এজন্য তা তাঁর আনন্দের সাথে গ্রহণ করা উচিত ছিল।

লাহোর থেকে পৃথক হওয়ার পর চার ভাইয়ের মধ্যে এই প্রথম স্নেহপূর্ণ মিলন ছিল। হুমায়ূন এতে পূর্ণ সংযম, দয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করলেন আর তিনি তাঁর সাথে এ রকম ব্যবহার করলেন যেন কিছুই হয়নি। তাঁর এই দয়া ও অনুগ্রহের সুযোগ নিলেন তাঁর ভাইয়েরা।

হুমায়ূনের মনে তাঁর ভাইদের প্রতি অপার স্নেহ ছিল, এ কেবল বাবুরের ইচ্ছার প্রতি এক কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল না ; বরং হার্দিকে স্নেহ ছিল। মিলনেই হুমায়ূন কামরানকে তাঁর ডান দিকে বসালেন, স্নেহার্দ্র হুমায়ূনের অশ্রুমোচন, অবশেষে, কামরানের ভরণ-পোষণের চিন্তা করে তাঁকে জায়গীর দেওয়া থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কামরানের মন ও মনোভাব কেমন ছিল। এতটা শত্রুতা করার পরও কামরানকে ক্ষমা করতে তাঁর এক মুহূর্তও সময় লাগল না। এ বাদশাহ হুমায়ূনের খুব বড় দুর্বলতা এবং ব্যক্তি হুমায়ূনের খুব বড় শক্তির প্রমাণ।

একতার প্রভাব

হুমায়ূনের ভাইদের সাথে তাঁর শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পরিণাম তৎক্ষণাৎ প্রকট হয়ে গেল। নিকটস্থ শাসকরা হুমায়ূনকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন। হায়দার মির্জা কাশ্মীর থেকে পত্র লিখে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন এবং কাশ্মীর আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর ধারণা ছিল সেখান থেকে হিঁদুস্তানে সহজে আক্রমণ চালানো যেতে পারে। হুমায়ূন তখনই ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি হায়দার মির্জাকে উত্তর দিলেন যে, সুযোগ-সুবিধা মতো তিনি কাশ্মীরে আসবেন। কাশগড়ের শাসক আবদুর রশিদ খাঁ হুমায়ূনের কাছে প্রচুর উপহার পাঠালেন। হুমায়ূন খ্বাজা জালালউদ্দীন মাহমুদকে ইরানের শাহের কাছে তাঁর দূত করে পাঠালেন।[১] এইভাবে নিজের ভাইদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে হুমায়ূন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন এবং শাসন ব্যবস্থাকে এক নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা শুরু করলেন।

হুমায়ূনের নির্বাসনকালের সমস্যাবলী তাঁর আমীরদের বিশ্বাসঘাতকতাই জটিল করে তুলেছিলে। তাঁরা কখনো বা কামরানের পক্ষে থাকতেন আবার কখনো বা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে হুমায়ূনের পক্ষাবলম্বন করতেন। এইভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হানাহানিতে তাঁদের ভূমিকাই থাকত মুখ্য। এবার হুমায়ূন তাঁর আমীরদের উপরেও মনোযোগ দিলেন। করাচা খাঁ ও মুসাহিব বেগ হুমায়ূনকে বারবারই ধোঁকা দিয়ে এসেছিলেন। দণ্ডরূপে হুমায়ূন তাঁদের মক্কায় চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। এঁরা রওনা হয়ে গেলেন কিন্তু হাজারা প্রদেশে গিয়ে থেমে

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রইলেন। হুমায়ূন তাঁর নিজের আদেশের উপর স্থির থাকতে পারলেন না এবং কিছুদিন পরেই তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়া হল। হুমায়ূনের প্রবল শত্রু মুহম্মদ উলুগ বেগ মির্জা ও তাঁর ভাই মুহম্মদ শাহ মির্জাকে ইতিমধ্যে হত্যা করা হয়েছিল[১] যার ফলে হুমায়ূন কিছুটা শান্তি পেলেন।

বল্খ্ অভিযান

ভাইদের সংঘর্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে হুমায়ূন বল্খ্ আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর কয়েকটি কারণ ছিল। উজবেক দলপতি পীর মুহম্মদ খাঁ কামরানকে সাহায্য করেছিলেন যার ফলে হুমায়ূন তাঁর প্রতি খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁকে শাস্তি দিতে চাচ্ছিলেন। এছাড়া বল্খ্ এর ভূখণ্ডটি খুব উর্বর ছিল। কামরান তাঁর প্রাপ্ত জায়গীর থেকে সন্তুষ্ট ছিলেন না। হুমায়ূন বল্খ্ জয় করে কামরানকে দিতে চাচ্ছিলেন।[২] বাস্তবে বল্খ্ অভিযানের কারণ ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার, শক্তি সঞ্চয় ও হুমায়ূনের পূর্বপুরুষদের রাজ্য অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা।

পরিস্থিতি বল্খ্ আক্রমণের অনুকূল ছিল। বাদাখশান হুমায়ূনের অধিকারে এসে গিয়েছিল। কামরান আত্মসমর্পণ করেছিলেন, ভাইদের মধ্যে কম-সে-কম বাহ্যিকভাবে ভাইদের ভ্রাতৃত্ব প্রকট হচ্ছিল, তাঁর দুই প্রধান শত্রুর মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। অনুকূল পরিস্থিতি দেখে হুমায়ূন পীর মুহম্মদের উপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কামরান, হিন্দাল, আসকারি, মির্জা ইব্রাহীম ও সুলেমানকে বল্খ্-অভিযানের জন্য সসৈন্যে আগমনের আদেশ দিলেন।[৩]

১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হুমায়ূন কাবুল থেকে বল্খ্ অভিযানের জন্য রওয়ানা হলেন।[৪] য়ূরাত চালাক[৫] নামক স্থানে তিনি একমাস যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে গজনী থেকে মুহম্মদ খাঁ ও বাদাখশান থেকে মির্জা ইব্রাহীম সসৈন্যে এসে মিলিত হলেন। এই শিবির থেকে খ্বাজা দোস্তে খাবন্দকে ডেকে আনার জন্য মির্জা কামরানকে পাঠানো হল। এখান থেকে অন্দরাব, তালিকান ও নারি হয়ে তিনি নীলবর উপত্যকায় পৌঁছালেন। এখানে মির্জা হিন্দাল এবং সুলেমানও এসে মিলিত হলেন। আসকারি ও কামরান, যাঁদের পৌঁছানোর আশা ছিল, এলেন না। হুমায়ূন এখান থেকে ইব্রাহীমকে বাদাখশান পাঠিয়ে দিলেন যাতে কামরান আক্রমণ করলে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারেন।[৬]

---

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৮৮।
২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৩৬।
৩. বায়েজিদ, পৃ. ১০৬-১০৭ ; জওহয়, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৩৬ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৫।
৪. আবুল ফজলের মতে ৯৫৬ হিজরির প্রারম্ভে তিনি রওনা হন। এ বছরটি শুরু হয়েছিল ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি। আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৫।
৫. কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে দু'মাইল দূরে।
৬. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন এখান থেকে সম্মুখবর্তী বাকলান হয়ে আইবক নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, যা বল্খের অধীনে ছিল। হুমায়ূন আইবক দুর্গ অবরোধ করলেন। দুর্গবাসীরা প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী লাভে অসমর্থ হওয়ার কারণে দুর্গরক্ষক খ্বাজা মাক দুর্গ সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

হুমায়ূন এই বিজয় থেকে লাভ ওঠালে বল্খ্ অধিকার করাটা তাঁর জন্য মোটেও কঠিন হত না। যুদ্ধ পরিষদের বৈঠকে হুমায়ূন পীর মুহম্মদের আতালিক খ্বাজা মাকের কাছে উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি দুটি মত পেশ করলেন। তিনি বললেন, হুমায়ূন তাঁর শিবিরে আটককৃত বন্দিদের হত্যা করুন এবং এরপর, তৎক্ষণাৎ বল্খ্ আক্রমণ করে দিন। যদি এতে সমস্যা হয় তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ ছিল যে, পীর মুহম্মদের সাথে সন্ধি করে নেওয়া হোক এবং খুল্ম-এর এক দিক্কার অংশ পীর মুহম্মদকে দেওয়া হোক এবং অবশিষ্টাংশ হুমায়ূন নিজেই রাখুন। প্রাপ্ত অংশে হুমায়ূনের নামে খুতবা পড়ানো হোক এবং মুদ্রা প্রচলিত হোক এবং এর উপর হুমায়ূনের অধিকার সুরক্ষিত থাকুক। এ দুয়ের কোনো মতই হুমায়ূন স্বীকার করলেন না।[১] তিনি উজবেক বন্দিদের কাবুল পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং বল্খ্ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

খুল্ম্, ও বাবা শামু হয়ে হুমায়ূন বল্খের নিকট পৌঁছালেন। উজবেকরা শাহ মুহম্মদ সুলতান হিসারি ও বক্কাস সুলতানের নেতৃত্বে মোগলদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের একটি দলকে পরাজিত করে দিলেন। পরদিন ভীষণ যুদ্ধ হল। মোগলরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল এবং উজবেকদের বল্খ্ নদীর ওপারে ভাগিয়ে দিল।[২] যদি তাঁরা তাৎক্ষণিক আক্রমণ চালিয়ে দিতেন তাহলে তারা বল্খ্ অধিকার করতে পারতেন কিন্তু এই সময়ে খবর এসে পৌঁছাল যে, কামরান কাবুল অধিকার করে নিয়েছেন। হুমায়ূনের সঙ্গেকার সৈনিক ও আমীর, যাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের কাবুলে রেখে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময়েই খবর এসে পৌঁছাল যে, বুখারা থেকে আবদুল আজীজ সসৈন্যে পীর মুহম্মদের সাহায্যের জন্য ধেয়ে আসছেন। এতে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সাফল্যের আশা খুব কম ছিল। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূন ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৩] আইবক হয়ে তিনি দররেগজ-এ এসে শিবির ফেললেন। এখানে কিছু দিন অবস্থান করে তিনি পরিস্থিতি অবলোকন করতে চাচ্ছিলেন। প্রয়োজনে তিনি এখান থেকে কাবুলেও যেতে পারতেন আবার উজবেকদের সাথে যুদ্ধও করতে পারতেন।

---

১. ঐ, পৃ. ২৮৭ বায়েজিদ, পৃ. ১০৯।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৮৯।

৩. ঐ পৃ. ২৮৯-৯০ ; বায়েজিদ, পৃ. ১১৩, তবকাতে আকবরী, দে. ২, পৃ. ১২০-২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদাখশান থেকে প্রত্যাবর্তন

দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূনের সৈন্যদের পিছু যেতে দেখে উজবেকেরা তাদের পিছু ধাওয়া করে আক্রমণ চালিয়ে দিল। হুমায়ূনের সৈন্যদের পশ্চাদভাগে হিন্দাল, সুলেমান ও হুসেন কুলি ছিলেন। উজবেকদের আক্রমণ থেকে হিন্দাল ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন। আক্রমণ হুমায়ূনের উপরেও হল। এক উজবেকের তীরের আঘাতে হুমায়ূনের তসররুন্না জেরিন নামক ঘোড়টি মারা গেল। চারিদিক থেকে হইচই শুরু হয়ে গেল। বহুসংখ্যক মোগল সৈনিক মারা গেল। হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের একত্রিত করে যুদ্ধ করতে চাইলেন কিন্তু এ অসম্ভব ছিল। বাধ্য হয়ে তিনি কাহমর্দ ও গুরবন্দ হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে (১ রজমান ৮৫৬ হি.) কাবুল পৌঁছালেন।[১] মির্জা সুলেমান বাদাখশানে, হিন্দাল কুন্দুজে ও অন্য আমীররা কাবুল ফিরে এলেন। এইভাবে হুমায়ূনের বিজয় তাঁর পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁর সৈনিক ও আমীরদের মধ্যে গুজবের আতঙ্ক যা কামরানের গতিবিধি ও তাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কারণ, লোক তখনও যা ভুলতে পারে নি। হুমায়ূনের বল্‌খ্‌ অভিযানের স্বপ্ন ধূলিসাত হয়ে গেল আর সে স্বপ্ন তাঁর আর কখনো পুরো হয় নি।

কাবুল ফিরে হুমায়ূন আইবকে বন্দিকৃত উজবেকদের মুক্ত করে দিলেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর পীর মুহম্মদ হুমায়ূনের উদারতার কথা শুনে প্রসন্ন হলেন এবং তিনিও বন্দিকৃত হুমায়ূনের সেবকদের মুক্ত করে দিলেন।[২] হুমায়ূন খ্বাজা জালালউদ্দীন মাহমুদকে দূত করে ইরানে পাঠিয়েছিলেন। কিছু কারণবশত, তিনি কান্দাহারের রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে নেওয়া হল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ চিত্রকর আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ মীর আলী হুমায়ূনের সেবা স্বীকার করলেন।[৩] মোগল চিত্রকলার ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, কেননা, এই চিত্রকররাই মোগল চিত্রকলার ভিত্তি স্থাপন করেন।

কামরানের বিদ্রোহ

যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, মিত্রতা হওয়ার পর কামরান তাঁর জায়গীর কুলাবে চলে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পরেই চাকর বেগের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেখান থেকে তাঁকে বের করে দেন। হুমায়ূনের আদেশ সত্ত্বেও তিনি বল্‌খ্‌ অভিযানে যান নি এবং কাবুল আক্রমণ করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। হুমায়ূনের বল্‌খ্‌ অভিযানের অসফলতা ও তাঁর পরাজয়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি তার সুযোগ

---

১. আকবরনামা ১, পৃ. ১৯০-৯১।
২. ঐ, পৃ. ২৯১।
৩. ঐ, পৃ. ২৯২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বার্থলিপ্সা কামরানের বুদ্ধি কীভাবে নাশ করেছিল, এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, উজবেকদের নিজের পক্ষে টানার জন্য তিনি সুলেমানের স্ত্রীর কাছে প্রেম-পত্র লিখলেন।[১] যে সময়ে হুমায়ূন বল্খ্ সমস্যায় ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে আসকারিকে কুলাবে রেখে কামরান বাদাখশান আক্রমণ করে বসলেন। সুলেমানকে তালিকান ছেড়ে কিলা-এ-জাফরে এসে শরণ নিতে হল। কামরান তালিকান অধিকার করে নিলেন এবং এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি কিলা-এ-জাফর অবরোধ করলেন ; কিন্তু তিনি তা অধিকার করতে সমর্থ হলেন না। তাকে ঐ ভাবেই ফেলে রেখে কুন্দুজ আক্রমণ করলেন। এখানে হিন্দাল তাঁর মোকাবিলা করলেন। কামরান হিন্দালকে তাঁর পক্ষে টানার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হিন্দাল তাঁর কথা শুনলেন না। এতে নিরাশ হয়ে কামরান উজবেকদের কাছে সাহায্য চাইলেন। উজবেকরা সর্বদাই মোগলদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে লাভ ওঠানোর চেষ্টা করে এসেছে। তারা তাঁর সহযোগিতার জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাল। এই পরিস্থিতিতে হিন্দাল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। তিনি কামরানকে কিছু জাল-পত্র লিখলেন, যা থেকে এটাই প্রকাশ করা হয়েছিল যে, কামরান ও হিন্দাল সম্মিলিতভাবে উজবেকদের ধ্বংস করতে চাইছেন। উজবেকরা এতে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। কামরানের এত করে বোঝানো সত্ত্বেও তাদের সন্দেহ দূরীভূত হল না এবং তারা তাঁকে ত্যাগ করল। বাধ্য হয়ে কামরানকে কুন্দুজ অবরোধ প্রত্যাহার করতে হল।[২]

এই সময়ে এ খবরও এসে পৌঁছাল যে, চাকর বেগ কাবুল আক্রমণ করে আসকারিকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছেন এবং বাধ্য হয়ে তাঁকে পালিয়ে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কামরান সাহায্যকারী সৈন্য পাঠালেন। এই সাহায্যকারী দল পৌঁছানোর পর চাকর বেগ অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। কুন্দুজ থেকে ফেরার সময়ে কামরানের শিবিরকে হিন্দালের শিবির মনে করে উজবেকরা লুটে নিল। এতে কামরান বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। বাধ্য হয়ে তাঁর এবং তাঁর সাথীদের আসকারির সাথে তালিকান দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল।[৩] সুলেমান ও হিন্দাল কামরানের

১. গুলবদন বেগম (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ, ১৯৩) কামরান ও সুলেমান মির্জার শত্রুতার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তরখান বেগম নামক এক কূটনির প্ররোচনায় কামরান এক পত্র ও রুমাল সুলেমানের স্ত্রী হরম বেগমের কাছে পাঠালেন এবং তাতে তিনি অত্যধিক প্রেমাবেগের প্রকাশ ঘটালেন। হরম বেগম এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর স্বামী ও পুত্রকে ডেকে এই বলে উত্তেজিত করলেন যে, তাঁদেরই কাপুরুষতার কারণেই কামরান এমন অপমানজনক পত্র লেখার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। পিতা-পুত্র কামরানের চিরশত্রু হয়ে গেলেন।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৯৩।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৯৩। পরে উজবেকরা যখন জানতে পারে যে, তারা কামরানের মালপত্র লুট করেছিল, তখন উজবেকরা তা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। নিরাশ হয়ে কামরানকে বাদখশান ছাড়তে হল। এখান থেকে পালিয়ে তিনি হাজারা প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কিবচাকের যুদ্ধ

এই সময়ে করাচা খাঁ কামরানকে কাবুল অধিকার করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কামরান এই আমন্ত্রণের সুযোগ নিতে চাইলেন। হুমায়ূনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, যাতে তিনি প্রস্তুত না থাকেন, তিনি এক পত্র লিখে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হুমায়ূন কামরানের চাল বুঝে গিয়েছিলেন। তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি রক্ষা-ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে সংলগ্ন গিরিপথগুলো রক্ষার ব্যবস্থা নিলেন। কাবুলকে আকবর ও কাসিম বরলাসের নেতৃত্বে রেখে হুমায়ূন স্বয়ং গুরবন্দ গিরিপথ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। হুমায়ূনের তাঁর আমীরদের অসন্তোষ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ছিল না। তিনি হাজী মুহম্মদের পরামর্শে তাঁর সৈন্যদের দুই ভাগে বিভাজিত করে দিলেন। এক ভাগ হাজী মুহম্মদ খাঁর অধীনে জুহাক ও বামিয়ান রক্ষার জন্য পাঠালেন এবং তিনি স্বয়ং ছোট একটা দল নিয়ে কিবচাক গিরিপথের কাছে শিবির স্থাপন করলেন। হুমায়ূনের কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর কামরানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কামরান বুদ্ধির সাথে কাজ করলেন। প্রারম্ভে তিনি জুহাক ও বামিয়ানের পথ ধরে কাবুল আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হাজী মুহম্মদ খাঁ সসৈন্যে এই গিরিপথে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কামরান কিবচাক গিরিপথ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন, যার রক্ষার দায়িত্বে স্বয়ং হুমায়ূন ছোট একটা বাহিনী নিয়ে নিয়োজিত ছিলেন।

হুমায়ূনের কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর কামরানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কামরানের আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে গেল, তা সত্ত্বেও করাচা খাঁ বলতে লাগলেন কামরান ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসছেন। কামরানের আক্রমণের ফলে হুমায়ূনের সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর মারা গেলেন। হুমায়ূন প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কিন্তু পলায়নপর সৈন্যদের একত্রিত করা অসম্ভব ছিল। তাঁর সৈন্যরা পূর্ণরূপে পরাজিত হল। হুমায়ূন রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে হল। তাঁর পলায়নকালে কোলাবের বাবা বেগ তাঁর পিছু ধাওয়া করে তাঁর মুকুটের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। সে আবারো হুমায়ূনের উপর আক্রমণ হানতে চাচ্ছিল কিন্তু ফরহাত খাঁ[১] তাকে ভাগিয়ে দিল। হুমায়ূনকে সে কোনো প্রকারে বাঁচিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেল। হুমায়ূনের প্রাণঘাতী চোট লেগেছিল। প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। যার ফলে তিনি এত দুর্বল হয়ে

১. মেহতর সকাহী বা সকাই ফরহাত খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিবচাকের যুদ্ধের জন্য দেখুন, জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৩৮-৩৯ ; বায়েজিদ, পৃ. ১২৭-৩০ ; আকবরনামা ১, পৃ. ২৯৬-৯৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লেন যে, তিনি তাঁর জীবাটি[১] বের করে সবদল খাঁ নামক এক চাকরকে দিয়ে দিলেন। কারমানের সৈন্যদের দ্বারা ধাওয়া খাওয়ার সময়ে ভারের কারণে সে হুমায়ূনের রক্তমাখা জীবাটি ফেলে দিল।

হুমায়ূন কেবল ১১ জন ব্যক্তির সাথে বামিয়ান ও জুহাক অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। খুব বেশি রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার ফলে তিনি এত দুর্বল হয়ে গেলেন যে, অত্যন্ত কষ্টে খুবই ধীর গতিতে চলতে লাগলেন। প্রচণ্ড শীত ও দুর্বলতার কারণে তিনি এক স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে গরম করার জন্য ভেড়ার পশম দিয়ে বানানো কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হল। অনেক কষ্টে হুমায়ূনকে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল। সৌভাগ্যবশত, এখানে ৩০০ সৈন্যসহ সুলতান মুহম্মদ তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন। এখানে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করার জন্য হুমায়ূন যুদ্ধ পরিষদের এক বৈঠক করলেন। কিছু আমীর কান্দাহার, কিছু বাদাখশান ও অন্য কয়েকজন কাবুল আক্রমণ করার পক্ষে মত দিলেন। অবশেষে বাদাখশান অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

এখান থেকে হুমায়ূন শাহ মুহম্মদকে গজনী রক্ষার জন্য পাঠালেন এবং আকবরের কাছে এক পত্র পাঠিয়ে তিনি তাঁর পরাজয়ের সংবাদ দিলেন। এরপর হুমায়ূন কোহমর্দ হয়ে অগ্রসর হলেন। সৌভাগ্যবশত, পথিমধ্যে কিছু ঘোড়া ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২,০০০ ঘোড়া এই মর্মে ধারে পাওয়া গেল যে, শত্রুদের উপর বিজয় লাভের পর তাদের অর্থ পরিশোধ করে দেওয়া হবে।[২] এ থেকে হুমায়ূন বড় সহায়তা পেলেন। হুমায়ূন অগ্রসর হলেন। খনজন নামক গ্রামের কাছে হিন্দালের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এখান থেকে তাঁরা সদলবলে অগ্রসর হয়ে অন্দরাব পৌঁছালেন। এইভাবে তিনমাস এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে কেটে গেল।

কামরানের তৃতীয় বার কাবুল অধিকার

কিবচাকের যুদ্ধের পর কামরানের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিজয়ের পর আহত করাচা খাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হল। কামরান তাঁকে খুব আদর করলেন। এরপর কোলাবের বাবা বেগ এসে হুমায়ূনের আহত হওয়ার খবর জানাল। কামরান এতে খুব প্রসন্ন হলেন। তিনি এখান থেকে অগ্রসর হলেন।

---

১. রেশম অথবা সুতির লবাদা যাতে তুলো ভর্তি থাকে। এ খুবই মজবুত হয়ে থাকে। এমনই মজবুত যে, তরবারির প্রচণ্ড আঘাতেই মাত্র তা কাটতে পারে। জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৩৯, পাদটীকা।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৯৯ ; বায়েজিদ পৃ. ১৩১ ও জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৪২-এ ঘোড়ার সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্নতা আছে। জওহর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, প্রথমে ৩০০ ও পরে ১৭০০ ঘোড়া। অর্থাৎ ২,০০০ ঘোড়া তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়। আবুল ফজলের মতে, এই ঘোড়াগুলোর মূল্য চারগুণ পাঁচগুণ নির্দিষ্ট করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিকারান নামক স্থানে এক ব্যক্তি হুমায়ূনের রক্তমাখা জীবা এনে কামরানকে দিল। এতে কামরানের স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল যে, হুমায়ূন নিহত হয়েছেন। তিনি এবার নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে কাবুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি বহু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হুমায়ূনের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে তাদের নিজের পক্ষে টেনে নিলেন। কাবুলের গভর্নর কাসিম খাঁ বরলাস প্রথমে তো একথা বিশ্বাসই করেননি ; কিন্তু হুমায়ূনের রক্তমাখা জীবা দেখে তাঁরও বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হুমায়ূন নিহত হয়েছেন। অবশেষে, দুর্গ তিনি কামরানের হাতে তুলে দিলেন।[১]

কামরান কাবুলে সঞ্চিত হুমায়ূনের সমস্ত কোষ অধিকার করে নিলেন এবং তাঁর সমস্ত প্রধান কর্মকর্তাদের বন্দি করে নিলেন। দীওয়ান খ্বাজা সুলতান আলীকেও বন্দি করা হল এবং তাঁর বাসভবনও কামরান অধিকার করে নিলেন। হুমায়ূনের সহকারীদের শাস্তি দিয়ে তাদের আতঙ্কিত করে তোলা হল। আকবরকেও বন্দি করা হল। এইভাবে কামরান কাবুলের উপর তাঁর প্রভুত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। তারপর, তিনি তাঁর নিজের লোকেদের জায়গীর প্রদান করলেন। আসকারিকে জুয়েশাহি, করাচা খাঁকে গজনী ও ইয়াসিন এবং দৌলত খাঁকে গুরবন্দ ও তার সংলগ্ন স্থানগুলো দেওয়া হল।[২]

পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য শপথ গ্রহণ

AMARBOI.COM

ভারতে নির্বাসিত হওয়ার পর হুমায়ূনকে কোনো বাইরের শত্রুর সাথে নয় ; বরং তার আপন ভাই বিশেষত, কামরানের সাথে যুদ্ধ করতে হল। কামরান তাঁর ভাগ্যের জন্য এক কলঙ্কে পরিণত হয়েছিলেন। এই পারস্পরিক সংঘর্ষে খুব কম সংখ্যক আমীরকেই মাত্র বিশ্বাস করা যেতে পারত। অধিকাংশ আমীর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কখনো বা কামরানের পক্ষে থাকতেন আবার কখনো বা হুমায়ূনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করতেন। হুমায়ূনের একান্ত অনুগত আমীররা এ দেখে বড়ই কষ্ট পেতেন যে, তাঁরা অনেক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-কাঠিন্য সত্ত্বেও এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কামরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, কিন্তু বন্দি হওয়ার পর কামরান ক্ষমা চেয়ে নিতেন আর দুই ভাই পুনরায় মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতেন। কিছুদিন পর কামরান পুনরায় বিদ্রোহ করতেন এবং এইভাবে আবার সংঘর্ষ চলতে থাকত।

হুমায়ূন তাঁর আমীরদের বিশ্বাসঘাতকতা রোধ করার জন্য তাঁদের শপথ গ্রহণ করার এবং প্রতিজ্ঞা করার জন্য বললেন, যাতে তাঁরা আর ধোঁকা না দিতে পারেন। হাজী মুহম্মদ খাঁ হুমায়ূনের কথা শুনে বললেন যে, হুমায়ূন ও তাঁর সেবকদের সম্পর্ক স্থির করার জন্য বাদশাহেরও প্রতিজ্ঞা করা একান্ত আবশ্যক

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৪৫।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কোনো কাজ-কথা বললে তাঁকে তা স্বীকার করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। এ পরামর্শ হিন্দালের পছন্দ হল না এবং তিনি বললেন যে, বাদশাহের মান-প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার দৃষ্টিতে এ ঠিক নয়, কিন্তু হুমায়ূন তা মেনে নিলেন। হুমায়ূন ও তাঁর আমীরগণ পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য শপথ গ্রহণ করলেন।[১]

হুমায়ূন ও তাঁর আমীরদের এমন নাটকীয়ভাবে শপথ গ্রহণের ঘটনা কয়েকটি দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হুমায়ূন ও তাঁর আমীরদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিশ্বাস ছিল না। আমীরদের বিশ্বাসঘাতকতায় হুমায়ূন পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাথেই হুমায়ূনের দয়ার নীতির কারণে আমিররা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তাঁরা একে অন্যকে শপথের পবিত্র বাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছিলেন।[২] হুমায়ূন কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই নিজেকে সীমিত করে নিয়েছিলেন[৩]—এ মন্তব্য সত্য নয়। বাস্তবে, এর চেয়েও অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মতভেদ অবস্থায় হুমায়ূন ও আমীরদের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কি-না, তা বলা সহজ নয়। আমীররা ভবিষ্যতে এই শপথের কোনো গুরুত্ব দেন নি। এইভাবে কেবল তাৎক্ষণিক গুরুত্ব লাভ করে।

হুমায়ূনের তৃতীয়বার কাবুল অধিকার

AMARBOI.COM

কামরান কাবুল অধিকার করে নিয়েছিলেন। হুমায়ূনের জন্য কামরানকে পরাজিত করা ও অন্যান্য স্থান পুনরাধিকার করা আবশ্যক ছিল। তিনমাসের মধ্যে হুমায়ূন তাঁর প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং অন্দরাব থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি উশতুর-করাম-এর সমীপে গিয়ে পৌঁছালেন। কামরান সসৈন্যে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হুমায়ূন যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি মীর শাহ সুলতানকে দূত করে শান্তি-বার্তার জন্য কামরানের কাছে পাঠালেন। এই সময়ে কামরান ভাল অবস্থায় ছিলেন। তিনি শর্ত দিলেন কাবুল তাঁর অধিকারে এবং কান্দাহার হুমায়ূনের অধিকারে থাকুক। হুমায়ূন পুনরায় এই প্রস্তাব পাঠালেন যে, কাবুল আকবরকে

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০২।

১. "The great Amirs did not displace the monarch, but placed restraints upon his power. This led necessarily, to a standing council which had not everything else been adverse, might have proved the first step one element of a better Government." (আর্সকিন ২, পৃ. ৩৯০)।

২. "The Emperor hence forth found himself in a position which was at once stronger and less independent, he could rely upon the support of his nobles, but he had bound himself to respect their opinion in matters of importance." (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩০২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হোক এবং কামরানের কন্যাকে আকবরের সাথে বিয়ে দেওয়া হোক। কামরান এ প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য রাজি ছিলেন কিন্তু কামরানের আমীররা দুই ভাইয়ের মধ্যে শান্তি চাচ্ছিলেন না। তাঁরা এই সন্ধির বিরোধিতা করলেন। করাচা খাঁ তো আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত জোরের সাথে বললেন, তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন কাবুলের উপর হুমায়ূনের অধিকার স্বীকার করবেন না।[১] এইভাবে শান্তি প্রয়াসও ব্যর্থ হল। সন্ধি-বার্তার ব্যর্থতার পর কামরানের সৈন্যদের মধ্যেকার কয়েকজন আমীর পালিয়ে হুমায়ূনের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিলেন। এঁদের মাধ্যমে হুমায়ূন কামরানের অবস্থা জানতে পারলেন। উশতুর করাম[২] নামক স্থানে দু'পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল। এতে করাচা খাঁ কামরানের পক্ষ হয়ে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন কিন্তু তিনি গুলি খেয়ে আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরা হল এবং সেখানেই হত্যা করা হল। কামরানের বহু সৈনিক মারা পড়ল এবং তাঁর সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল।[৩] কামরানকে বেশ বদল করে কয়েকজন সৈন্যসহ পালিয়ে যেতে হল। হুমায়ূনের সৈন্যদের দ্বারা আসকারি বন্দি হলেন। কামরানের সৈন্যদের ফেলে যাওয়া বহু রসদসামগ্রী হুমায়ূনের সৈন্যদের হাতে এসে গেল।

হুমায়ূন কাবুলে প্রবেশ করলেন। এখানে আকবরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁকে সুরক্ষিত দেখে হুমায়ূন খুব প্রসন্ন হলেন। কামরান আকবরের উপর কোনো অত্যাচার করেন নি। এই খুশিতে হুমায়ূন দীনহীন ও নিঃস্বদের মধ্যে ধন বণ্টন করলেন। এই সময়ে হুমায়ূন তাঁর বইয়ের সিন্দুকগুলো পেয়ে গেলেন, যেগুলো কিবচাকের যুদ্ধে খোয়া গিয়েছিল। এগুলো পেয়ে হুমায়ূন যারপরনাই খুশি ও আনন্দিত হলেন। এ থেকে তাঁর পুস্তক-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কাবুল অধিকার করার পর হুমায়ূন বিভিন্ন ব্যক্তিকে জায়গীর ও পুরস্কার প্রদান করলেন। আকবর চীর্খ নামক একটি গ্রাম লাভ করলেন যেটি লুহগুরের তুমানে অবস্থিত ছিল। সুলেমানকে বাদাখশানে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হল কিন্তু তাঁর পুত্র ইব্রাহীমকে রাখা হল এবং আকবরের সৎ-বোন বখশী বানুর সাথে তাঁর বাগদান হল।[৪] হাজী মুহম্মদকে দরেখানা (মহলের প্রধান আধিকারিক) নিযুক্ত করা হল।

উশতুর করামের পরাজয়ের পর কামরান কেবল আট সাথীর সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আফগানরা পথিমধ্যে তাঁর জিনিসপত্র লুট করে নিল। পালানোর সুবিধার জন্য কামরান তাঁর চুল ও দাড়ি মুণ্ডন করে নিলেন এবং এক সর্বত্যাগী

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৩, করাচা খাঁ বলেন, "সরে মা ব কাবুল।"
২. পন্‌জশির নদীর কাছে গিরিপথ। একে উশতুর গিরারও বলা হয়েছে।
৩. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৯৬, আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৩-৩০৪ ; জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৪৭।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিরের বেশে মন্দরাবর পৌঁছালেন।[১] সৌভাগ্যবশত, সেখানে তিনি ১৫,০০০ সৈন্য একত্রিত করতে সমর্থ হলেন। তিনি পুনরায় তাঁর পুরাতন নীতির ভিত্তিতে হুমায়ূনের বহুসংখ্যক আমীরকে নিজের পক্ষে টানার প্রয়াস চালালেন। কামরান সসৈন্যে কাবুলের আশপাশের এলাকাগুলোতে চক্কর লাগিয়ে ফিরছিলেন। হুমায়ূন বাহাদুর খাঁ ও মহম্মদ কুলি বরলাসের নেতৃত্বে তাঁর পিছু ধাওয়া করার জন্য একটি বাহিনী পাঠালেন। মোকাবিলা করা অসম্ভব দেখে কামরান পালিয়ে গেলেন। এখান থেকে পালিয়ে তিনি আফগানিস্তানে আশ্রয় নিলেন। হুমায়ূনের সৈন্যরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে কাবুলে ফিরে এলো।

আসকারির নির্বাসন

কামরান থেকে মুক্তি পেয়ে হুমায়ূন বাদাখশানের শাসক মির্জা সুলেমানকে নিজের পক্ষে টানার প্রয়াস চালালেন। তিনি তাঁর কাছে তাঁর কন্যা শাহজাদী খানমের সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন যাতে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়াতে বাদাখশানের দিক থেকে তাঁর হৃদয় শান্ত হয়ে যায়। সুলেমান মির্জার স্ত্রী হরম বেগম প্রারম্ভে সাধারণ দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানোতে অপ্রসন্ন হলেন কিন্তু পরে হুমায়ূনের এই আশ্বাস পেয়ে শান্ত হলেন যে, তাঁর মান-মর্যাদা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠানো হবে এবং তিনি স্বয়ং এসে নববধূকে নিয়ে যাবেন। তাঁর কন্যা তখনো ছোট ছিলেন, এজন্য বিয়ে কিছুদিনের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হল।[২]

আসকারি বন্দিরূপে হুমায়ূনের কাছে ছিলেন, কিন্তু কত দিন যাবত তাঁকে এইভাবে রাখা যাবে— তা এক কঠিন প্রশ্ন ছিল। তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রকারের আনুগত্যের আশা করাটা ছিল অর্থহীন। হুমায়ূন আসকারিকে বাদাখশানে পাঠিয়ে দিলেন (১৫৫১ খ্রি.) এবং তাঁর প্রার্থনা মতে তাঁকে হজ্বে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সুলেমানকে বাদাখশানের পথ ধরে, আসকারিকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হল। আসকারি মক্কা-মদীনায় চলে গেলেন এবং সেখানে ১৫৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

কামরানের ন্যায় আসকারিও হুমায়ূনকে বড়ই কষ্ট দিয়েছিলেন। গুজরাত বিজয়ের পর হুমায়ূন তাঁকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু নিজের মূর্খতার কারণে তা তিনি হারিয়ে বসেন। বাংলা অভিযান থেকে ফেরার সময়ে

---

১. জালালাবাদ থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৭।

২. ব্যানার্জি হুমায়ূন, ২, পৃ. ১৯৬ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৭ ; বায়েজিদ, পৃ. ১৪১-৪৪ এ সম্পর্কিত ঘটনা বেশ বড় করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. আকবরনামা, ১, প. ৩০৮ ; ফিরিশতার মতে, আরবের পথে (৯৬১ হি. ১৫৫৩-৫৪ খ্রি.) আসকারি মৃত্যুবরণ করেন। আবুল ফজলের প্রদত্ত তারিখ সঠিক। তাঁর এক কন্যা ছিলেন। আকবর তাঁকে ইউসুফ খাঁ মাশহাদির সাথে বিয়ে দেন। ব্রিগস, ২, পৃ. ১৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি হুমায়ূনকে ভাল সহায়তা দিয়েছিলেন। চৌসা এবং কনৌজের পরাজয়ের পর তিনি পঞ্জাবেই হুমায়ূনকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরই ভয়ে হুমায়ূনকে ইরানে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কান্দাহার দুর্গ হুমায়ূন তাঁর কাছ থেকেই অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর বারবার বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও হুমায়ূন তাঁকে বারবার ক্ষমা করতে থাকেন। অবশেষে, নিরুপায় হয়ে তাঁকে বহিষ্কার করতে হয়। তিনি দয়ালু এবং সভ্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হুমায়ূনের সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আকবরের প্রতি তিনি কখনোই খারাপ ব্যবহার করেন নি।

হিন্দালের মৃত্যু

কামরান জালালাবাদ থেকে বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত চারবাগ দুর্গ অবরোধ করলেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ূন তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। কামরান পালিয়ে পেশোয়ারে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে, কামরান হাজী মুহম্মদকে নিজের পক্ষে টানার প্রয়াস চালালেন। সৌভাগ্যবশত, বৈরাম খাঁ কান্দাহার থেকে কাবুলে আসার সময়ে গজনীতে হাজী মুহম্মদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে হুমায়ূনের পক্ষে করে নিলেন। ইতিমধ্যে কামরান ভিন্ন পথ ধরে কাবুলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্গরক্ষকের সতর্ক থাকার খবর পেয়ে আক্রমণের চিন্তা ত্যাগ করে তিনি লামগান অভিমুখে পালিয়ে গেলেন। হুমায়ূন লামগান পর্যন্ত কামরানের পিছু ধাওয়া করলেন। ওখান থেকে তিনি বৈরাম খাঁকে পাঠালেন কামরানকে ধাওয়া করার জন্য। কামরানকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে সিন্ধু নদের অপর পারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল।

হুমায়ূন ইতিমধ্যে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর আমীরদের মধ্যে হাজী মুহম্মদ খাঁ ও শাহ মুহম্মদ এখনও বিশ্বাসঘাতকতার ধান্দায় লিপ্ত রয়েছে। এ দুই ভাই যোগ্য সৈনিক ছিলেন কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসের অযোগ্য। হুমায়ূন এঁদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এঁদের উপর ১০২ অভিযোগ দায়ের করা হল এবং এঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।[১] এই দণ্ড থেকে স্পষ্ট যে, হুমায়ূন তাঁর দয়ালুতা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। কাবুল নিবাসের সময় আবুল মালী হুমায়ূনের ব্যক্তিত্ব ও গুণে প্রভাবিত হয়ে নিজেকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। পরে আবুল মালী খুবই প্রসিদ্ধ আমীর হয়ে ওঠেন। হুমায়ূন এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজালেন, এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে জায়গীর বিতরণ করলেন। এইভাবে বৈরাম খাঁকে কান্দাহার, হিন্দালকে গজনী, গিরদিজ, বংগস ও লুহুগুর প্রদান করা হল। কুন্দুজকে যৌথভাবে মীর বরকা ও মির্জা হাসানকে দেওয়া হল। এইভাবে অন্য

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩০৯-১১। জওহর এ ঘটনা কামরানের অন্ধ করে দেওয়ার পরের বলে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীরদেরও জায়গীর দেওয়া হল। খাজা গাজীকে ইরানে দূত করে পাঠানো হল।[১]

১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে কাবুলের কাছে কামরানকে সসৈন্যে একবার দেখা গেল, কিন্তু নিকটস্থ লোকেদের দিক থেকে কোনো প্রকারের সাহায্যের আশা না দেখে তিনি খুবই নিরাশ হলেন। হুমায়ূন তৎক্ষণাৎ তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। হিন্দাল সিয়াহ্‌আব নদীর তটে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। কামরান তাঁর উপর রাতের আঁধারে অকস্মাৎ আক্রমণ চালালেন, যার ফলে তাঁর বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হল। হুমায়ূন অগ্রসর হলেন এবং জালালাবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে জিরইয়ার[২] এ শিবির ফেলে, পরিখা খনন করে নিজের অবস্থান মজবুত করে নিলেন। ২৩ নভেম্বর ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে আফগান সৈনিকদের সাথে নিয়ে কামরান হুমায়ূনের শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। আঁধার রাতে শত্রু-মিত্র নিরূপণ করা কঠিন ছিল। এই যুদ্ধে লড়তে লড়তে হিন্দাল আফগানদের হাতে নিহত হলেন।[৩] সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর।

যুদ্ধের পর হুমায়ূন হিন্দালের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু এই দুঃখদায়ক সংবাদটি হুমায়ূনকে দেয়ার সাহস কারোরই ছিল না। হুমায়ূন চিৎকার করে হিন্দালকে ডাকলেন কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পরে আবদুল হাই একটি দোঁহার[৪] মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর জানালেন। হুমায়ূন এ সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখ পেলেন। পরে হিন্দালের আংটি হুমায়ূনের সামনে নিয়ে আসা হল। তা দেখামাত্রই হুমায়ূন শোকাবেগে তাঁর সাফা খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। হিন্দালকে প্রথমে জুয়েশাহিতে দাফন করা হল। পরে তাঁর লাশ কাবুলে এনে বাবুরের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫] তাঁর জায়গীর ও তাঁর সাথে সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হুমায়ূন আকবরকে কাবুলে পাঠালেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল তিনি যেন ওখান থেকে গজনী চলে যান। হুমায়ূন স্বয়ং ১৫৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে, শীতভর বেহসুদে অবস্থান করলেন।

হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের পর হিন্দাল আলোয়ারের জায়গীর লাভ করেছিলেন। তিনি হুমায়ূনের সাথে বাংলা অভিযানে গিয়েছিলেন, কিন্তু হুমায়ূনকে ওখানেই ত্যাগ করে আগ্রায় ফিরে এসে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩১১।

২. কাবুল নদীর দক্ষিণে ছোট একটি গ্রাম।

৩. জওহর স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৪৮-৪৯ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩১৩ ; বায়েজিদ, পৃ. ১৪৬-৪৭ ; গুলবদন বেগম (হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৯৮-৯৯) তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন।

৪. দুই পদ-বিশিষ্ট কবিতাকে দোঁহা বলে। এ কবিতায় দুই ছত্রের মধ্যেই সমস্ত ভাবের প্রকাশ ঘটানো হয়। —অনুবাদক।

৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩১৪ ; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ১৯৯ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের নির্বাসনের সময়ে তিনি তাঁর সাথে কিছুদিন সিন্ধুতে থাকেন। হামিদা বানুর সাথে হুমায়ূনের বিয়ের পর তিনি কান্দাহারে চলে গিয়েছিলেন।

হুমায়ূনের ইরান থেকে ফেরার পর তিনি পুনরায় তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর সাথে প্রায় ৬ বছর (১৫৪৫-৫১ খ্রি.) থাকেন এবং তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তিন ভাইয়ের মধ্যে হিন্দালই হুমায়ূনকে সবচেয়ে কম কষ্ট দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কাবুলে শোকের ছায়া নেমে আসে। গুলবদন বেগমের ভাষায় সেখানকার দেওয়াল-প্রাচীর-দরজা-জানালাগুলোও তাঁর জন্য শোকাশ্রু বিসর্জন করেছিল। তাঁর বোন গুলচেহরা বেগম কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যান।[১]

কামরান মির্জা, এই যুদ্ধের পর, যে যুদ্ধে হিন্দাল মারা গিয়েছিলেন, পালিয়ে আফগানদের আশ্রয়ে চলে গেলেন। এখানকার লোকেরা তাঁকে সাহায্য করল। প্রত্যেক গোত্র ও ভূস্বামী কামরানকে এক সপ্তাহ করে নিজের কাছে রাখতেন এবং কামরান সেখান থেকে আবার অন্যত্র চলে যেতেন। এর ফলে, কামরানকে পাকড়ানো হুমায়ূনের পক্ষে সহজ ছিল না। শীতভর হুমায়ূন বেহসুদ (হাজারা প্রদেশ)-এ পড়ে রইলেন। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে তিনি কামরানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। কামরানের দুই সৈনিক ধরা পড়ল, যাদের মাধ্যমে কামরানের নিবাসের সন্ধান পাওয়া গেল। হুমায়ূন আক্রমণ হানলেন। আফগান সৈনিকদের সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ ছিল। যুদ্ধে কামরান পরাজিত হলেন এবং আফগানরা বহুসংখ্যক জানোয়ার ফেলে পালিয়ে যাওয়ার ফলে তা হুমায়ূনের অধিকারে এসে গেল। আফগান গোত্রগুলোর কামরানকে সহযোগিতার কথা জানতে পেয়ে হুমায়ূন সৈন্য পাঠিয়ে তাদের গ্রামগুলো নষ্টভ্রষ্ট করার আদেশ দিলেন এবং তাদের মহিলাদের বন্দি করা হল, হুমায়ূনের সৈন্যরা কামরানের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে গেল, কিন্তু রাত্রি নেমে আসার কারণে কামরানকে ধরতে পারল না। তার স্থলে লোকেরা বেগ মুলুককে ধরল যে সর্বক্ষণই কামরানের সাথে সাথে থাকত। আফগানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল এবং তারা যখন বুঝতে পারল যে, এ সবই কামরানকে আশ্রয় দেয়ার কারণেই ঘটছে, তখন তারা কামরানকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিল।[২]

ইসলাম শাহের দরবারে কামরান

আফগানদের দিক থেকে কোনো প্রকারের সাহায্যের আশা না পেয়ে কামরান ভারতের সূরবংশীয় শাসক ইসলাম শাহের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই

---

১. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২০০।

২. জওহর স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৫০ ; আকবরনামা. ১, পৃ. ৩২০-২১ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, ২০২-২০৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে ইসলাম শাহ চিনাব নদের তটে বন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। কামরান খাইবার গিরিপথের কাছ থেকে বুদাগ খাঁকে ইসলাম শাহের কাছে পাঠালেন। সূর শাসক তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং কামরানকে জানালেন যে, তিনি ঐ এলাকাতেই অবস্থান করুন, কেননা, তাঁর কাছে সেনা প্রেরণ এবং তার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দূত মির্জার কাছে ফেরার আগেই কামরান আলী মুহম্মদ আস্পকেও ইসলাম শাহের কাছে পাঠালেন। যখন তিনি বনের কাছে পৌঁছালেন তখন ইসলাম শাহ তাঁর পুত্র আওয়াজ খাঁকে কয়েক আমীরসহ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য পাঠালেন।[১]

কামরান যখন ইসলাম শাহের সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। অভিবাদন জানাতে দেরি করতে দেখে এক আফগান তাঁর ঘাড় ধরে কুর্নিশ করতে বাধ্য করালেন। দরবারে তাঁর প্রবেশ করার পর এক আমীর চিৎকার করে বললেন,—"বাদশাহ সালামত, কাবুলের মুকদ্দমের পুত্রের উপর একটু অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, যিনি আপনার আশির্বাদ নেওয়ার জন্য এসেছেন।" ইসলাম শাহ প্রথমে এ কথার প্রতি মনোযোগ দেন নি। যখন পর পর তিনবার কামরানের আগমনের বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে জানান দেওয়া হল, তখন তিনি তাঁর প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রাজ-শিবিরের কাছে কামরানের তাঁবু বসানো হল এবং তাঁকে একটি ঘোড়া, বস্ত্র, দাস ও একটি হিজড়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল। এ সমস্ত বস্তুতে কামরান অত্যধিক নিরাশ হলেন।[২]

পরেও কামরানের সাথে রাজকীয় ব্যবহার করা হল না। বহুসংখ্যক লোক তাঁকে উপহাস করতেন। কিছু লোক কামরানের দরবারে প্রবেশ করার সাথে সাথে "ময়ূর এসেছে, ময়ূর এসেছে" বলে চিৎকার করে মজা করতেন। কামরান তাঁর সেববকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কামরান অসন্তুষ্ট তো ছিলেনই ; তিনি সক্রোধে জবাব দিলেন, "তবে তো ইসলাম শাহ প্রথম শ্রেণীর ময়ূর এবং শেরশাহ তাঁর চেয়ে বড় ময়ূর।" কামরানের এ ক্রোধ দেখে ইসলাম শাহ আদেশ দিলেন মির্জার সাথে যেন এ ধরনের মজা না করা হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে কবিতারও চর্চা হত এবং কখনো বা তা রসিকতা ছাড়িয়ে বেরসিকতারও সূচনা করত। বদায়ূনী

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩২৫, বদায়ূনীর মতে, হেমুও, যিনি হুমায়ূনের মৃত্যুর পর কিছু সময়ের জন্য দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁকে আফগান সৈনিকদের সাথে পাঠানো হয়। মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৩৮৯। কামরান এই অভ্যর্থনায় খুশি হলেন না এবং তিনি বুদাগকে, যিনি ইসলাম শাহের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণের জন্য প্রোৎসাহিত করেছিলেন, তাঁকে একান্তে ভর্ৎসনা করলেন।

২. আর্সকিন, ২, পৃ. ৪০৮-৪০৯ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩১৬-১৭ ; রায়, সাকসেসার্স অব শেরশাহ, পৃ. ৩৭-৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন, এই ধরনের একটি শায়র শুনে ইসলাম শাহ খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি কামরানকে বন্দি করার আদেশ দেন।[১]

পঞ্জাব সমস্যা সমাধানের পর ইসলাম শাহ দিল্লি ফিরে গেলেন এবং তাঁর সাথে কামরানকে বন্দির ন্যায় নিয়ে যাওয়া হল। কামরান এই পরিস্থিতিতে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জোগী খাঁ নামক তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে মাছিওয়াড়ার নিকটবর্তী রাজা বকখু নামক এক ভূস্বামীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। একদিন রাত্রে তিনি মহিলার বেশ ধরে বোরকা পরে পালিয়ে গেলেন। ঘোড়া ব্যবসায়ীদের সাথে তিনি গকখরদের দেশে চলে গেলেন। গকখর দলপতি সুলতান আদম তখনও হুমায়ূনের প্রতি অনুগত ছিলেন। এজন্য তিনি মির্জাকে সাহায্য দিতে রাজি হলেন না। তিনি কামরানের উপর পাহারা বসিয়ে দিয়ে হুমায়ূনকে জানিয়ে দিলেন।[২]

ইসলাম শাহ কামরানের সাথে সদ্ব্যবহার কেন করলেন না ? প্রয়োজনমতো তিনি তাঁকে আপন পক্ষে টেনে নিয়ে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কামরানের সাথে এমন ব্যবহার করলেন যাতে কামরান অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁর হাত থেকে পালিয়ে গেলেন। ইসলাম শাহের এই ব্যবহার ছিল কিছুটা কামরানের উদ্দণ্ড প্রকৃতির কারণে আর কিছুটা ছিল সিন্ধুকে তাঁর এবং মোগলদের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করে নেওয়া। তিনি সিন্ধুনদের ওপারের রাজনীতির প্রতি তখন মনোযোগী হতেন না, যতক্ষণ না তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব না ফেলত।

কামরানের মতো বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে সাহায্য দিয়ে তিনি ব্যর্থ সংঘর্ষ চাচ্ছিলেন না। গুলবদন বেগমের বর্ণনা যদি বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে তিনি সম্ভবত কামরানের মতো ব্যক্তিকে, যিনি তাঁর ভাইদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন আর যিনি তাঁর এক ভাইকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এমন ব্যক্তিকে তিনি কোনো প্রকারের সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।[৩]

১. বদায়ুনী, ১ পৃঃ ৩৯০, শায়রটি এই রকম ছিল :

গর্দিশে গরদূনে গরদান গরদ না রা দর্গ কর্দ
বর সরে আহলে তমীজা ওয়া নাকি সারা মর্দ কর্দ
ললাট লিখন এমন সে যে শ্রেষ্ঠ জনকে মাটিতে মেশায়।
যোগ্যদেরই মাথার উপর অযোগ্যদের বসিয়ে দেয়।—অনুবাদক।

কামরানের মুণ্ডিত মস্তক দেখে ইসলাম শাহ রসিকতা করে বললেন, "আপনাদের মহিলারা কী আপনার মতো মস্তক মুণ্ডন করেন ?" কামরান সাথে সাথে জবাব দিলেন, "তারা আফগান শাসকদের মতো গোঁফ রাখে।" "ব্যানার্জি হুমায়ূন, ২ পৃঃ ২০৪-২০৫ পাদটীকা ৪। দুটি কবিতার বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, তারীখে দাউদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৪৯৮।

২. আকবারনামা ১, পৃ. ৩২৬।

৩. হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরানের পতন

সুলতান আদম গকখরের কাছ থেকে খবর পেয়ে হুমায়ূন সিন্ধু নদ পেরিয়ে গকখর ভূমিতে প্রবেশ করলেন। হুমায়ূনের সাথে বিশাল বাহিনী দেখে প্রথমে আদম গকখর আশঙ্কা করেছিলেন তিনি হয়তো তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে আসছেন। কিন্তু মুনিম খাঁ যখন তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, হুমায়ূনের উদ্দেশ্য অসৎ নয়, তখন আদম পরহাল নামক স্থানে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কামরান হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত হতে টালবাহানা করতে চাইলেন কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করা হল।[১]

এতটা বিরোধিতা করা সত্ত্বেও হুমায়ূন কামরানকে তাঁর ডানদিকে বসালেন এবং আকবরকে বাম দিকে। কিছুক্ষণ পর তরমুজ আনা হল। একটি তরমুজ থেকে হুমায়ূন ও কামরান এবং অন্য তরমুজ থেকে আকবর ও আবুল মালী খেলেন। অন্য লোকেদের মধ্যেও তরমুজ বিতরণ করা হল। হুমায়ূন আদম গকখরের কাছ থেকে পান নিয়ে বিতরণ করলেন। এখান থেকে লোকেরা শিবিরে চলে গেলেন। সেখানে সভা আয়োজন করা হল। পুরো রাত সঙ্গীত, বাদ্য-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হল। পরবর্তী রাতটিও এইভাবে কেটে গেল। এমনভাবে আনন্দোৎসব করা হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল কামরানকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, কেননা আনন্দোৎসবে তিনিও অংশগ্রহণ করছিলেন।[২]

তৃতীয় দিনে সুলতান আদম গকখরের সম্মানে দাওয়াত করা হল। তাঁকে পতাকা ও কাড়া-নাকাড়া, যা রাজসিক চিহ্ন বলে গণ্য হত—প্রদান করা হল এবং তাঁকে বিদায় জানানো হল। দাওয়াতের পর কামরানের প্রশ্ন এলো। কামরানকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব জওহরের উপর অর্পণ করা হল।

কামরানের গ্রেফতারের পর হুমায়ূনের আমীরদের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশ লোক মনে করেছিলেন এমন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু স্বয়ং হুমায়ূন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কাজীরাও কামরানকে কঠোর দণ্ড দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, আমীররা হুমায়ূনের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি তাঁদের মত স্বীকার করে নেবেন। আমীরদের নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্ত ছিল যে, কামরানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। অনেক কষ্টে হুমায়ূন সবশেষে স্বীকৃতি দিলেন যে, কামরানকে অন্ধ করে দেওয়া হোক।[৩]

---

১. তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ১২৮; আকবরনামা, ১,পৃ. ৩২৭।
২. জওহর, স্টুয়াট, পৃ. ১৫২-৫৩।
৩. তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১২৮; হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২০১; বায়েজিদ, পৃ. ১৫৬-৫৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩২৭-২৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জওহর লিখেছেন, কামরান একদিন তাঁকে বললেন, তিনি রমজানের রোজা মাত্র দু'দিন রাখতে পেরেছেন। জওহরের মাধ্যমে তিনি প্রার্থনা জানালেন, অবশিষ্ট রোজাগুলো তাঁকে করতে দেওয়া হোক। কামরানের ধারণা ছিল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। জওহর তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁর নিরাশ হওয়া উচিত নয়, তিনি পুরো মাসই রমজানের রোজা রাখতে পারবেন কিন্তু কামরানের বিশ্বাস হল না।

কামরানকে অন্ধ করে দেওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আলী দোস্তকে। অনেক অপরাধ ও অন্যায়-অত্যাচার করা সত্ত্বেও কামরান মৃত্যুকে বড়ই ভয় করতেন। তিনি জওহরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কি হত্যা করা হবে ? জওহর উত্তর দিলেন, "পাদশাহীর স্বভাব পাদশাহীই জানেন।" আবুল ফজল লিখেছেন, তখন কামরান মনে করলেন তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে তাঁর দিকে দৌড়ে গেলেন। আলী দোস্ত বললেন, "মির্জা ধৈর্য ধারণ করো। হত্যার আদেশ নেই। এত উদ্বেগ কিসের ? এর আগে যেহেতু তুমি সৈয়দ আলী এবং অন্যান্য নিরপরাধ লোকেদের অন্ধ করে দিয়েছিলে, সেহেতু তোমাকেও অন্ধ করে দেওয়া হবে।" কামরান একথা শুনে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন। তিনি শুয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে কাপড় ঠেসে দেওয়া হল। তাঁর চোখে পঞ্চাশ বার ক্ষুর চালানো হল। কিন্তু কামরান উফ পর্যন্ত করলেন না। এমন কি, যে লোকটি তাঁর হাঁটু চেপে বসে ছিল তাকে তিনি বললেন, "হাঁটুর উপরে তুমি কেন বসে আছো ? আমাকে অযথা কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ ?" তারপর, রক্তাপ্লুত দু'চোখের উপর লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হল। তিনি এ যন্ত্রণা সইতে না পেরে আল্লাহ আল্লাহ করে কাতরে উঠলেন। তিনি বললেন, তিনি যা কিছু করেছেন তার বদলা তিনি পেয়ে গেছেন।

জওহর, তিনি যে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, এ দৃশ্য দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না এবং কোনো অনুমতি ছাড়াই তিনি তাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন।

অন্ধ করে দেওয়ার পর কামরান কাবুলে, যেখানে তিনি শান-শওকতের সাথে রাজত্ব চালিয়েছিলেন, যেতে রাজি হলেন না। তিনি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে মক্কা যাওয়ার জন্য আদেশ প্রার্থনা করলেন। সিন্ধু নদের কাছে কামরান বিদায় নেওয়ার আগে হুমায়ূনের সাথে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই শর্তে তাঁকে মিলনের অনুমতি দেওয়া হল যে, কামরান এমন কোনো বেদনাদায়ক ভাব প্রকাশ করবেন না যাতে হুমায়ূনের কষ্ট হয়। কামরানের চোখের উপর রুমাল বেঁধে দিয়ে তাঁকে হুমায়ূনের সামনে নিয়ে আসা হল। তাঁকে দেখে হুমায়ূন অশ্রু

---

১. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৫৪-৫৫; তাঁর চোখে অস্ত্র প্রয়োগের তারিখ আবুল ফজলের মতে, ৯৬০ হিজরির শেষে (নভেম্বর, ১৫৫৩ খ্রি.) আর্সকিন জওহরের এই বাক্যের ভিত্তিতে যে, রমজান মাস ছ'দিন পেরিয়েছিল ; ৯৬০ হি. (১৭ আগস্ট ১৫৫৩) নিশ্চিত করেন। আকবরনামা, ১, পৃ. ৩২৮-৩১ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ৪১৩।

২. পৃ. ৩২৮-৩১; আর্সকিন, ২. পৃ. ৪১৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোধ করতে পারলেন না, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে কামরান নিজেকে অবরুদ্ধ রাখলেন।[১] কামরান হুমায়ূনের প্রতি শুভেচ্ছাস্বরূপ একটি কবিতা পড়লেন এবং তিনি বললেন, তাঁর উপর যা কিছু ঘটে গেছে এসব তাঁর কৃতকর্মেরই পরিণাম। হুমায়ূন অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে কামরানকে বললেন, যা কিছু হয়েছে তার জন্য তিনি লজ্জিত কিন্তু তিনি স্বয়ং এজন্য দায়ী নন। হুমায়ূন কামরানের সাথে কুরআনের প্রথম অধ্যায় পাঠ করলেন। কামরান হুমায়ূনের কাছে প্রার্থনা জানালেন, তাঁর পরিবার-পরিজন ও আশ্রিতদের দেখভাল যেন তিনি করেন। হুমায়ূনের চলে যাওয়ার পর কামরান কান্নায় ভেঙে পড়লেন ।[২]

কামরানের বিদায়ের দৃশ্য ছিল এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা। জীবনে যিনি ভাইকে ভাই বলে মনে করেননি আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হননি, আজ সেই কামরান তাঁর নিজের ভাগ্যের পরিণতির জন্য বিলাপ করছিলেন। তাঁর অনেক সেবকের মধ্যে একমাত্র চিলমা কোকা[৩] তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর সবচেয়ে উচ্চাদর্শ স্থাপন করলেন তাঁর পত্নী চোচক বেগম। তিনি তাঁর অন্ধ স্বামীর সাথে নির্বাসনে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কা যাওয়ার সময় তিনি থাট্টা থেকে যাত্রা করলেন। সেখানে বেগমের পিতা শাহ হুসেন তাঁকে না যাওয়ার জন্য বললেন, কিন্তু তাতে তিনি নিবৃত্ত হলেন না। তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি আমাকে যখন মির্জার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সে সময়ে মির্জা অন্ধ ছিলেন না। এখন যদি আমি তাঁকে ত্যাগ করি তাহলে দুনিয়ার লোকে বলবে শাহের কন্যা তার স্বামীর দুর্দিনে তাঁকে ত্যাগ করেছিল। এতে আমার নামে কলঙ্ক লাগবে।"[৪] এই বলে তিনি কামরানের সাথে নৌকায় তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন।

কামরান এখান থেকে মক্কায় চলে যান এবং ওখানেই ৫ অক্টোবর ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৫]

কামরান চরিত্রের সিংহাবলোকন

হুমায়ূনের দুঃখ দুর্ভোগের সবচেয়ে বড় কারণ ছিলেন কামরান। প্রায় ২০ বছর যাবত তিনি হুমায়ূনের সাথে যুদ্ধ করেন। নির্বাসন কালে তো হুমায়ূনের পুরো সময়টাই কামরানের সাথে যুদ্ধ করেই অতিবাহিত হয়েছে।

---

১. ব্যানার্জি হুমায়ন, ২, পৃ. ২০৮।

২. বায়েজিদ, পৃ. ১৫৯ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩০-৩১।

৩. ইনি মির্জা কামরানের কোকা হমদমের পুত্র ছিলেন। ইনি কামরানের মৃত্যুর পর হিঁদুস্তানে ফিরে আসেন। আকবরের আমলে তাঁকে খানে আলম উপাধি দেওয়া হয়। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস তিনি আফগানদের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন।

৪. তারীখে মাসুনী, পৃ. ৮৩।

৫. তবকাতে আকবরী, দে, ২. পৃ. ১২৯ ; পাদটীকা ২ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ৪১৯ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরান বাবুরের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে সর্বপ্রকারে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কামরানের মধ্যে কিছু গুণ ছিল যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে তিনি এক যোগ্য শাসক হতে পারতেন এবং জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারতেন। তিনি একজন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন এবং যুদ্ধে প্রাণ বাজি রাখতেও কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি বাবুরের আমলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরেও আফগান, ইরানী ও মধ্য এশিয়ার অনেক জাতির সাথে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাম মির্জা ও ইরানী সৈন্যদেরও পরাজিত করেন। তাঁর যুদ্ধের সময়কার ঘটনাবলীর অবলোকন থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কামরানের মধ্যে ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে নিজের পক্ষে টানার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এই কারণে আফগানরা তাঁকে মনে প্রাণে সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি বারবার কাবুল অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কামরান কবিও ছিলেন এবং ইসলাম শাহের দরবারে উভয়ের মধ্যে কবিতার লড়াইও চলেছিল। তারীখে দাউদীর লেখক আবদুল্লাহ লিখেছেন, কামরান মির্জা একজন উচ্চস্তরের কবি ছিলেন এবং ইসলাম শাহের সাথে তাঁর এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। প্রথম সাক্ষাতে কামরানের যোগ্যতার পরীক্ষা স্বরূপ ইসলাম শাহ তিনটি দোঁহা বলেন এবং কামরানকে তার সমীক্ষা করতে বলেন। কামরান তার উত্তরে বলেন, এর একটি দোঁহা ইরাকের কবির, দ্বিতীয়টি হিঁদুস্তানের কবির এবং তৃতীয়টি এক আফগান কবির রচনা। ইসলাম শাহ সবার সামনে কামরানের যোগ্যতার প্রশংসা করেন।[১]

এ থেকে কামরানের সাহিত্যিক যোগ্যতা ও অভিরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

কামরানের চরিত্রের এক মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায় আকবরের প্রতি তাঁর ব্যবহারে। আকবর কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কাছে থাকেন এবং এমন পরিস্থিতিতে যখন তাঁর পিতার সাথে তাঁর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছিল, তখন তিনি কখনোই আকবরকে হত্যা করার চেষ্টা করেননি। তিনি চাইলে আকবরকে যে কোনো সময়েই হত্যা করতে পারতেন। কেবল একবার তিনি আত্মরক্ষার জন্য কাবুল দুর্গের প্রাচীরের উপরে আকবরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, যার বর্ণনা আমরা আগেই দিয়েছি। তিনি হুমায়ূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্রের কোনো ক্ষয়ক্ষতির কথা তাঁর মনে জায়গা দেন নি।

কামরানের চরিত্রের কিছু বিশেষ দোষ স্পষ্টরূপে আমাদের সামনে আসে। তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তি ছিলেন এবং আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিচ হতেও নিচতর কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারতেন না এবং তাঁর অধিকাংশ কাজই ধোঁকা এবং প্রতারণায় পূর্ণ থাকত। হুমায়ূনের প্রতি বারবার ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

---

১. ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৪৯৮ ; কামরানের কবিতাবলীর একটি সংকলন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। দেখুন, মৌলবী আবদুল ওয়ালির প্রবন্ধ, ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী ; (১৯১৪ খ্রি.) পৃ. ২১৯-২৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরান ক্রূরও ছিলেন। কাবুলের অধিবাসীদের প্রতি তাঁর আচরণ তাঁর ক্রূরতার অন্যতম উদাহরণ। প্রারম্ভে তিনি মদকে ঘৃণার চোখে দেখতেন কিন্তু পরে তিনি মদ ধরেন এবং তা এক পর্যায়ে মাত্রাতিরিক্তও করে ফেলেন। কামরানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তিনি যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতেন এবং নিজের ভাইদের সহযোগিতা করে সূর বংশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তাহলে এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা সম্ভবত শেরশাহের শক্তিতে কুলাত না। দুই ভাইয়ের মধ্যেকার সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হানি ঘটে। এ সমস্ত কারণে কামরানকে হুমায়ূনের দুর্দৈব তাঁর দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে অভিহিত করলে মোটেও অত্যুক্তি হয় না।

এ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কামরানের চরিত্রের এমন একটি অভ্যন্তরীণ দিকের পরিচয় পাওয়া যায় যা থেকে তাঁর সহৃদয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হুমায়ূনের সামনে এলে তিনি এমন ব্যবহার করতেন যে, তা থেকে মনে হত তিনি হুমায়ূনকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু পরে সে শুভ-কামনা অশুভ কামনায় পরিণত হয়ে যেত।

কামরানের বিদায়ের ঘটনা হুমায়ূনকে উদ্বেলিত ও দুঃখিত করে তুলেছিল। তিনি বারবার অনুভব করতেন তাঁকে অন্ধ করে দিয়ে তিনি খুব বড় পাপ করেছেন। এই কারণে তাঁর কাবুলে পৌঁছানোর পর, মহিলারা কামরানের দণ্ড ও নির্বাসন উপলক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে তিনি পরম দুঃখ ও বেদনার সাথে বলেন, এ অভ্যর্থনার সময় নয়, কেননা, কামরানের চোখ সেলাই করাটা ছিল তাঁর নিজের চোখ সেলাই করার মতোই।[১] এজন্য কেউ তাঁকে দোষী ঠাউরে বসেন এই ভেবে তিনি কাশগড়ের শাসক আবদুর রশীদকেও পত্র লিখে এই ঘটনা জানিয়ে দেন।[২]

কামরানের নির্বাসন হুমায়ূনের জীবনের একটি যুগ সমাপ্তির দ্যোতক। ১৫ বছর ধরে যে সংঘর্ষ চলে আসছিল, তা শেষ হয়ে গেল। হুমায়ূনের ভবিষ্যত নির্মাণের এক অভ্যন্তরীণ বাধা শেষ হয়ে গেল।

কাশ্মীর বিজয়ের চিন্তা ও কাবুল প্রত্যাবর্তন

হুমায়ূন এবার জনজূহা গোত্রের ভূস্বামী বীরানার উপর আক্রমণ হানলেন যিনি কোনো শাসকের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। তিনি বীরত্বের সাথে লড়লেন, কিন্তু পরাজিত হলেন। আবুল ফজল লিখেছেন, এই যুদ্ধে মোগলদের পক্ষে খ্বাজা কাসিম মাহদী ও অন্য কিছু লোক শহীদ হয়ে গেলেন। আদম গকখরের অনুরোধে হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাঁর ভূমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।[৩]

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩২।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩২।
৩. তবকাতে আকবরী, দে, ২ পৃ. ১২৯ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩২৯ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৫৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে হুমায়ূন নিকটস্থ ভূস্বামী রাজা শঙ্করের পঞ্চাশটি গ্রাম লুট করলেন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বন্দি করলেন, তাদের ধন-সম্পত্তি লাভ করে তিনি তাদের মুক্ত করে দিলেন। এ থেকে সৈন্যরা যথেষ্ট পরিমাণে ধন লাভ করল।[১]

কাশ্মীর বিজয়ের পর হায়দার মির্জা হুমায়ূনকে সেখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়ে হুমায়ূন সেখানে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না, যার ফলে তিনি যেতে পারেন নি। তিনি এবার কাশ্মীর বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তাঁর সহায়ক আমীররা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হায়দার মির্জার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। আশঙ্কা ছিল হুমায়ূনের কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর আফগানদের পাহাড়ি পথগুলো বন্ধ করে দিয়ে হুমায়ূনের আক্রমণকারী সৈন্য ও কাবুলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়ার, যার ফলে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারত। মোগল সৈন্যদের সংখ্যা কম ছিল এবং বহুসংখ্যক আফগান রোহতাস দুর্গে একত্রিত হয়েছিল। হুমায়ূন কাশ্মীরে প্রবেশ করলেই তারা অতি সহজে পেছনে রক্ষা-পংক্তি ধ্বংস করে দিতে পারত। এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে আদম গকখরও কাশ্মীর আক্রমণ না করার পরামর্শ দিলেন। আমীররাও কাশ্মীরকে অন্ধ-কূপ ও বন্দিগৃহ বলে অভিহিত করে তার নিন্দা করলেন এবং কাশ্মীর অভিযানের বিরোধিতা করলেন। হুমায়ূনের কাছ থেকে আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত শুনে অধিকাংশ সৈনিক পালিয়ে কাবুল চলে গেল।[২]

হুমায়ূনকেও বাধ্য হয়ে কাবুলে ফিরে চলার আদেশ দিতে হল। কিছুদূর যাওয়ার পর কামরানের সাথে তাঁর শেষ বারের মতো সাক্ষাৎ হওয়ার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে তিনি সিন্ধু নদ পেরুলেন এবং বিকরাম দুর্গ (পেশোয়ার)-এর, যা আফগানরা নষ্টভ্রষ্ট করে দিয়েছিল, পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা হল। দুর্গে সিকান্দার খাঁ উজবেককে নিযুক্ত করে[৩] হুমায়ূন কাবুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন এবং ৯৬১ হিজরির শুরুতে (ডিসেম্বর ১৫৫৩ খ্রি.) সেখানে পৌছালেন।

---

১. জওহর স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৫৬।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩২৯-৩০ ; জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৫৭ ; তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ১২৯।

৩. তবকাতে আকবরী, দে, পৃ. ১২৯-৩০ জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৫৮; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩১-৩২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়
দ্বিতীয় রাজত্ব ও মৃত্যু

হুমায়ূনের প্রতি শেরশাহের নীতি

একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও হুমায়ূনের নির্বাসন এবং অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তির উপর সূর আফগানের এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চৌসা এবং কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করার পর শেরশাহ পূর্ণরূপে ভারতের শাসক বনে যান। তিনি তাঁর রাজত্বকালে মালব, মুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি এলাকা জয় করে, সমগ্র উত্তর ভারতকে একসূত্রে বেঁধে দেন এবং এক সংগঠিত, সুব্যবস্থিত শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

শাসকরূপে শেরশাহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি হুমায়ূনের নির্বাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ কথা এই অর্থে সত্য বলে প্রতীত হয় যে, যে শাসনব্যবস্থা শেরশাহ হুমায়ূনের নির্বাসনকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই-ই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তরও বনে যায় এবং পরেও তারই ভিত্তিতে দেশ সুগঠিত হয়।

হুমায়ূন ও শেরশাহের সম্পর্কের কথা আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করেছি। হুমায়ূনের পর শেরশাহ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি তিন প্রকারের নীতি অবলম্বন করতে পারতেন—

১. আক্রমণকারী নীতি, অর্থাৎ তিনি কাবুল, কান্দাহার ও অন্যান্য প্রদেশ যেগুলো মোগলদের অধিকারে ছিল, তা যুদ্ধের মাধ্যমে আপনাপন অধিকারে নিতে পারতেন।
২. কূটনৈতিক নীতি, অর্থাৎ, শান্তিপূর্ণ নীতি অবলম্বন করে কামরান বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য দিয়ে হুমায়ূনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারতেন।
৩. রক্ষণাত্মক নীতি, অর্থাৎ হুমায়ূনকে সিন্ধু নদের পশ্চিম দিকে ভাগিয়ে দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য-সীমা পরিপূর্ণরূপে সুরক্ষিত করে নিতে পারতেন। যার ফলে, এই অংশগুলোতে হুমায়ূনের আক্রমণের ভয় থাকত না।

---

১. শেরশাহের শাসনব্যবস্থায় জন্য দেখুন, কানুনগো, শেরশাহ পৃ. ৩৪৭-৪১৫ ; শরণ, দি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগলস্ পৃ. ৪৯-৬০ ও ১৬১-৬৪ ; এ এল শ্রীবাস্তব, শেরশাহ অ্যান্ড হিজ সাকসেসার্স , পৃ. ৫৬-৯১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেরশাহ বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। তিনি চিন্তা করেন যে, সিন্ধু নদের পশ্চিমাংশে আক্রমণ করা ও তাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাটা তাঁর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এই আক্রমণের পরিণামস্বরূপ তাঁর সাম্রাজ্যও বিপদে পড়ে যেতে পারত। এছাড়া হুমায়ূন যখন ইরানের শাহের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে যান তখন ঐ পরিস্থিতিতে হুমায়ূনের সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল ইরানের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। এই কারণে শেরশাহ হুমায়ূনকে কাবুল বা সিন্ধু নদের পশ্চিম এলাকা থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করেননি। শেরশাহ হুমায়ূনের শত্রুদের, বিশেষত, তাঁর ভাইদের সাহায্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ কলহ জিইয়ে রাখতে পারতেন। তিনি কাশ্মীরে এই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন এবং কাজী চককে হায়দার মির্জার বিরুদ্ধে বরাবর লড়িয়ে রেখেছিলেন। হুমায়ূনের সাথে তাঁর এই ধরনের নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন পড়েনি, কেননা, কামরান নিজে ও তাঁর ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে অনবরত লড়ে চলেছিলেন। যদি শেরশাহের দরবারে কামরান ঐ ধরনের সাহায্য নেওয়ার জন্য উপস্থিত হতেন, যেমনটি ইসলাম শাহের দরবারে গিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে শেরশাহ হলে সম্ভবত ঐ নীতি অবলম্বন করার সুযোগ পেতেন। তৃতীয় নীতি ছিল নিজের সীমান্ত সংরক্ষিত রাখা এবং হুমায়ূনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে তিনি পুনরায় তাঁর সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় সফল না হতে পারেন। শেরশাহ এই নীতি অবলম্বন করাকে সঠিক বলে বিবেচনা করেন এবং এতে তিনি সফল হন।

হুমায়ূনের পরাজয়ের পর শেরশাহ তাঁকে সিন্ধু নদের অপর পারে ভাগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন এবং হুমায়ূনের এই অনুরোধ যে, পঞ্জাব তাঁকে দিয়ে দেওয়া হোক, তা তিনি অস্বীকার করেন। হুমায়ূন যতদিন সিন্ধু এবং রাজপুতানায় থাকেন, ততদিন শেরশাহ সদা-সতর্ক ছিলেন। মালদেবের কাছ থেকে হুমায়ূনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শেরশাহ হুমায়ূনকে কোনো অবস্থাতেই নিজের সাম্রাজ্যের জন্য সাক্ষাৎ-বিপদরূপে দেখাতে চান নি। হুমায়ূন ও মোগলদের দিক থেকে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি বাকখর অঞ্চল জয় করে তাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক প্রয়াস চালান। রোহতাসের প্রসিদ্ধ দুর্গ তিনি কাশ্মীরের দিক থেকে হায়দার মির্জা ও আফগানিস্তানের দিক থেকে নিজের সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করেন। শেরশাহ মুলতান ও সিন্ধু অধিকার করে নিজের রাজ্যসীমা আরো শক্তিশালী করে নেন। এভাবে শেরশাহ নিজের সাম্রাজ্য সুগঠিত করার অবসর লাভ করেন। শেরশাহ যতদিন অবধি জীবিত থাকেন, ততদিন যাবত হুমায়ূন নিজের সমস্যাতেই ব্যস্ত থাকেন এবং সূর সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করার সুযোগও পান নি, সুবিধাও পান নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ভাগ্যবশত শেরশাহ দীর্ঘদিন যাবত জীবিত থাকতে পারেন নি। কালিঞ্জর দুর্গের কাছে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তিনি মৃত্যুবরণ[১] করেন (২২ই মে ১৫৪৫ খ্রিঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খাঁ ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। ইসলাম শাহ এক যোগ্য শাসক ছিলেন এবং তিনি শেরশাহের সাম্রাজ্যকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি সাহিত্য-প্রেমী ছিলেন। তিনি সাহিত্য-সভায় অত্যন্ত বাক-চাতুর্য ও রসিকতার সাথে আরবি ও ফারসি কবিতার উপর টিপ্পনী কাটতেন। তিনি নিজেও একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এ সমস্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে উচ্চশ্রেণীর সমাজে মদ্যপান ও বিলাস-ব্যসন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলাম শাহ এর ধারেকাছেও যেতেন না। তিনি উচ্চ শ্রেণীর সৈনিক ছিলেন এবং সামরিক যোগ্যতা ও গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অহংকারী, অবিশ্বাসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর ছিলেন। কখনো কখনো তাঁর ব্যবহার এতটাই পাশবিক হত যে, তা দর্শকদের হৃদকম্প ধরিয়ে দিত।

ইসলাম শাহ ভাল শাসক ছিলেন। তিনি শরিয়তী বিধানমতে ৮০ পৃষ্ঠার একটি আইন-বিধি প্রস্তুত করান। এই আইনবিধি তিনি রাজকর্মচারীদের বিচারকার্যের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলায় পাঠিয়ে দেন। শেরশাহ দুই মাইল অন্তর-অন্তর সরাইখানা (বিশ্রামগৃহ) স্থাপন করেন। ইসলাম শাহ এর মধ্যে মধ্যে একটি করে সরাইখানা আরো বানিয়ে দেন। সামরিক সংস্কারের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে শক্তি ও গতি সঞ্চার করেন। তিনি আফগান আমীরদের শক্তি খর্ব করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি তাঁদের সমস্ত হাতি ছিনিয়ে নেন এবং তাঁদের কাছে মাত্র মাদীহাতি রাখার অনুমতি দেন। বহুসংখ্যক আমীর তাঁদের আখড়াগুলোতে নর্তকী রাখতেন। তিনি তাদেরও ছিনিয়ে নেন, যার ফলে আমীরদের সামাজিক মনোরঞ্জনের সাধনাও অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর শাসনকালে তাঁর সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেক শুক্রবারে দরবার বসত। সেখানে এক সামিয়ানায় সিংহাসনের উপর ইসলাম শাহের জুতো ও তূণীর রাখা হত এবং আমীরদেরও ইসলাম শাহের সামনে ঝুঁকে অভিবাদন জানাতে হত, যেন তাতে ইসলাম শাহই বসে আছেন। সেখানে রাজকীয় নিয়ম ও আদেশ শোনানো হত।[২]

আফগানরা যারা নিজেদের উদ্দণ্ডতা, আত্মগর্বী ও লড়াকু স্বভাবের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, এরকম আদেশের ফলে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। পরিণামস্বরূপ তাঁরা বিদ্রোহ

১. তাঁর এ মৃত্যু ছিল হিদী মৃত্যু।—অনুবাদক।

২. ইসলাম শাহের বিধি-নিয়মের জন্য দেখুন ইলিয়ট ও ডাসন, ৫, পৃ. ৪৮৬-৮৮ ; এ. এল. শ্রীবাস্তব, শেরশাহ অ্যান্ড হিজ সাকসেসার্স, পৃ. ১১৫-১৮ ; রায়, সাকসেসার্স অব শেরশাহ, পৃ. ৫৪-৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। এই বিদ্রোহ দমনে ইসলাম শাহের অনেক সময় লেগে গেল। তিনি শক্তি, ক্রূরতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এই বিদ্রোহীদের দমন করলেন। এদের মধ্যে নিয়াজীদের বিদ্রোহ ছিল সবচেয়ে কঠোর। এই সময়ে মজহবী আন্দোলনও তাঁর সাম্রাজ্যে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম শাহ এর নেতার প্রতিও কঠোর আচরণ করেন।১

নিয়াজীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও আফগান সৈনিকদের প্রতি রুক্ষ আচরণের জন্য তাঁকে দু'বার হত্যায় চেষ্টা চালানো হয় কিন্তু তিনি দু'বারই বেঁচে যান।

হুমায়ূনের প্রতি ইসলাম শাহও, শেরশাহের ন্যায় আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন নি। কামরান বারবার সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে এলেও তিনি তাঁকে সাহায্য দেওয়াটা উচিত বলে বিবেচনা করেন নি। তিনি সতর্কতা ও সীমান্ত রক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করেন। পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ রক্ষার জন্য তাঁকে নিয়াজী আফগানদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় এবং তাদের নষ্টভ্রষ্ট করতে তিনি সফল হন। গকখরদের উপরও আক্রমণ চালিয়ে তাদের ভূমি তছনছ করে দেন। তিনি রোহতাস দুর্গের, শেরশাহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। এ ছাড়া তিনি মানকোর্টের দুর্গ নির্মাণ করেন। ইসলাম শাহ হুমায়ূনের গতিবিধির উপর এতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, তিনি তাঁর বিরোধিতা করার জন্য সকল দিক দিয়েই প্রস্তুত থাকতেন। ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন যখন কামরানকে বন্দি করার জন্য নীলাভ পৌছান তখন ইসলাম শাহ অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর গলায় ওষুধ প্রয়োগের জন্য পট্টি বাঁধা হয়েছিল। তিনি সেই পট্টি খুলে ফেলে দেন এবং তিনি তাঁর সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দেন। কামানগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক হাতি না থাকার কথা জানতে পেরে আফগান সৈন্যদের জানোয়ারের মত ব্যবহার করেন। তাঁর ৬০টি কামান ও কামানগাড়ি টানার জন্য ৬০,০০০ আফগান সৈনিককে ব্যবহার করেন এবং প্রতিদিন ১২ মাইল গতিতে তিনি সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হন। হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে ইসলাম শাহ সেখান থেকে লুধিয়ানা হয়ে গোয়ালিয়র চলে যান।

তাঁর এ নীতি হুমায়ূনকেও আশ্চর্যন্বিত করে দেয়। এ ঘটনা থেকে ইসলাম শাহের সতর্কতা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইসলাম শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হুমায়ূনের ভারত আক্রমণের সাহস হয়নি।

সূর সাম্রাজ্যের পতন

প্রায় ৯ বছর শাসন করার পর ৩০ অক্টোবর ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভগন্দর রোগে ইসলাম শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ১২ বর্ষীয় পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তাঁর শাসন বেশিদিন চলে নি। তাঁর মামা ও চাচা মুবারিজ খাঁ তাঁকে হত্যা করিয়ে

১. ইসলাম শাহের বিদ্রোহ দমন ও মজহবী আন্দোলনের জন্য দেখুন, রায় সাকসেসার্স অব শেরশাহ, পৃ. ১০-৩৬, ত্রিপঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল, পৃ. ১৪৩-৫২ ; তারীখে দাউদী, ইলিয়ট ও ডাসন, ৪, পৃ. ৫০১-৫০৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ং মুহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। মুহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে (১৫৫০-৫৭ খ্রি.) সূর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

শেরশাহ্ যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করেছিলেন তা শেষ হয়ে গেল। আফগান আমীরদের অবদমিত বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুনরায় জেগে উঠল। মুবারিজ খাঁ ব্যভিচারী ও মূর্খ ছিলেন। একজন ভাল গায়ক হওয়া ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো গুণ ছিল না। তিনি ক্ষয়িষ্ণু প্রসিদ্ধির জন্য অপব্যয় করতেন। উদাহরণত, তিনি ৫০০ টাকা মূল্যের সোনা লাগিয়ে তীর বানিয়েছিলেন। তিনি এই তীর চালাতেন এবং এ তীর পেয়ে কেউ তাঁর কাছে এলে তাকে ৫০০ টাকা দিয়ে দেওয়া হত। এ সমস্ত কারণে লোকে তাঁকে আদিল শাহের স্থলে আধলি (অন্ধ) বা আদিলী (মূর্খ) বলতেন। সৌভাগ্যবশত, হেমু নামক এক হিঁদু অধিকারী তাঁকে বড় সাহায্য করেন। হেমু প্রারম্ভে রেওয়াড়িতে শোরা-র ব্যবসায়ী ছিলেন, ইসলাম শাহ তাঁকে বাজার নিরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা বলে তিনি ধীরে ধীরে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন।

আদিল শাহ্ আফগান নেতাদের বিরুদ্ধে ইসলাম শাহের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি নতুন আমীরদের উৎসাহিত করেন এবং পুরাতন আমীরদের, যাদের দিক থেকে তাঁর ভয় ছিল, অবদমিত করার চেষ্টা করেন। গোয়ালিয়রে জায়গীর বিতরণের সময় তো দরবারেই তরবারি চলে যায়। আদিল শাহ্ কনৌজের জায়গীর শাহ মুহম্মদ ফরমূলীর কাছ থেকে নিয়ে সরমস্ত খাঁ সরওয়ানীকে দিয়ে দেন। এতে ফরমূলী খুবই অসন্তুষ্ট হন। শাহ মুহম্মদ ফরমূলীর পুত্র সিকান্দার দরবারেই সরমস্ত খাঁকে হত্যা করে বসেন। তিনি স্বয়ং নিহত হন এবং আদিল শাহকে মহিলা মহলে পালিয়ে গিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতে হয়। এই ঘটনার পর তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। তাজ খাঁ কররানী বিদ্রোহ করেন। আদিল শাহ ছিবরামাউ-তে তাঁকে পরাজিত করেন। ওখান থেকে পালিয়ে তাজ খাঁ চুনার চলে গেলে সেখানে হেমু তাঁকে পরাজিত করে বাংলা সীমান্তের দিকে ভাগিয়ে দেন।

আদিল শাহ ইব্রাহীম খাঁ সূরকে বন্দি করতে চাইলেন। ইনি ছিলেন গাজী খাঁ-র পুত্র ও আদিল শাহের ভগ্নিপতি। আদিল শাহের বোন একথা জানতে পেরে তাঁর স্বামীকে চুনার দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। তিনি পালিয়ে বিয়ানায় চলে গেলেন। আদিল শাহ ঈসা খাঁ নিয়াজীকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন, কিন্তু ইব্রাহীম তাঁকে কালপিতে পরাজিত করে দেন। এই বিজয় তাঁকে উৎসাহিত করে। তিনি আরো অগ্রসর হয়ে দিল্লি অধিকার করে নেন। তিনি ইব্রাহীম শাহ উপাধি ধারণ করে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করলেন। তিনি আগ্রাও অধিকার করে নিলেন। কয়েকজন আমীরও তাঁর সাথে যোগ দিলেন। এভাবে তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। আদিল শাহ তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হলেন। যমুনার নিকট ইব্রাহীম সূর এই শর্তে আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর পক্ষ অবলম্বনকারী আমীরদের কোনো ক্ষতিগ্রস্ত

১. রায়, সাকসেসার্স অব শেরশাহ ; পৃ. ৬৫-৬৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হবে না। আদিল এই শর্ত স্বীকার করে নিলেন এবং তিনি তাঁর আমীরদের ইব্রাহীমকে বিশ্বাস করানোর জন্য পাঠালেন। ইব্রাহীম এদের নিজের পক্ষে টেনে নিলেন। যার ফলে, বাধ্য হয়ে আদিলকে চুনারে ফিরে যেতে হল। এভাবে দিল্লি ও আগ্রা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল।

ইব্রাহীমের বিরোধিতায় উৎসাহিত হয়ে পঞ্জাবের গভর্নর আহমদ খাঁ সূরও বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনি ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে দিল্লি অধিকার করার জন্য পাঠালেন। ইব্রাহীম ৮০,০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। এত বড় বাহিনী দেখে আহমদ সন্ধি করতে চাইলেন। তিনি এই শর্তে ইব্রাহীমকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পঞ্জাব প্রদেশ তাঁকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিন। ইব্রাহীম তা অস্বীকার করলেন। আগ্রা থেকে পশ্চিমে ১৮ মাইল দূরে ফরহা[১] নামক স্থানে যুদ্ধ হল (সন ১৫৫৫ খ্রিঃ) যাতে ইব্রাহীম পরাজিত হলেন এবং সম্ভলে পালিয়ে গেলেন। আহমদ সিকান্দার উপাধি ধারণ করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন।

বাংলার গভর্নর মুহম্মদ খাঁ সূরও এই অরাজকতা থেকে লাভবান হলেন। তিনি শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে দিল্লির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করলেন।

মালবের গভর্নর ছিলেন সুজাত খাঁ। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরের অরাজকতার সুযোগ নিয়ে তিনিও স্বাধীন হয়ে যান। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় এবং তাঁর পুত্র বাজ বাহাদুর মালবের স্বাধীন শাসক হয়ে বসে যান।

AMARBOI.COM

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

সূর সাম্রাজ্যের পতনের পরিণামস্বরূপ শেরশাহের সাম্রাজ্য পাঁচটি সালতানাতে বিভক্ত হয়ে হয়ে যায়। পঞ্জাবে সিকান্দার শাহ সূর, সম্ভল ও দোয়াবে ইব্রাহীম সূর, চুনার থেকে বিহার পর্যন্ত অংশ আদিল শাহ, মালবে বাজ বাহাদুর ও বাংলায় মুহম্মদ খাঁ সূর পৃথক পৃথকভাবে সুলতান হয়ে বসে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক শাসক পুরো সাম্রাজ্য অধিকার করতে চাচ্ছিলেন এবং অন্য চার উত্তরাধিকারকে পরাজিত করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সূর রাজ্যের শান্তি চলে গিয়েছিল। সুলতান শক্তিমান ছিলেন ফলে আমীরদের শক্তি খুব খুব বেড়ে গিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেশের শাসন শক্তিকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তৃতীয় মাহমুদ সিংহাসনে বসেন (১৫০৮-৫৪ খ্রি.) তার শাসনকাল ছিল বাস্তবে আমীরদের সংঘর্ষের কাল। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান তৃতীয় আহমদ শাহ (১৫৫৪-৬১ খ্রি.) গুজরাতের সুলতান হন। তিনি বালক ছিলেন সে জন্য প্রকৃত শাসনকার্য

১. ২৭° ১৯ ও ৭৭°৪৯ পূর্বে এর অবস্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমাদ খাঁর অধিকারে ছিল।[১] গুজরাত অন্য কোনো রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লাভবান হওয়ার মত অবস্থায় ছিল না।

সিন্ধুর অবস্থাও ভাল ছিল না। হুমায়ূনের সিন্ধু থেকে বিদায় হওয়ার পর শাহ হুসেন আরগুন জ্বরে আক্রান্ত হন, যার ফলে তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এ অবস্থায় তাঁর আমীররা মির্জা মুহম্মদ ঈসা তরখানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। শাহ হুসেন ও ভক্করের গভর্নর সুলতান মাহমুদ ঈসা তরখানের নিরন্তর বিরোধিতা করে আসেন কিন্তু তাঁদের বাধ্য হয়ে সিন্ধুর বহুসংখ্যক এলাকা তাঁকে দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করতে হয়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহ হুসেনের মৃত্যু হয়ে যায়। যার ফলে পুরো সিন্ধু ঈসা তরখানের হাতে এসে যায়। মুহম্মদ ঈসা তরখানও ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির্জা মুহম্মদ বাকী তরখান ক্ষমতাসীন হন।[২]

রানা সাঙ্গার (৩০ জানুয়ারি ১৫২৮ খ্রি.) মৃত্যুর পর মেবারে অভ্যন্তরীণ কলহ শুরু হয়ে যায়, যার ফলে গুজরাত ও অন্যান্য রাজ্যও সুযোগ গ্রহণ করে। অনেক কঠিন অবস্থা অতিক্রম করার পর উদয় সিংহ মেবাবের রাজা হন কিন্তু তাঁর মধ্যে রানা সাঙ্গার সেই তেজস্বিতা ছিল না। এ দিনগুলো ছিল মেবারের পতনের দিন। শেরশাহ মালদেবকে পরাজিত করে যোধপুরের উত্থানও শেষ করে দিয়েছিলেন। রাজস্থানে না অন্য কোনো রাজ্য ছিল আর না কোনো নেতা ছিল, যার পক্ষে যে কোনো শত্রুর মোকাবিলা সম্ভব হত।

এইভাবে সম্পূর্ণ উত্তর ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এমন কোনো নেতা বা শক্তি ছিল না যিনি এই সম্মিলিত শক্তিকে একত্রিত করতে পারতেন। পঞ্জাব অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। হুমায়ূনের নির্বাসনের পেছনে আফগান ও তাঁর ভাইদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর ভাইদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। আফগান সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়েছিল। হুমায়ূনের জন্য তাঁর হারানো সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির এর চেয়ে উপযুক্ত সুযোগ আর ছিল না।

ভারতীয় অভিযান

হিঁদুস্তান আক্রমণের পূর্বে, ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ এবং ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের শুরু পর্যন্ত, হুমায়ূন কাবুলে অবস্থান করে, ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় রসদসামগ্রী একত্রিত করবার কাজে ব্যস্ত রইলেন। ইতিমধ্যে কিছু আমীর হুমায়ূনের কাছে কান্দাহারের হাকিম বৈরাম খাঁর বিষয়ে "সত্যমিথ্যা নানা কথা" লাগাল এবং তাঁর মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে দিল যে, তিনি ইরানের শাহের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র রচনা করছেন। কান্দাহার অরক্ষিত রেখে হিন্দুস্তান অভিযানে যাওয়া উচিত

১. কাম্বিস্সারিয়ট, হিস্ট্রি অব গুজরাত, পৃ. ৪১৪।
২. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩,পৃ. ৫০২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। হুমায়ূন কাবুলে আলী কুলি খাঁকে নিযুক্ত করলেন এবং শীতের শুরুতে কান্দাহার অভিমুখে প্রস্থান করলেন (৯৬১ হি. ডিসেম্বর ১৫৫৩)। তাঁর ইচ্ছা ছিল কান্দাহারে মুনীম খাঁ কিংবা অন্য কাউকে নিযুক্ত করে বৈরাম খাঁকে সাথে করে কাবুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।[১]

হুমায়ূনের আগমনের খবর পেয়ে বৈরাম খাঁ কান্দাহার থেকে সাত মাইল[২] আগে অগ্রসর হয়ে অন্দাম নামক স্থানে তাঁকে স্বাগত জানালেন। হুমায়ূনের অভ্যর্থনায় তিনি যে আবেগ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করলেন তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা লাগানো হয়েছিল, তা সত্য নয়। বৈরাম খাঁ আন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন, যাতে পণ্ডিত, ধার্মিক ব্যক্তি ও সৈনিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এই স্বাগত উৎসবে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ধন থেকেও খরচ করেন।

আবুল ফজল লিখেছেন, বৈরাম খাঁ সেবা এবং আনুগত্যে কোনো প্রকারের ত্রুটির অবকাশ রাখেননি। প্রত্যেক ব্যবস্থা তিনি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে করেন এবং যে কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু প্রয়োজন পড়লেই হুমায়ূনের সামনে উপস্থিত করা হত। এভাবে শীতঋতু আমোদ-প্রমোদে ব্যতীত হল।[৩]

খ্বাজা গাজী, যাঁকে দূত করে ইরানে পাঠানো হয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর সেবায় প্রসন্ন হয়ে হুমায়ূন তাঁকে বিত্ত বিভাগে ইশরাফে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন।

এই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়, যা হুমায়ূনের দুর্বল চরিত্র, সমকালীন ধর্মান্ধতা ও আকবরের সিংহাসনারোহণের প্রারম্ভিককালে আমীরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। আবুল মালী হুমায়ূনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহের কারণে তাঁর মাথা বেশ মোটা হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন কট্টর সুন্নী। ধর্মান্ধতাবশত তিনি মীরে শিকার করাবেগের পিতা শের আলী বেগকে, শিয়া হওয়ার কারণে হত্যা করলেন। আবুল মালী প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি "এই দুষ্ট শিয়াকে হত্যা করবেন।"[৪]

তা সত্ত্বেও হুমায়ূন তাঁকে দণ্ড দিলেন না। আবুল মালী হুমায়ূনের অনুগ্রহের কারণে ছাড়া পেয়ে গেলেন কিন্তু অনুশাসনের দৃষ্টিতে এ ঠিক ছিল না। শিয়া আমীরদের মধ্যে এর ফলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়াটা স্বাভাবিক ছিল। এ ঘটনা থেকে হুমায়ূনের দুর্বলতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়।

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩২-৩৩ ; বায়েজিদ, পৃ. ১৭০-৭১ ; তবকাতে আকবরী , দে ২, পৃ. ১৩০ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ পৃ. ৪৫৫।

২. আকবরনামা অনুসারে ১০ ফারসাখ। এক ফারসাখ এর দৈর্ঘ্য ১৮,০০০ ফুট। আকবারনামায় কিছু হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে দুই ফারসাখ লেখা আছে। দুই ফারসাখ প্রায় সাত মাইলের সমান হয়। এ অধিক ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ৪০ মাইল বা দশ ফারসাখ স্বীকার করেন। (হুমায়ূন, পৃ. ৩৩৯)।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩৩।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন কান্দাহারে তিন মাস যাবত অবস্থান করলেন। ইতিমধ্যে, ১৮ এপ্রিল ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে চোচক বেগম (জুজুক বেগম)-এর গর্ভ হতে হুমায়ূনের পুত্র মির্জা হাকিম জন্মগ্রহণ করেন।[১]

হুমায়ূন তাঁর যাত্রাপথে পীর-আউলিয়া ও পণ্ডিতদের দর্শন করতেন ও তাঁদের সাথে বার্তালাপের সুযোগ নষ্ট করতেন না। এখানেও তিনি মওলানা জইনুদ্দীন মাহমুদ কমানগড়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইনি এ যুগের বিশিষ্ট সুফী ছিলেন এবং বৈরাম খাঁ তাঁর শিষ্য হয়ে গিয়েছিলেন। হুমায়ূন তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বহু বিষয়ে ভাব-বিনিময় হয়।[২]

হুমায়ূন কান্দাহারে বৈরাম খাঁর স্থলে মুনীম খাঁকে নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি মুনীম খাঁকে এই ধরনের প্রস্তাবও করেছিলেন কিন্তু তিনি হুমায়ূনকে প্রস্তাব দিলেন যে, ঐ পরিস্থিতিতে যখন শিয়া আমীরদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ বিরাজ করছে, একজন বিশ্বস্ত শিয়া আমীরের পদে পরিবর্তনের জন্য তা উপযুক্ত সময় নয়। হুমায়ূন এই পরামর্শ স্বীকার করে নিলেন।[৩]

কান্দাহার বৈরাম খাঁর অধিকারে থাকতে দিয়ে হুমায়ূন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। শিয়া আমীর ও সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে এ আদেশ বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দিত। এছাড়া কান্দাহার অধিকার করার পর হুমায়ূন সেখানে বৈরাম খাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং ইরানের শাহকে যে ধরনের পত্র দিয়েছিলেন, যা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁরই সেবককে কান্দাহারের হাকিম নিযুক্ত করেছেন। পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ওদিক থেকেও ভয়ের আশঙ্কা থাকতে পারত।

কান্দাহার হতে প্রস্থানের পূর্বে হুমায়ূন কান্দাহার দুর্গে বৈরাম খাঁর নিযুক্তিকে পুনঃস্বীকৃতি দিলেন, যা থেকে শাহ ও হুমায়ূনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষভাব উপ্ত না হতে পারে। হুমায়ূন জায়গীরেও পরিবর্তন সাধন করলেন। এইভাবে জমীনদাওয়ার খ্বাজা মুয়াজজমের কাছ থেকে নিয়ে আলী কুলির ভাই বাহাদুর খাঁকে দিয়ে দেওয়া হল। তিনি বৈরাম খাঁকে আদেশ দিলেন, কান্দাহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার পর তিনি যেন কাবুলে এসে হুমায়ূনের সাথে মিলিত হন, যাতে হিন্দুস্তান আক্রমণের পূর্বে তিনি তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন।[৪]

এসব নিশ্চিত করে হুমায়ূন কাবুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। বৈরাম খাঁর তৎপরতা ও আনুগত্যের অনুমান এ থেকে করা যায় যে, তিনি তিনি অতি দ্রুত ব্যবস্থা করে হুমায়ূনের অগ্রসর হওয়ার কয়েকদিন পরেই রওনা হয়ে গেলেন এবং

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩২ ও বায়েজিদ, পৃ. ১৭৫-৭৬ এর প্রদত্ত তারিখ ঠিক নয়।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৫৫-৫৬।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩৪, তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩০ ; বায়েজিদ, পৃ. ১৭০-৭১১ মুন্তাখাবাউত্তাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৪৫৮।

৪. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৫৮-৫৯; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩৪; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গজনীতে হুমায়ূনের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন (৩১ জুলাই ১৫৫৪ খ্রি.)। বৈরাম খাঁর পৌঁছানোতে সম্রাট বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে আনন্দোৎসবের আয়োজন করলেন। বৈরাম খাঁর আগমনে এ উৎসব কেন করা হল ? বৈরাম খাঁ কি আসলেই সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন ? এমনও প্রতীত হয় যে, হুমায়ূনের বৈরাম খাঁর দিক থেকে খুব বেশি ভয় ছিল এবং তাঁর আগমনের ফলে তিনি ঐক্য ও শক্তি অনুভব করলেন ?

গজনী থেকে পুরো দল কাবুলে গেল (অক্টোবর-নভেম্বর ১৫৫৪ খ্রি., ৯৬১ হি.)[১]। কাবুলে হুমায়ূন সেনা একত্রীকরণ ও যুদ্ধ-সামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণ একত্রীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেনাদলে সৈন্য নেয়ার জন্য মধ্য এশিয়ার অন্যান্য এলাকা থেকেও লোকেদের আমন্ত্রণ জানানো হল। হিঁদুস্তানে ইসলাম শাহের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাঁর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভারত অভিযানের এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল। এই সময়ে দিল্লি ও আগ্রার কিছু নাগরিক ইসলাম শাহ সূরের মৃত্যু ও আফগানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর দিলেন এবং এই সুযোগে তা থেকে লাভ উঠিয়ে নিজের সাম্রাজ্য পুনরাধিকার করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।[২]

হুমায়ূনের কাবুল থেকে প্রস্থান

আক্রমণের পূর্বে কাবুল, কান্দাহার ও অন্যান্য অংশের শাসনব্যবস্থা ঠিক করার প্রয়োজন ছিল। হুমায়ূন তাঁর পুত্র মির্জা হাকিমকে কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি তখনও শিশু ছিলেন। এই কারণে বাস্তবিক শাসনের জন্য মুনিম খাঁকে তাঁর সংরক্ষক নিযুক্ত করা হল। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করার জন্য বৈরাম খাঁকে কাবুলে ছেড়ে দেওয়া হল। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল যে, ব্যবস্থা সম্পন্ন করার অনতিকাল পরেই যেন তিনি প্রধান বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন। এইভাবে শুভদিনে শুভ নক্ষত্রে (জিলহিজ্জ ৯৬১ হি. ১২ নভেম্বর ১৫৫৪ খ্রি.) কেবল তিন হাজার সৈন্য নিয়ে হুমায়ূন ভারতীয় অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন।[৩] তাঁর পিতার ন্যায় হুমায়ূন যুদ্ধের পূর্বে দু'টি প্রতিজ্ঞা করলেন। প্রথমত, যুদ্ধের সময়ে কাউকে বন্দি করা হবে না এবং দ্বিতীয়ত, অভিযানকালে গোশত খাবেন না।

সুর খাব, লামাগানাত ও জালালবাদ হয়ে হুমায়ূন বিকরাম (পেশোয়ারে) পৌঁছালেন (২৫ ডিসেম্বর ১৫৫৪ খ্রি.)। বৈরাম খাঁ ৫,০০০ সৈন্য নিয়ে সিন্ধু নদের নিকট হুমায়ূনের সাথে এসে মিলিত হলেন। হুমায়ূনের সেনাদলে সৈনিক ছাড়াও

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৩৪।
২. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৭২।
৩. বায়েজিদ পৃ. ১৭৬-৮৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪০-৪১। এত কম সৈন্যসহ রওনা হওয়াতে একথা প্রকট হয় যে, হুমায়ূনের প্রচেষ্টা খুব জনপ্রিয় হয় নি। বায়েজিদ সৈন্যদের সাথে ২৩২ বিশিষ্ট ব্যক্তি, ২৯ গায়ক এবং বাদকের নাম দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আকবরের সাথে ৫৬ ব্যক্তি ও বৈরাম খাঁর সাথে ৫৪ ব্যক্তির নামও দিয়েছেন। আবুল ফজল ৫৭ প্রধান সহায়ক এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুসংখ্যক গায়ক এবং বাদকও ছিলেন। আকবর, যার বয়স তখন বারো বছরের কিছু বেশি ছিল, তিনিও তাঁর সাথে ছিলেন।

সিন্ধু নদ পেরিয়ে সৈন্যরা পঞ্জাবে প্রবেশ করল। পঞ্জাবে বেশি যাত্রা-বিরতি করা হল না। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে, এই সময়ে পঞ্জাব সিকান্দার শাহ সূরের অধিকারে ছিল। হুমায়ূনের আক্রমণ তাঁকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিল। পশ্চিম দিক থেকে হুমায়ূন ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে মুহম্মদ আদিল শাহ সূর তাঁর রাজ্য অধিকার করতে চাচ্ছিলেন। দুই তরফা যুদ্ধের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সিকান্দার শাহ সূর তাঁর কেন্দ্র লাহোর থেকে দিল্লি হটিয়ে নিলেন। পঞ্জাব রক্ষার জন্য রোহতাস দুর্গ অবরোধ করে তিনি সেখানে তাতার খাঁ কাশীকে নিযুক্ত করলেন।[১] সিকান্দার আদম খাঁ গকখরের সাথেও সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর আনুগত্যের নিশ্চয়তা স্বরূপ তাঁর পুত্রকে বন্ধকরূপে নিজের কাছে রেখেছিলেন।[২] এইভাবে সিকান্দারের আশা ছিল যে, হুমায়ূন পঞ্জাবে সাফল্য পাবেন না।

সিন্ধু নদ পার হওয়ার পর হুমায়ূন আদম খাঁ গকখরকেও সাহায্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু তিনি হুমায়ূনকে সাহায্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তিনি হুমায়ূনকে জানালেন যে, তিনি সিকান্দার সূরের সাথে সন্ধি করেছেন এবং তাঁর পুত্র লশকরী সিকান্দার সূরের কাছে বন্ধক স্বরূপ রয়েছে। এই অবস্থায় তিনি হুমায়ূনকে সাহায্য করতে পারবেন না। এর জবাবে কিছু মোগল আধিকারিক রায় দিলেন যে, আদমের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে পরাজিত করে দেওয়া হোক, কিন্তু তাঁর অতীতের সেবার কথা মনে রেখে হুমায়ূন তাঁর উপর আক্রমণ করলেন না।[৩]

আদম হুমায়ূনকে সহায়তা কেন করলেন না? বাস্তবে তাঁর চরিত্র ও তাঁর পিছনের ঘটনাবলী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তিনি বীর ও প্রতিশ্রুতিরক্ষকারী ব্যক্তি ছিলেন। একবার সন্ধির পর তিনি যতটা সম্ভব তা পালন করতে চাইতেন। এছাড়া তাঁর এ ভয়ও ছিল যে, মোগলদের সাহায্য করলে তাঁর পুত্রকে দণ্ডিত করা হবে। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা ও সরলতার সাথে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী ব্যক্তি হতেন তাহলে তিনি হুমায়ূনের নির্বাসনের পর তৎক্ষণাৎই শেরশাহের সাথে সন্ধি করে নিতেন। এ কারণে একথা বলা যে, হুমায়ূনের সাফল্যের আশা না দেখে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন নি,—সত্য নয়।[৪]

হুমায়ূনের আক্রমণের খবর পেয়ে রোহতাসের দুর্গপতি তাতার খাঁ দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। বিনা যুদ্ধে হুমায়ূন দুর্গ অধিকার করে নিলেন। তাঁর সৈন্যরা ঝিলাম, চেনাব ও রাভি নদী পেরিয়ে কালানুর পৌছাল। সেখান থেকে তিনি তাঁর

---

২. আকবরনাম, ১, পৃ. ৩৪১ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়াবিখ, ১, পৃ. ৪৫৯।

৩. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৬০ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৪১।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪১।

৫. "In reality Adam was under the impression that Humayun was not likely to succed in his struggle with the afghans and he judged in impolitic to help Mughals to win a victory over their apponents." (ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ৩৪২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যদের তিনভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ বৈরাম খাঁ, তরদী বেগ প্রমুখের নেতৃত্বে হরিয়ানা অভিমুখে পাঠানো হল, যেখানে আফগান দলপতি নসীব খাঁ শিবির ফেলে অবস্থান করছিলেন। দ্বিতীয় দল শিহাবউদ্দীন খাঁ, ফরহাত খাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে লাহোর অভিমুখে রওনা হয়ে গেল এবং তৃতীয় দল হুমায়ূনের সাথে কালানুরে অবস্থান করতে লাগল। শিহাবউদ্দীন বিনা যুদ্ধে বা বিনা প্রতিরোধে লাহোর অধিকার করে নিলেন। তিনি নাগরিকদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিজের পক্ষে করে নিলেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ূন কালানুর থেকে অগ্রসর হয়ে লাহোরে প্রবেশ করলেন (২৪ রবিউল আখির ৯৬২ হি. ; ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৫ খ্রি.)।[১] এখানে নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে স্বাগত জানালেন।[২]

হুমায়ূন তাঁর আমীর ও সেবকদের মধ্যে জায়গীর বিতরণ করলেন এবং রাজস্ব উসুলের ব্যবস্থা করলেন। নির্বাসনকালে জওহর তাঁকে বড়ই সেবা করেছিলেন। এবার তাঁকে উপহার দেওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। তাঁকে হায়বাতপুর পরগনাটি দেয়া হল। তাঁর বিচক্ষণতাসুলভ ব্যবস্থাপনায় প্রসন্ন হয়ে হুমায়ূন তাঁকে তাতার খাঁ লোদির কোষ এবং জায়গীরও প্রদান করলেন।

এই সময়ে খবর পাওয়া গেল যে, আফগান নেতা শাহবাজ খাঁ ১২,০০০ আফগান সৈন্যসহ[৩] দীপালপুরের নিকট মোগলদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। হুমায়ূন, শাহ আবুল মালী, আলীকুলি শাইবানী প্রমুখকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন। আফগান, প্রবল পরাক্রমে মোগলদের উপর আক্রমণ চালাল। আবুল মালী শত্রুর আক্রমণের ফলে নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেলেন। মোগলরা প্রবল বিক্রমে লড়াই করল। আফগানরা পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। বহু সংখ্যক হাতি, ঘোড়া ও অন্যান্য রসদসামগ্রী মোগলদের হাতে এসে গেল। হুমায়ূন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এই অভিযানে তিনি কাউকে বন্দি করবেন না। এই কারণে যুদ্ধলব্ধ মহিলা ও শিশুদের তিনি নসীব খাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[৪]

এইভাবে হরিয়ানাও মোগলদের অধিকারে এসে গেল। মোগল সৈন্যরা এখান থেকে জলন্ধর পৌঁছাল। আফগানরা ওখান থেকেও পালিয়ে গেল এবং মোগলরা জলন্ধর অধিকার করে নিল।

পঞ্জাবের একের পর এক স্থান মোগলদের অধিকারে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বাস্তবে আফগানদের সাহস শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং কুশলী

---

১. আকবরনামা,১, পৃ. ৩৪২-৪৩ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৭৪।

২. জওহর (স্টুয়ার্ট পৃ. ১৬৪) লিখেছেন, সৈয়দ ও নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সৈয়দ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে তাঁকে স্বাগত জানাতে এলেন। সেখানেও তাঁদের দুটি দল ছিল—একটি মখদুমউল মুলকের নেতৃত্বে এবং অন্য দলটি মিয়া হাজী মেহদীর নেতৃত্বে। হুমায়ূন অনেক কষ্টে দুই দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেন।

৩. জওহর (স্টুয়াট পৃ. ১৬৬) এর মতে, আফগান সৈনিকদের সংখ্যা ছিল ১২,০০০ এবং মোগল সৈনিকদের সংখ্যা ছিল ৮০০ ; বায়েজিদ (পৃ. ১৯০) আফগান সৈনিকদের সংখ্যা ২০,০০০ লিখেছেন।

৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বের অভাবে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। আতঙ্ক এতটা ছেয়ে গিয়েছিল যে, কোনো অশ্বারোহীকে মোগল বেশে দেখলে আফগানরা পালিয়ে যেত এবং পিছন ফিরে একবার দেখতও না।[১]

আফগান সৈনিক ও আমীররা নিজ নিজ স্বার্থেই মগ্ন থাকত এবং নিজ নিজ পরিবার পরিজনদের রক্ষায় ব্যস্ত থাকত। শেরশাহের আমলের জাতীয় ঐক্যের আবেগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। মোগল আমীরদের মধ্যেও কেবল বাহ্য ঐক্য ছিল। এই সময়েও বৈরাম খাঁ ও তরদী বেগের মধ্যে নীতির প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। তরদী বেগ চাচ্ছিলেন পলায়নপর আফগানদের পিছু ধাওয়া করতে। বৈরাম খাঁ এর অনুমতি দেননি। তরদী বেগের সেবক বাত্তু খাঁ ও খ্বাজা মুয়াজ্জমের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়ে গেল, এমন কি তরবারিও চলে গেল। হুমায়ূন ফরমান ও মৌখিক সংবাদ দ্বারা দুই দলকে বোঝালেন। বৈরাম খাঁ জলন্ধরে রয়ে গেলেন। হুমায়ূন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক পরগনা দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করলেন।[২]

মাছিওয়াড়ার যুদ্ধ

বৈরাম খাঁ সিকান্দার উজবেককে মাছিওয়াড়ায় নিযুক্ত করলেন। এখানে পৌছে সিকান্দার উজবেক দেখলেন মোগলরা শক্তিশালী। এজন্য অগ্রসর হয়ে তিনি সেরহিন্দও অধিকার করে নিলেন। সেরহিন্দে মোগল অধিকারের খবর পেয়ে সিকান্দার সূর এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়লেন যে, মোগলরা এবার দিল্লিতেও আক্রমণ চালাবে। তিনি স্বয়ং আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, এ কারণে তিনি মোগলদের সেরহিন্দ থেকে বিতাড়িত করার জন্য তাতার খাঁ কাশীর নেতৃত্বে আফগান বাহিনী পাঠালেন। সিকান্দার উজবেক দেখলেন যে, আফগানদের মোকাবিলা করা কঠিন। এ কারণে সেরহিন্দ ছেড়ে তিনি জলন্ধরে বৈরাম খাঁর কাছে ফিরে এলেন। তাঁর এই পলায়নের ফলে বৈরাম খাঁ খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর এই অনুশাসনহীনতা ও কাপুরুষতা দেখে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন।[৩]

বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে মোগল সৈন্যরা জলন্ধর থেকে মাছিওয়াড়ায় পৌছাল। তরদী বেগে মত প্রকাশ করলেন শীতঋতু পর্যন্ত ওখানেই যাত্রা-বিরতি করা হোক, সমস্ত পুল অধিকার করে শত্রুদের সতলজ পার হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা হোক এবং বর্ষা ঋতু শেষ হলেই আফগানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়া হোক। বৈরাম খাঁ এতে সম্মতি দিলেন না। তাঁর যুক্তি ছিল এতে সময় নষ্ট হবে, সৈন্যদের মধ্যে শিথিলতা এসে যাবে, যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশি। তিনি তৎক্ষণাৎ নদীর ওপারে চলে যেতে চাচ্ছিলেন।

---

১. আকবরনামা, ১,পৃ. ৩৪৪।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৪।

৩. একে মাছীওয়াড়া, মাছীওয়াড়া বা মাছীবাড়াও লেখা হয়েছে। এ পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় ৩০°৫৫´ উত্তর ও ৭৫০°১২´ পূর্বে সমরালা তহসিলে, সমরালা গ্রাম থেকে ৬ মাইল ও লুধিয়ানা থেকে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজন প্রধান আমীরও তার সাথে একমত হলেন এবং তাঁর আদেশে সৈন্যরা নদী পার হল। বাধ্য হয়ে তরদী বেগ ও তাঁর সমর্থকদেরও নদী পেরুতে হল। তাঁর সামনে আফগান সৈন্যরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।

বৈরাম খাঁ মোগল সৈন্যদের চার ভাগে ভাগ করলেন। ডান দিকের দলটির নেতৃত্বে খিজির খাঁ হাজারা, বামদিকে তরদী বেগ, মাঝখানে বৈরাম খাঁ এবং অগ্রণী দলের নেতৃত্বে রইলেন সিকান্দার খাঁ উজবেক। এইভাবে মোগল সৈন্যরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আফগান বাহিনীতে ৩০,০০০ অশ্বারোহী ছিল। মোগল সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন, কিন্তু মোগল সৈন্য আফগানদের চেয়ে অনেক কম ছিল।[১]

আফগানরা তাৎক্ষণিক যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হল। এই তাৎক্ষণিক অগ্রসরতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, মোগল সৈন্যদর সংখ্যা কম ছিল, প্রতীক্ষা করলে এদের সাহস বাড়তে পারত, দ্বিতীয়ত, নদী পার হওয়ার পর মোগল সৈন্যরা তখনো স্পষ্টরূপে সংগঠিত হতে পারে নি। এ কারণে আফগানদের জন্য তাৎক্ষণিক আক্রমণ অধিক লাভজনক ছিল।

মোগলরা দিনের তৃতীয় প্রহরে নদী পার হল (১৫ মে ১৫৫৫ খ্রি.)। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হল। ভীষণ যুদ্ধে বেধে গেল। আফগান সৈনিকদের সন্নিকটে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রাম তাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। গ্রামের বাড়িগুলো ছিল চালে ছাওয়া। অন্ধকারের মধ্যে গ্রামে আগুন লেগে গেল।[২]

চালের বাড়িগুলো ধু-ধু করে জ্বলতে লাগল। গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে থাকায় আফগান বাহিনী ছিল আলোকিত স্থানে। মোগলরা অন্ধকারে থাকায় সুরক্ষিত ছিল এবং আফগানরা তাদের দেখতে পাচ্ছিল না। জোরে হাওয়া বইতে থাকায় আগুন আরো বেড়ে যাওয়াতে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। বৈরাম খাঁ ও অন্য মোগল সেনাপতিরা চারিদিক থেকে আফগানদের ঘিরে ফেললেন। আফগানরাও প্রচণ্ড রকমের মার খেল। এইভাবে রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। দশ ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় হয়ে গেল। আফগানরা পরাজিত হল এবং পালিয়ে গেল। আফগান সৈনিকদের ফেলে যাওয়া বহু রসদসামগ্রী, হাতি-ঘোড়া ও কোষ মোগলদের হাতে এসে গেল।

---

১. ফিরিশতা ব্রিগস, ২, পৃ. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট পৃ. ১৬৭ ; আফবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৫ বায়েজিদ, পৃ. ১৯১; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩২।

২. ফিরিশতার মতে, শীত ঋতু হওয়ার কারণে আফগানরা আগুন জ্বালিয়ে, আগুন পোহাচ্ছিল। তিনি লিখেছেন, "আফগানরা, যারা মোটা বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ, আগুন নেভানোর জায়গায় আলোকিত করার জন্য যত কাঠ এবং যত পশুখাদ্য ছিল তার সবটাই একসাথে আগুনে ঢেলে দিল।" (ফিরিশতা, ব্রিগস, পৃ. ১৭৪-১৭৪)। বদায়ূনীর মতে, আফগানরা উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামে আশ্রয় নিল। যেমনই তারা মোগলদের দেখল, অমনিই তারা কাঁচা বাড়ির চালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬০)। নিজামউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, মোগলদের আক্রমণে ভয় পেয়ে আফগানরা নিকটবর্তী গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল (তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩৩)। আকবরনামায় (৩খণ্ড ১, পৃ. ৩৪৫) স্পষ্ট নয় যে, আগুন কিভাবে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছিওয়াড়া যুদ্ধের পরিণাম

এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক আফগান মারা পড়ল। এর বিপরীতে মোগলদের বেশি সৈন্য হতাহত হল না। মোগলরা আফগানদের রসদসামগ্রী, হাতি-ঘোড়া, কোষ ইত্যাদি অধিকার করে নিল। এই যুদ্ধের পরদিন বৈরাম খাঁ অগ্রসর হয়ে বিনা বাধায় সেরহিন্দ অধিকার করে নিলেন। এই যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ পুরো পঞ্জাব, সেরহিন্দ, হিসার ফিরোজা ও দিল্লি প্রদেশেরও কিছু অংশ মোগলদের অধিকারে এসে গেল।[১]

এই বিজয় মোগলদের একদিকে উৎসাহিত করল অন্যদিকে আফগানদের বিহ্বলতা ও নিরাশাও আরো বাড়িয়ে দিল।

যুদ্ধের পূর্বে বৈরাম খাঁ তাঁর বাহিনীতে কম সংখ্যক সৈন্যের প্রতি হুমায়ূনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু হুমায়ূন তা এই বলে এড়িয়ে যান যে, আবুল মালী কেবল ৭০০ অশ্বারোহী নিয়ে আফগানদের পরাজিত করেছিলেন। যাই হোক, মোগলরা এত কম সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে খুবই বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়।

হুমায়ূন এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না এবং বিজয়ের কৃতিত্ব বৈরাম খাঁকেই দেওয়া উচিত ছিল। তিনি যদি তরদী বেগের কথা মেনে নিতেন তাহলে এর পরিণাম কি হত, তা বলা কঠিন। আফগানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি। গ্রামে আগুন লেগে যাওয়াতে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। যদি আলো না থাকত তাহলে আফগানদের এত সহজে পরাজিত করা যেত কি-না তাতে সন্দেহ আছে। এছাড়া আফগানদের তুলনায় মোগলদের অস্ত্রশস্ত্রও উত্তম ছিল।[২]

AMARBOI.COM

সেরহিন্দের যুদ্ধ

মাছিওয়াড়ার যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের পরাজয়ের খবর শুনে সিকান্দার শাহ সূর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুকাল পূর্বেই তিনি ছোট্ট একটি বাহিনীর সাহায্যে ইব্রাহীম সূরকে পরাজিত করেছিলেন। মোগলদের সেরহিন্দ অধিকারের খবর পেয়েই তিনি স্বয়ং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর সেনা-কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের শপথ করালেন এবং ৮০,০০০ অশ্বারোহী সেনা, যুদ্ধের হাতি ও কামানসহ সেরহিন্দ অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেরহিন্দ দুর্গ অবরোধ করলেন। বৈরাম খাঁ তো তার নিরাপত্তার ব্যবস্থার করলেনই সেই সাথেই তিনি পরিস্থিতির খবর জানিয়ে হুমায়ূনকে সাহায্য পাঠাতে এবং তাঁকে আসার জন্য প্রার্থনা জানালেন।[৩]

---

১. তবকাতে আকবরী, দে. ২, পৃ. ১৩৩।

২. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১,পৃ. ৪৫৯-৬০।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহব্বত খাঁর মাধ্যমে মাছিওয়াড়া বিজয়ের সংবাদ এবং লুটের সামগ্রী পেয়ে হুমায়ূন বড়ই প্রসন্ন হলেন এবং তিনি বৈরাম খাঁকে 'খানে খানান' এবং 'ইয়ার বফাদার' উপাধি দিলেন।[১]

বৈরাম খাঁর সমস্ত ছোট বড় সেবকের নাম রাজসিক দফতরে লিখে নেওয়া হল এবং তাঁদের পদোন্নতি ঘটানো হল। হুমায়ূন যখন সেরহিন্দে আফগানদের আক্রমণের খবর পেলেন সে সময়ে তিনি পেটের ব্যথায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং তিনি তাৎক্ষণিক অগ্রসর হতে অপারগ ছিলেন। তিনি আকবরকে সেরহিন্দে অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন এবং বৈরাম খাঁকে জানিয়ে দিলেন, তিনি সুস্থ হওয়ামাত্রই রওনা হয়ে যাবেন।

সুস্থ হতেই হুমায়ূন সেরহিন্দ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। লাহোরের কাছে আকবরের সৈন্যদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। নির্বাসনের পর হুমায়ূন বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিলেন। লাহোর থেকে অগ্রসর হওয়ার আগে তিনি সেখানকার শাসনব্যবস্থা পাকা করে নেয়া আবশ্যক বলে বিবেচনা করলেন। ফরহাত খাঁকে লাহোরের শিকদার, বাবুস বেগকে পঞ্জাবের ফৌজদার, মির্জা শাহ্ সুলতানকে আমীন ও মেহতর এবং জওহরকে খাজানদার (কোষাধ্যক্ষ) নিযুক্ত করা হল।[২]

এখান থেকে হুমায়ূন সসৈন্যে সেরহিন্দ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। ২৮ মে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে (৭ রজব ৯৬২ হি.) তিনি সেরহিন্দে পৌঁছে গেলেন।

আফগান সৈন্যরা সেরহিন্দ দিল্লি সড়কে তাদের শিবির স্থাপন করল, যাতে মোগলরা দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হলে বাঁধা দেয়া যেতে পারে। তারা শেরশাহের ন্যায় চারিদিকে পরিখা খনন করিয়ে পূর্ণরূপে সৈন্য মোতায়েন করে নিয়েছিল। এর বিপরীতে মোগল সৈন্যরা সেরহিন্দে দৃঢ় পদে অবস্থান নিল। এইভাবে আফগান ও মোগলরা যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দুই দলের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন কিন্তু সাধারণ অনুমান থেকে প্রতীত হয় যে, আফগান সৈন্যদের সংখ্যা মোগল সৈন্যদের চেয়ে চার গুণ বেশি ছিল, অর্থাৎ, মোগল সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ এবং আফগান সৈন্যদের সংখ্যা ৪০,০০০[৩] এর

১. ফিরিশতার মতে, হুমায়ূন তাঁকে 'ইয়ার বফাদার' ছাড়াও 'হমদম গমগুসার' (দুঃখ ব্যথার সাথী) উপাধি দেন (ফিরিশতা, কা, পৃ. ২৪২)। মাসিরিউল উমরার মতে, তাঁকে 'ইয়ার বফাদার,' 'বিরাদর নেকুসিয়ার' ও 'ফরজন্দ সাআদতসাদ' উপাধিও দেওয়া হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৪৭ হতে উদ্ধৃত।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৬।

৩. বায়েজিদের মতে, আফগান সৈন্যদের সংখ্যা ১,০০,০০০ এবং জওহর ও ফিরিশতার মতে, ৮০,০০০ ছিল। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, আফগান সৈন্যদের সংখ্যা মোগল সৈন্যদের চার গুণ ছিল। মোগল সৈন্যদের সংখ্য জওহরের মতে, ৫,০০০ ও বায়েজিদের মতে, ১০,০০০ ছিল। বায়েজিদ (পৃ. ১৯২-৯৩) মোগল সেনা-কর্তাদের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তরকাতে আকবরী দে, ২. পৃ. ১৩৩-৩৪ ; ফিরিশতা , ব্রিগস, ২, পৃ. ১৭৫ ; জওহর, স্ট্যুয়ার্ট, পৃ. ১৬৮; বায়েজিদ পৃ. ১৮০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম ছিল না। পঁচিশ দিন যাবত[১] দু'পক্ষের সৈন্যরা একে অন্যের উপরে আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে, ছোট বড় লড়াইও হতে থাকল।

গুজরাত অভিযানে হুমায়ূন যেমন বাহাদুর শাহের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুসামগ্রীর উপর অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন, এই নীতি তিনি এখানেও অবলম্বন করলেন। হুমায়ূন তাঁর অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে আফগান সৈন্যদের উপভোগ্য বস্তুসামগ্রী পৌছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। বারবার এই ধরনের ঘটনায় আফগান সৈন্যরা পেরেশান হয়ে উঠেছিল। একদিন তরদী বেগ আফগান সৈন্যদের একটি দলের উপর, যা সিকান্দারের ভাই কালাপাহাড়ের নেতৃত্বাধীন ছিল, আক্রমণ হানলেন। কালাপাহাড় মারা গেলেন এবং আফগানদের প্রচুর রসদ-সামগ্রী মোগলদের হাতে এসে গেল।[২]

হুমায়ূন তাঁর সৈন্যদের চারভাগে বিভক্ত করলেন। একটি হুমায়ূন, দ্বিতীয়টি আকবর, তৃতীয়টি শাহ আবুল মালী এবং চতুর্থ দলটি বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে ছিল।[৩]

হুমায়ূনের এই বিভাজন মোগল পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল এবং সৈন্যরা ডাইনে, বামে, মধ্যে এবং অগ্রগামী দলরূপে বিভাজিত ছিল। ২২ জুন ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের পাহারার পালা ছিল।[৪]

আফগানরা ঐ দিন যুদ্ধ শুরু করে। তারা বৈরাম খাঁর দলের উপর আক্রমণ চালায়। আফগনদের ভীষণ আক্রমণ, বিশেষত, হস্তীবাহিনীর আক্রমণের আতঙ্কে বৈরাম খাঁর সিপাইরা ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। সৈন্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, বৈরাম খাঁ মারা গিয়েছেন। হুমায়ূন অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন, কিন্তু এ খবর ভিত্তিহীন জেনে তিনি বড়ই খুশি হলেন।[৫]

বৈরাম খাঁ তাঁর সৈন্যদের পিছু হটিয়ে নিয়ে প্রথম থেকে নিরাপত্তা পংক্তিতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার আদেশ দিলেন। আফগানরা নিরাপত্তা পংক্তিতে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে

AMARBOI.COM

---

১. আবুল ফজল ৪০ দিন লিখেছেন (আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৮) ও জওহর একমাস (স্টুয়ার্ট পৃ. ১৬৯), ড. ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন যে, দু'দল সৈন্য দেড় মাস যাবত একে অন্যের মুখোমুখি ডেটে দাঁড়িয়ে রইল (হুমায়ূন পৃ. ৩৪৯) হুমায়ূন ৭ রজব (২৮ মে) সেরহিন্দ পৌছান। সেরহিন্দের যুদ্ধ ২ শাবান (২২ জুন) সংঘটিত হয়। এই হিসেবে পঁচিশ দিন হয়।

২. আকবারনামা, ১, পৃ. ৩৪৮—৪৯)

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৪৬। জওহর (স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৭০)-এর মতে একটি দল সিকান্দার খাঁ উজবেকের নেতত্বাধীন ছিল। তিনি আকবরের নাম দেননি। এমনও মনে হয় যে, আকবরকে, যার বয়স ১৩ বছরের কম ছিল, তাঁকে নামেমাত্র নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সাহায্যের জন্য সিকান্দার খাঁ উজবেক, আবদুল্লাহ খাঁ উজবেক প্রমুখও ছিলেন।

৪. আকবরনামা (খণ্ড, ১, পৃ. ৩৪৮–৪৯)-এর মতে, যে দিন যুদ্ধ হয় ঐ দিন আকবরের সেবকদের (নৌবাত তরদদু) পালা ছিল। নিজামউদ্দীন ও ফিরিশতা একে (নৌবতে করাবলী) ও বদায়ূনী (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬০) নৌবাত য়াজক লিখেছেন। মি. দে এর অনুবাদ, "Turn of the command of the advance guard." করেছেন। তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩৪, পাদটীকা ২। ব্রিগস এর অনুবাদ করেছেন ; "While the prince Akbar was visiting the pickets of the camp." (ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৭৫)

৫. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল কিন্তু তারা তা ভাঙতে ব্যর্থ হল। এই সময়ে হুমায়ূনের আদেশে তরদী বেগ ও শাহ আবুল মালী সিকান্দার সূরের সৈন্যদের উপর যারা আগে এসে গিয়েছিল, তাৎক্ষণিক চক্কর লাগিয়ে পিছনের অংশে আক্রমণ চালিয়ে দিলেন। আফগানরা চারিদিক থেকে মোগল সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আফগানরা পরাজিত হল এবং প্রচুর সংখ্যায় মারা পড়ল। অবশিষ্ট সৈন্যরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। সিকান্দার সূর পালিয়ে শিবালিক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সমকালীন ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে বৈরাম খাঁ মৃত আফগানদের মাথার খুলি দিয়ে একটি বিজয়স্তম্ভ (পিরামিড) বানালেন এবং তার নাম রাখলেন 'সিরে মনজিল'।[১]

যুদ্ধের পরে এক মনোরঞ্জক প্রশ্ন উপস্থিত হল। বিজয়ের ঘোষণা কার নামে করা যায়? বাস্তবে বিজয়ের কৃতিত্ব বৈরাম খাঁর পাওয়া উচিত ছিল। এঁরই নামে যুদ্ধের ঘোষণা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হুমায়ূনের প্রিয়পাত্র আবুল মালীও দাবি উপস্থিত করলেন। তাঁর মতে, তিনি মাছিওয়াড়ার যুদ্ধের পূর্বে আফগানদের পরাজিত করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাদের পরাজয়ের পটভূমি তৈরি করেছিলেন। এই দৃষ্টিতে তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁকেই যুদ্ধজয়ী ঘোষণা করা উচিত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে হুমায়ূন সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যুদ্ধের ঘোষণা আকবরের নামে করা হোক।[২]

এইভাবে তিনি এক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করলেন। এই ঘটনা থেকে বৈরাম খাঁ ও আবুল মালীর মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান আমীর হওয়ার দ্বন্দ্বের বীজ বপণী হল। কিন্তু বৈরাম খাঁর যোগ্যতা ও হুমায়ূন কর্তৃক প্রদত্ত উপাধিরাজি থেকে স্পষ্ট ছিল যে, দুই আমীরের মধ্যে কার স্থান উচ্চে।

AMARBOI.COM

আফগানদের পরাজয়ের কারণ

সেরহিন্দের পরাজয় আফগানদের প্রতিরোধ এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং তারা এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল যে, মোগলদের দিল্লি ও অন্যান্য স্থান অধিকার করা আর কঠিন হল না। আফগানদের পরাজয় ও পতনের কি কারণ ছিল?

শেরশাহ ও ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সূর আফগানদের ঐক্য নাশ হয়ে গিয়েছিল। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তাদের শক্তি ক্ষীণ করে দিয়েছিল এবং তাঁর সেনাপতিরা তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিলেন। তাদের সংগঠিত সাম্রাজ্যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার আবশ্যকীয় সাধন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিকান্দার শাহ সূরের উপরেই মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর মধ্যে সামরিক যোগ্যতা ছিল না। শত্রুকে সিন্ধু নদের অপর পারে অথবা তার উত্তর গিরিপথে প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। সিকান্দার লাহোর ও পাঞ্জাবের অন্য অংশগুলোও অরক্ষিতভাবে ছেড়ে দেন।

---

১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬১।
২. আকবরনামা, পৃ. ৩৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোহতাসের দুর্গপতি কাপুরুষতা প্রদর্শন করলেন এবং আদম গকখর ভীতত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এইভাবে পঞ্জাবের মাছিওয়াড়া পর্যন্ত অংশ বিনা যুদ্ধে মোগলদের অধীনে এসে যায়। মাছিওয়াড়ার যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় অনেক পরিস্থিতির কারণে ছিল।

আফগানদের বিপরীতে মোগল সেনানায়করা যোগ্য এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। বৈরাম খাঁর মতো অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সাহসী ও যুদ্ধকলায় পারদর্শী ব্যক্তি আফগানদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তরদী বেগ, আবুল মালী, সিকান্দার খাঁ উজবেক, আবদুল্লাহ খাঁ উজবেক প্রমুখ উচ্চস্তরের সেনানায়করাও ছিলেন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রও আফগানদের চেয়ে উন্নতমানের ছিল। মোগলদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল আক্রমণের গতি। বৈরাম খাঁর বুদ্ধি সবচেয়ে বড় সাহায্য দেয়। আফগানদের সাফল্য সম্ভব ছিল যদি সূরের উত্তরাধিকারিগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতেন, কিন্তু এ অসম্ভব ছিল।

দিল্লি অধিকার

সেরহিন্দ বিজয় আফগানদের প্রতিরোধ-শক্তি প্রায় শেষ করে দিয়েছিল। এই বিজয়ের পর সর্বপ্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দিল্লি অধিকার করা। হুমায়ূন সিকান্দার উজবেককে দিল্লি অধিকার করার জন্য পাঠালেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁর পিছে পিছে রওনা হলেন। বর্ষার কারণে কিছুদিন তাঁকে সামানায় অবস্থান করতে হল। এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য খুব লাভপ্রদ ছিল। দিল্লি অধিকার করে সিকান্দার উজবেক তাঁকে সেখানে অনতিবিলম্বেই পৌঁছানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। হুমায়ূন আবুল মালীকে পঞ্জাবের হাকিম নিযুক্ত করলেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল যে, তিনি যেন তাঁর কেন্দ্র জলন্ধরে রাখেন এবং কাবুল ও দিল্লির মধ্যে যাতায়াতের পথে যেন কোনো সমস্যা না হয়। সামানা থেকে রওনা হয়ে হুমায়ূন ২০ জুলাই ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সলিমগড় পৌঁছালেন। সেখান থেকে ২৩ জুলাই ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে প্রবেশ করলেন[১] এবং দ্বিতীয় বার মোগল সিংহাসনে আসীন হলেন।

দ্বিতীয় রাজত্ব

দিল্লি অধিকার হয়ে যাওয়ার পর হুমায়ূন নিজেকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ অবশ্যই ঘোষণা করলেন কিন্তু তাঁর বাস্তবিক শক্তি ও অধিকার নামমাত্র ছিল। সূর বংশের উত্তরাধিকারী তখনও জীবিত ছিলেন। সিকান্দার সূর সেরহিন্দের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে শিবালিক পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে অবস্থান করে মোগলদের পঞ্জাব থেকে তাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দিল্লি থেকে দক্ষিণে বিয়ানা ও দিল্লি ইব্রহীম সূরের হাতছাড়া হয়ে যায়। চুনার, আগ্রা ও তার নিকটবর্তী

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫১ ; ফিরিশতা, বিগ্রস্, ২, পৃ. ১৭৬-৭৭ ; তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশগুলো মুহম্মদ আদিল সূরের অধিকারে ছিল। এর সেনাপতি হেমু যোগ্য এবং বীর ছিলেন। মুহম্মদ শাহ সূর বাংলায় শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। এর অতিরিক্ত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় আমীরদের প্রভুত্ব ছিল এবং মোগলদের পক্ষে তাদের সহজে পরাজিত করে তাদের অধীনতা স্বীকার করানো কঠিন ব্যাপার ছিল। হিসারে রুস্তম খাঁ অনেক আফগান আমীরকে একত্রিত করে মোগলদের বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বদায়ূনে রায় হুসেন জলওয়ানী, মালবে বাজবাহাদুর ও অন্যান্য অংশে আফগান দলপতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দৃঢ়পদে অবস্থান করছিলেন।

নিযুক্তি এবং জায়গীর বিতরণ

সিংহাসনে বসার পর হুমায়ূন তাঁর জায়গীরদারদের মধ্যে জায়গীর বিতরণ করলেন এবং শাসনকার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজের লোকেদের নিযুক্ত করলেন। আকবরকে হিসার এবং ঐ গোত্রের সরকার প্রধান করা হল এবং তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়। বৈরাম খাঁকে সেরহিন্দের সরকার এবং অন্য পরগনা, তরদী বেগকে মেওয়াত, সিকান্দার খাঁ উজবেককে আগ্রা, আলী কুলি খাঁকে সম্ভল এবং হায়দার মুহম্মদ খাঁ আখতা বেগকে বিয়ানায় নিযুক্ত করা হল। আবুল মালীকে পঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তরদী বেগ দিল্লির গভর্নর পদ লাভ করলেন।[১] মুস্তাফাবাদ পরগনার রাজস্ব হযরত মুহম্মদ[২]-এর আত্মার শান্তি হেতু দান-পুণ্যের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হল।[৩]

এই নিযুক্তিতে আবুল মালী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করলেন। এর কিছুটা ছিল হুমায়ূনের পক্ষপাত আর কিছুটা ছিল তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য। হুমায়ূন আবুল মালীকে ঠিকমত বুঝতে পারেননি এবং যেমনটি পরে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁর পদের অপব্যবহার করেন।

হিসার অধিকার

নিযুক্ত আমীররা ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন। শামসুদ্দীন আতকা আকবরের প্রতিনিধিরূপে হিসার অধিকার করার জন্য রওনা হলেন। রুস্তম খাঁ ২,০০০ সৈন্যসহ মোগলদের বিরোধিতা করলেন, কিন্তু আতকা খাঁর ৪০০ সৈনিক বড়ই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে আফগানদের পিছু হটিয়ে দিলেন। রুস্তম খাঁ হিসার দুর্গে আশ্রয় নিলেন। তেইশ দিন অবরোধের পর হিসার সমর্পণ করে দিল। রুস্তম খাঁ

---

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫১। ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ১৭৭।

২. মূল গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, 'মুহম্মদ সাহাব'। তাঁর নাম শুনলে সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে হয়।—অনুবাদক।

৩. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬২-তে বদায়ূনী লিখেছেন, এই পরগনার আয় ৩০ লক্ষ টনকা ছিল। আঈনে আকবরী ২, পৃ. ৩০১-এ এই পরগনার আয় ৭৪, ৯৬, ৬৯ দাম লেখা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত হলেন এবং ৭০০ বন্দিসহ তাঁকে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর বীরত্বের কারণে হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করার এবং তাঁকে জায়গীর দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল যে, তিনি তাঁর পুত্রকে বন্ধক রূপে বিকরাম (পেশোয়ার)-এর দুর্গে থাকতে দেবেন। রুস্তম এ শর্ত স্বীকার না করায় বাধ্য হয়ে তাঁকে বন্দি করে মুহম্মদ ইশাক আকার কাছে সোপর্দ করা হল।[১]

কম্বর দীওয়ানার মৃত্যুদণ্ড

বদায়ূন রায় হুসেন জলওয়ানী নামক আফগানের অধিকারে ছিল। সেরহিন্দের যুদ্ধের পর যে সময়ে হুমায়ূন দিল্লি রওনা হন, সে সময়ে কম্বর আলী দীওয়ান নামক এক মোগল, সৈন্য একত্রিত করে রাজকীয় আদেশ ছাড়াই সম্ভল পৌঁছে যান। তিনি লুটতরাজ করতেন এবং লুটের ধন লোকেদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি লোকেদের অত্যধিক খাওয়াতেন আর বলতেন, "খাও, ধন-সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন এবং প্রাণও আল্লাহর দান। কম্বর দীওয়ানা আল্লাহর বকাবল (ভোজ অধিকর্তা)।"[২] তাঁর পুত্র সাইফুল্লাহ বদায়ূন অধিকার করে নিলেন। কম্বর অগ্রসর হয়ে কাণ্ড গোলায়[৩] রুকন খাঁ নামক আফগানকে পরাজিত করলেন এবং মল্লাবা।[৪] পর্যন্ত এলাকা অধিকার করে নিলেন। কম্বর এক স্বাধীন ব্যক্তির মতো কাজ করতেন, কিন্তু হুমায়ূনের প্রতি আনুগত্যের পত্রও লিখতেন। শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মনও বাড়তে লাগল এবং তিনি সুলতান ও খাঁ উপাধি, পতাকা এবং নাকাড়াও লোকেদের প্রদান করতে লাগলেন। এ অধিকার শুধুমাত্র স্বাধীন শাসকদেরই থাকতে পারত। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে থামানোর প্রয়োজন ছিল। হুমায়ূন আলী কুলি খাঁ শাইবানীকে[৫] দীওয়ানার বিরুদ্ধে পাঠালেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল, তিনি যদি দরবারে আসতে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়। আলী কুলি তাঁকে ডেকে পাঠালে দীওয়ানা দরবারে আসতে আপত্তি জানিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন "তুইও যেমন বাদশাহের দাস, আমিও তাই। আমি এ প্রদেশ তরবারির জোরে অধিকার করেছি।"[৬]

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫২।
১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১, পৃ. ৪৬৫।
২. জিলা শাহজাহানপুর, উত্তর প্রদেশ।
৩. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখের ইংরেজি অনুবাদক র‍্যাংকিং একে পঞ্জাবের পাহাড়ি দুর্গ মলাউ বলে অভিহিত করেছেন। মল্লাবা হরদোঈ জেলায় অবস্থিত। সম্ভবত, ঐ স্থানটিই, কেননা, তা শাহজাহানপুর ও হরদোঈ জেলার আশেপাশে অবস্থিত।
৪. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৩ তে একে শাইবানী ও অন্য কিছু গ্রন্থে এ স্থলে সীপ্তানি লেখা আছে। তবকাতে আকবরী, দে, ২, পৃ. ১৩৬ পাদটীকা ১ ; ইলিয়ট ও ডাসন পৃ. ৫।
৫. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৩ ; বদায়ূনীর মতে, (মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১,পৃ. ৫৬৪) তিনি বলতেন, "আমি তোর চেয়ে বাদশাহের বেশি বিশ্বাসের পাত্র। আমার এই মাথা আর বাদশাহীর মুকুট জোড়া বালকের মতো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে যুদ্ধ হল। দীওয়ানা পরাজিত হলেন এবং পালিয়ে বদায়ূনের দুর্গে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। এখান থেকে হুমায়ূনকে প্রার্থনাপত্র লিখলেন। আলী কুলি এই বাহাদুর ব্যক্তিকে ক্ষমা করাতে চাচ্ছিলেন। তিনি মুহম্মদ বেগ তুর্কমান এবং মোল্লা গিয়াসউদ্দীনকে তাঁর সাথে বার্তালাপ করার জন্য দুর্গে পাঠালেন কিন্তু দীওয়ানা তাঁদের বন্দি করলেন। এই দুই দূত কেল্লার লোকদের আপন পক্ষে টেনে নিয়ে দীওয়ানাকে বন্দি করলেন। তা সত্ত্বেও দীওয়ানা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না। বাধ্য হয়ে আলী কুলি দীওয়ানাকে হত্যা করালেন (১৮ জানুয়ারি ১৫৫৬ খ্রি.) এবং তার কর্তিত মস্তক হুমায়ূনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ূন কাসিম মুখলিসকে দীওয়ানার সম্ভল, বদায়ূন ও কান্তগোলা বিজয় উপলক্ষে তাঁকে ক্ষমা করতে এবং সম্ভব হলে তাঁকে পারিতোষিক দেওয়ার আদেশপত্র পাঠালেন। মুখলিসের পৌঁছানোর আগেই দীওয়ানা নিহত হয়েছিলেন। হুমায়ূন আলী কুলির প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর এই জলদিবাজির জন্য তাঁকে যাচ্ছেতাই করলেন। তিনি লিখলেন, 'যখন সে (কম্বর) আনুগত্য প্রদর্শন করতে চাচ্ছিল এবং আমার সেবায় উপস্থিত হতে চাচ্ছিল তখন তুমি কেন যুদ্ধ হতে দিলে আর যখন তাঁকে বন্দি করা হল তখন আমার আদেশ ব্যতীত কেন তাঁকে হত্যা করলে ?'[১]

আলী কুলির দীওয়ানাকে হত্যা করানো উচিত হয়নি। দীওয়ানার ব্যবহার, অনুমতি ব্যতীত বিভিন্ন স্থান অধিকার করা, উপাধি বিতরণ করা, বন্দি হওয়ার পরেও আলী কুলির সাথে ভাল ব্যবহার না করা, এ সবই তাঁর উগ্রতা প্রদর্শন করছিল। এমন ব্যক্তির সাথে কঠোর ব্যবহার আবশ্যক ছিল। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করতে চাচ্ছিলেন। এর কিছুটা তো ছিল মোগলরা তখনও পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করতে না পারা। এবং তা সত্ত্বেও আফগানদের বিরোধিতা করবার জন্য এমন ব্যক্তিদের প্রয়োজন ছিল। আর কিছুটা ছিল হুমায়ূনের স্বভাবের কারণে।

AMARBOI.COM

গাজী খাঁর হত্যা

আফগান দলপতি গাজী খাঁ বিয়ানার গভর্নর ছিলেন। মোগল আমীর হায়দার মুহম্মদ আখতাবেগী বিয়ানা অধিকার করে তাঁকে পরাজিত করলেন। গাজী খাঁ দুর্গে আত্মগোপন করলেন। পরে তিনি এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন যে, তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। হায়দার মুহম্মদ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না এবং তাঁর সম্পত্তির লোভে তাঁকে হত্যা করে দিলেন। বদায়ূনীর বর্ণনামতে, পরদিন পুঁতে রাখা ধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। হায়দার মুহম্মদ দুধের শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে হত্যা করালেন।[২] তাঁর এই ব্যবহারের হুমায়ূন খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি শিহাবউদ্দীন আহমদ খাঁকে যিনি মীরে ব্যুতাত ছিলেন, এই ঘটনার

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৪।
২. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৩ - ৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদন্ত ও গাজী খাঁর সম্পত্তির খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য পাঠালেন। গাজী খাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি হায়দার মুহম্মদ ছিনিয়ে নেন। বদায়ূনীর মতে, হায়দার মুহম্মদ বহুমূল্য রত্নগুলো লুকিয়ে ফেলেন এবং অন্য বস্তুগুলো সমর্পণ করেন।[১] হুমায়ূন তাঁকে শাস্তি দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি হিঁদুস্তানে সম্প্রতি এসেছিলেন, এজন্য তাকে তিনি এমন করাটা উচিত বলে মনে করলেন না।[২]

মির্জা সুলেমান কর্তৃক অন্দরাব অধিকার

অন্দরাব ও ইশকিমিশ তরদী বেগের জায়গীর ছিল। হিঁদুস্তানে হুমায়ূনের সাথে আসার সময়ে তিনি মুকিম খাঁকে এই অঞ্চলগুলো দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। সুলেমান এই অঞ্চলগুলো অধিকার করতে চাচ্ছিলেন। প্রারম্ভে তিনি মুকিম খাঁকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এতে সফল না হয়ে তিনি অন্দরাব আক্রমণ করে তা অবরোধ করলেন। যুদ্ধ করা কঠিন বিবেচনা করে মুকিম খাঁ সপরিবারে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে অনেক কাল কাবুল দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।[৩] এইভাবে হুমায়ূন ও তাঁর আমীরদের অনুপস্থিতির পরিণামস্বরূপ এ অঞ্চলগুলো তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

সিকান্দার সূর ও পঞ্জাব সমস্যা

সিকান্দার সূর পঞ্জাবে আত্মগোপন করেছিলেন। হুমায়ূন মীর শাহ আবুল মালীকে পঞ্জাবের গভর্নর করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন সিকান্দার সূরের কবল থেকে পঞ্জাব রক্ষা করে। তাঁকে বলা হয়, জলন্ধরকে যেন তিনি তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র বানিয়ে নেন। এই আদেশের পরোয়া না করে তিনি জলন্ধর ছেড়ে লাহোরে পৌছে গেলেন। আবুল মালী বদ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি জনগণকে কষ্ট দিতেন এবং শাহী আদেশের পরোয়া করতেন না। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তদের সাথেও দুর্ব্যবহার করতেন এবং লাহোরে খুব ঠাটবাটের সাথে থাকতেন।[৪]

তিনি লাহোরের সিকান্দার ফরহাত খাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর স্থলে নিজের লোক বসালেন এবং শাহী কোষের অপব্যয় করতে লাগলেন। তিনি আমীরদের হেনস্তা করতেন এবং তাঁদের সম্পদ আত্মসাৎ করতেন। হুমায়ূন তাঁর এই কর্মকাণ্ডের খবর পেলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি অত্যধিক স্নেহের কারণে তিনি এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করলেন না। পঞ্জাবের এই অব্যবস্থায় পরিণামস্বরূপ সিকান্দার সূর তাঁর স্থান থেকে বেরিয়ে

১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৩ - ৬৪।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৪।
৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৪।
৪. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬২ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলেন। তিনি হায়বাত খাঁ সুলতানীর প্রায় পাঁচ কোটির কোষ লুটে নিলেন এবং তাঁকে তাঁর কর্মকর্তাদের সাথে হত্যা করলেন এবং মানকোটের নিকটবর্তী পরগনাগুলো থেকে রাজস্ব উসুল করতে লাগলেন। এই ধনের সহায়তায় তিনি তাঁর সৈন্যদের সংগঠিত করলেন এবং পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হলেন।[১]

আবুল মালী সিকান্দারের অভিযানের খবর পেলেন। তিনি নিদ্রা ত্যাগ করে তাঁর আমীরদের সাথে পরামর্শ করলেন। সকলেই সিকান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু মোগলদের কাছে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী ছিল না। জওহর যিনি সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন, তাঁর পরামর্শানুযায়ী, দুর্গ মেরামতের জন্য নিয়ে আসা কাঠ, শিকলের টুকরো ইত্যাদির সহাতায় 'অরাবা' তৈরি করা হল। জওহরও অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ দিলেন।[২] এই সময়ে ৫০০ মোগল সিপাহি মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল, তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো হল। এইভাবে আবুল মালী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর পদ ও দায়িত্বশীলতার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। কোনো প্রকারে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি সিকান্দার সূরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সিকান্দার পুনরায় পার্বত্যাঞ্চলে পালিয়ে গেলেন।

আবুল মালীর কর্মকাণ্ডের খবর পেয়ে হুমায়ূনের পরামর্শদাতারা আবুল মালীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে অন্যত্র বদলি করে দেয়ার জন্য মত প্রকাশ করলেন। হুমায়ূনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। পরিস্থিতি অনুসারে বৈরাম খাঁ সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁকে নিযুক্তি দুয়ের মধ্যে ঈর্ষা আরো বেড়ে যেতে পারত। অবশেষে হুমায়ূন আকবরকে পঞ্জাবের গভর্নর ও বৈরাম খাঁকে শাহজাদার অভিভাবক নিযুক্ত করলেন এবং আবুল মালীকে বদলি করে হিসার ফিরোজা প্রদান করলেন। এইভাবে হুমায়ূন এ সমস্যার সমাধান করলেন।

আকবর তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাথে পঞ্জাবে রওনা হয়ে গেলেন। (নভেম্বর ১৫৫৫ খ্রি.) সেরহিন্দের কাছে আবুল মালীর বাহিনীর কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর তাঁর সাথে মিলিত হলেন। রাজসিক নিয়মানুসারে বৈরাম খাঁর এই ব্যক্তিদের স্বাগত জানানো উচিত ছিল না। কিন্তু বৈরাম খাঁ এতে আন্তরিকভাবে প্রসন্ন হলেন, কেননা, এরফলে আবুল মালীর শক্তি খর্ব হয়ে গিয়েছিল। আবুল মালী হুমায়ূনের কাছে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন এবং বৈরাম খাঁ ও আকবরকে লিখলেন, তাৎক্ষণিক লাহোরে এসে পৌছালে সিকান্দারকে পরাজিত করা সম্ভব। বৈরাম খাঁ তাঁকে লিখলেন, "তুমি এদিকে চলে এসো এবং সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করো।" বৈরাম খাঁ হুমায়ূনকেও পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন এবং তাঁর কাছে আবুল মালীকে ডেকে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন।[৩] হুমায়ূন বৈরাম খাঁর পত্রের উত্তরে আবুল মালীর পত্রপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে লাহোর অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য লিখলেন।

---

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৫৬।

২. জওহর, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৭১-১৭২।

৩. এই পত্র ব্যবহারের জন্য দেখুন, স্টুয়ার্ট, পৃ. ১৭৩-৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আবুল মালীকে তৎক্ষণাৎ দরবারে আসার জন্য লিখলেন। যেদিন আবুল মালী হুমায়ূনের পত্র পান ঐ দিন বৈরাম খাঁর দূতও তাঁকে লাহোর থেকে রওনা হওয়ার পরামর্শ দিতে এবং তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পৌঁছে গেলেন। আবুল মালীকে বাধ্য হয়ে হুমায়ূনের আদেশ মান্য করতে হল।

সিকান্দার সূর তাঁর গুপ্তস্থান থেকে বাইরে এসে গিয়েছিলেন কিন্তু আকবর ও তাঁর সৈন্যদের আগমনের খবর পেয়ে পুনরায় পার্বত্যাঞ্চলে ফিরে গেলেন। আবুল মালী সুলতানপুরে এসে আকবরের সাথে মিলিত হলেন। আকবর স্বয়ং তাঁকে দরবারে বসার আদেশ দিলেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। ভোজনের সময়ে তাঁর জন্য পৃথক দস্তরখানা বিছানো হল। এতে আবুল মালী খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি শিবিরে ফিরে গিয়ে আকবরকে খবর পাঠালেন, হুমায়ূন তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। তিনি আকবরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জুয়েশাহীতে তিনি হুমায়ূনের সাথে একপাত্রে আহার করতেন এবং আকবর সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই সম্মান লাভ করতে পারেন নি। তিনি আপত্তি করলেন— "তাঁর জন্য পৃথক কালীন কেন বিছানো হল এবং তাঁর জন্য কেন পৃথক দস্তরখানা পাতা হল?" আকবর হাজী মুহম্মদ শিস্তানীকে বললেন, তাঁকে গিয়ে বলে দিন যে, "রাজকীয় আইন এক আর ভালবাসার আইন আর এক। বাদশাহর সাথে আপনার যে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্ক আমার সাথে নেই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি দু'য়ের সম্পর্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য না বুঝে অভিযোগ শুরু করেছেন।"[১] আবুল মালী বুঝে গেলেন যে, তাঁর এ অভিযোগে কোনো কাজ হবে না।

পঞ্জাবে প্রবেশ করার পর আকবর সিকান্দার সূরের বিরুদ্ধে হরিয়ানায় পৌছালেন। এখানে তিনি হুমায়ূনের দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার খবর পেলেন। এখান থেকে তিনি সুলতানপুর এসে পরবর্তী খবরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।[২]

হুমায়ূনের মৃত্যু

সিংহাসনে দ্বিতীয় বার আসীন হওয়ার পর, এমনও প্রতীত হয় যে, হুমায়ূন জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। আকবরের পঞ্জাব চলে যাওয়ার পর তিনি প্রায়শই পরকালের কথা বলতেন।[৩] আর দিল্লির মকবরা ও কবর দেখে পরকালের কথা তাঁর আরো বেশি করে স্মরণে আসত।

বায়েজিদ লিখেছেন, হুমায়ূন প্রায়ই ভাবতেন যে, তিনি এই দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করবেন এবং তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, হিঁদুস্তানে, যা তাঁর ভাইদের

১. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৬-৬৭ ; বিগোন তোরয়ে সলতগত দীপর অস্ত ওয়া কানুনে ইশক দীগর। আঁ নিসবতে কী হজরতে জাহাঁবানী রা ব শুমা বুন্দ, মুরা নীস্ত। অজব কি দয়ীময়ানে ঈ দো নিসবত তফরকান কর্দা গিলা কর্দা য়দ।

২. হোশিয়ারপুর (পঞ্জাব জিলায়) ৩১°৩৮ উত্তর ও ৭২°৫২ পূর্বে।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৬২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্পরিক বিরোধের কারণে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, পুনরাধিকার করার পর তা আকবরকে দিয়ে দেবেন এবং স্বয়ং তাঁর সময় দরবেশ, বিদ্বান প্রমুখদের সংসর্গে অতিবাহিত করবেন।[১] আফিম খাওয়া তিনি অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। সাত দিনের খোরাক তিনি একটি কাগজে পুরে নিয়ে তিনি বললেন, সাত দিনে তিনি এক পুরিয়া আফিমই খাবেন। ২৪ জানুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাছে আফিমের চারটি গুলি ছিল। তিনি তা গোলাপ পানিতে মিশিয়ে সেবন করলেন।[২] ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁর কয়েকজন অধিকারীকে, যারা হজ্ব সম্পন্ন করে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর সামনে পেশ করা হল। তুর্কি অ্যাডমিরাল সীদী আলী রঈস, যিনি গুজরাত থেকে এসেছিলেন, ঐ দিন হুমায়ূনের সাথে মিলিত হন। কাবুল থেকেও তিনি সেখানকার পরিস্থিতির খবর পেলেন। এখান থেকে হুমায়ূন তাঁর গ্রন্থাগারের ছাদের উপরে গেলেন এবং এখান থেকে যে সমস্ত লোকেরা মসজিদে সমবেত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অভিবাদন (কুর্নিশ) গ্রহণ করলেন। অনেক সময় অবধি মক্কা, গুজরাত ও কাবুলের বিষয়ে আলাপ অলোচনা করলেন। এরপর, তিনি কয়েকজন গণিতজ্ঞকে শুক্র গ্রহের উদয়ের ক্ষণ দেখার জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি ঐ সময়ে তার প্রশাসনিক কর্তাদের পদোন্নতি ঘটাতে চাচ্ছিলেন। এই সময়ে যখন তিনি নিচে নামছিলেন এবং সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পৌছাতেই মিসকিন নামক মুয়াজ্জিন মসজিদে আযান দিলেন। হুমায়ূনের নিয়ম ছিল আযানের আওয়াজ কানে আসামাত্রই তাৎক্ষণিক হাঁটু গেড়ে দিয়ে অবনত হয়ে পড়া। ঐ সময়েও তিনি আযান শুনে ওখানেই বসে পড়তে চাচ্ছিলেন।[৩] শীতের দিন হওয়ার কারণে তিনি লম্বা লবাদা (পোস্তিন)[৪] পরে ছিলেন। বসার সময়ে তাঁর পায়ের নিচে ঐ পোস্তিনে ছাপ পড়ল। যে ছড়িটি তাঁর হাতে ছিল তা পিছলে গেল এবং তিনি সিঁড়ি থেকে পিছলে গিয়ে মাথার উপরে ভর করে পড়ে গেলেন। তাঁর ডান কান পাটিতে খুব জোরে চোট লাগল, যার ফলে তাঁর ডান কান দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। অচেতন অবস্থায় তাঁকে রাজমহলে নিয়ে আসা হল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর

১. বায়েজিদ, পৃ. ১৯৪।

২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৩। আকবরনামা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীত হয় না যে, তিনি চারটি গুলি এক সাথে রেখেছিলেন না একটি গুলি। সম্ভবত, তিনি একদিনের খোরাক খেয়েছিলেন।

৩. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৩; এ বমবেরি, দি ট্রাভেলস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অব দি টর্কিশ অ্যাডমিরাল সীদী আলী রইস পৃ. ৫৫।

৪. এ ছিল এক ধরনের লম্বা ওভারকোট, যা পশুর চামড়া দিয়ে বানানো হত। এর ভেতরে তুলো এবং বাইরে চামড়া থাকত।

৫. আকবরনামারা মতে, আকবর যখন হরিয়ানায় ছিলেন তখন এক দ্রুতগামী দূত পৌছালেন যিনি হুমায়ূনের দুর্ঘটনায় খবর দিলেন। শায়খ নজর জূলী কালানুরে তাঁর পরে পৌছান। (আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৭)

৬. মুন্তাখাবুত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৬ ; তবকাতে আকবরী, ২ দে, পৃ. ১৩৭ তে এঁকে শায়খ জোলী বা জুলী এবং আকবরনামায় (১, পৃ. ৩৬৪) নজর শায়খ কোলী লেখা রয়েছে । হোদীওয়ালা, স্টাডিজ হন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, ১ পৃ. ৫১৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা ফিরল কিন্তু তিনি পুনরায় অচেতন হয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁর দুর্বলতা আরো বেড়ে গেল এবং মনে হতে লাগল তাঁর বাঁচা অসম্ভব। হেকিমরা সমস্ত প্রকারের ওষুধ প্রয়োগ করলেন কিন্তু কিছুই হল না। এক দ্রুতগামী দূতকে খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য আকবরের কাছে পঞ্জাবে পাঠানো হল এবং শায়খ নজর জূলীর মাধ্যমে আকবরের কাছে এক ফরমান পাঠানো হল। এতে কেবল এতটাই জানানো হল যে, হুমায়ূন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছেন এবং তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখন সব ঠিক আছে। এই ফরমান এই কূটনৈতিক দৃষ্টিতে লেখা হয়েছিল যে, লোকেদের মধ্যে যে কোনো বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। হুমায়ুন তো অচেতন ছিলেন, এই কারণে তাঁর ঘনিষ্ঠ আমীররাই এর ভাষা নিশ্চিত করেছিলেন। বাস্তবে তাঁর অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং ২৬ জানুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে, রবিবারের দিন হুমায়ূনের মৃত্যু হয়ে গেল।[১]

মোগল সাম্রাজ্য অবব্যস্থিত ছিল। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দিল্লি থেকে দূরে ছিলেন এবং চারিদিকে শত্রু ছিল। এই অবস্থায় হুমায়ূনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। জনগণকে বিশ্বাস করানোর জন্য হুমায়ূন জীবিত কথাটি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হল। প্রারম্ভে এ ঘোষণা প্রচার করা হল যে, বাদশাহ ঘোড়ার চড়ে নিজের প্রদেশে যাত্রা করবেন। এরপর পুনরায় দ্বিতীয় ঘোষণা দেওয়া হল, আবহাওয়া খারাপের দরুন যাত্রা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দিন সার্বজনীন দরবারের ঘোষণা দেওয়া হল কিন্তু তা এই বলে স্থগিত করে দেওয়া হল যে, শুভ মুহূর্ত না হওয়ার কারণে জ্যোতিষীরা এর স্বীকৃতি দেননি। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে সৈন্যদের মধ্যে আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের সন্দেহ হল হুমায়ূনের মৃত্যু হয়েছে। এবার লোকদের সম্রাটের দর্শন করানো আবশ্যক হয়ে পড়ল। মোল্লা বেকসি নামক এক ব্যক্তির চেহারার সাথে হুমায়ূনের চেহারার খুব মিল ছিল। তাঁকে রাজকীয় বস্ত্র পরানো হল, কিন্তু তাঁর চেহারা ও চোখ বোরকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। তাঁকে নিয়ে গিয়ে সেই স্থানে বসিয়ে দেওয়া হল যেখানে হুমায়ূন বসতেন। রাজসিক ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর অন্য কর্মচারীরাও তাঁর সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি নদীর দিকে মুখ করে লোকেদের দর্শন দিলেন। লোকেরা কুর্নিশ করল। তাঁদের বিশ্বাস জন্মে গেল যে,

৬. সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে হুমায়ূনের মত্যু সন বিষয়ে ভিন্নতা দেখা যায়। তবকাতে আকবরী, মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ফিরিশতা, দুর্ঘটনার তারিখ তো শুক্রবার ৭ রবিউল আউয়াল ৯৬৩ হি লিখেছেন কিন্তু মৃত্যু তিথির বিষয়ে কয়েক দিনের পার্থেক্য দেখা যায়। এটা স্বাভাবিক কেননা তাঁর মৃত্যু গোপন করা হয়েছিল। এর বিবেচনার জন্য দেখুন, আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৩-৬৪ ; তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ১৩৯ ; জওহর, স্টুয়ার্ট পৃ. ১৭৫; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৫-৬ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৬৫ ; ব্যানার্জী হুমায়ূন ২, পৃ. ২৫৮ ; ত্রিপাঠী, রাইজ অ্যান্ড ফল পৃ. ১৬৯; এ. এল শ্রীবাস্তব, আকবর দি গ্রেট ১, পৃ. ১৭-১৮ ; হোদীওয়ালা, স্টাডিজ ইন মোগল ন্যুমিসমেটিকস, পৃ. ২৬৪-৬৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন জীবিত আছেন। সতেরো দিন যাবত হুমায়ূনের মৃত্যু-সংবাদ গোপন করা হল।[১]

তারপর তরদী বেগ ও অন্য আমীররা[২] দিল্লির জুমা মসজিদে আকবরের নামে খুতবা পড়ালেন এবং তাঁকে হুমায়ূনেরও উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। আকবর এ সময়ে কালানুরে ছিলেন। মৃত্যুর বিশ্বস্ত সংবাদ পেয়ে বৈরাম খাঁ তাৎক্ষণিক তাঁর রাজতিলকের ব্যবস্থা করলেন। আকবর এই আকস্মিক বজ্রপাতে বিমূঢ় হয়ে শোকতাপ করতে লাগলেন। আতকা খাঁ ও মাহম আনগা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বৃহৎ ব্যবস্থার না ছিল সময় আর না ছিল সাধন। সেখানেই একটি ইটের চবুতরায় শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (২ রবিউল আখির ৯৬৩ হি.) আকবরের রাজ্যাভিষেক হল এবং তাঁকে মোগল সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল।[৩]

মৃত্যুর পর হুমায়ূনের মৃতদেহ দিয়ে দিল্লিতে দাফন করা হল। হেমুর দিল্লি অধিকার করার সময় তাঁর মৃতদেহ সেখান থেকে বের করে সেরহিন্দ নিয়ে গিয়ে অস্থায়ীরূপে পুনরায় দাফন করা হল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মোগলদের দিল্লি অধিকার করার পর হুমায়ূনের মৃতদেহ পুনরায় দীনপনাহয় নিয়ে আসা হল। সেখানে কয়েক বছর যাবত পড়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ূনের রানী বেগা বেগম বা হাজী বেগম তাঁর নির্দেশনায় হুমায়ূনের মকবরা বানালেন এবং সেখানেই তাঁর মৃতদেহ শেষবারের মতো দাফন করা হল। ভাগ্যের কেমন বিড়ম্বনা যে, হুমায়ূন জীবনভর শান্তি পেলেন না আবার তাঁর মৃতদেহও বারবার দাফন করা হল।

১. বমবেরি, ট্রাভেলস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অব দি টার্কিশ এডমিরাল সীদী আলী রঈস, পৃ. ৫৬-৫৭ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৪।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬৪।
৩. এ. এল শ্রীবাস্তব, আকবর দি গ্রেট, খণ্ড, ১, পৃ. ১৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাদশ অধ্যায়
সিংহাবলোকন

হুমায়ূনের মতো ভাগ্যবান এবং তাঁর মতো অভাগা সম্রাট জগতে সুদুর্লভ। একদিকে তিনি তাঁর পিতৃসূত্রে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর মূর্খতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিণামস্বরূপ তিনি তা হারিয়ে বসেন। নির্বাসন কালে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে যে কষ্ট সইতে হয় তা যে কোনো ব্যক্তিকে জর্জরিত করে দিত। তাঁর ভাইয়েরা এবং অন্য আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে সর্বদাই কষ্ট দিয়েছে। জীবনভর চেষ্টা করা সত্ত্বেও অবশেষে তাঁকে তাঁর পিতার আদেশের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাইদের দণ্ড দিতে হয়, সেজন্য তাঁকে সর্বদাই দুঃখ ও অনুতাপ করতে হয়। তাঁর ৪৮ বছরের জীবনে কেবল দশ বছরই তিনি হিন্দুস্তানের সিংহাসনে বসে শাসন করতে সমর্থ হন।[1] এই উত্থান পতনের ফলে তিনি কোনো স্থায়ী শাসন, গুরুত্বপূর্ণ সৌধ অথবা সংস্থা রেখে যেতে পারেন নি, যা তাঁর যশ ও খ্যাতির নক্ষত্র রূপে বিরাজ করতে পারত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বড়ই অভাগা ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে, তিনি তাঁর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে সবশেষে প্রকৃত বিজয় তিনিই লাভ করেন। এই বিজয় তাঁর সমস্ত কষ্ট ও মর্যাদাহানিকে নিরসন করে দেয়। তাঁর এর চেয়েও বড় সৌভাগ্য ছিল তিনি মহান আকবরের মহান পিতা ছিলেন, যিনি শুধু ভারত নয় ; বরং বিশ্বের এক মহান শাসক রূপে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

সাম্রাজ্য ও শাসন

সম্রাট

হুমায়ূন এক সম্রাট ছিলেন এবং তাঁর শাসন প্রণালী ছিল একনায়কতান্ত্রিক। তিনি সম্রাটকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। তাঁর মত ছিল যেভাবে ঈশ্বর

১. হুমায়ূনের জন্ম ৬ মার্চ ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ২৬ জানুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ খ্রি. এ সিংহাসনে বসেন। কনৌজের যুদ্ধে (১৭ মে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দের) পর তাঁর প্রথম সাম্রাজ্যের পতন হয়। ২৪ জুলাই ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং সিংহাসনে বসেন। এইভাবে প্রথম সাম্রাজ্যের সময় ৯ বছর ৪$\frac{১}{২}$ মাস এবং দ্বিতীয় বার ৬ মাস অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর তিনি মোগল সাম্রাজ্যের শাসক থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণীকূলের প্রাণ রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকেন তেনমই সম্রাটও তাঁর সাম্রাজ্যের জনগণের প্রাণ-রক্ষার জন্য নিবেদিত থাকেন। হুমায়ূন আধ্যাত্মিক ও রহস্যবাদী প্রবৃত্তির মানুষ ছিলেন। তিনি জগৎ-সংসারকে বাস্তবিক সত্যের ছায়ামাত্র মনে করতেন। সম্ভবত, এ কারণেই তিনি অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বারবার সংসার ত্যাগের কথা বলতেন। হুমায়ূন জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর আবিষ্কার ও পরিকল্পনাবলী হতে স্পষ্ট প্রকাশ হয় যে, তিনি স্বর্গের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতেন। বাংলা নিবাসকালে তিনি তাঁর রাজমুকুটের উপর পর্দা (নিকাব) ঝুলিয়ে দিতেন। যখন পর্দা উঠাতেন তখন লোকে "আলোর উদর হয়েছে" বলে তাঁকে অভিবাদন জানাতেন। তাঁর এই ব্যবহার থেকে কিছু লোকের ধারণা হয় যে, তিনি খোদাই দাবি করেছেন। ইরানে লোকেরা এ নিয়ে উপহাস করেন।[১] খন্দমীর তাঁকে "হজরত বাদশাহ খিলাফত পনহে হকীকী মিজাজী এবং সালতানাতের যোগ"[২] বলে মনে করেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ (হজরত বাদশাহ জিল্লাহুল্লাহ) বলে সম্বোধন করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, হুমায়ূন নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করেন এবং ললাট লিখনের উপর বিশ্বাস করতেন।

হুমায়ূনের রাজত্বের ইতিহাসে দুটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চৌসার যুদ্ধের পর তিনি নিজাম ভিশতিকে, কামরানের বিরোধিতা সত্ত্বেও, সিংহাসনে বসান। এ ললাট লিখন তত্ত্বের বিপক্ষে ছিল। এর অর্থ হল সম্রাট যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাতে পারেন। রাজত্বের সম্মান এর দ্বারা খুব বড় ধাক্কা খায়। তাঁর ভাইয়েরা রাজ-শক্তিকে বারবার সতর্ক করেন এবং তাঁকে এর ভিত্তিতে চলতে বাধ্য করেন।

AMARBOI.COM

হুমায়ূনের শাসনকালে তাঁর আমীররা কখনো কখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতেন। ভাইয়েরা বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও হুমায়ূন তাদের ক্ষমা করে দিতেন। অবশেষে আমীরেরা তাঁকে শপথ নিতে বাধ্য করেন এবং তাদের যে কোনো সিদ্ধান্তই তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য করে তোলেন। এই ভাবে তাঁর শাসন ক্ষমতাকে আমীরেরা সীমিত করে দেন। এ আমীরদের খুব বড় বিজয় ছিল। হুমায়ূন তাঁর শাসনকালে সেই রাজত্বকে সেই শক্তি ও বল প্রদান করতে অসমর্থ হন যা তাঁর পুত্রের শাসনকাল লাভ হয়। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন নিজেকে অন্য সমকালীন শাসকদের চেয়ে উচ্চ বলে মনে করতেন এবং ইরানের শাহের দয়ার উপর নির্ভরশীল থাকার পরেও তিনি একথা গোপন করেন নি। নিজেকে উচ্চ বলে মনে করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে না খলীফা বলে ঘোষণা করেন আর না সম্পূর্ণ মুসলিম বিশ্বের নেতা।

---

১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১. পৃ. ৪৪৬।
২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূন, বেণী প্রসাদ. পৃ. ১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্য

সিংহাসনে আরোহণের সময় হুমায়ূন তাঁর পিতৃসূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন যা অক্সাস নদী থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্যের বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। হুমায়ূন এই সাম্রাজ্য বাড়ানোর চেষ্টা অবশ্যই করেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালব ও গুজরাত জয় করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এই সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর তাঁর পতন শুরু হল। প্রথমে গুজরাত ও মালব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। তারপর বাংলা, বিহার ও দিল্লি প্রদেশ ও সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য থেকেই তিনি বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন। কিছুদিন তো তাঁর অধীনে এক ইঞ্চি ভূমিও ছিল না। তিনি তার বাহুবলে তাঁর হৃত সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করে নেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি ভারতের শাসক অবশ্যই হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পঞ্জাব, দিল্লি, বিহার ও দোয়াবের অধিকাংশ এলাকা আফগানদের অধীনে ছিল, যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এইভাবে তাঁর মৃত্যুর সময়ে বাবুরের কাছ থেকে প্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গিয়েছিল।

সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিভাজন

AMARBOI.COM

বাবুর ও হুমায়ূনের সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিভাজনের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। বাবুর তাঁর আত্মকথায় ভীরা তথা বিহারের মধ্যবর্তী ত্রিশটি সরকার বা জমিদারের কথা উল্লেখ করেছেন। হুমায়ূনের শাসনের প্রাথমিক যুগে সম্ভবত বাবুরের যুগেই বিভাজন চালু থাকে।[১] সাম্রাজ্যের ভূমি চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : ১। খালসা ভূমি যা সাম্রাজ্যের ব্যক্তিগত অধিকারে ছিল ; ২। জায়গীর সেই ভূমি যা আমীরদের দেওয়া হয়েছিল ; ৩। সয়ূরগাল অর্থাৎ লাখেরাজ ভূমি যা বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিদের দেয়া হত। ৪। জমিদারদের অধিকারভূক্ত ভূমি। এ অংশ যুদ্ধাবস্থা, শান্তিও ও অভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য স্বাধীন ছিল।

দ্বিতীয় রাজত্বকাল হুমায়ূন শেরশাহের দ্বারা সংগঠিত সাম্রাজ্য লাভ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণে এর সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এর কাঠামো মজবুত ছিল যার উপর আকবর এক সুসংগঠিত শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় রাজত্ব লাভের পর হুমায়ূন তাঁর সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করতে চাচ্ছিলেন এবং তাঁর মস্তিষ্কে এজন্য এক পরিকল্পনাও ছিল। আবুল ফজলও

---

১. পরমাত্মাশরণ প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোগলস. পৃ. ৪৬-৪৭ ত্রিপাঠী সাম অ্যালপেকটস, পৃ. ২৯৬-৯৭ ; মোর ল্যান্ড আগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মুসলিম ইন্ডিয়া. পৃ. ৭৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন হুমায়ূন কয়েকটি স্থানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। তিনি দিল্লি, আগ্রা, জৌনপুর, মাণ্ডু, লাহোর, কনৌজ এবং অন্যান্য স্থানে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ আমীরদের নিযুক্ত করে তাঁদের অধীনে ঐ সমস্ত স্থানে একটি করে বাহিনীও রাখতে চাচ্ছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজের কাছে ১২,০০০ অশ্বারোহীর অধিক রাখতে চাচ্ছিলেন না।[১] তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে তাঁর স্বপ্ন পুরো হতে পারল না।

উজির

হুমায়ূনের মধ্যে না প্রশাসকীয় যোগ্যতা ছিল আর না তিনি এর জন্য সময় পেয়েছিলেন। এ কারণে শাসন সংগঠনের সংস্থাগুলোতে তিনি কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেন নি।[২] মোগলদের আগমনের পর উজির (প্রধানমন্ত্রী) এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। বাবুরের আমলে নিজামউদীন খলীফা তাঁর শক্তিশালী উজির ছিলেন। এ ঐতিহ্য হুমায়ূনের আমলেও জারি থাকে। তাঁর রাজত্বের প্রাথমিক যুগে তাঁর উজির ছিলেন আমীর ওয়াইস মুহম্মদ। তিনি সৈনিক ও রাজ্যের সমস্ত বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তাঁর পর হিন্দু বেগ হুমায়ূনের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাঁকে আমীরুল উমরা উপাধি ও সোনার কুর্সি দেওয়া হয়। হুমায়ূন শের খাঁ বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন। এ উজির কেবল শাসনকার্যের জন্য দায়ী থাকতেন না, বরং সেনানায়কও ছিলেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। এজন্য সামরিক ও নাগরিক শাসনের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না।[৩] এরপর আর কোনো আমীর ঐ স্থান লাভ করেন নি। হুমায়ূনের নির্বাসন কালে যখন উজিরের করাচা বেগের কোষাধ্যক্ষের সাথে ঝগড়া হয় তখন হুমায়ূন উজিরের পক্ষাবলম্বন করেন নি।[৪]

তাঁর ভারত অভিযানের সময় বৈরাম খাঁ ও আবুল মালীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল কিন্তু হুমায়ূন দু'জনকে এইভাবে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস চালান যাতে একের শক্তি অন্যের চেয়ে বেড়ে না যায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আবুল মালীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান এবং বৈরাম খাঁকে আকবরের সাথে পঞ্জাবে পাঠান। এই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়, যার ফলে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল যা যে কোনো সময়ে ভয়ংকররূপে জ্বলে উঠতে পারত।

---

১. আকবরনামা.১ পৃ. ৩৫৬।

২. "He left no traces of any constructive achivement in the Political institutions of the country." পরমাত্মাশরণ, প্রভিসিয়াল, গভর্নমেন্ট অব দি মোগলস, পৃ. ৪৭।

৩. ইবনে হাসান, দি সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার অব দি মোগল এম্পায়ার, পৃ, ১২০।

৪. এই ঘটনার জন্য দেখুন এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের ১০৮ পাদটীকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার

হুমায়ূন রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু সাধারণ সংস্কারও করেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর গজ ৪১½ ইস্কান্দারির সমতুল্য ছিল। হুমায়ূন একে বাড়িয়ে ৪২ ইস্কান্দারি করে দেন, যার ফলে এ পুরো ৩২ সংখ্যার (digit) হয়ে যায়।[১] হুমায়ূনের আমলে সম্ভবত আকবরের আমলের চেয়ে কম রাজস্ব নেওয়া হত।[২]

দরাবারের নয়া নিয়ম ও উৎসব

হুমায়ূন সম্রাটের অভিবাদনের জন্য কুর্নিশ ও তসলিম এর নিয়ম নির্ধারণ করেন। কুর্নিশে ডান হাত কপালে রেখে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাতে হত। তসলিমে হাতের পিছনের অংশ ভূমিতে রেখে তা ধীরে ধীরে উপরে ওঠানো হত এবং দাঁড়ানোর পর হাত কপালে রাখা হত।[৩] সম্রাটের দরবারে প্রবেশের সময় নাকাড়ার ধ্বনি দ্বারা তাঁর আগমনের খবর জানানো হত। এইভাবে দরবার শেষ হওয়ার পর যখন সম্রাট চলে যেতেন তখন তোপধ্বনি দিয়ে এ খবর জানিয়ে দেওয়া হত।[৪] হুমায়ূন দরবারে শাহজাদা ও অন্যান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের জন্য সোনা এবং রুপোর কুরসির[৫] ব্যবস্থা করতে চাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের নিজের বশে রাখতে সফল হবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু বেগকে একটি কুরসি প্রদান করেছিলেন।

পুরাতন নওরোজ উৎসব যা ইরানীরা পালন করত,[৬] তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর স্থলে হুমায়ূন নয়া নওরোজ উৎসব শুরু করেন যা বসন্ত ঋতুতে ঐ সময়ে পালন করা হত যেদিন দিন-রাত সমান হয়।[৭] হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের দিনটিও মহাসমারোহে পালন করা হত। এই অবসরে লোকেদের পুরস্কৃত এবং দান করা হত উৎসব হতে এবং নানা রকম এর আনন্দোৎসব পালন করা হত।[৮] সম্রাটের জন্মোৎসবও মহাসমারোহে পালন করা হত। হুমায়ূনকে আমন্ত্রণসহ

---

১. ব্যানার্জি হুমায়ূন. ২. পৃ. ৩৪৩।

২. ড. ব্যানার্জির মতে. (হুমায়ূন. ২. পৃ. ৩৪৩) হুমায়ূন এক দরবারে (আট মণের কিছুটা বেশি) ওজনের শস্যদানার উপর দুই বাবরি অর্থাৎ চার টনকা কর নিতেন। আকবরের আমলে এই ওজনের জন্য চার বাবরি দিতে হত। বাবরি ছিল একটি রৌপ্য মুদ্রা। ২½ বাবরি আকবরের আমলে এক রুপী (টাকা) বরাবর ছিল। টনকা ছিল দুই তাম্রমুদ্রার সমান।

৩. আঈনে আকবরী.১.পৃ.১৬৬-৬৭।

৪. আকবরনামা ১. পৃ. ৩৫৮।

৫. ঐ, ৩৫৬-৫৭।

৬. নওরোজ উৎসব ইরানে ঐদিন পালন করা হত যখন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করত।

৭. খন্দমীর কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ,পৃ. ৬৯। এইদিনটি ২১ মার্চের কাছাকাছি সময় পড়ে।

৮. ঐ পৃ. ৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা দিয়ে ওজন করা হত, সর্বসাধারণ ও বিশেষ লোকেদের পানাহার করানো হত এবং অন্য প্রকারের মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা করা হত।[১]

আবিষ্কার ও নতুন পরিকল্পনাদি

হুমায়ূন কিছু নতুন প্রশাসনিক নিয়ম প্রচলন করেন এবং মনোরঞ্জনের নয়া নয়া সাধন প্রস্তুত করেন। এ সমস্ত পরিকল্পনায় প্রশাসনিক দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব ছিল না কিন্তু এ থেকে হুমায়ূনের চরিত্র,তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমীর ও রাজকর্মচারীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ

হুমায়ুন আমীর ও রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন[২]—১। আহলে দৌলত, ২। আহলে সআদত, ৩। আহলে মুরাদ।[৩]

আহলে দৌলত এ সেই সমস্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বুদ্ধি, বীরত্ব ও কুশলতার সাথে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন এবং সাম্রাজ্যের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করতেন। সম্রাটের আত্মীয়-স্বজন, ভাই, আমীর, উজির ও সৈনিকদের এই শ্রেণীতে রাখা হয়েছিল। এতে এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যাদের সাহায্য ছাড়া রাজকার্য চলতে পারে না।

আহলে সআদতে বিশিষ্ট শায়খ, সৈয়দ, কাজী, দার্শনিক, কবি ও পণ্ডিতদের রাখা হয়েছিল। এই সমস্ত ব্যক্তি নিজদের জ্ঞান ও আদর্শের সাহায্যে রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করতেন।

আহলে মুরাদ এ সেই সমস্ত ব্যক্তি সম্মিলিত ছিলেন যারা নিজেদের সৌন্দর্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে মনোরঞ্জন করতেন। এতে গায়ক বাদক সুন্দরী নারী, সুন্দর যুবক প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত হতেন।

প্রতিটি বিশিষ্ট শ্রেণীর একজন করে অধিকারী থাকতেন। যার কর্তব্য ছিল তাঁর শ্রেণীর লোকেদের সংগঠিত রাখা। আহলে দৌলত-এর প্রধান অধিকারী ছিলেন শুজাউদ্দীন আমীর হিন্দু বেগ।[৩] একে তাঁর শ্রেণীর আমীরদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হত এবং সেনাদের বেতন প্রহরীদের নিযুক্তি ইত্যাদিও করতে হত। সআদত বিভাগ মওলানা মুহীউদ্দীন মুহম্মদ ফরগরীর অধীনে ছিল। এই শ্রেণীর

---

১. ঐ পৃ. ৭৪-৭৫।

২. এই বিভাজনের জন্য দেখুন, খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ২৩-৩১ ; আকবরনামা ১, পৃ. ৩৫৭-৫৯।

৩. আহলে দৌলত অর্থাৎ রাজ্যের সমূহ, আহলে সআদতের অর্থ সৌভাগ্যের সমূহ, আহলে মুরাদ অর্থাৎ অভিলাষ বা ইচ্ছা পূরণের সাধনসমূহ।

৪. হিন্দু বেগ বাবুর ও হুমায়ূনের আমলের বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। হুমায়ূনের আমলে তিনি জৌনপুরের গভর্নর ছিলেন। তাঁকে আমীরুল উমরা উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকদের সমস্যাবলীর সমাধান, জনসাধারণের মধ্যে ছোটবড় দাবি বা হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ, ধার্মিক অধিকারীদের নিযুক্তি ওশিন (বেতন-ভাতা বা সম্মানী) ইত্যাদি নিশ্চিত করার দায়িত্ব এর উপর অর্পিত ছিল। আহলে মুরাদ-এর অধিকারী ছিলেন আমীর ওয়াইস মুহম্মদ। মনোরঞ্জন ও এর সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলীর দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিল। তিন অধিকারীকে একটি করে সোনার বাণ দেওয়া হয়েছিল, যাতে অন্যান্য লোকদের মধ্যে তাঁদের সহজে চেনা যায়। এই বাণগুলো আহলে সআদত-এর বাণ, আহলে দৌলত-এর বাণ এবং আহলে মুরাদ-এর বাণ বলে অভিহিত হত।

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে দুটি করে দিন নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছিল। এই নিশ্চিত দিনগুলোতে দরবার বসত এবং সম্রাট ঐ শ্রেণীর লোকদের সাথে মিলিত হতেন। এই দিনগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এইভাবে শনিবার ও বৃহস্পতিবার আহলে সআদত-এর জন্য, রবিবার এবং মঙ্গলবার আহলে দৌলত-এর জন্য এবং সোমবার ও বুধবার আহলে মুরাদ-এর জন্য নিশ্চিত ছিল।

এই বিভাজন কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তির উপরে ছিল না। আবশ্যক ছিল না যে, এক শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তি ঐ শ্রেণীরই হতে হবে, অর্থাৎ, মুরাদ শ্রেণীর প্রধান অধিকারী ওয়াইস মুহম্মদ না ছিলেন গায়ক আর না ছিলেন সুন্দর যুবক। মধ্য যুগের আমীররা সৈনিক তো হতেনই, সেই সাথে তাঁদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সাহিত্যিক বা অন্যান্য গুণাবলীরও অধিকারী হতেন। এই বিভাজন কোনো নিশ্চিত গুণের ভিত্তিতে হলে বহুসংখ্যক ব্যক্তি দুই বা তিন শ্রেণীতে এসে যেতেন।

AMARBOI.COM

এই বিভাজনের ফলে হুমায়ূন রাজকার্যের জন্য কেবল দুটি দিন, রবিবার ও মঙ্গলবার লাভ করেন। অবশিষ্ট দিনগুলো আমোদ-প্রমোদ ও মনোরঞ্জনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। শাসনের দৃষ্টিতে এ বিভাজন ক্ষতিকর ছিল। সৌভাগ্য এটাই ছিল যে, এই বিভাজন কখনোই কঠোরভাবে পালন করা হয় নি।

এই বিভাজনের একটি মনোরঞ্জক ইতিহাস আছে। বাবুরের জীবৎকালে হুমায়ূন একদিন কাবুলে ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ মওলানা মসীহুদ্দীন রুহুল্লাহর সাথে ভ্রমণে বেরুলেন। পথিমধ্যে তিনি শুভাশুভ ফল (ফাল)[১] নির্ণয়ের চিন্তা

---

১. ফাল বা ফলাফল নির্ণয়ের প্রথা ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। কিছুকে ভাল এবং কিছুকে মন্দ বলে মনে করা হয়। ফলাফল নির্ণয় কুরআন থেকেও করার প্রথা আছে। চোখ বন্ধ করে কুরআন খোলা হয়, তারপর পিছনে সাত পৃষ্ঠা গোনা হয় তারপর যে বাক্য বা ছত্রের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়ে তা থেকে ফাল বের করা হয়। হাফিজের দীওয়ান থেকেও ফাল বের করা হয়। পটনার খুদাবক্স লাইব্রেরিতে হাফিজের দীওয়ান রয়েছে যাতে হুমায়ূন ও জাহাঙ্গীরের স্বহস্ত লিখিত টিপ্পনী রয়েছে যা থেকে জানা যায়, এঁরা এ থেকে ফাল বের করতেন। ফাল এর জন্য দেখুন, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম ১ পৃ. ৪৬-৪৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। তিনি তাঁর উস্তাদকে বললেন, যে তিন ব্যক্তির সাথে প্রথম দেখা হবে তাঁদের নাম জিজ্ঞাসা করে তাদের ফাল নির্ণয় করা হোক। কিছু দূর চলার পর এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, যাঁর নাম ছিল মুরাদ খ্বাজা। তারপর এক ব্যক্তি গাধার পিঠে করে জ্বালানি কাঠ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। একে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তার নাম দৌলত খ্বাজা। হুমায়ূন বললেন, তৃতীয় ব্যক্তির নাম সআদত খ্বাজা হলে একটি শুভ ফল লাভ হবে। ঐ সময় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল যে তার নাম সআদত খ্বাজা বলে জানাল।[১] হুমায়ূন এতে খুবই আনন্দিত ও প্রভাবিত হলেন। শাসনকার্য লাভের পর তারই ভিত্তিতে তিনি কর্মচারী ইত্যাদির বিভাজন করেন।

বারো শ্রেণীর বাণ

সম্রাট ও তাঁর কর্মচারীদের বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।[৩] প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক বিশেষ প্রকারের বাণ নিশ্চিত ছিল। দ্বাদশতম শ্রেণীর বাণটি ছিল সর্বোচ্চ এবং সেটি ছিল সম্রাটের প্রাপ্ত। সর্বনিম্ন শ্রেণীর বাণটি ছিল প্রথম বাণ, যা দারোয়ান, উটওয়ান প্রমুখের প্রাপ্ত ছিল। এই রকমই দ্বিতীয় বাণটি ছিল নিম্নশ্রেণীর সেবকদের, তৃতীয়টি সাধারণ সৈনিকদের চতুর্থটি কোষাধক্ষদের, পঞ্চমটি নওজওয়ান সৈনিকদের, ষষ্ঠটি আফগান গোত্রের সেনাপতিদের ও উজবেকদের, সপ্তমটি রাজ্যের ছোট কর্মকর্তাদের, অষ্টমটি দরবারী ও বিশেষ কর্মচারীদের, নবমটি প্রতিষ্ঠিত আমীরদের, দশমটি উৎকৃষ্ট শায়খ, সৈয়দ, বিদ্বান ও ধার্মিক লোকদের, একাদশ বাণটি সম্রাট ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন প্রমুখদের ছিল।

প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করে শ্রেণীর বাস ছিল—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-যা উচ্চতার ভিত্তিতে প্রদান করা হত।

এই শ্রেণীগুলোর সংখ্যা বারোটি কেন হল ? খন্দমীরের মতে, বারো মানে এক বছর হয়, দিন এবং রাত বারো-ঘণ্টার মান্য করা হয়। এই রকমই ইতিহাস এবং ধর্মেও বারোটি উদাহরণ পাওয়া যায়।[৩]

এই বিভাজনও কোনো যুক্তি বা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এমন কিছু লোকও ছিলেন যাদের কোনো শ্রেণী নির্দিষ্ট ছিল না, যেমন, অন্তঃপুরের মহিলাদের সম্ভবত, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসে আসতে পারতেন। এই বিভাজনে বিদ্বানদের রাজ্যের অন্য কর্মচারীদের চেয়ে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে।

---

১. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ২৪-২৫ ; আকবরনামা ১, পৃ. ৩৫৭ ; আবুল ফজল তৃতীয় ব্যক্তিকে পুরুষ এবং খন্দমীর বালক লিখেছেন।

২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৩১ - ৩৩ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৫৯

৩. অন্যান্য উদাহরণের জন্য দেখুন, খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৩২ - ৩৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসনকার্যের চারটি বিভাগ

হুমায়ূন তাঁর রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনকার্য চারটি তত্ত্বের উপর চারটি বিভাগে বিভক্ত করেন।[১] প্রথম আতশী (অগ্নি), দ্বিতীয় হাওয়াই (হাওয়া), তৃতীয় আবী (পানি) এবং চতুর্থ খাকী (মাটি)। প্রতিটি বিভাগে একজন করে উজির নিযুক্ত করা হয়। আতশী বিভাগের উজির ছিলেন ইমাদুল মুল্ক। তিনি তোপখানা, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবস্থাপক ছিলেন। হাওয়াই বিভাগের উজীর ছিলেন লুতফুল্লাহ। সম্রাটের পোশাকাদি, ভোজনালয়, পশুশালা ও উট ইত্যাদি ছিল এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আবী বিভাগ শরাব, শরবত, নহর ইত্যাদির দেখাশুনা করত। এই বিভাগ ছিল খ্বাজা হুসেনের অধীন। খাকী বিভাগের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন জালাল উদ্দীন মির্জা বেগ। এ বিভাগ কৃষি ভবন, খালসা ভূমি, কোষ ইত্যাদির দেখাশুনা করত।

প্রারম্ভে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে প্রধান আমীর নিযুক্ত করা হত। আমীর নাসির কুলী আতিশী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সর্বদাই লাল বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমীর নিহাল এই পদে নিযুক্ত হন। পরে আমীর ওয়াইস মুহম্মদকে চার বিভাগেরই সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

এই শাসন বিভাজন সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক ছিল। নহর বিভাগ কৃষির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা শরাব বিভাগের সাথে ছিল। ওয়াইস মুহম্মদ খুবই গুরুত্ব লাভ করেছিলেন, কেননা, এই চার বিভাগের অতিরিক্ত আহলে মুরাদ বিভাগের দায়িত্বও তাঁর উপরে অর্পিত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, মনোরঞ্জনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি শাসন, উৎপাদন, কৃষি, নির্মাণ, তোপখানা ইত্যাদিও দেখাশুনা করতেন।

AMARBOI.COM

সাত মজলিসের আয়োজন

হুমায়ূন সাত প্রকারের মজলিস সাত শ্রেণীর লোকের জন্য আয়োজন করেন। এ সমস্ত মজলিস গ্রহ-নক্ষত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। প্রথম প্রকারের মজলিস চাঁদের সাথে সম্পর্কিত ছিল (কমর এর মজলিস)। এই সভায় রাজপূত, পর্যটক এবং সংবাদ বাহককে রাখা হত। দ্বিতীয় প্রাকারের মজলিস পূর্ব গ্রহের সাথে সম্পর্কিত ছিল (আতায়িদের মজলিস)। এতে অসামরিক কর্মচারী অন্য লোকেরা আসতেন। এইভাবে অন্য লোকেদের জন্যও আরো পাঁচটি মজলিসের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক মজলিসের সাজসজ্জা ও লোকেদের পোশাকাদিও গ্রহ-

১. ঐ পৃ. ৩৫ - ৩৬ ; আকবরনামা ১, পৃ. ৩৫৯ - ৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্রের উপর ভিত্তি করে করা হত। সম্রাট সপ্তাহের একটি করে দিন প্রত্যেক প্রত্যেক মজলিসে ব্যয় করতেন।[১]

নাকাড়া বাজানোর নিয়ম

দিনে তিনবার নাকাড়া বাজানোর আদেশ ছিল, প্রথমটি ছিল প্রাতঃকালীন যা নামাজ এবং প্রার্থনার সময়ে বাজানো হত, একেন 'জৌবতে সআদত' বলা হত। দ্বিতীয়টি, সূর্যোদয়ের পর, সলতানাতের বিভাগীয় কার্যাবলীর শুরুতে বাজানো হত, একে 'নৌবতে দৌলত' বলা হত। তৃতীয়টি, সন্ধ্যার নাকাড়া, লোকেদের আনন্দ এবং বিশ্রাম গ্রহণের সময়ে বাজানো হত, একে 'নৌবতে মুরাদ' বলা হত। প্রত্যেক মাসের শুরুতে এবং চতুর্দশ তিথিতে প্রসন্নতার নাকাড়া বাজানোর আদেশ ছিল। একে 'নাক্কাড়া এ শাদিয়ানা' বলা হত।[২] সম্ভবত, এরই উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কালের মোগল সম্রাটগণ নৌবতখানা ব্যবস্থা চালু করেন।

ন্যায়ের তবলা (তবল-এ-আদিল)

হুমায়ূন 'গর্জনকারী মেঘের সমান' এক তবলা (বা ঢাক বা ঢোল) দীওয়ানখানার দরজার কাছে রাখার ব্যবস্থা করেন। ন্যায় বিচার প্রার্থীরা এটি বাজাত। এটি বাজানোর নিয়ম এইভাবে নিশ্চিত করা হয় যেন শ্রবণকারী অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারেন। সাধারণ ঝগড়ায় ছড়ি একবার, বেতন না পেলে দু'বার, সম্পত্তি অপহরণ হলে তিনবার এবং কেউ নিহত হলে চারবার বাজানোর আদেশ ছিল।[৩]

ন্যায়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে একে ন্যায়ের তবলা (তবল-এ-আদিল) বলা হত।

হুমায়ূনের এ আদেশ কোনো নতুন আদেশ ছিল না। ইরানের শাসকরা এই ধরনের ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। পরে সম্ভবত এরই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাহাঙ্গীর এই ন্যায়ের শৃঙ্খলা (শিকল) চালু করেন।

আনন্দ মঙ্গলের কালীন (বিসাতে নিশাত)

হুমায়ূন এক আনন্দ মঙ্গলের কালীন নির্মাণ করান।[৪] এটি গোলাকার ছিল এবং এটি তাত্ত্বিক গ্রহ-নক্ষত্রের পথের অনুরূপভাবে বিভাজিত ছিল। প্রথম বৃত্ত

১. ফিরিশতা, ফা. পৃ. ২১৩ ; ব্রিগস, ২ পৃ. ৭১। ফারসিতে মজলিস শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, ব্রিগস এর অনুবাদ করেছেন 'হল অব অডিয়েন্স'। এইভাবে প্রথম মজলিসকে 'প্যালেস অব মুন' এবং দ্বিতীয়টিকে 'প্যালেস অব আতারিদ' করেছেন। এই আবিষ্কারের কথা শুধুমাত্র ফিরিশতা বর্ণনা করেছেন।

২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৮১ - ৮২।

৩. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ, ৮২ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬১ - ৬২ ; আর্সকিন, ২, পৃ. ৫৩৩ - ৩৪।

৪. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৮০ - ৮১ ; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাটলাস রূপী আকাশের অনুরূপ, সদাচারীদের কর্মানুসারে শ্বেত বর্ণের, দ্বিতীয়টি নীলা, তৃতীয়টি শনি গ্রহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে কালো, চতুর্থটি ভাগ্যশালী বৃহস্পতির সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে ধূসর বর্ণের, পঞ্চমটি মঙ্গল গ্রহের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে লাল রঙের, ষষ্ঠটি সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সোনালী রঙের সোনা রূপার তারের জালিকা দিয়ে বানানো কাপড়ের, সপ্তমটি শুক্রগ্রহের অনুরূপ উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের ; অষ্টমটি বুধের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় কারণে বেগুনি রঙের[৪] এবং নবমটি চন্দ্রের অনুরূপ শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের মতো শুভ্র ছিল। চন্দ্রবৃত্তের উপরাংশটি অগ্নি এবং বায়ুর বৃত্ত ক্রমে রাখা হয়, তারপর মাটি ও পানিকে। পৃথিবীর বসতি অংশটি সাতটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সাতটি গ্রহের বৃত্ত দু'শ' শ্রেণীতে বিভাজিত ছিল, এইভাবে এই কালীনের উপর ১,৪০০ মানুষ বসতে পারত। এই কালীন বরাবর একটি কাঠের চৌকি ছিল, যার উপর এটি বিছানো হত। হুমায়ূন স্বয়ং সূর্যের সাথে সম্পর্কিত ষষ্ঠ গ্রহে উপবেশন করতেন। অন্য লোকেদের সাতটি গ্রহের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসানো হত। উদাহরণ, ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমীর এবং শায়খেরা কৃষ্ণবর্ণের বৃত্তটিতে উপবেশন করতেন, যেটি শনির সাথে সম্পর্কিত ছিল। সৈয়দ এবং পণ্ডিতেরা হল-গৃহের ধূসর বর্ণের বৃত্তে[১] উপবেশন করতেন, কেননা, এ বৃত্ত বৃহস্পতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উপর্যুক্ত বৃত্তগুলোতে উপবেশন করে কখনো কখনো লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাশা ফেলতেন। পাশার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে মানুষের আকৃতি আঁকা থাকত, যাঁর কাছে যে ভঙ্গির পাশা পড়ত তাঁকে ঐ ভঙ্গিতে দাঁড়াতে কিংবা বসতে হত। এইভাবে এ এক আনন্দময় ক্রীড়ায় পরিণত হত, যা থেকে সম্রাট ও আমীররা আনন্দ লাভ করতেন।

AMARBOI.COM

কাচের বিশেষ প্রকারের শোষক

মাছি ও ধুলো বালি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ প্রকারের কাচের পাত্রের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি পানাহার সামগ্রী ব্যবস্থাপকদের দরবারে শরবত ইত্যাদি পরিবেশন এই সমস্ত পাত্রে করার জন্য আদেশ দেন।[২]

তাজে ইজ্জত

হুমায়ূন (১৫৩২ - ৩৩ খ্রি. ৯৩৯ হি.) একটি মুকুট প্রস্তুত করান[৩] যা নতুনত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এতে অনেক বহুমূল্য বস্তু, যেমন, ইউরোপীয় মখমল,

---

১. এই গ্রহের এই রঙ নির্বাচনের জন্য বিস্তারিত দেখুন, খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ পৃ. ৮০ ; এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ৪ পৃ. ১০৫৮ - ৫৯।
২. খন্দমীর কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৮০ - ৮১; আকবরনামা, ১, পৃ. ৩৬১।
৩. খন্দমীর কানুনে হুমায়ূনী বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৮১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা-রুপোর জালিকা দিয়ে নির্মিত সাটন, সতরঙ্গে তাজা (এক প্রকারের রেশমি কাপড়)। উরমূক (এক প্রকারের রেশমি তুলোট কাপড়), খিংখাব ইত্যাদি উত্তম পদ্ধতিতে লাগানো হয়েছিল। প্রত্যেক টোপ এ ফারসির সাত অঙ্কে (V)-র মতো একটি করে কাটা অংশ থাকত, দুটি কাটা অংশকে মেলে সাতাত্তর (VV)-এর আকৃতি লাভ করত। এই তাজকে 'তাজে ইজ্জত' বলা হত। আবজাদ-এর ভিত্তিতে এই ইজ্জত-এর জোড়ও ৭৭ হত। ইসলাম ধর্মে সাত সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব থাকার কারণে এই মুকুট নির্মাণে সাতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১] এই তাজও জোতিষ-এর ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল, যাতে পরিধানকারী ভাগ্যশালী হন।

বিশেষ কোট বা প্রত্যেক দিনের জন্য বিশেষ রঙের বস্ত্র

হুমায়ূন উলবাকতা নামক এক বিশেষ প্রকারের কোট তৈরি করিয়েছিলেন। এটি সামনে খোলা এবং কোমর পর্যন্ত লম্বা হত। এটি আংরাখার উপর পরা হত।[২]

গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে হুমায়ূন প্রত্যেক দিন বিশেষ বর্ণের বস্ত্র এবং ঐ বর্ণের মুকুট ধারণ করতেন। এই রকমই তিনি শনিবারে কালো, রবিবারে পীত, সোমবারে শ্বেত, মঙ্গলবারে রক্তিম, বুধবারে ধূসর, নীলা বা রেশমি বর্ণের এবং শুক্রবারে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ধারণ করতেন।[৩]

AMARBOI.COM

নৌকা সজ্জা

বিশেষ প্রকারের প্রমোদ তরণী : বিশেষ প্রযুক্তিতে মূল্যবান কাঠ দিয়ে হুমায়ূন যমুনা নদীতে ছয়টি বজরা (হাউস বোট) নির্মাণ করেন। প্রত্যেকটি বজরার দু'তলায় চৌকোণা সুন্দর কামরা ছিল। নৌকাগুলোর মুখোমুখি করে বিশেষ ভাবে মিলিয়ে দেওয়ার ফলে মধ্যবর্তী স্থানে একটি অওষ্টভূজাকৃতি হাউজ তৈরি হয়ে যেত। এই কামরাগুলো এত সুন্দর ঢঙে বহুমূল্য বস্তুরাজি দিয়ে সজ্জিত করা হত যে, দর্শক তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত। মওলানা ইউসুফ তাবীব, জালালউদ্দীন ওয়াইস মুহম্মদ প্রমুখ এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।[৪]

নৌকায় বাজার : নৌকায় বাজার লাগানোর প্রথাও হুমায়ূন প্রবর্তন করেন। এ জন্য বিশেষপ্রকারের লম্বাচওড়া নৌকা নির্মিত হয়। এগুলোর উপর দুই দিকে দোকান তৈরি করানো হয়। প্রত্যেক পেশা এবং কলাকৌশল জানা লোকেদের এতে দোকান খুলে ব্যবসা করার আদেশ দেওয়া হয়। নৌকার সুসজ্জিত বাজার সমেত হুমায়ূন নিজের রাজত্বের প্রথম বর্ষে দিল্লি থেকে আগ্রার দিকে প্রস্থান করেছিলেন। পথিমধ্যে

১. হিউগস, এ ডিকশনারি অব ইসলাম, পৃ. ৫৫০, ৫৬৯ - ৫৭০।
২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৫০।
৩. ঐ, পৃ. ৫০ - ৫২ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৬১।
৪. ঐ পৃ. ৩৬ - ৪০ ; ঐ পৃ. ৩৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেক ব্যক্তির পানাহার, বস্ত্র, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রয়োজন হলে এই নৌকা-বাজার থেকে তা পাওয়া যেত।[১] এ এক প্রকারের চলমান বাজার ছিল। এ থেকে মোগল সম্রাটদের যাত্রা পথে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যেত।

নৌকা-উদ্যান : এরকমই, সম্রাটের আদেশে নৌকায় তক্তা বিছিয়ে তাতে মাটি ফেলে দিয়ে তাকে কৃষিযোগ্য উদ্যানে পরিণত করা হয়। এইভাবে কৃষিযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করা হয় যাতে বিভিন্ন প্রকারের ফুলফল ও তরি-তরকারি লাগানো যায়।[২] এইভাবে নদীতে সবুজে ভরা উদ্যানও সম্রাটের সাথে পরিভ্রমণ করত।

চলমান পুল : বহু সংখ্যক নৌকা পরস্পর মিলিয়ে শিকল কিংবা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। তার উপর তক্তা বিছানো হত এবং সেগুলো পেরেক দিয়ে এমনভাবে গেঁথে দেয়া হত যে, ঘোড়সওয়ার চললেও তা টলত না। এইভাবে এর উপর দিয়ে হাতি, উট ইত্যাদিকে নদী পার করাতে বড় সুবিধা হত। পুলের প্রয়োজন না থাকলে নৌকাগুলো পৃথক করে দেওয়া হত এবং সেগুলোকে তখন অন্য কাজে লাগানো হত।

চলমান রাজপ্রাসাদ : এ মহল বা প্রাসাদ কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল এবং তাকে ইচ্ছামতো যে কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া যেত। ছুতোর মিস্ত্রিরা একে এমন সুন্দর ঢঙে নির্মাণ করেছিল এবং কাঠের দু'টুকরো জোড়ার কাজে এমন কৌশলের পরিচয় দিয়েছিল যে, দেখলে মনে হত তা এক কাষ্ঠ নির্মিত রাজপ্রাসাদ। এ ছিল তিন-তলা বিশিষ্ট। সবচেয়ে উঁচু তলায় পৌঁছানোর জন্য সিঁড়ি তৈরি করানো হয়েছিল যা ইচ্ছামতো খাটানো এবং খোলা যেত। চিত্রকররা এই মহলের নানা বর্ণের রঙ দিয়ে সুসজ্জিত করে দিয়েছিল। এই মহলের মাথায় শোভা পেত একটি সোনার গম্বুজ যা সূর্যের মতো ঝকমক করত। প্রাসাদের দরজাগুলোতে খোতান, তুর্কি ও ইউরোপ থেকে আনানো কাপড়ের পর্দা শোভা পেত।[৩]

বিচিত্র তাঁবু

হুমায়ূন একটি বড় তাঁবুও নির্মাণ করান। এটি আকাশের বারোটি রাশিচক্রের ভিত্তিতে বারোটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। এর প্রতিটি কক্ষে ঝরোকা বানানো ছিল। এগুলো থেকে সূর্যের আলো প্রবেশ করে অদ্ভুত শোভা সৃষ্টি করত।[৪]

এছাড়া হুমায়ূন আরো একটি তাঁবু নির্মাণ করিয়েছিলেন যা খুবই বড় ছিল এবং সমস্ত তাঁবুকে ঢেকে নিত। এতে কোনো ঝরোকা ছিল না। কাঠের সুন্দর সুন্দর টুকরো

---

১. ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪।
২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৪৪ - ৪৫ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৬১।
৩. ঐ পৃ. ৪৫ ; ঐ পৃ. ৩৬০।
৪. ঐ, পৃ. ৪৬ - ৪৭ ; ঐ পৃ. ৩৬০।
৫. ঐ, পৃ. ৪৮ - ৪৯ ; ঐ, পৃ. ৩৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়ে স্তম্ভ তৈরি করে তার উপর এটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। এই তাঁবুতেও কয়েক প্রকারের রঙ ছিল। খাঁড়া করার পর এটি খুব উঁচুতে উঠে যেত।[১]

হুমায়ূন সম্পর্কিত স্মারক

ভবন নির্মাণ ও স্থাপত্য কলায় হুমায়ূনের খুবই আকর্ষণ ছিল। খন্দমীর লিখেছেন, হুমায়ূনের সুন্দর ভবন ও দুর্গ নির্মাণের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল।[২] ঐ সময় অবধি সুযোগ-সুবিধা পেলে তিনি নিশ্চয়ই সুন্দর ভবনের রূপে তিনি সৃজনশীল গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন কিন্তু জীবনের উথাল-পাথাল ও বিড়ম্বনার কারণে এমনটি সম্ভব হয় নি।[৩] তা সত্ত্বেও হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত অথবা তাঁর দ্বারা নির্মিত কিছু ভবনের কথা আমরা জানতে পারি।

রাজত্বের প্রারম্ভিক যুগে হুমায়ূন দীন পনাহ-য় নিজের রাজধানী স্থাপন করে সেখানে অনেক ভবন নির্মাণ করান।[৪] দীন পনাহ-র ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে দিল্লির পুরানা কেল্লায় দেখা যায়। নগর লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু দুর্গের বাহ্য প্রাচীর ও একটি দরওয়াজা (খুনী দরওয়াজা) অস্তিত্ব আজও রয়েছে, যার ফলে গড়ের স্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। এটি তিন ফার্লং লম্বা এবং দেড় ফার্লং চওড়া। প্রাচীর চল্লিশ ফুট উঁচু। সে যুগে যমুনা ঐ স্থানে দিয়ে প্রবাহিত ছিল বর্তমানে সেখানে নিজামউদ্দীন রেল স্টেশন রয়েছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে দুর্গ থেকে যমুনার জলছবির আনন্দ নেওয়া যেত। দুর্গ যমুনার পানিতে ঘেরা থাকত। এ ইমারতের নির্মাণকাজ পুরনো হয়ে না যেত এবং নষ্ট না হত তা হলে বাস্তুকলার ইতিহাসে এর একটি বিশিষ্ট স্থান থাকত।

পুরানো কেল্লাতেই হুমায়ূনের পুস্তকালয় রয়েছে।[৫] এটি গ্রানাইট ও লাল পাথরে নির্মিত একটি দো-তলা ভবন। এর সিঁড়ি পাতলা। এতে আজো কিছু তাক আছে, যাতে বই রাখা হত। এই ভবনের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ূনের মৃত্যু হয়। পুরাতন কেল্লার মধ্যস্থলে একটি গভীর কূপ রয়েছে। এটি হুমায়ূন নির্মাণ করান যাতে দুর্গে পানির অভাব না হয়।[৬]

সেলিম গড় দুর্গের নিকট যমুনা-তটে নীলী ছতরী (নীল ছাতা) নামক ইমারত রয়েছে। এর গম্বুজ নীল টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি। এটি ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন কর্তৃক নির্মিত হয়।[৭]

---

১. খন্দমীর কানুনে হুমায়ূনী বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৪৮ - ৪৯ ; আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৬১।
২. খন্দমীর কানুনে হুমায়ূনী বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৫৫।
৩. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৪ পৃ. ৫২৪।
৪. দীন পনাহ-র স্থাপনার জন্য দেখুন এই পুস্তকের পৃ. ১১৯।
৫. এই ইমারতের জন্য দেখুন জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭১ খ্রি. পৃ. ১৩৫ ; কার স্টিফেন- আরকিওলজিকাল অ্যান্ড মনুমেন্টাল রিমেন্স অব ডেলহি পৃ. ১৯৩ - ৯৪।
৬. স্পীয়র, ডেহলি, উস্‌কে স্মারক আউর ইতিহাস পৃ. ৩৩।
৭. জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন; "এই ইমারতের নিচে পানির কাছে একটি চৌকোণা ঘাট বাদশাহ হুমায়ূনের আদেশে নির্মিত হয়, যার উপর উজ্জ্বল খপরাইল লাগানো ছিল এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি হুমায়ূনের গভীর ভালবাসা ছিল। সুলতানী আমলে আমীর খসরু ফারসি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি ছিলেন। এঁর মকবরায় হুমায়ূন একটি অভিলেখ (শিলালিপি) নির্মাণ করান যা আজও মজুত রয়েছে। তিনি ৯৩৮ হিজরিতে (১৫৩১ খ্রি.) এর অভ্যন্তরে একটি চার কোণা প্রাচীর তৈরি করান, তার উপর শ্বেত-পাথর লাগান এবং তাঁর কবরে একটি শ্বেত পাথরের সমাধি প্রস্তর রাখেন।[১] ঐ শিলালিপিতে খসরুকে তিনি "শব্দ সাম্রাজ্যের সম্রাট" ছাড়াও বিশিষ্ট ওলি বলেও অভিহিত করেছেন। শুধু কবি হিসেবেই নন ; বরং একজন ওলি হিসেবেও তাঁকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন।

আগ্রায় হুমায়ূনের কোনো ইমারত নির্মাণের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি মসজিদ, যা পতিতাবস্থায় রয়েছে, হুমায়ূন কর্তৃক নির্মিত বলে কবিতা আছে।[২] এই রকমই একটি মসজিদ ফতেহাবাদে (জেলা হিসার) রয়েছে। এটি একটি বৃহৎ এবং পূর্ণাঙ্গ ইমারত। এর খপরাইল এনামেলের তৈরি। সম্ভবত, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন এটি নির্মাণ করান।[৩] সারনাথে একটি চৌখণ্ডী স্তূপের একটি অষ্টভূজাকৃতির মিনার বা বুর্জ রয়েছে, যা হুমায়ূনের এখানে আগমন উপলক্ষে, তাঁর স্মৃতিতে রাজা টোডরমলের পুত্র গোবর্ধন কর্তৃক আকবরের আমলে নির্মিত হয়।[৪] সাহারানপুর জেলার নকুর তহসিলের গঙ্গোহ নামক গ্রামে শায়খ আবদুল্লাহ কুদ্দুসের মকবরা রয়েছে। এটি ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন নির্মাণ করিয়েছিলেন, যদিও এই বিশিষ্ট ওলির মৃত্যু এর ৬ বছর পরে হয়েছিল ; হুমায়ূন এই ওলির কুঠিতে তাঁর সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করেছিলেন।[৫] আজমগড় জেলার মহাল তহসিলের নিগূণ গ্রামে একটি মসজিদ আছে, যেটি হুমায়ূনের আমলে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[৬] এই রকমই কালিঞ্জরের জলাশয়টিও তাঁর আমলে ৯৩৬ হিজরিতে খনন করা হয়েছিল।[৭]

উপর্যুক্ত ইমারতগুলো ছাড়াও আরো কিছু ইমারত নির্মাণ বিষয়ে কেবল সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়। খন্দমীর লিখেছেন, আগ্রায় হুমায়ূন 'ইমারতে

এমন ইবাদার স্থান খুব কমই আছে। মরহুম সম্রাট হুমায়ূন দিল্লিতে অবস্থানকালে তাঁর বিশিষ্ট জনদের সাথে এখানে বসতেন এবং দরবারিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন।" জাহাঙ্গীরের আত্মকথা, ব্রজরত্ন দাস কর্তৃক হিন্দিতে অনূদিত পৃ. ২০৮।

১. মির্জা ওয়াহিদ, লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অব আমীর খসরু, পৃ. ১৩৮ - ৩৯।
২. পার্সি ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইসলামিক পিরিয়ড, পৃ. ৯৬।
৩. ঐ স্মিথ, এ হিস্ট্রি অব ফাইন আর্টস ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সীলোন, পৃ. ১৫৮।
৪. মজুমদার বি. এ গাইড টু সারনাথ, পৃ. ২৬ - ২৭ ; জার্নাল ইউ. পি. হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, খণ্ড ১৫, পৃ. ৫৫ - ৬৪।
৫. আঈনে আকবরী. ৩ পৃ. ৪১৭ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন ২, পৃ. ৩৪৯। গঙ্গোহ সাহারানপুর থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।
৬. ব্যানার্জি, হুমায়ূন, ২, পৃ. ৩৪৯ - ৫০।
৭. ঐ পৃ. ৩৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিলিসম্' নির্মাণ করেছিলেন, যার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।[১] হুমায়ূন আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে ঐ স্থানে, যেখানে হিঁদু রাজাদের আমলে কোষাগার ছিল, একটি মহল নির্মাণ করান। এই মহলে বহুসংখ্যক কামরা এবং দালান ছিল আর এটি এতই উঁচু ছিল যে, উপরে উপবেশনকারী ব্যক্তির মনে হত সে আকাশে বসে আছে। এখান থেকে যমুনা সাত আট মাইল দূর অবধি দেখা যেত।[২] গোয়ালিয়রে হুমায়ূন খোদাই করা পাথর দিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করান এবং তাকে অত্যন্ত সুন্দর ঢঙে সাজানো হয়। খন্দমীর এই ইমারতকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য নিদর্শন বলে অভিহিত করেন।[৩]

হুমায়ূন কর্তৃক নির্মিত ইমারতগুলো বাস্তুকলার দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা সত্ত্বেও এ থেকে প্রকট হয় যে ইমারত নির্মাণে হুমায়ূনের খুবই আগ্রহ ছিল এবং সময় ও সুবিধা পেলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভবনাদি নির্মাণ করাতেন। তাঁর ইরান নিবাসও ব্যর্থ যায় নি। সেখান থেকে তিনি কলা-তত্ত্ব সাথে করে নিয়ে আসেন, যা পরে ভারতীয় কলার সাথে মিশে গিয়ে মোগল কলার অঙ্গে পরিণত হয়।

হুমায়ূনের মকবরা

হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত স্থাপত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর মকবরা যা হুমায়ূনের মকবরা নামে সুপ্রসিদ্ধ। এটি আকবরের আমলে নির্মিত হয়। সাধারণত, শাসকগণ নিজেদের মকবরাগুলো তাঁদের জীবৎকালেই নির্মাণ করিয়ে নিতেন। দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূন এ সময় পান নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী হাজী বেগম (বেগা বেগম) এ কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সম্রাটের মৃত্যুর আট বছর পর (১৫৬৪ খ্রি.) বেগম এই মকবরার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করান।

AMARBOI.COM

এ মকবরা দিল্লিতে দীন পনাহ-র নিকট নির্মিত হয়। এর নিকট নিজামউদ্দীন আউলিয়ার[৪] দরগাহ রয়েছে, যেখানে সে সময়েও অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করত, যেমন আজও করে। এর নির্মাণকাজ শুরুর সময়ে আকবরের রাজধানী ছিল আগ্রায়। এর প্রধান বাস্তুকার ছিলেন মীরাক মির্জা গিয়াস, যিনি সম্ভবত ইরানী ছিলেন। মকবরার কাছেই একটি আরব সরাই আছে। এ নাম সম্ভবত কারিগর

---

১. এই পুস্তকের পৃ. ১২০-২১।

২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৫৮-৫৯ ; তিন চার কুরোহ লিখেছেন। কুরোহ (সংস্কৃতের ক্রোশ) দু'মাইলের সমান ছিল। প্রাচীন কালে মগধের ক্রোশ ছিল ১½ মাইল এর সমান ।

৩. ঐ পৃ. ৫৯।

৪. বিখ্যাত সাধক হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ-সংলগ্ন এই বিশাল এলাকাটি 'হযরত নিজামউদ্দীন' নামে পরিচিত। —অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারগুলোর বসতির কারণে হয়েছে, যাঁরা এই মকবরা নির্মাণ করেন। ভবনে বিদেশী প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এর অধিকাংশ কারিগর ভারতীয় ছিলেন।[১]

এই মকবরার চারিদিকে পার্ক রয়েছে আর এর চারিদিকে ঘিরে রয়েছে উঁচু প্রাচীর। এই প্রাচীরের চারটি দিকের মধ্যভাগে একটি করে দ্বার রয়েছে। এর প্রধান দ্বারটি পশ্চিমে রয়েছে। অন্য দ্বারগুলো কেবল সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নির্মিত হয়েছে। দরবারে প্রবেশ পথেই যে পার্ক পাওয়া যায়, তাতে মোগল আমলের নানা রকমের গাছপালা দ্বারা সজ্জিত থাকত। লোদীর আমলে মকবরার চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণের প্রণালী তো শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এইভাবে মকবরার সাথে চৌকোণা উদ্যান ব্যবস্থার এই হল প্রধান এবং প্রথম ইমারত।[২] এর নির্মাণে লাল এবং শ্বেত পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ ইমারত লাল পাথরের এবং গুম্বজ শ্বেত পাথরের। মাঝে মাঝে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যও শ্বেত পাথরের প্রযুক্ত হয়েছে। মকবরা ২২ ফুট উঁচু চতুষ্কোণ চবুতরার উপর নির্মিত হয়েছে। এর নির্মাণ এমনভাবে হয়েছে যে, এর ছাদ থেকে কয়েকটি কামরা বেরিয়ে এসেছে। সম্ভবত এখানে বিদ্যার্থীরা বিদ্যাভ্যাস করত।

হুমায়ূনের মকবরা থেকে মোগল আমলের বাস্তুকলার বাস্তবিক ইতিহাস শুরু হয়েছে। এর আগেকার মোগল ইমারত নগণ্য এবং সে সবের শিল্পমূল্যও খুব কম। এর বিশেষত্বের কিছু কারণ আছে। এর গুম্বজকে পূর্ণ গুম্বজ বলা হয় অর্থাৎ এ পূর্ণ অর্ধবৃত্ত। গুম্বজের চূড়া চন্দ্রাকার, কমলাকার নয়। এর কারণ ইরানী প্রভাব। এর পরবর্তীকালের গুম্বজগুলোর চূড়া (যেমন তাজমহল) কমলাকার। এই গুম্বজ নির্মাণেও বিশেষত্ব রয়েছে। এর মেহরাবেও ইরানী প্রভাব রয়েছে। মকবরা সংলগ্ন উদ্যান এর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।[৩] তাজমহল নির্মাণের সময়ে তার বাস্তুকার হুমায়ূনের মকবরা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং দুই ইমারতের মধ্যে কয়েক দিক দিয়ে মিল রয়েছে। ইরানী প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ইমারত।[৪]

হুমায়ূনের মকবরার নিচে ভূমিগৃহে মোগল পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বহু কবর রয়েছে। এইগুলোতে কোনো শিলালিপি না থাকায় জানা সম্ভব নয় যে,

---

১. "There is little doubt that the masnory of the building was done by Indian craftsmen." হ্যাভেল, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ফ্রম দি ফার্স্ট মুহমেডান ইনভেসন টু দি প্রেজেন্ট ডে. পৃ. ১৬৩।

২. ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ইসলামিক পিরিয়ড, পৃ. ৯৭।

৩. "The innovation here seems to have been more the association as a garden with a tomb than the style as the garden itself. হ্যাভেল, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার পৃ. ১৬৩। হুমায়ূনের মকবরার উদ্যানের জন্য দেখুন, উইলিয়াম স্টুয়ার্ট, গার্ডেন অব দি গ্রেট মুগলস পৃ. ৯৫-৯৭।

৪. "With all the persian elements in the details the plan as the whole building is characteristically Indian." হ্যাভেল, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার পৃ. ১৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনটি কার কবর। শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহর প্রাণদণ্ডের পর, কোন সংস্কারকর্ম ছাড়াই এই মকবরায় তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।[১] আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরেও কয়েক রাজকুমার ও মৃত সম্রাটকেও এখানে দাফন করা হয়।[২] এখানে এত কবর রয়েছে যে, হুমায়ূনের মকবরাকে তৈমুরী বংশের কবরস্থান বলা হয়। মোগল বংশের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ ও তাঁর পুত্ররাও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পালিয়ে হুমায়ূনের মকবরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানেই তাঁদের বন্দি করা হয়[৩] এবং বাহাদুর শাহের দুই পুত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিধির কি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা ছিল যে, মোগল সাম্রাজ্যের পতনও এই মকবরায় হল।

মোগল চিত্রকলা ও হুমায়ূন

ফারসি ও তুর্কি ভাষায় চিত্রকরকে মুসাব্বির বলা হয়। কুরআনে আল্লাহর উদ্দেশ্যেও এই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ভাস্কর্য, প্রতিমা নির্মাণ ও ভবিষ্যদ্বাণী এ সবই শয়তানের কাজ, এ কারণে মুসলমানদের এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাকে ঘোর নরকে নিক্ষেপ করা হবে, কেননা, সে তার চিত্রিত মূর্তিরাজিতে প্রাণ-সঞ্চারে সমর্থ হবে না। কুরআন ও হাদীসের এই ভাষ্যের কারণে কট্টর মুসলমানরা চিত্রকলার ঘোর বিরোধিতা করেছেন, তা সত্ত্বেও ইসলামী দেশগুলোতেও[৪] এ সম্পূর্ণ নির্মূল হতে পারেনি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতে প্রাচীন চিত্রকলার ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এর বিপরীতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানে চিত্রকলার উন্নতি হচ্ছিল। বিখ্যাত চিত্রকর বিহজাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর চিত্রকলার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তাঁর ঘরানা জীবিত ছিল। তাঁর শিষ্য আগা মীরাক, সুলতান মুহম্মদ ও মুজাফফর আলী খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।[৫] ইরানে পুস্তক-চিত্রণের কলাও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল।

---

১. সরকার হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব, ১-২ পৃ. ৫৪৯-৫০।

২. ইরউইন, লেটার মুগলস, ১, পৃ. ৩৪, ২৫৬।

৩. সুরেন্দ্রনাথ সেন, এইটিন-ফিফটি-সেভেন পৃ. ১০৯-১১১ ; মজুমদার আর সি দিং, সিপাই মিউটিনি অ্যান্ড রিভোল্ট অব ১৮৫৭, পৃ. ৭৪-৭৫।

৪. লেখকের এ পর্যবেক্ষণ ইসলামের মূল নীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ইসলাম নিষ্প্রাণ চিত্রকলার বিরোধিতা করে না। কিন্তু সে ভাস্কর্য, মূর্তি বা প্রাণ আছে এরকম চিত্র অঙ্কনের বিরোধিতা করে। কেননা, পৌত্তলিকতা ও মূর্তির প্রশ্নে ইসলাম আপসহীন। তাছাড়া তিনি লিখেছেন "ইসলামী দেশগুলোতেও।" এও ভুল। এ ক্ষেত্রে ইসলামী দেশ এর সংজ্ঞা নিরূপণ একান্ত জরুরি। বরং লেখকের বলা উচিত ছিল মুসলিম দেশ। কেননা ইসলামী দেশ, ও মুসলিম দেশ, সমার্থক নয়। —অনুবাদক

৫. ব্রাউন, পার্সি ইন্ডিয়ান পেন্টিং আন্ডার দি মুগলস, পৃ. ৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের মধ্যে শিল্প চেতনার অভাব ছিল না। ইরানে তিনি ঐ সমস্ত চিত্রকলা থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের চিত্রকর্ম দেখেছিলেন। তবরেজ এ মীর সৈয়দ আলী নামক এক চিত্রকর যুবকের সাথে হুমায়ূনের পরিচয় হয়। মীর সৈয়দ আলীর পিতা মীর মনসুর বাদাখশানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কুশলী চিত্রকর ছিলেন। তবরেজ এ বিহজাদের নিল্প ঘরানার সংবাদ পেয়ে তিনি ও তাঁর পুত্র বাদাখশান থেকে তবরেজ-এ আসেন। এখানে মীর সৈয়দ আলী চিত্রকলায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তিনি কবিও ছিলেন এবং 'জুদাই' উপনামে কবিতা লিখতেন।[১] তবরেজ-এ হুমায়ূনের খ্বাজা আবদুস সামাদ নামক অন্য এক চিত্রকরের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তিনি সিরাজের গভর্নর শাহসুজার উজির খাজা নিজাম-উল-মুলক-এর পুত্র ছিলেন। আবদুস সামাদ ঐ সময়ে চিত্রকলা ও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হুমায়ূন তাঁকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঐ সময়ে হুমায়ূনের কোনো রাজ্য ছিল না এবং তিনি স্বয়ং ইরানের শাহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই কারণে আবদুস সামাদ ঐ সময়ে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি।

কিছুদিন পর হুমায়ূনের কাবুল অধিকার করার পর আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলী ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।[২] এ দুই চিত্রকরের দ্বারা হুমায়ূনের আমন্ত্রণ গ্রহণের দিনটি ছিল মোগল চিত্রকলার ইতিহাসের একটি সোনালী দিন। মোগল চিত্রকলার ইতিহাস ঐ দিন থেকে শুরু হয়।

হুমায়ূন ও তাঁর পুত্র আকবর এই চিত্রকরদের কাছ থেকে চিত্রাঙ্কন শেখাও শুরু করেন।[৩] এ থেকে মোগল সম্রাটদের চিত্রকলার প্রতি আগ্রহের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হুমায়ূন চিত্রকরদের ফারসি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দাস্তানে আমীর হামজা' চিত্রণের আদেশ দেন। প্রারম্ভিক পরিকল্পনা অনুসারে একশ'টি করে চিত্র অঙ্কন করে বারো খণ্ড গ্রন্থের কাজ শেষ করার কথা ছিল। অর্থাৎ মোট ১২০০ চিত্র অঙ্কন করার কথা ছিল। সাত বছরের পরিশ্রমে এঁরা চারটি খণ্ড প্রস্তুত করেন।[৪] এই চিত্রগুলো কাপড়ে করা হয়। চিত্র বড় আকার ২২″ × ২৮ $\frac{১}{৪}$″-এর। এই চিত্রগুলোতে ইরানী, বিশেষত, বিহজাদ এর শৈলীর স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও এতে ভারতীয়ত্বের ঝলক স্পষ্ট।[৫] এই চিত্রগুলোকে দুই চিত্রকর অন্য

১. ব্রাউন, পার্সি ইন্ডিয়ান পেন্টিং আন্ডার দি মুগলস, পৃ. ৫৩।
২. আকবরনামা, ১, পৃ. ২৯২।
৩. ব্রাউন, ইন্ডিয়ান পেন্টিং আন্ডার দি মুগলস, পৃ. ৫৪।
৪. ঐ আঈনে আকবরী, ১ পৃ. ১১৫
৫. It is interesting to find even of this early school-called the school of Humanun by Clarke—an unmistakalble Indian feeling. The manner of the Tumuride styles is dominant in the delineation of landscape and arehitecture in the rendering of clouds rocks water trees and animals. but in the selection of recial types drapery and attitudes there is greater freedom and in grouping still more. তারাচাঁদ, ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কালচার, পৃ. ২৭০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগীদের সহায়তায় অঙ্কন করেন। এই কাজ শুরু হওয়ার কিছুদিন পর হুমায়ূন ভারতীয় অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন, ফলে এই কাজের তত্ত্বাবধান করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও কাজ চলতে থাকে। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবর এই কাজ পুরা করেন। দুই চিত্রকর আকবরের আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং মোগল চিত্রকলার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবর আবদুস সামাদকে "শীরীন কলম" (মধুর কলম) উপাধি দেন এবং তাঁর রাজত্বের দ্বাবিংশতম বর্ষে এঁকে ফতেহপুর সিকরির শাহী টাকশালের অধিকারীও নিযুক্ত করেন এবং পরে রাজত্বের একত্রিংশতম বর্ষে তাঁকে দীওয়ান করে মুলতান পাঠান। আবদুস সামাদ চারশ' মনসবদারের পদ লাভ করেন, কিন্তু প্রভাব ও সম্মানের দৃষ্টিতে তাঁর একটি বিশেষ স্থান ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পোস্ত বীজের উপর কুরআনের পুরো ১১৩ টি সুরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১] আকবরের আমলের মুদ্রায়ও আবদুস সামাদের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

এইভাবে হুমায়ূন মোগল চিত্রকলার বীজ বপন করেন। তিনি চিত্রকলার বিকাশের পটভূমি প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন আর আকবরের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তা এক ছায়াদার বৃক্ষ রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্য প্রীতি

হুমায়ূন বিদ্বান ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। মোগল সম্রাটদের মাতৃভাষা ছিল চুগতাই তুর্কি কিন্তু তিনি দেশত্যাগের পর ধীরে ধীরে এই ভাষা ত্যাগ করে ফারসি ভাষা রপ্ত করে নিয়েছিলেন। ফারসি ঐ যুগে এশিয়ার দেশগুলোতে সভ্য লোকেদের ভাষা বলে পরিগণিত হত। সুলতানী আমলে রাজভাষা ছিল ফারসি। মোগলরা তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। এইভাবে ফারসি ভাষা মোগল আমীর ও দরবারের প্রধান ভাষা বনে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মোগলরা এ অবধি মাতৃভাষা ত্যাগ করেন নি। অবসর পেলে তাঁরা তুর্কি ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। বিশেষত, যখন অন্য কেউ তাঁদের কথা না বুঝত তখন তাঁরা তুর্কি ভাষায় কথা বলতেন। হুমায়ূনও এই অবসরে এই ভাষা ব্যবহার করতেন। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে করাচা খাঁ যখন নিজের গলায় তরবারি ঝুলিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হন তখন হুমায়ূন তুর্কি ভাষায় বলেন "সৈনিক নিজের জীবৎকালে এই ধরনের ভুল করতেই থাকে" এবং তিনি তাঁকে ক্ষমা করার আদেশ দেন।[২]

"There is something in this work which is not Safavid, in some way it is reminisent of the Rajput style, vaguely suggestive of an indian environments" ব্রাউন ইন্ডিয়ান পেন্টিং আন্ডার দি মুগলস, পৃ. ৫৬।

১. আঈনে আকবরী, ব্লকম্যান পৃ. ৫৫৫।

২. আকবরনামা ১ পৃ. ২৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে, কামরানের আত্মসমর্পণের পর (২২ আগস্ট ১৫৪৮ খ্রি.) যখন তাঁকে দরবারে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি সম্রাটের থেকে সরে বসলেন। হুমায়ূন তুর্কি ভাষায় বললেন, "আরো কাছে বসো।"[১] এইভাবে হুমায়ূন তাঁর তুর্কি ভাষায় জ্ঞানের সদ্ব্যবহার অন্য উপলক্ষেও করেন।[২]

হুমায়ূন আরবি ভাষাও জানতেন। জওহর ও নফায়সুল মআসীরের লেখক আলাউদ্দৌলা ইবনে ইয়াহিয়া কজবীনী তাঁর কুরআন পাঠ এবং নিজের স্মৃতি থেকে কুরআনের বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অবসরে উদ্ধৃত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নক্ষত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্বান ছিলেন। সম্ভবত, তিনি আরবি ভাষা থেকে এতে সহায়তা লাভ করেন।

ফারসি ভাষায় হুমায়ূনের খুব ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি এই ভাষায় সহজে কথাবার্তা বলতে পারতেন। এই জ্ঞানের ফলে ইরানে তাঁর অনেক সুবিধা হয়।

তিনি ফারসি ভাষায় কবিতাও লিখতেন। আবুল ফজল তাঁর কবি ও কাব্যপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। কবিতা রচনায় তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। সময় সময় তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়ে অনেক উচ্চস্তরের কবিতা লিখতেন। তাঁর দীওয়ান[৩] আকবরের গ্রন্থাগারে ছিল[৪] বর্তমানে যা সহজপ্রাপ্য। এ ছাড়া তাঁর কবিতাবলী আবুল ফজল ও অন্য লেখকরা তাঁদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রেম ও সুফীতত্ত্ব[৫] বিষয়ক কবিতাও আছে। তাঁর কবিতাবলী স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সুগঠিত। তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে গজল ও রুবাইকে সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করা হয়।[৬] অন্য কবিদের কবিতার সংস্কার করার যোগ্যতাও তাঁর ছিল। বদায়ূনী এই ধরনের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন,[৭] যা থেকে তাঁর যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কবিতায় তিনি তাঁর উপনাম 'হুমায়ূন' দিয়েছেন। হুমায়ূনের প্রায় সমস্ত রচনাই ফারসিতে পাওয়া যায়। তাঁর কিছু পত্র ও কেবল একটি মাত্র কবিতা তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়।[৮]

---

১. ঐ পৃ. ২৮১।
২. অন্য উদাহরণের জন্য দেখুন, গণি, এ হিস্ট্রি অব পার্শিয়ান ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অব দি মোগল কোর্ট, ২, হুমায়ূন পৃ. ৭ - ৯।
৩. দীওয়ান শব্দের অর্থ কবিতা সংগ্রহ। ফারসিতে কবিতা সংগ্রহকে দীওয়ান বলা হয়।
—অনুবাদক
৪. আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৬৮ ; হাজী হাসান, দি ইউনিক দীওয়ান অব হুমায়ূন। দেখুন, জার্নাল, বিহার অ্যান্ড উড়িষা রিসার্চ সোসাইটি ১৯৩৯ খ্রি. পৃ. ৭১ ; ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন পৃ. ৩৭১ টিপ্পনী ২।
৫. সূফী কবি অর্থাৎ রহস্যবাদী কবি। —অনুবাদক।
৬. গনি, হিস্ট্রি অব পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, ২ পৃ. ১৩ - ২০।
৭. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ , ১ পৃ. ৪৭৮ - ৮১।
৮. গণি, হিস্ট্রি অব পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ পৃ. ৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন কেবল কবিই ছিলেন না ; বরং কবি এবং বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতাও ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ও উৎসাহে প্রভাবিত হয়ে ইরান, তুর্কিস্তান, বুখারা ও সমরকন্দের কবিরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এসে তাঁর দরবারে শোভা বর্ধন করতেন। বুখারার জাহী য়াজমান ও মাওরাউন্নহর-এর হায়রাতী কাবুলেই তাঁর দরবারে এসে গিয়েছিলেন। মাওলানা আবদুল বাকী সদর তুর্কিস্তানী, মীর আবদুল হাই বুখারী, খ্বাজা হিজরি জামী, মওলানা বজমী, মোল্লা মুহম্মদ সালীহ ও মোল্লা জান মুহম্মদ তাঁর দ্বিতীয়বার ভারত অভিযানের সময়ে তাঁর সাথে আসেন। মীর আবদুল লতিফ কজবীনী, মওলানা ইলিয়াস, মওলানা আবদুল কাসিম অস্তরাবাদী, খ্বাজা আইয়ুব, শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ফারিগী শিরাজী এবং শওকী তবরীজী ইরানের সফভী দরবার ও সেখানকার নগরগুলো থেকে এসেছিলেন।[১]

সীদী আলী রঈস হুমায়ূনের কাব্য-প্রেমের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হুমায়ূনের শাহী তীরন্দাজ খুশহালও এই কবি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন।[২] শায়খ আমানুল্লাহ পানিপথী হুমায়ূনের প্রধান কবি ছিলেন। তিনি সুফী এবং ধর্মশাস্ত্রবিশারদও ছিলেন। তিনি হুমায়ূনের প্রশংসায় অনেক কাসীদা রচনা করেন। তাঁর কবিতাবলী মাধুর্য, দরদ ও সরলতায় জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মওলানা কাসিম শাহী বিদ্বান ও কবি ছিলেন। হুমায়ূনের প্রশংসায় তিনিও কাসীদা, মসনভী ও গজল রচনা করেন। তিনি কামরানের সাথে হজ্বেও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন। হুমায়ূন ও কামরানের মৃত্যুর পর তিনি খুব সুন্দর একটি তিথিবন্ধ (Chronograms) রচনা করেন। মওলানা জুনূনী বাদাখশানের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। হুমায়ূনের বাদাখশান বিজয়ের পর তিনি তাঁর সেবা স্বীকার করেন। হুমায়ূনের প্রশংসায় তিনি এতে ৩৮টি শায়রের[৩] এক সুন্দর কাসীদা রচনা করেন। শায়খ জইনুদ্দীন খাফী 'বফাই' উপনামে কবিতা লিখতেন। তিনি বাবুরের সদর ছিলেন। তিনি আগ্রায় যমুনার তীরে একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। ১৫৩৩ - ৩৪ খ্রিস্টাব্দে চুনারের নিকট তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁরই নির্মিত মাদ্রাসায় তাঁকে দাফন করা হয়। বফাই-এর বন্ধু শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ফারিগী তাঁর মিষ্ট বাণীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এঁরও ১৫৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁকে আগ্রায় শায়খ জৈন এর খানকাহে দাফন করা হয়। অন্য প্রধান কবিদের মধ্যে খ্বাজা আইয়ুব, শাহ তাহির হায়দার তুনিয়াই, জাহী য়াতমান ও মওলানা নাদিরী সমরকন্দী অন্যতম।[৪]

---

১. গণি হিস্ট্রি অব পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ. ১৪৯ - ৫০।

২. বম্বে, দি ট্রাভেলস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অব টার্কিশ অ্যাডমিয়াল সীদী আলী রইস, পৃ. ৪৯-৫৩।

৩. দুই পদ-বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ভাব-সমৃদ্ধ কবিতাকে 'শায়র' বা শের্ বলে। এ ফারসি শব্দ। —অনুবাদক

৪. এই কবিদের জন্য দেখুন গণি, হিস্ট্রি অব পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, ২ পৃ. ৫৫-৬২ ও পৃ. ১৪৯-৬০ ; বায়েজিদ পৃ. ১৭৬-৮৭ ; মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৪৬৯-৯২ ; লা, প্রমেশন অব লার্নিং পৃ. ১৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য ছাড়াও হুমায়ূনের গণিত, নক্ষত্রশাস্ত্র,[১] জ্যোতিষশাস্ত্র,[২] ও ইতিহাসের জ্ঞানও ছিল। জ্যোতিষ ও নক্ষত্রশাস্ত্রে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁর আবিষ্কারাদি, যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, জ্যোতিষ এবং নক্ষত্রশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন, হুমায়ূন এক জ্যোতির্গৃহ নির্মাণ করতে চাচ্ছিলেন। এর জন্য তিনি বহু যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করে নিয়েছিলেন এবং এর জন্য কয়েকটি স্থানও নির্বাচন করেছিলেন।[৩] মৃত্যু সম্পর্কিত দুর্ঘটনার পূর্বে তিনি গণিতজ্ঞ ও নক্ষত্রশাস্ত্রীদের শুক্রগ্রহের নিরীক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হুমায়ূন বিশ্বাস করতেন মনুষ্যজীবন নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে তিনি অদৃষ্টবাদী[৫] ছিলেন। যখন শাহ তহমাসপ তাঁকে বলেন যে, তাঁর এই দুরবস্থার কারণ হল তাঁর দুষ্কর্ম, তখন তিনি বলেন, এ সবই অদৃষ্টের পরিণাম।

তাজে ইজ্জত, বিসাতে নিশাত, বিভাগ বিভাজন, বাণের বারোটি শ্রেণী নির্ধারণ, প্রত্যেক দিনের জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্ধারণ ইত্যাদি নক্ষত্রের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য ছিল। ফিরিশতা লিখেছেন, হুমায়ূন এমন এক গ্লোব নির্মাণ করিয়েছিলেন যার উপর পঞ্চভূত ও আকাশের বর্গীকরণ অঙ্কিত ছিল এবং সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিল।[৪] তাঁর দরবারে নক্ষত্রশাস্ত্রের কয়েক জন পণ্ডিত ছিলেন। এই বিদ্বানদের মধ্যে শাহ তাহির দক্ষিণী ও মওলানা ইলিয়াস সবিশেষ উল্লেখ্য। মওলানা ইলিয়াস হুমায়ূনকে নক্ষত্রশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ের জ্ঞাতা ছিলেন এবং জ্যোতির্গৃহ নির্মাণেরও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৫]

কবি ও নক্ষত্রশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতেরাও তাঁর দরবারের শোভা বর্ধন করতেন। মীর আবদুল লতিফ কজবীনী, যাঁকে কাবুলে আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল, খুবই উচ্চস্তরের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা কাজী দহিয়ার ন্যায় তিনিও উচ্চস্তরের ঐতিহাসিক ছিলেন। হুমায়ূন একে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তিনি সম্রাটের মৃত্যুর পর দিল্লি এসে পৌঁছান। ঐতিহাসিক বায়েজিদ, জওহর ও খন্দমীর তাঁর দরবারের শোভাবর্ধন করতেন।[৬] মওলানা মুহম্মদ 'জওয়াহিরুল উলুম' (বিজ্ঞানের রত্ন) এই আমলে ফারসিতে রচনা করেন। এতে ইতিহাস, নক্ষত্র-শাস্ত্র, গণিত, ভেষজশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি ১২০ টি বিষয়ের উপর চর্চা রয়েছে। এটি হুমায়ূনের আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ঐ যুগে এই ধরনের বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) রচনা বড়ই সাহসিক কর্ম ছিল।[৭]

---

১. নক্ষত্রশাস্ত্র বা Astrology। —অনুবাদক।
২. জ্যোতিষশাস্ত্র বা Astronomy দুটি শাস্ত্রের পৃথক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। —অনুবাদক।
৩. আকবরনামা ১ পৃ. ৩৬৮।
৪. অদৃষ্টবাদ, বা তকদীরে বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ।—অনুবাদক।
৫. ফিরিশতা, ব্রিগস ২ পৃ. ৭১।
৬. গণি, হিস্ট্রি অব পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, ২ পৃ. ৫৩।
৭. এই ঐতিহাসিকদের জন্য এই পুস্তকের ভূমিকা দেখুন।
৮. গণি, হিস্ট্রি অব পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, ২, পৃ. ৭৮ - ১০০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন পুস্তকপ্রেমীও ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন, এ ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক সাথী। অভিযান বা যাত্রাপথেও গ্রন্থাগার তাঁর সাথে সাথে থাকত।[১] মিরাতে সিকান্দারীর লেখক লিখেছেন, পুস্তক সর্বদাই তাঁর সাথে সাথে থাকত এবং লেখকের পিতাকেও তাঁর সাথে থেকে সর্বদাই পুস্তক পাঠ করতে হত। সন ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে তালিকান যুদ্ধের পর তিনি যখন তাঁর পরাজয়ের খবর পান তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর বইগুলোর কী খবর ? সেগুলো সুরক্ষিত আছে জেনে তিনি বড়ই প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হন।[২] কিছুদিন পর কিবচাকের যুদ্ধে খোয়া যাওয়া বইগুলোর সিন্দুকগুলো পাওয়ার পর তাঁর খুশির সীমা ছিল না।[৩] দিল্লি পুনরাধিকার করার পর তিনি শেরশাহের বিনোদ-গৃহ, শের মশগুলকে, গ্রন্থাগারে পরিণত করেন, সেখান থেকেই পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হুমায়ূনের উৎসাহে শিক্ষারও উন্নতি হয়। তিনি দিল্লিতে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন শায়খ হুসেন।[৪] এছাড়া অনেকেই ব্যক্তিগত মাদ্রাসাও খুলেছিলেন।

হুমায়ূনের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা

হুমায়ূন ধার্মিক মুসলমান এবং সুন্নী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহারে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশও করতেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বিনা ওজুতে থাকতেন না এবং পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্ অথবা নবী মুহম্মদ[৫] এর নাম উচ্চারণ করতেন না। বাধ্য হয়ে এমন কোনো ব্যক্তির নাম বলতে হলে, যাতে আল্লাহ নামের অংশও সামিল আছে, তিনি আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নামে ডাকতেন। যেমন, আবদুল্লাহর স্থলে শুধুমাত্র আবদুল বলে ডাকতেন। একবার তিনি আবদুল হাই সদরকে আবদুল বলে ডাকেন। ওজু করার পর তিনি মীরকে বলেন "ক্ষমা করবেন, আমার ওজু ছিল না। হাই আল্লাহর নাম, সেজন্য আমি পুরো নাম উচ্চারণ করিনি।"[৬] এইভাবে, পত্রে 'হুওয়া' লেখার স্থলে দুটি আলিফ লিখতেন, যাতে ১১ হয়ে যেত। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে 'হুওয়া'র জোড়ও ১১ হয়।[৭]

---

১. আকবরনামা, ১ পৃ. ১৩৬ ; কাউন্ট অব নোয়র দি এমপেরর আকবর ইংরেজি অনুবাদ পৃ. ১৩৬ ; জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথায় (রোজর্স কৃত ইংরেজি অনুবাদ পৃ. ১৭) হুমায়ূনের গ্রন্থাগারিক রূপে নিজামের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁর পুত্র জাহাঙ্গীর কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। লা, প্রমেশন অব লার্নিং পৃ. ১৩২ ; সূর্য, আল-মিনহাজ, পৃ. ৫১।

২. জওহর, স্ট্যুয়ার্ট পৃ. ১৩২।

৩. আকবরনামা ১ পৃ. ৩০৫।

৪. লা, প্রমোশন অব লার্নিং পৃ. ১৩৪।

৫. এ পবিত্র নাম পড়া বা উচ্চারণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম পড়তে হয়। —অনুবাদক।

৬. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১ পৃ. ৪৬৭ ; ফিরিশতা, ব্রিগস, ২ পৃ.১৭৮।

৭. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ৪৬৭-৬৮; 'হুওয়া' শব্দের অর্থ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ। আবজাদ অনুসারে এই পাঁচ এবং ওয়াও ৬ এর সমান অর্থাৎ দু'য়ের জোড় ১১ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ূন ধর্মান্ধ ছিলেন না। ইরানে তাঁর শিয়া মত গ্রহণের আলোচনা আমরা আগেই করে এসেছি। এমনও প্রতীত হয় যে, তিনি তো ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী ছিলেনই কিন্তু শিয়া সুন্নীর প্রভেদ তিনি মানতেন না। এ উদারতা তাঁর মাতা মাহম বেগম, স্ত্রী হামিদা বানু ও তাঁর নিজের স্বভাবের কারণে ছিল। শিয়া ও সুন্নী আমীরদের একসাথে স্বাগত জানানোটা তাঁর কাছে মোটেও অসম্ভব ব্যাপার বলে প্রতীত হত না। একদিকে যেখানে তাঁর সাথে আবুল মালীর ন্যায় কট্টর সুন্নী ছিলেন, সেখানে তাঁর বিশিষ্ট আমীরদের মধ্যে বৈরাম খাঁর ন্যায় শিয়াও ছিলেন। তাঁর ভাই ও তাঁর মিত্ররা তাঁর এই উদারতার কারণে তাঁকে শিয়া বলে মনে করতেন। কনৌজের যুদ্ধের পর তাঁর সব ভাই লাহোরে এক সাথে ছিলেন। একদিন হুমায়ূন ও কামরান কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুর পা তুলে একটি কবরে প্রস্রাব করছিল। কামরান বললেন, "মনে হয় এ কবরবাসী কোনো রাফেজী (শিয়া)।" হুমায়ূন এর উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, মনে হয় এই কুকুরটাও সুন্নী।"[১] সম্ভবত, এ উত্তর কামরানকে রাগানো ও শিয়া আমীরদের খুশি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ থেকে প্রতীত হয় যে, তিনি শিয়া সুন্নীর ভেদ পছন্দ করতেন না।

জ্যোতিষ এবং নক্ষত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে ধর্মভীরু করে তুলেছিল। বদায়ূনী লিখেছিলেন, ঘরে এবং মসজিদে তিনি মনের ভুলেও কখনোই বাম পা আগে রাখতেন না। কেউ বাম পা আগে বাড়ালে তিনি তাঁকে বাম পা ফিরিয়ে নিয়ে ডান পা আগে বাড়াতে বলতেন।[২] হায়দার মির্জার মতে, তিনি মন্ত্র ও জাদুতে বিশ্বাস করতেন।[৩] শুভাশুভের ফল নির্ণয় এবং নক্ষত্রের ভালমন্দ গতি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তিনি শুভকাজ শুরু করতেন না।

হুমায়ূনের যুগে সুফী-সন্তদের প্রভাব বেড়ে চলেছিল। অবসর পেলে তিনি ফকিরদের দর্শন করতেন এবং তাঁদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। ইরানে যে নগর বা স্থানে তিনি পৌঁছাতেন, সেখানকার বিশিষ্ট দরগাহ, মকবরা ইত্যাদি জিয়ারত[৪] করতেন। তাঁর কবিতাবলীতেও সুফী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত অভিযানের পূর্বে তিনি সুফীদের মতো মাংস না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি মৌলভী ও সুফী সাধকদের সাথে কথা বলে আনন্দ পেতেন। সাধারণত, রাত্রির শেষ প্রহর এবং কখনো কখনো পুরোরাত তাঁদের সাথে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাটিয়ে দিতেন।[৫]

---

১. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২ পৃ. ১৭৯।
২. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৮।
৩. তারীখে রশীদী ও রাস পৃ. ৩৯৯।
৪. দর্শন।
৫. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১, পৃ. ৪৬৭ ; তবকাতে আকবরী দে, ২, পৃ. ১৩৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন সুফী-সন্তদের মধ্যেকার কয়েক জনের সাথে হুমায়ূনের নিকট সম্বন্ধ ছিল। তিনি শায়খ মুহম্মদ গওস ও তাঁর বড় ভাই শায়খ বাহলুলকে বড়ই আদর-সম্মান করতেন। শায়খ গওস তাঁর যুগের প্রধান সাধক ছিলেন। তিনি সুফীদের শত্তারী সিলসিলার সুফী সাধক ছিলেন। তিনি বারো বছর অবধি চুনারের পার্বত্যঞ্চলে তপস্যা করেছিলেন।[১] পরে তিনি গোয়ালিয়রে তাঁর খানকাহ নির্মাণ করেন। হিন্দালের বিদ্রোহের সময় হুমায়ূন এর বড় ভাই বাহালুলকে বোঝানোর জন্য বাংলা থেকে আগ্রায় পাঠান। দুর্ভাগ্যবশত, শায়খ বাহলুলকে হিন্দাল হত্যা করেন। হুমায়ূনের নির্বাসনের পর শায়খ গওস গুজরাত চলে যান। এরফলে হুমায়ূন বড়ই খুশি হন। দু'য়ের মধ্যে পত্র বিনিময় চলতে থাকে।[২]

নিজের উদারতার কারণেই হুমায়ূন হিঁদুদের প্রতি কট্টর নীতি অবলম্বন করেন নি। হিঁদুদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। ধর্মের নামে মন্দির ধ্বংস ও ধর্ম-পরিবর্তনের আদেশও তিনি দেন নি। এর বিপরীতে কিছু রাজপুত শাসক কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে সাহায্য করেন। চৌসার যুদ্ধের পর রাজা বীরভান তাঁকে বড় সহযোগিতা করেন। মালদেব তাঁকে সহযোগিতা দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। যোধপুর থেকে ফিরে তিনি কোথাও আশ্রয় পাচ্ছিলেন না। ঐ সময়ে অমরকোটের রাজা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে আশ্রয় দেন। এইভাবে হিঁদুদের সাথে হুমায়ূনের সুন্দর সম্পর্ক জারি থাকে। রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাব ফেলার জন্য তিনি কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ নেন নি।[৩]

সামরিক যোগ্যতা

মধ্যযুগে সম্রাটদের জন্য নিপুণ সামরিক যোগ্যতা আবশ্যিক ছিল। হুমায়ূনের কঠিনতা ও সমস্যাবলীর মধ্যে এক উচ্চস্তরের সামরিক যোগ্যতা আবশ্যই ছিল। হুমায়ূন তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক কালে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আশা ছিল তিনি উচ্চস্তরের সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করবেন, কিন্তু দুভার্গ্যবশত তিনি এ দিকে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারলেন না। হিঁদুস্তানে বাবুরের মৃত্যুর পর তিনি এমন একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারেন নি যা তাঁর সামরিক দক্ষতার স্মারক হয়ে থাকতে পারত। বাহাদুর শাহের সাথে তাঁর একটি যুদ্ধও খোলাখুলি হয় নি। শের খাঁর সাথে যে দুটি যুদ্ধ হয় তাতেও তিনি পরাজিত হন। মাছিওয়াড়া যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন না এবং সেরহিন্দের যুদ্ধের বিজয়ের কৃতিত্ব তো বৈরাম খাঁর প্রাপ্য।

---

১. বীল, ওরিয়েন্টাল বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারি, পৃ. ১৮৭।

২. নিজামী দি শত্তারী সেন্টস অ্যান্ড দেয়ার অ্যাটিচিউট টুওয়ার্ডস দি স্টেট, মেডিভ্যাল ইন্ডিয়া কোয়ার্টারলি, জিলক্বদ অক্টোবর ১৯৫০ খ্রি. পৃ. ৬২-৬৫।

৩. রায় চৌধুরী, দি স্টেট অ্যান্ড রিলিজন ইন মোগল ইন্ডিয়া, পৃ. ১৮৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সামরিক দুর্বলতার কিছু কারণ ছিল। বাস্তবে হুমায়ূন শান্তির সম্রাট ছিলেন। যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের শক্তির মূল্যায়ন করতে পারতেন না। বাংলা অভিযানে চুনার দুর্গ জয় করতে তাঁর ৬ মাস লেগে যায়। সেখান থেকে ফেরার সময় চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে তিনি কিছু সামরিক ভুল করেন যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই রকমই তিনি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে মন্দসৌরেও সামরিক কুশলতা দেখাতে পারেন নি। যুদ্ধে শত্রুর উপর তাৎক্ষণিক আক্রমণের যে প্রয়োজন পড়ে, হুমায়ুনের মধ্যে সে গুণের নিতান্ত অভাব ছিল। যে সময়ে বাহাদুর শাহ মন্দসৌর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময়ে তিনি তাঁর সৈন্যদের সাথে তা দেখতে থাকেন। চৌসার যুদ্ধে তাৎক্ষণিক আক্রমণ না করে তিনি অযথা সময় নষ্ট করেন। যুদ্ধে উৎসাহের সাথে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করতেও তিনি সঙ্কোচের পরিচয় দিতেন, কনৌজের যুদ্ধের নেতৃত্ব হায়দার ও মাছিওয়াড়ার যুদ্ধের নেতৃত্ব বৈরাম খাঁর উপরে ছিল। আনন্দপ্রিয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি যুদ্ধের কঠিনতা থেকে আত্মগোপন করতেন। যুদ্ধকালেও আমোদ-প্রমোদের অবসর পেলে তিনি যুদ্ধ ভুলে গিয়ে মনোরঞ্জনের মধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন।

নির্বাসনের পর হুমায়ূনের মধ্যে কিছুটা সক্রিয়তা ও বিচক্ষণতা আসে। আফগানিস্তান ও বাদাখশানের সামরিক কর্মকাণ্ডে এই পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস আমরা পাই কিন্তু এ অবস্থায় প্রারম্ভিক জীবনের বিলাস ব্যসনকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলাটা অসম্ভব ছিল। তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর পরিবর্তিত যোগ্যতার আরো কিছু উদাহরণ পাওয়া যেত।

শেরশাহের দ্বারা তাঁর পরাজয়ের কারণে তাঁর সামরিক অযোগ্যতার ঢ্যারো পেটানোটা আমাদের ভুল হবে। শেরশাহ ধূর্ত, চতুর এবং বুদ্ধিমান সেনানায়ক ছিলেন। যেমন ড. কানুনগো লিখেছেন, তাঁর মধ্যে বাঘ ও শিয়ালের সম্মিলিত গুণ ছিল।[১] তিনি তাঁর সমকক্ষ শত্রুদের সাথে শিয়ালের ন্যায় চতুরতা ও দুর্বলদের সাথে বাঘের ন্যায় দম্ভ ও তর্জন-গর্জন প্রদর্শন করতে পারতেন। তিনি সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তাঁর উত্থান ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর কর্মশীলতা ও বুদ্ধির পরিণাম। তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে সম্রাট হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁর সৈনিকদের সাথে প্রচণ্ড রোদে পরিখাও খনন করতে পারতেন আবার তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইও করতে পারতেন। তারীখে দাউদীর লেখক লিখেছেন, শেরশাহ স্বয়ং তাঁর সামনে ঘোড়া দাগাতেন। দাগানোর সময়ে ঘোড়ার চুল ও চামড়া পুড়ে যাওয়াতে গন্ধ ছুটত, যার ফলে তাঁর নাকের কাছে গোলাপ পানিতে ভিজানো রুমাল রাখা হত। যখন তাঁকে বলা হয় যে, এই দুর্গন্ধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে ঘোড়া দাগানো হোক, তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন। একথা যখন হুমায়ূনকে জানানো হল, তখন তিনি বললেন,

১. ড. কানুনগো, শেরশাহ পৃ. ৪০৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শের খাঁ এমন ব্যবহার করছেন যা অন্য কোনো সম্রাট করেন নি। তিনি আজও সাধারণ সৈনিকের ন্যায় ব্যবহার করছেন।" এই ঘটনা ও হুমায়ূনের উত্তর থেকে দুই সম্রাটের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে আমাদের সুবিধা হয়। হুমায়ূন সম্রাটের পুত্র এবং নিজে সম্রাট ছিলেন। একথা তিনি কখনোই ভুলতে চাইতেন না। শেরশাহর ন্যায় ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে সাফল্য পাওয়া, বিশেষত, যখন মোগল আমীরদের আবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছিল এবং আফগানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল, সহজ ছিল না।

হুমায়ূনের সবচেয়ে বড় সামরিক গুণ ছিল তাঁর সাহস। চৌসার যুদ্ধের পর তিনি শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে ভীতত্রস্ত হন নি। সঙ্গী-সাথী আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁকে ত্যাগ করে, ফলে, মরুভূমি ও বরফ ঢাকা উপত্যকায় তাঁকে অনেক কষ্ট সইতে হয়, কিন্তু তিনি সাহস হারান নি। তিনি তাঁর সামরিক শক্তিতেই কাবুল, কান্দাহার ও হিঁদুস্তানের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই সাফল্য তাঁর অতীতের সমস্ত সামরিক ভুলত্রুটি শুধরে দেয়।

হুমায়ূনের পত্নীগণ

হুমায়ূনের আট পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত, তাঁর আরো পত্নীও থেকে থাকবেন। এদের মধ্যে তিনজন বেগা বেগম, হামিদা বানু ও মাহ চুচক বেগম— গুরুত্বপূর্ণ। বাবুরের জীবৎকালে তাঁর যুবাবস্থায় বেগা বেগমের সাথে হুমায়ূনের বিয়ে হয়েছিল। এর পুত্র আল-আমান-এর জন্ম ও তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে বাবুরের পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মুখরা ছিলেন এবং সবার সামনে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তিনি ভীত হন নি। বাংলা অভিযানে তিনি হুমায়ূনের সাথে ছিলেন। জাহিদ বেগের সাথে তাঁর বোনের বিয়ে হয়েছিল। জাহিদ বেগ হুমায়ূনকে অসন্তুষ্ট করে তোলেন। বেগা বেগমের অনুরোধ সত্ত্বেও হুমায়ূন তাঁকে ক্ষমা করেন নি। চৌসার যুদ্ধে বেগা বেগম আফগানদের দ্বারা বন্দিনি হন এবং তাঁকে হুমায়ূনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হামিদা বানুর সাথে হুমায়ূনের বিয়ের পর বেগা বেগমের গুরুত্ব কমে যায়। হুমায়ূনের হিঁদুস্তান আক্রমণের সময় তিনি কাবুলে ছিলেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর অন্য মহিলাদের সাথে তিনিও ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। ১৫৬৪ - ৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হাজী বেগম নামেও অভিহিত হন। তিনিই হুমায়ূনের মকবরা নির্মাণ করান। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আকবর হাজী বেগমকে তাঁর মায়ের মতো সম্মান করতেন।[১]

হুমায়ূনের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন হামিদা বানু। তাঁর বংশপরিচয় ও বিবাহের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। তিনি আকবরের মা ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিতা, বিদূষী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইরানে হুমায়ূন হামিদা বানুর মাধ্যমে বড়ই সহায়তা

১. গুলবদন বেগম, হুমায়ূননামা, বেভারিজ, পৃ. ২১৮ - ২০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ করেন। হুমায়ূনের ভারত অভিযানকালে তিনিও কাবুলে ছিলেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবরের শাসনামলে তিনি ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে যান। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পুত্র আকবরের রাজত্বকালে অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁর বিয়ের ৬৩ বছর পর ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।[১]

মাহ চুচক বেগমকে হুমায়ূন ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন। এঁর চার কন্যা ও দুই পুত্র মুহম্মদ হাকিম ও ফররুখফাল ছিলেন। শাখদান এ হুমায়ূনের অসুস্থতার সময়ে তিনি তাঁর বড়ই সেবা করেন। আকবর সিংহাসনারূঢ় হলে তিনি তাঁর পুত্র মির্জা হাকিমের সাথে কাবুলেই থাকেন। তাঁর নাবালকত্বের কারণে তিনি তাঁর সংরক্ষিকা ছিলেন। সেখানকার শাসন কার্য চালাতে তাঁকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবুল মালী কর্তৃক নিহত হন।[২]

হুমায়ূনের অন্য এক পত্নী গুনবার বেগমের বখশী বানু নামে এক কন্যা ছিলেন, সুলেমান মির্জার পুত্র ইব্রাহীম মির্জার সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মির্জা শরফুদ্দীন হুসেন আহরারীর সাথে তাঁর পুনরায় বিয়ে হয়।[৩] চাঁদ বিবি ও শাদ বিবি নামে হুমায়ূনের দুই পত্নী চৌসার যুদ্ধে নিখোঁজ, নিহত কিংবা ডুবে মারা গিয়েছিলেন। নিজামউদ্দীন খলীফার কন্যা গুলবর্গ বেগম বরলাসের সাথে হুমায়ূনের বিয়ে চৌসার যুদ্ধের পূর্বে হয়। হুমায়ূনের সাথে বিয়ে হওয়ার আগে ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিয়ে মীর শাহ হুসেন আরগুনের সাথে হয়েছিল, কিন্তু পরে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। গুলবদন বেগম সিন্ধুতে হুমায়ূনের সাথে ছিলেন।[৪] খাজঙ্গ ইয়াসাওয়ালের কন্যা, মেওয়াজান, গুলবদনের সেবিকা ছিলেন। ইনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। মাহম বেগমের কথায় হুমায়ূন তাকে বিয়ে করেন।[৫]

বিলাসী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ূন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এ স্ত্রীরা কেবল তাঁর মনোরঞ্জনের সাধন ছিলেন।

ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব

হুমায়ূন সুন্দর, নিটোল ও গম রঙের আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৬] সাধারণত তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকত। তাঁর বাল্যকাল তাঁর পিতার সুযোগ্য সংরক্ষণের মধ্যে

১. ঐ .পৃ. ২৩৭-৪০ ; হামিদা বানু তাঁর বিবাহের সময় (২৯ আগস্ট ১৫৪১ খ্রি.) বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে সম্ভবত তাঁর জন্ম ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে হয়ে থাকবে।
২. ঐ. পৃ. ২৬০ আঈনে আকবরী, ১, পৃ.৩৩৩-৩৩৯।
৩. গুলবদন বেগম. হুমায়ূননামা, বেভারিজ. পৃ. ২৩৫ ; ব্যানার্জি, হুমায়ূন.২. পৃ.৩৯।
৪. গুলবদন বেগম. হুমায়ূননামা, বেভারিজ. পৃ. ২৩০।
৫. ঐ ; পৃ. ১১২।
৬. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২, পৃ. ২৪৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিবাহিত হয়েছিল। প্রারম্ভেই তাঁকে শিক্ষিত ও শাসকের সম্পূর্ণ গুণে গুণান্বিত করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। তাঁর প্রারম্ভিক জীবন সুখ ও আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল। এক বড় পিতার পুত্র হওয়ার কারণে কাঠিন্যের অভিজ্ঞতা, যা মানুষকে প্রত্যেকটি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে, তা তিনি লাভ করতে পারেন নি। তিনি স্বভাবগতভাবে আনন্দ ও বিনোদনপ্রিয় ছিলেন। স্বভাবগতভাবে তিনি পবিত্রাত্মা মানুষ ছিলেন। যতদূর সম্ভব তিনি অপশব্দ ব্যবহার করতেন না। কারো প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলে তার প্রতি শুধুমাত্র 'মূর্খ' শব্দটি প্রয়োগ করতেন।[১] তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণ এবং নিজের ভাই বোন ও অন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অপার স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন। ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের নিচকর্ম করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই তাদের ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। কামরানের ক্ষমাহীন ক্রূরতা, ধৃষ্টতা ও নিচতা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁকে অন্ধ করে দেওয়ার পর তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। নিজের পিতার প্রতি তাঁর অপার শ্রদ্ধা ছিল এবং অনেক কষ্ট সহ্য করার পরও, নিজের ভাইদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার পিতৃ-আদেশ তিনি আজীবন পালন করে যান।

গুলবদন বেগম তাঁর দয়ালুতা ও ভালবাসার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মাহমের মৃত্যুর পর হুমায়ূনের স্নেহের কারণেই তিনি নিজেকে অনাথ বলে মনে করতেন না। হুমায়ূন তাঁর সকল স্ত্রীকেই ভালবাসতেন। দীন পনাহ্-র উৎসবের সময় বেগা বেগমের অভিযোগ ও হুমায়ূনের উত্তর থেকে প্রতীত হয় যে, হুমায়ূনের জিনানখানা বড় ছিল এবং বৃদ্ধা মহিলাদের প্রতিও তাঁর সর্বদাই মনোযোগ থাকত।

হুমায়ূনের ধনের মোহ ছিল না এবং তিনি ধন সঞ্চয়ের চেষ্টাও করেন নি। বদায়ূনী লিখেছেন, তিনি এত বড় দানী ছিলেন যে, পুরো ভারতের রাজস্বও তাঁর দানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।[২] দাওয়াত এবং উৎসবগুলোতে তিনি প্রচুর ধন বরবাদ করতেন। খন্দমীর লিখেছেন, অষ্টবিংশতিতম জন্মদিনে তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হয়, যা প্রায় ১৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রার সমতুল্য ছিল, তা লোকেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[৩] তাঁর এ সমস্ত অভ্যাসের পরিণামে তাঁর নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্যও ধন অবশিষ্ট ছিল না। নির্বাসনের সময়ে তো তাঁর কাছে ধনের এতটা অভাব হয় যে, ইয়াদগার নাসির ও অন্য আমীরদের কাছ থেকে তাঁকে সুদ করে অর্থ ধার করতে হয়। এমন ব্যক্তিই বাবুরের জীবৎকালে দিল্লির রাজকোষ কেন লুট করেছিলেন ? এ ধনের প্রতি মোহের কারণে নয় ; বরং অন্য কোনো কারণ ছিল।

---

১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১.পৃ.৪৬৮।
২. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১, পৃ. ৪৬৮।
৩. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূন, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৭৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি

প্রত্যেক ব্যক্তির উত্থান-পতন তাঁর চারিত্রিক দোষগুণ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। হুমায়ূনের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এবার আমরা তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর আলোকপাত করলে দেখব যে, ত্রুটিগুলোই তাঁর অসফলতার মূল কারণ ছিল। স্বভাবগতভাবে হুমায়ূন অলস ছিলেন, সেই সাথে তাঁর মধ্যে দায়িত্বহীনতাও ছিল। এই দু'টি দুর্গুণ মিলে তাঁকে কয়েকবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। হুমায়ূনের মন কঠিন পরিস্থিতি থেকে পলায়ন করতে চাইত। যতদূর সম্ভব তিনি এ সমস্ত কাঠিন্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন। বাবুর তাঁর আত্মকথায় অভিযোগ করেছেন, ভারতের অন্তিম আক্রমণের সময় হুমায়ূন সময়মতো পৌছান নি। গুজরাত অভিযানে তাঁর সারঙ্গপুরে যাত্রা বিরতি করা, গুজরাতের বিদ্রোহের সময় কাছে থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা, গুজরাত অভিযান থেকে ফিরে আগ্রায় ব্যর্থ সময় নষ্ট করা, বাংলা অভিযানে রাজকার্য ভুলে থেমে থাকা, চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করা ইত্যাদি তাঁর এই সমস্ত দোষের জলন্ত উদাহরণ। সবচেয়ে বেশি লজ্জার কথা হল, ইরানের শাহের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও কজবীনে পড়ে থাকা এবং শাহকে শেষপর্যন্ত জবরদস্তি ইরান থেকে তাঁকে ভাগাতে হল। অলস স্বভাবের কারণেই হুমায়ূন যুদ্ধে এবং অন্য অবসরে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। যার ফলে, শত্রুরা লাভবান হত।

কঠিন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া শাসক বা নেতার একটি প্রধান গুণ। হুমায়ূন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারতেন না। শেরশাহের সাথে সন্ধি এবং যুদ্ধের সমস্যার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গুজরাত অভিযানের পূর্বে তিনি শেরশাহের সাথে চুনারের যুদ্ধ করেন এবং পুনরায় সন্ধি করে নেন। গুজরাত থেকে ফিরে শেরশাহের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর কয়েক মাস লেগে যায়। বাংলা অভিযানের সময়ে মনের-এ, চৌসার যুদ্ধের পূর্বে এবং কনৌজের যুদ্ধের পরে লাহোরেও সন্ধি-বার্তা চলতে থাকে। সন্ধি করে তিনি তা ভঙ্গও করেন, যেমন শেরশাহের সাথে মনের-এ এবং বাহাদুর শাহের সাথে মাণ্ডুতে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

হুমায়ূন একদিকে যেখানে দয়ালু ছিলেন, সেখানে অন্যদিকে তিনি এমন ক্রূরতা প্রদর্শন করতেন যে, তা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যেত। মাণ্ডুর হত্যাকাণ্ড এবং চম্পানীর-এ ইমামের হত্যাকাণ্ড এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি তাঁর প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে দণ্ড দিতে পক্ষপাতিত্ব করতেন। এর পরিমাণস্বরূপ অন্য আমীরদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব ছাড়িয়ে পড়ত। ধর্মের নামে হত্যা করা সত্ত্বেও তিনি আবুল মালিকে দণ্ড দেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধবিশ্বাস হুমায়ূনের জীবনের অঙ্গ বনে গিয়েছিল। শুভাশুভের নির্ণয় (ফাল) ব্যতীত তিনি কোনো শুভ কাজে হাতে দিতেন না। কখনো কখনো অত্যাবশ্যকীয় কাজও শুভ নক্ষত্রের জন্য রেখে দেওয়া হত। তিনি মন্ত্র ও জাদুটোনায়ও বিশ্বাস করতেন। এসব ভাবনা তাঁকে আত্মনির্ভর হতে দিত না এবং সক্রিয় কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

হুমায়ূনের উর্বর-মস্তিষ্ক পরিকল্পনা নির্মাণে বড়ই নিপুণ ছিল। তাঁর পরিকল্পনা ও আবিষ্কার আমাদের আশ্চর্যন্বিত করে তোলে। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পরিকল্পনা কাল্পনিক এবং মনোরঞ্জনের জন্য ছিল, তার প্রশাসকীয় গুরুত্ব ছিল না। যদি হুমায়ূন বাস্তবিকই শাসন সম্পর্কিত নিয়ম এ ক্ষেত্রে প্রতিপাদন করতেন তাহলে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে গণ্য হতেন।

তিনি তাঁর নিকটস্থ লোক ও শত্রুদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারতেন না। তিনি বাহাদুর শাহ ও শেরশাহের শক্তি অনুমান করতে পারেন নি। তাঁর নিকটস্থ লোকেরা তাঁকে নিরন্তর ধোঁকা দিয়ে চলত তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করে তাঁদের ক্ষমা করে দিতেন। কী দুঃখজনক ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল যে, যোধপুর থেকে ফেরার সময় তরদী বেগ গর্ভবতী হামিদা বানুর জন্য নিজের ঘোড়াটি দিতে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর এ দয়ালুতা একটি গুণ হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর অনেক কাঠিন্যের জন্য তিনি নিজেই দায়ী হয়ে যান।[১]

হুমায়ূনের মধ্যে সমকালীন যুগের বিলাসিতা ও যৌন সম্পর্কিত দুর্গুণও ছিল। কিছু বাজে লোকের, যেমন মওলানা মুহম্মদ ফরগলী প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহচর্য তাঁকে আরো অধঃপতিত করে দেয়। তাঁর আফিম খাওয়ার অভ্যাসও বেড়ে যায়। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসব ব্যসন ত্যাগ করার প্রয়াসও চালান, কিন্তু এর আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. রাম প্রসাদ ত্রিপাঠী তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন "মনে হয় হুমায়ূনের বুদ্ধি এককেন্দ্রিক ছিল, যে কারণে মৌলিক পরিকল্পনা বিফল হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত। তিনি নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন দিক না বুঝতে পেরে ফেঁসে যেতেন, কেননা, সম্ভবত তাঁর নিজের সীমিত যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না। কেননা, গুজরাত ও বাংলার সুদূর প্রান্তগুলোতে সামরিক অভিযান তাঁর জন্য নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল। মালব ও বিহারে নিজের অবস্থান মজবুত করেই তবে সেগুলোর বিজয়ের কাজ তাঁর হাতে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি সমস্ত বোঝা একসাথে ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন, যা ক্রমশ নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর রাজনৈতিক অনুমান হত ভ্রমাত্মক, যা থেকে মনে হয় তিনি না মানব ও মানব প্রকৃতি আর না রাজনৈতিক অবস্থার ও প্রশাসনিক সমস্যার সাচ্চা জহুরী ছিলেন। কূটনীতি ও রাজনীতিতে তিনি না বাবুরের সমকক্ষতা অর্জন করেন আর না শেরশাহের। যে প্রদেশ সহজে এবং না ভেবে চিন্তে তিনি

১. ঈশ্বরী প্রসাদ, হুমায়ূন, পৃ. ৩৭৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন সহজে জয় করে নিয়েছিলেন, তেমনি তাকে অত সহজে পরস্পর সূত্রে বেঁধে নেওয়ার যোগ্যতার অভাব তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি সেগুলো নিজের অধিকারে রাখতে পারলেন না এবং সেগুলো তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর ভাগ্য ও রাজ্যের উপর ঘাতক প্রক্রিয়া সাধিত হল।"[১]

ইতিহাসে স্থান

ভারতীয় ইতিহাসে, বিশেষত মোগল যুগের ইতিহাসে হুমায়ূনের স্থান কোথায়? কিছু ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসা করেছেন আর কিছু তাঁর নিন্দা। নিজামউদ্দীন আহমদের মতে, তাঁর ফিরিশতাতুল্য ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ মানবীয় গুণ পূর্ণরূপে সুশোভিত ছিল। বীরত্ব ও পৌরুষে তিনি জগতের সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দান-ধানে পুরো হিঁদুস্তানের আয়ও তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা, সৌজন্য দ্বারা, কলাকার এবং গুণীদের আশ্রয়দান ও ধার্মিকতাকে লালন করেছেন।[২] আবুল ফজল লিখেছেন, সাম্রাট্যের বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের এত বেশি প্রমাণ রয়েছে যে, যা গণনা করা অসম্ভব। তিনি তাঁর 'নকল' ও 'আসল'-এর জ্ঞান, কাব্য প্রতিভা ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন।[৩] ফিরিশতা তাঁর জ্ঞান, লালিত্য এবং সহৃদয়তাপূর্ণ স্বভাব, ধার্মিকতা এবং কবিতা-প্রেমের প্রশংসা করেছেন।[৪] মুল্লা বদায়ূনী লিখেছেন : "সম্রাট অসাধারণ গুণবান ছিলেন। তিনি সমস্ত বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর দ্বারা সুশোভিত ছিলেন। জ্যোতিষ, নক্ষত্রশাস্ত্র এবং সমস্ত রহস্যময় বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।" তিনি তাঁর ধার্মিকতা, কবিতা-প্রেম ইত্যাদিরও প্রশংসা করেছেন।[৫] হুমায়ূনের চাচা হায়দার মির্জা লিখেছেন : "হুমায়ূন বাদশাহ বাবুরের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সর্বাধিক যোগ্য এবং সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাঁর ন্যায় যোগ্যতা এবং প্রতিভা অতি অল্প মানুষের মধ্যে দেখেছি। কিন্তু কিছু দুষ্ট ও বিলাসপ্রিয় লোকের সঙ্গদোষের কারণে, যাতে মুল্লা মুহম্মদ ফরগরী এবং তাঁর ন্যায় অন্যান্য লোকেদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর মধ্যে কিছু কু-অভ্যাস জন্মে গিয়েছিল যার অন্যতম ছিল আফিম সেবন। বাদশাহর মধ্যে যত দোষ জন্মায় আর যা সাধারণ লোকেদের চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়, এই কু-অভ্যাসের কারণেই। এছাড়া তাঁর মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুণ ছিল। তিনি যুদ্ধে বাহাদুর, উৎসবে মত্ত এবং খুবই দয়ালু ছিলেন। সংক্ষেপে তিনি প্রতিষ্ঠিত সম্রাট ছিলেন এবং অপূর্ব বৈভব ও ঐশ্বর্যের পালনকর্তা ছিলেন।"[৬]

---

১. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ, ১. পৃ. ৪৬৮।
২. খন্দমীর, কানুনে হুমায়ূনী, বেণীপ্রসাদ, পৃ. ৭৬।
৩. আকবরনামা, ১ পৃ. ৩৬৮।
৪. ফিরিশতা, ব্রিগস, ২ পৃ. ৭০ - ৭১ এবং ১৭৮ - ৮০।
৫. মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ ১ পৃ.৪৬৮।
৬. তারীখে রশীদী, এ এবং রাস, পৃ. ৪৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ হুমায়ূনের তিক্ত সমালোচনা করেছেন। আর্সকিন লিখেছেন, যদিও হুমায়ূন বীর, সৎ-স্বভাবী, উদার এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত গুণ তাঁর দোষের চৌহদ্দীতে এসে যেত, যার কারণে তা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। তাঁর বুদ্ধির এমন অসারতা ছিল যে, তা তাঁর সমস্ত গুণকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। আর্সকিনের এ মত যে, যদি তিনি আরো কিছুদিন পিতৃসিংহাসনে আসীন থাকতেন তাহলে তিনি তাঁর বংশের অন্তিম সম্রাট হতেন।[১] লেনপুল তো তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর পতনের কাহিনী আরো মনোরঞ্জক করে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন হুমায়ূরে চরিত্র আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ভাল সাথী এবং বন্ধু প্রমাণিত হতে পারতেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন এক সম্ভ্রান্ত মানুষের জীবন ছিল, কিন্তু সম্রাটরূপে তিনি অসফল ছিলেন। হুমায়ূন এর অর্থ 'ভাগ্যবান' কিন্তু হুমায়ূনের ন্যায় 'হতভাগ্য' সম্রাট আর হয় না। তাঁর পতন ছিল তাঁর চরিত্রেরই অনুকূল। যদি কোথাও পিছলে যাওয়ার সন্দেহ থাকত তাহলে হুমায়ূন তা থেকে মুক্তি পেতেন না। তিনি সারাটি জীবন ধরে পিছলাতে থাকেন এবং অবশেষে তিনি পিছলে গিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।[২] আর্সকিনের মন্তব্য : "হুমায়ূন বীর, প্রসন্নচিত্ত, হাস্যপ্রিয়, মনোরঞ্জক বন্ধু, অত্যধিক শিক্ষিত, উদার এবং দয়ালু হওয়ার কারণে স্থায়ী তত্ত্বের উপরে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের পিতা বাবুরের চেয়েও কম যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। এ সমস্ত গুণাবলীর সাথে তাঁর মধ্যে কিছু কট্টর দোষও ছিল। তিনি চঞ্চল, চিন্তাহীন এবং অস্থির ছিলেন। কর্তব্যের কোনো জোরালো ভাবনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করত না। তাঁর উদারতা অপব্যয়িতার এবং অনুরাগ দুর্বলতায় পরিবর্তিত হয়ে যেত। তাঁর মধ্যে কিছু সময়ের জন্য পূর্ণরূপে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রিভূত করার ক্ষমতা ছিল না, আর এইরূপে বিস্তারিতভাবে আইন প্রণয়ন করার প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল না, এবং রুচিও। এজন্য, যে সাম্রাজ্য তাঁর পিতা অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করতে তিনি সর্বথায় অযোগ্য ছিলেন।"[৩]

হ্যাভেল হুমায়ূনের প্রতি সহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও লেখেন, হুমায়ূন তাইমুর বা বাবুরের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্মশীল ছিলেন না। তিনি দুর্বল এবং দুর্বিদগ্ধ ছিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত বিষয়েই জ্যোতিষীদের পরামর্শ নিতেন। এতটা সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গ্রহ হুমায়ূনের বিরুদ্ধাচরণ করে। ব্যক্তিগত সাহসের অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না, কিন্তু মোগল বংশের পুনঃস্থাপনের কৃতিত্ব তাঁর যোগ্যতায় নয় ; বরং তাঁর সাথীদের অটল ভক্তি এবং শেরশাহের উত্তরাধিকারীদের

---

১. আর্সকিন, ২ পৃ. ৫৩৪ - ৩৫।
২. লেনপুল, মেডিভ্যাল ইন্ডিয়া, পৃ. ২১৯।
৩. স্যালিসন, আকবর পৃ. ৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলতার কারণে ছিল।[১] এলফিনস্টোন লিখেছেন : "হুমায়ূনের মধ্যে বুদ্ধির অভাব ছিল না, কিন্তু শক্তির অভাব ছিল যদিও তিনি দুর্ব্যসন ও উগ্র আবেগ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই সাথেই সিদ্ধান্তহীন এবং স্নেহশূন্যও ছিলেন। স্বভাবতভাবে তিনি যতটা আরামপ্রিয় ও অলস ছিলেন ততটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও বাবুরের সংরক্ষণে তাঁর লালন-পালন হয়েছিল। এজন্য তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অভ্যাস ছিল। সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি কখনো সাহসের অভাব দেখান নি এবং না যশ ও পদের লোভ থেকে পূর্ণরূপে নিজেকে বঞ্চিত করেন, যদিও তিনি শক্তি অধিক হতেও অধিকতর রূপে প্রয়োগ করেন নি। স্বভাবগতভাবে তিনি না ছিলেন ক্রূর আর না ছিলেন ধূর্ত আর যদি তিনি য়ুরোপের এক সংবিধানিক রাজা হতেন তাহলে তিনি দ্বিতীয় চালর্স এর চেয়ে অধিক বিশ্বাসঘাতক ও রক্তপিপাসু সিদ্ধ হতেন না।"[২]

উপর্যুক্ত পণ্ডিতদের মূল্যায়নের সাথে পূর্ণরূপে একমত হওয়া কঠিন। হুমায়ূনের চরিত্র পূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য কিছু মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের জন্য তাঁর সমকালীন পরিস্থিতি, কাঠিন্য, চরিত্র ও তাঁর বিরোধী ব্যক্তিদের অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক। মহাপুরুষদের সফলতার পিছনে বহু-কিছু সৌভাগ্য ও পরিস্থিতি দায়ী থাকে। কোনো ব্যক্তির সাফল্যের আধারে তাঁর মূল্যায়ন করাটা একচোখা হবে। নেপোলিয়নের সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তাঁর পরাজয় ও তাঁর হৃদয় বিদারক পতন আমাদের সামনে অন্য চিত্র উপস্থিত করে। যদি আমরা শুধু তার ভুলের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহলে কী আমরা নেপোলিয়নের বাস্তবিক ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করতে পারব ? অশোক ও আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁদের সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, আকবরের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁর ভারতীয় ঐক্যের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। গাঁধীজী জীবন ভর হিঁদু মুসলিম ঐক্যের সাধনা করে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবৎকালেই ধর্মেই ভিত্তিতে দেশভাগ হল এবং তাঁর দুঃখজনক পতন তাঁর কর্মকাণ্ডের এক অসফল কাহিনী উপস্থিত করে। এজন্য কী আমরা বলব যে, আকবর, অশোক কিংবা গাঁধীজীর আদর্শ মূর্খতাপূর্ণ ছিল ?

হুমায়ূন শান্তির যুগের সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার দ্বারা সংগঠিত সাম্রাজ্য লাভ করলে তিনি তাঁর সৃজনশীল শক্তি দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের এমন এক চিত্র নির্মাণ করতেন যা আদর্শ হত। তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল তাঁর সীমাহীন কাঠিন্য। তাঁর শত্রুরা তাঁর চেয়ে চতুর ছিল। তাঁর বহু সময় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুদের সাথে সংঘর্ষে কেটে যায়। তাঁর অসফলতার অনেক দায়িত্ব তৎকালীন পরিস্থিতি, বাবুর কর্তৃক রেখে যাওয়া সমস্যা, তাঁর শত্রুদের চতুরতা এবং প্রবলতা,

---

১. হ্যাভেল, এরিয়ান রুল-ইন ইন্ডিয়া পৃ. ৪২১ - ২৯ ও ৪৪৮ - ৪৯।

২. এলফিনস্টোন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া পৃ. ৪৫১ - ৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের অসহযোগিতা এবং বিদ্রোহ, আফগান জাগরণ ও তাঁর কিছুটা ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আর্সকিনের এ মন্তব্য হুমায়ূন আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট হতেন— হুমায়ূনের প্রতি অবিচারের দ্যোতক।

হুমায়ূনের জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে— ১৫০৮ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রারম্ভিক কাল ; ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংঘর্ষের কাল ; ১৫৪০ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (অন্ধ করে দেয়া পর্যন্ত) কামরানের নির্বাসন এবং সংঘর্ষের কাল ; আর ১৫৫৩ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়ের কাল। রাজ্যারোহণ থেকে নিয়ে চৌসার যুদ্ধ পর্যন্ত সংকট সত্ত্বেও ভাগ্য তাঁর সহায় হয়। তার পরই দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়। ইরান থেকে সাহায্য নিয়ে পুনরায় কান্দাহার অধিকার করার পর (১৫৪৫ খ্রি.) তাঁর ভাগ্যোদয় হয়, একের পর এক শত্রুর পতন হতে থাকে এবং তাঁর হারানো যশ ও সাম্রাজ্য পুনরায় ফিরে আসে।

বাস্তবে শের খাঁ ও আকবরের উদয়ের ফলে আমাদের দৃষ্টি এতটা ঝলসে যায় যে, হুমায়ূনের আলো অনেক ঘোলাটে হয়ে পড়ে। একে আমরা সরাতে পারলে স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, মোগল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ূনের একটি সম্মানিত স্থান রয়েছে।

মোগল যুগের গুরুত্ব কেবল তাঁর বিজয় বা শাসনব্যবস্থার কারণে নয় ; বরং সাংস্কৃতিক উৎসাহ বিকাশ ও উপযোগী নীতির উপর। মোগল যুগ সাহিত্য ও কলার স্বর্ণযুগ ছিল। এই যুগে ফতেহপুর সিকরি, আগ্রা ও দিল্লিতে এমন সব ইমারত নির্মিত হয় যা আজও বিশ্বের চোখে বিস্ময়োৎপাদন করে। এই যুগে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিকাশের যুগ ছিল। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যকে পুনর্জীবন. দান করে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শান্তির নীতির বিকাশ ঘটে। হুমায়ূন মোগল যুগের সমস্ত অঙ্গনেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি চিত্রকলার জন্মদাতা, সাহিত্যের উচ্চস্তরে সংরক্ষক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের স্তম্ভ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এমন বীজ বপন করেন যাকে আকবর তাঁর বুদ্ধিবলে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। হুমায়ূনের যোগদান আওরঙ্গজেবের মতো সাম্রাজ্যের পতনের নয় ; বরং স্থায়িত্বের ভিত্তি প্রস্তর। যতদিন যাবত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাংস্কৃতিক, কলাত্মক ও সাহিত্যিক বিকাশে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্বীকৃত থাকবে ততদিন যাবত হুমায়ূনের নাম মোগল ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ অধ্যায়
সমকালের প্রধান সহায়ক গ্রন্থাবলী

সম্রাট হুমায়ূন সম্পর্কিত অধিকাংশ গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যেকার প্রধান গ্রন্থাবলীর মধ্যে খন্দমীরের 'কানুনে হুমায়ূনী' কেবল তাঁরই আদেশে লেখা হয়। অন্যান্য গ্রন্থাবলী আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে লেখা হয়। এ সমস্ত গ্রন্থের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বর্তমানে গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর উল্লেখ হয়েছে, যা থেকে এর মূল্যায়ন হতে পারে। এখানে সমকালের প্রধান গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে; যা থেকে তাঁর মহত্ত্ব অনুধাবনে অনেক সুবিধা হবে। এগুলোর শেষে প্রধান সমকালীন এবং অর্বাচীন গ্রন্থাবলীর যেগুলো থেকে এই পুস্তক রচনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে, তালিকা দেওয়া হয়েছে।

তুজুক-ই-বাবরী (ওয়াকিয়াত-ই-বাবরী) অর্থাৎ বাবুরের আত্মজীবনী : বাবুর তাঁর এ আত্মজীবনী তাঁর মাতৃভাষা চুগতাই তুর্কিতে রচনা করেন। এতে আরবি ও ফারসি ভাষার প্রচুর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আকবরের আমলে আবদুর রহীম খানে-খানান এটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। মিসেস বেভারিজ কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে টীকা-টিপ্পনীসহ মূল পুস্তকের ভারি সুন্দর অনুবাদ করেছেন। বাবুরের আত্মজীবনী রোজ-নামচার ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। বাবুরের জীবনের ৪৭ বছর ১০ মাসের ইতিহাসের মাত্র আঠারো বছরের বৃত্তান্তই এতে পাওয়া যায়। বাবুর ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবসরে হুমায়ূন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন, যা হুমায়ূনের প্রারম্ভিক জীবন ও চরিত্র অনুধাবনের জন্য বড়ই উপযোগী। হুমায়ূনের জন্ম, বাবুরের পুত্রদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, ভারত অভিযানে হুমায়ূনের অংশগ্রহণ, তাঁর বাদাখশান যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন, তাঁর ভাইদের প্রতি হুমায়ূনের ব্যবহারের আদেশ ইত্যাদি অনেক ঘটনার জন্য বাবুরনামা অত্যন্ত উপযোগী গ্রন্থ। অসংখ্য ঘটনা থেকে হুমায়ূনের চরিত্রের দুর্গুণও প্রকট হয়। দুর্ভাগ্যবশত, হুমায়ূনের জীবনের প্রারম্ভিক ঘটনাবলী বাবুরনামায় এত সংক্ষিপ্ত যে, অনেক কথা, যেমন হুমায়ূনের শিক্ষা, তাঁর মায়ের বংশ পরিচয়, হুমায়ূনের বাদাখশান থেকে প্রত্যাবর্তনের কারণ, চার পুত্রের মধ্যে কেবল হুমায়ূন ও কামরানের অংশ নিশ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যাওয়ার কারণ ইত্যাদি অনেক কথাই স্পষ্ট নয়, যার ফলে ঐতিহাসিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। হুমায়ূনের প্রারম্ভিক জীবনের জন্য অন্য কোনো গ্রন্থ না থাকার কারণে এটাই তাঁর সম্পর্কে জানার একমাত্র সাধন।

কানুনে হুমায়ূনী : এই গ্রন্থের লেখক গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ খন্দমীর ১৪৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মীর খন্দমীর (১৪৩৩-৯৮ খ্রি.) এঁর নানা ছিলেন। এঁর প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর নানার তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিরাত থেকে কান্দাহারে আসেন। সেখানে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আগ্রা পৌছান। এখানে মোগল সম্রাট বাবুর কর্তৃক সম্মানিত হন। সিংহাসনারোহণের পর হুমায়ূন তাঁকে আমীরুল আখবর উপাধি প্রদান করেন। গুজরাত অভিযানে (১৫৩৪ খ্রি.) তিনি হুমায়ূনের সাথে ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

খন্দমীর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলোর মধ্যে হবিবুসসিয়ার (১৫২৩ খ্রি. পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাস) খুবই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এঁকে হুমায়ূন সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার আদেশ সম্রাট ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়রে দিয়েছিলেন। খন্দমীর এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শুরুতে এবং ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে লেখক আলঙ্কারিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। কানুনে হুমায়ূনীতে হুমায়ূনের শাসনের তিন বছরের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণ, দীন পনাহ স্থাপন, তাঁর দ্বারা পরিচালিত রাজসিক নিয়ম-কানুন আবিষ্কার, জশন ইত্যাদির বর্ণনা আছে। হুমায়ূন সম্পর্কিত এটাই একমাত্র গ্রন্থ যা তাঁর আদেশে লেখা হয়েছিল। এ গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, ড. বেণীপ্রসাদ এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, যা অত্যন্ত উপযোগী।

আকবরনামা রচনার জন্য উপকরণ সামগ্রী একত্রিত করার জন্য, আকবর এমন লোকেদের যাঁরা তাঁর পিতা ও পিতামহের সমকালীন ছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কিত যিনি যা-কিছু জানেন, তিনি যেন তা লিপিবদ্ধ করেন। এই আদেশেরই পরিণামে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে—গুলবদন বেগমের 'হুমায়ূননামা', জওহরের 'তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত' এবং বায়েজিদের 'তাজকিরায়ে হুমায়ূন ও আকবর' হুমায়ূনের জীবন সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই।

গুলবদন বেগমের হুমায়ূননামা : বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগম ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর মায়ের নাম ছিল দিলদার বেগম। বাবুরের ভারত-আক্রমণের সময়ে এঁর বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে অন্যান্য মহিলার সাথে তিনিও ভারতে আসেন। বাবুরের মৃত্যুর সময়ে গুলবদনের বয়স ছিল মাত্র আট বছর। খিজির খাঁ মোগলের সাথে এঁর বিয়ে হয়। শের খাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে হুমায়ূনের পরাজয়ের পর গুলবদন আগ্রা থেকে লাহোর এবং সেখান থেকে কামরানের সাথে কাবুল যান। পলায়নের যুগে হুমায়ূন ও তাঁর ভাইদের সংঘর্ষের সময়ে গুলবদন সেখানেই ছিলেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতে আসেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্ব-এ গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন এবং ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হিন্দাল, গুলবদনের সহোদর ভাই ছিলেন। গুলবদনের যখন দু'বছর বয়স ছিল, তখন হুমায়ূনের মা তাঁকে পালন-পোষণ করেন। তিনি বরাবরই তাঁর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন এবং হুমায়ূন সম্পর্কিত বহুকথা তিনি মাহমের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন। গুলবদন এ স্মৃতিকথা ফারসি ভাষায় আকবরনামার জন্য আকবরের আদেশে লিপিবদ্ধ করেন। মোগলদের মাতৃভাষা ছিল চুগতাই তুর্কি। গুলবদন এ ভাষার শব্দাবলীও প্রয়োগ করেছেন। হুমায়ূননামা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাবুর ও হুমায়ূনের যুগের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাবুরের আমলের ঘটনাবলী খুবই সংক্ষিপ্ত। পুস্তকের বেশি অংশই হুমায়ূনের সাথে সম্পর্কিত।

হুমায়ূনের আমলের ঘটনাবলী তাঁর সামনেই ঘটেছিল। মোগল পরিবারের হওয়ার কারণে এ সমস্ত ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত লোকেদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। হুমায়ূনের বেগম হামিদা বানুর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এভাবে বহু পরিমাণ তথ্য, যা তাঁর পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব ছিল, তা অন্য কারো পক্ষে ছিল না। মহিলা হওয়ার কারণে অন্য লেখকদের সাথেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে এবং মোগল মহিলাদের বিষয়েও অনেক মনোরঞ্জক তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, মোগল যুগের মহিলাদের অবস্থা জানার জন্য এ গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অতিরিক্ত এতে সমকালীন রীতি রেওয়াজ, সামাজিক নিয়ম-কানুন ইত্যাদিরও বর্ণনা রয়েছে। মাহম বেগম কর্তৃক উৎসবের আয়োজন, আইনবন্দি, তিলিসম উৎসব, হিন্দাল মির্জার বিবাহোৎসব, মাহমের হুমায়ূনের পুত্র-সন্তান জন্মের আকাঙ্ক্ষা এবং সুন্দরী কন্যাদের সাথে হুমায়ূনের বিয়ের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, মোগল মহিলাদের পারস্পরিক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লড়াই এবং এরকম অজস্র ঘটনা গুলবদন বেগমের রচনা ছাড়া অপ্রাপ্য রয়ে যেত। বাবুরের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী, হুমায়ূনের প্রতি বাবুরের স্নেহভালবাসা, মাহমের হুমায়ূনের রাজকার্যের প্রতি আগ্রহ, চৌসার যুদ্ধে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মহিলাদের কথা, চৌসা এবং কনৌজের পরাজয়ের পর মোগল পরিবার ও আমীরদের শোচনীয় অবস্থার কথা, হামিদা বানুর সাথে বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনাবলী, হুমায়ূনের সাথে তাঁর ভাইদের সম্পর্ক, কাবুলে কামরানের অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনাবলীর বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুলবদন বেগম প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক ছিলেন না। হুমায়ূননামা তাঁর স্মৃতিকথা। তিনি এতে বর্ণিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। এরফলে, তিনি কোথাও কোথাও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। উদাহরণত, তাঁর সহোদর হিন্দালের প্রতি কোথাও কোথাও তিনি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, তাঁর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গুলবদন ঘটনাবলীর সততারও অনুসন্ধান করেন নি। বহু ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত, যেমন কনৌজ ও চৌসার যুদ্ধ। তাঁর লেখা তারিখও সর্বদাই সঠিক নয়।

মিসেস বেভারিজ গুলবদনের মূল গ্রন্থের সংস্করণ সম্পাদন করেছেন এবং টীকা-টিপ্পনীসহ তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

তাজাকিরাতুল ওয়াকিয়াত : এ গ্রন্থের লেখক জওহর আবতাবচির জন্ম ও প্রাথমিক জীবনের ঘটনাবলী আমাদের জানা নেই। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে একথা স্পষ্ট যে, হুমায়ূনের নির্বাসনকালে, উছ্ এবং ভক্কড় গমনের পর তিনি বরাবর তাঁর সাথে থাকেন। পঞ্জাব বিজয়ের পর হুমায়ূন জওহরকে হায়বাতপুরের রাজস্ব উসুলের কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁর কাজে প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাতার খাঁ লোদীর রাজকোষ এবং তাঁর অধীনস্ত প্রদেশও তাঁকে দিয়ে দেন। তা ছাড়া তাঁকে কিছু আধিকারিকের সাথে পঞ্জাব এবং মুলতানের খাজাঞ্চি নিয়োগ করা হয়। হুমায়ূনের দিল্লি অধিকারের পর সিকান্দার সূরের বিরুদ্ধে তিনি পঞ্জাবে আবুল মালীকে সহায়তা করেন। আকবরের আমলে তাঁর কার্যক্রম ও পদের কথা আমরা জানতে পারি না। যদিও তাঁর রাজত্বকালে তিনি বহুকাল অবধি জীবিত থাকেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ লেখা শুরু করেন।

জওহরের স্মৃতিকথায় হুমায়ূনের জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তিনি যা কিছু লিখেছেন তা তাঁর স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখেছেন এবং এমন সব ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন যা তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। তিনি হুমায়ূনের সাথে প্রায় পঁচিশ বছর কাল অতিবাহিত করেন। যার ফলে, হুমায়ূনকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ তিনি লাভ করেন। হুমায়ূনের নির্বাসনকালের ঘটনাবলীর জন্য জওহর খুবই উপযোগী। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই স্মৃতিকথা লেখার জন্য জওহরের কাছে কোনো ডায়েরি ছিল না। এই কারণে ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমনটি তিনি স্বয়ং লিখেছেন যে, ঘটনাবলীর তারিখ দেওয়া সম্ভব হল না। তাঁর প্রদত্ত তারিখ এতটা বিভ্রান্তিকর যে, তা থেকে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, আকবরের জন্মসন। হুমায়ূন এমন উচ্চস্তরে আসীন ছিলেন যে, তাঁর কার্যাবলীর আলোচনা করা ও তাঁকে কাছে থেকে দেখা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। একজন ঐতিহাসিকের গুণ না থাকা সত্ত্বেও কয়েক স্থলে জওহরের নিজের বিচার বিবেচনা দেখে আমরা চমৎকৃত হয়ে যাই। গুজরাত অভিযানের সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনকে জওহরের এই পরামর্শ যে, বাহাদুর শাহকে গুজরাতের ডেপুটি নিযুক্ত — উচিত ছিল এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেজর স্টুয়ার্ট জওহরের তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এ বিষয়ে আর্সকিনের মত ছিল যে, এ অনুবাদ ঠিক নয়। মেজর স্টুয়ার্ট এর অনুবাদ ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত জওহরের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মেলে। সম্ভবত, এ অনুবাদ ঐ পাণ্ডুলিপি থেকেই করা হয়ে থাকবে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, স্টুয়ার্টের অনুবাদে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে, তবে, আর্সকিনের মতের সাথে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না।

তাজকিরায়ে হুমায়ূন ওয়া আকবর : এই গ্রন্থের লেখক বায়েজিদ বিয়াত একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন ইরানের অধিবাসী এবং তাঁর বাল্যকাল তবরেজ এ অতিবাহিত হয়েছিল। ইরানে তিনি হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁর সেনাদলে ভর্তি হয়ে যান। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূনের বৈরাম খাঁকে দূত করে কাবুলে পাঠানোর সময়ে বায়েজিদও তাঁর সাথে গিয়েছিলেন। বৈরাম খাঁ তো ফিরে আসেন কিন্তু বায়েজিদ গিরদিজে তাঁর ভাই বাহরাম সক্কার কাছে চলে যান। তিনি বহুদিন অবধি হুমায়ূনের এক প্রতিষ্ঠিত আমীর ও সেবক রূপে থাকেন এবং হুমায়ূনের দ্বারা তিনি সম্মানও পেতে থাকেন। ঐ সময়কার কিছু ঘটনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূনের কান্দাহার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে বায়েজিদ হুমায়ূনের জন্য আকবরের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ কিছু ফল নিয়ে সেখানে পৌছান। হুমায়ূনের ভারত-অভিযানের সময়ে তিনি কাবুলে মুনইম খাঁর কাছে রয়ে যান। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোর আসেন এবং বৈরাম খাঁর পতনের সময়ে সংবাদ বাহকের কাজ করেন। তারপর, উত্তর প্রদেশের পূর্ব-প্রান্তীয় জেলাগুলোতে বসবাসের অবসর লাভ করেন। আকবরের রাজত্বকালে তাঁকে অন্য সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত করা হয়। ১৫৯০-৯১ সালে তিনি লাহোরের রাজকার্যের আমীন এবং দারোয়ান ছিলেন। ১৫৯০-৯১ সনে যখন তিনি তাঁর এ গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে যান এবং পক্ষাঘাতের কারণে তাঁর বাম হাত অকেজো হয়ে যায়। আবুল ফজল এক লিপিক নিযুক্ত করেন। বায়েজিদ বলতেন আর লিপিক লিপিবদ্ধ করতেন। পুস্তক পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, বায়েজিদ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত।

বায়েজিদ তাঁর গ্রন্থে ১৫৪২ থেকে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ অবধি মোগল যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে হুমায়ূনের পুরো ইতিহাস এ গ্রন্থে নেই। হুমায়ূনের সাথে মিলিত হওয়ার পর তিনি এমন বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি আর কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে তিনি নিজেই অংশ নিয়েছিলেন। বায়েজিদ এমন কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণত, তিনি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন যাঁরা হুমায়ূনের সাথে ভক্কড় থেকে ইরানের পথে রওনা হয়েছিলেন। ফলে ভারত আক্রমণের সময়ে তিনি এমন লোকেদের নামের তালিকা দিয়েছেন যাঁরা হুমায়ূন ও বৈরাম খাঁর সঙ্গে ছিলেন। শাহ তাহমাস্পের পত্র, যাতে হুমায়ূনের অতিথি সৎকারের বর্ণনা রয়েছে এবং কাশগড়ের শাসককে লেখা হুমায়ূনের পত্রটিও তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বায়েজিদ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মূল গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের হুমায়ূন সম্পর্কিত অংশটির ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন ড. বেণীপ্রসাদ সাক্সেনা, যা ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে (জিলদ ৬, ভাগ ১, পৃ. ৭১-১৪৮)।

তারীখে রশীদী : এই গ্রন্থের লেখক মির্জা হায়দার বাবুরের চাচাত ভাই ছিলেন। ১৪৯৯ - ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাশখন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫০৬ - ০৭ খ্রিস্টাব্দে হায়দার মির্জার পিতা মুহম্মদ হুসেন গুরগান বাবুরের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু বাবুর তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কিছুদিন পর শাইবানী খাঁ তাঁকে হত্যা করেন। হায়দার মির্জা তখন ছিলেন শিশু। বাবুর তাঁকে দেখাশুনা করেন। হুমায়ূনের রাজত্বকালে তিনি ভারতে আসেন। কানৌজের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মোগল বাহিনী ছিল এঁরই নেতৃত্বাধীন। কনৌজের পরাজয়ের পর তিনি লাহোর পর্যন্ত হুমায়ূনের সাথে ছিলেন। পঞ্জাব থেকে তিনি কাশ্মীরে চলে যান এবং সেখানকার শাসক হয়ে বসেন। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে কিছু স্থানীয় লোক তাঁকে হত্যা করে।

মির্জা হায়দার হুমায়ূন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি। তা সত্ত্বেও হুমায়ূন সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূন ও তাঁর ভাইদের শোচনীয় অবস্থা, কনৌজের যুদ্ধ মোগলদের পলায়ন, লাহোরে যুক্তি পরামর্শ ইত্যাদি ঘটনাবলীর জন্য তাঁর বর্ণনা অত্যন্ত উপযোগী।

ইলিয়াস ও রাস "এ হিস্ট্রি অব দি মোগলস অব সেন্ট্রাল এশিয়া" নাম দিয়ে তারীখে রশীদীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, যা থেকে বর্তমান গ্রন্থে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

নফায়সুল মাআসির : এই গ্রন্থের লেখক মীর আলাউদ্দৌলা বিন ইয়াহিয়া সাইফি হুসাইনী কজবীনী। লেখক ১৫৬৫ - ৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৫৮৯ - ৯০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। এতে সমকালীন কবিদের জীবনী ও তাঁদের কবিতাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। হুমায়ূনের আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

তারীখে ইব্রাহীমী : এই গ্রন্থের লেখক ইব্রাহীম বিন জরীর (হরীর)-এর সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। এটি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এতে হযরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদম থেকে নিয়ে ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে। মূল গ্রন্থ অপ্রকাশিত।

তারীখে এলচীয়ে নিজাম শাহ : এই গ্রন্থের লেখক খওয়ারশাহ বিন কুবাদ আল-হুসাইনী, বুরহান নিজামশাহ প্রথম (১৫০৮ - ৫৩ খ্রি.) এর সেবক ছিলেন। এঁকে রাজদূত করে রানে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে কয়েক বছর বসবাস করেন এবং তিনি শাহ তাহমাস্প এর সাথে সাক্ষাৎও করেন। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এতে কামরানকে লেখা হুমায়ূনের পত্রাবলী এবং বাহাদুর শাহকে লেখা পত্রাবলী সংযুক্ত হওয়ায় এ গ্রন্থও সবিশেষ উপযোগী।

মিরাতুল মমালিক : সাদী আলী রঈস নামক এক তুর্কি অ্যাডমিরাল ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। লেখক এমন পরিবারের ছিলেন, যারা সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বয়ং গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্রী ও কবি ছিলেন। হুমায়ূন এর সাথে সাক্ষাৎ করে খুবই প্রসন্ন হন এবং তিনি অ্যাডমিরালের গজলের প্রশংসা করেন এবং আমীর আলীশীয়ের এর সাথে তাঁর তুলনা করেন। আগ্রা বিজয় সম্পর্কে সাদী আলী হুমায়ূনের জন্য এক তিথি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন। তিনি হুমায়ূনের বার্তালাপের বর্ণনা দিয়েছেন যা থেকে হুমায়ূনের বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। হুমায়ূনের মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনাবলীর জন্যও গ্রন্থটি খুবই উপযোগী এবং বেরি কর্তৃক এটি 'দি ট্রাভেলস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারস অব দি টার্কিশ অ্যাডমিরাল সীদী আলী রঈস' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ইবনে বতুতা সহ অন্য পর্যটকদের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

AMARBOI.COM

তারীখে আলফি : সম্রাট আকবরের যুগে ইসলামের এক হাজার বছর পূর্ণতা লাভ করছিল। তারীখে আলফি রচিত হয় আকবরের আদেশে, যাতে কয়েক জন লেখক অংশগ্রহণ করেন। হুমায়ূনের সম্বন্ধে এতে নতুন কিছু নেই, যদিও তাঁর আমলের অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করেন। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।

তারীখে খানদানে তিমুরিয়া : এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাটনার খুদাবখশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে আকবরের দ্বাবিংশতম বয়স পর্যন্ত তৈমুর বংশের ইতহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি একটি চিত্রিত গ্রন্থ, এজন্য এটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আহসানুততাওয়ারিখ : এ গ্রন্থের লেখক হাসান এ রুমলু ১৫৮২ - ৮৩ খ্রিস্টাব্দে এটি রচনা করেন। গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে এটি প্রকাশিত হয়েছে এবং মি. সেডন এর ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। লেখক শাহ তাহমাস্পের দরবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। এতে হুমায়ূনের ইরান নিবাসের ঘটনার উপর আলোকপাত রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবকাতে আকবরী : এই গ্রন্থের লেখক খ্বাজা নিজামউদ্দীন আহমদের জন্ম আনুমানিক ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে। এঁর পিতা খ্বাজা মুহম্মদ মুকিম হরভি বাবুরের খুবই বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এবং দীওয়ানে ব্যুতাত- এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। হুমায়ূনের গুজরাত বিজয়ের পর ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে যে সময়ে আসকারিকে সেখানে নিযুক্ত করা হয়, ঐ সময়ে মুকিম তাঁর উজির ছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে যে সময়ে হুমায়ূন শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আগ্রায় পৌছান সে সময়ে মুকিম হরভি তাঁর সাথে ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের শুরুতেও তিনি প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। নিজামউদ্দীন আহমদ আকবরের রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ-স্তরের সৈনিক ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজকীয় অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কয়েক বছর তিনি গুজরাতে বখশী পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেখান থেকে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দরবারে ডেকে নেওয়া হয়। পয়তাল্লিশ বছর বয়সে, ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

নিজামউদ্দীন 'তবকাতে আকবরী'তে গজনী বংশ মর্যাদা থোকে শুরু করে ১৫৯৪-৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় ২৯ টি গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছেন। এর ফলে তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর পিতা বাবুর ও হুমায়ূনের শাসনকার্যের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি অনেক তথ্য তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। 'তবকাতে আকবরী'র ভাষা সরল। নিজামউদ্দীন তাঁর রচনায় সমকালীন অনেক লেখকদের ন্যায় কট্টরতা ও পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেন নি ; তিনি বরং উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কবিদের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হুমায়ূনের জীবনের কিছু ঘটনার জন্য নিজামউদ্দীনের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খলীফার ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তাঁর বিবরণ আমাদের প্রধান সাধন হয়েছে, কেননা, তাঁর পিতার কারণেই এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। এর অতিরিক্ত মুহম্মদ জামান মির্জা ও মুহম্মদ সুলতান মির্জা, হুমায়ূনের বাংলা অভিযান ইত্যাদি অনেক ঘটনার জন্য এ গ্রন্থ খুবই উপযোগী বলে সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর পিতা আসকারির উজির ছিলেন। গুজরাতে মোগলদের বিজয় ও পলায়নের ঘটনাবলীর তথ্য সম্ভবত তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। কয়েক স্থলে নিজামউদ্দীনের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কিছু ঘটনা বিতর্কিত। মি. ব্রজেন্দ্রনাথ দে এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

মুনতাখাবউত্তাওয়ারিখ : এই গ্রন্থের লেখক আবদুল কাদির বদায়ূনী ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরের টোডা ভীম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করেন বসওয়াড়ায়। তারপর আবুল ফজল ও ফৈজির সাথে শায়খ মুবারক নাগৌরির কাছে আগ্রায় শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বদায়ূনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে আসেন। তিনি সেখানে পাটিয়ালির জায়গীরদারের অধীনে ৯ বছর অতিবাহিত করেন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকবরের দরবারে আসেন। তাঁকে এক হাজার বিঘা জমি মদ্দে মা-আশ রূপে দেয়া হয়। আবদুল কাদির পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতও জানতেন। রামায়ণ-মহাভারতের ফারসি অনুবাদে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। তিনি আরো কিছু গ্রন্থও রচনা করেন, সেগুলোর মধ্যে 'মুন্তাখাবউত্তওয়ারিখ' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে গজনী বংশ থেকে শুরু করে আকবরের রাজত্বকালের ৪০ বছরের সময়-কালের ইতিহাস লিপিদ্ধ হয়েছে। আব্দুল কাদির লিখেছেন, তাঁর গ্রন্থ তবকাতে আকবরীর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু নতুন কথা আছে যা তবকাতে আকবরীতে নেই। বদায়ূনী ছিলেন কট্টর সুন্নী মুসলিম, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সে রকম। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমানদের তিনি কট্টর সমালোচক। আকবরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুদার, সংকুচিত, পক্ষপাতপূর্ণ ও তিক্ত। এই কারণে যদিও এ পুস্তক ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও বহুকাল যাবত তা গোপন রাখা হয় এবং জাহাঙ্গীরের আমলে তা প্রকাশ হয়। হুমায়ূনের ইতিহাস প্রসঙ্গে বদায়ূনী ঐ যুগের শিয়া সুন্নী মতভেদ এবং অন্য সমকালীন লোকেদের ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং কবিদেরও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই দৃষ্টিতে তাঁর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী। র‍্যাংকিং এবং লো এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গুশলানে ইব্রাহীমী বা তারীখে ফিরিশতা : ঐতিহাসিক ফিরিশতার পুরো নাম মুহম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ ফিরিশতা আস্তারাবাদী। ফিরিশতার জীবনের অধিককাল সময় দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর এ ইতিহাস ইব্রাহীম আদিল শাহকে (১৬০৬-৭) উৎসর্গ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে এটি রচিত হয়। ফিরিশতা ৩৫ টি গ্রন্থের আলোকে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যেকার বহু গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফিরিশতার বিশেষ স্থান রয়েছে। ব্রিগ্‌স চার খণ্ডে এ বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। নওলকিশোর প্রেস, লখনৌ থেকে এর ফারসি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ফিরিশতা হুমায়ূন সম্পর্কিত এমন কিছু ঘটনা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কয়েক স্থানে ফিরিশতা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। এর ভাষাও সরল ও স্পষ্ট।

এই সমস্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও সমকালীন রাজ্যের (আঞ্চলিক) ইতিহাসও আছে যা হুমায়ূনের ইতিহাসের জন্য উপযোগী। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে মীর আবু তুরাব ওয়ালীর তারীখে গুজরাত, সিকান্দার বিন মুহম্মদ মঞ্জুর মিরআতে সিকান্দারী, আবদুল্লাহ বিন উমর আল-মক্কীর 'জাফরুল বালেহ বে মুজাফর ওয়া আলেহ' ও মীর মুহম্মদ মাসুমীর 'তারীখে সিন্ধ',গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখে গুজরাত : এই গ্রন্থের লেখক মীর আবু তুরাব ওয়ালী শিরাজের সৈয়দদের বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। এঁর পিতা ও চাচা গুজরাতে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আবু তুরাবকে কিছুদিন পর তাঁকে আকবরের দরবারে উপস্থিত করা হয়। তাঁর উপর আকবরের এতটা বিশ্বাস ছিল যে, ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মীরে হজ্ব নিযুক্ত করা হয় এবং অমাত্যদের বেগমদের একটি বড় দল নিয়ে তিনি মক্কায় যান। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাতে ফিরে আসেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে গুজরাতের আমীনে সুবা নিযুক্ত করা হয়। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তারীখে গুজরাতে ১৫২৫ থেকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে। বাহাদুর শাহের দরবারে মোগল শরণার্থীদের গতিবিধি, বাহাদুর শাহ ও হুমায়ূনের মত-বিরোধের জেরে তাঁদের মধ্যেকার পত্র-ব্যবহার এবং হুমায়ূনের গুজরাত অভিযান সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য এ পুস্তক খুবই উপযোগী। লেখক তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ঐ সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা তিনি নিজে জানতেন। হুমায়ূন সম্পর্কিত অনেক ঘটনায় তাঁর পিতা, তাঁর চাচা ও তিনি স্বয়ং অংশ নিয়েছিলেন।

মিরআতে সিকান্দারী : এই গ্রন্থের লেখক সিকান্দার বিন মুহম্মদ ওরফে 'মঞ্জু' তাঁর ইতিহাস ১৬১১ কিংবা ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন। এতে প্রথম মুজফফর শাহ থেকে শুরু করে তৃতীয় মুজফফর শাহের মৃত্যু (১৫৯১ খ্রি.) পর্যন্ত সময়-কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বহু সংখ্যক কিংবদন্তি ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অতিরিক্ত এতে বাহাদুর শাহ সম্পর্কিত অনেক কিংবদন্তি ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন, বাহাদুর শাহের তোতা ও শিল্পী মঞ্জুকে বন্দি করার এবং তাকে মুক্তি দেওয়ায় কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন। দুই শাসকের মধ্যেকার পত্র ব্যবহার ও বাহাদুর শাহের শেষ পত্রটির উল্লেখও এতে করা হয়েছে। বেলে এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

জাফরুল বালেহ বে মুজাফফর ওয়া আলেহ : এই গ্রন্থের লেখক আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন উমর আল-মক্কী ওরফে হাজিউদ্দবীর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন এবং তাঁর পিতার সাথে আহমদাবাদে বসবাস করতে থাকেন। গুজরাত বিজয়ের পর লেখকের পিতাকে সম্রাট আকবর গুজরাতের ওয়াকফ প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়োগ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর (১৫৭৬ খ্রি.) পর তিনি অন্য এক আমীরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর খানদেশের আমীর ফৌলাদ খাঁর সেবায় পৌছান। হাজীউদ্দবীর তাঁর এ গ্রন্থ ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আরবি ভাষায় রচনা করেন। এমনও প্রতীত হয় যে, পরে তিনি এর পরেও সংশোধন করেন। এই গ্রন্থে গুজরাতের সুলতানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের সাথে সাথে অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরও বর্ণনা করেছেন। এতে বাহাদুর শাহ ও হুমায়ূনের মধ্যে ব্যবহৃত পত্রাবলীও সংকলিত হয়েছে। হুমায়ূন ও বাহাদুর শাহ সম্পর্কিত অনেক উপযোগী সামগ্রীও রয়েছে। ডেনিসন রাস 'অ্যান অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত' নামে এর ইংরেজি অনুবাদ রয়েছেন। এই নামে এ গ্রন্থটি অধিক প্রসিদ্ধ।

তারীখে সিন্ধ : এই গ্রন্থের লেখক মীর মুহম্মদ মাসুম 'নামী' ভক্কড়ের শায়খুল ইসলামের পুত্র ছিলেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাতে আসেন এবং নিজামউদ্দীন আহমদের বন্ধু হয়ে যান। ১৫৯৫ - ৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ২৫০ এর মনসব প্রদান করেন। ১৬০৩ - ৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রাজদূত করে ইরানে পাঠানো হলে ১৬০৬ - ৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভক্কড়ে ফিরে আসনে এবং ওখানেই ইন্তেকাল করেন। তারীখে সিন্ধ এ মুসলমানদের বিজয় থেকে শুরু করে সম্রাট আকবরের সময়কার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। হুমায়ূনের সিন্ধুতে বসবাসের সময়কার উপযোগী বিবরণ এতে রয়েছে। ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট পুনা 'তারীখে সিন্ধ' নামে এটি প্রকাশ করেছেন।

আফগানদের সাথেও হুমায়ূনের সংঘর্ষ হয়েছিল। আফগান ঐতিহাসিকদের রচনাতেও হুমায়ূন সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিকেরা অবশ্য সমকালীন নন। তা সত্ত্বেও এরা পরস্পর সূত্রে এ সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ওয়াকিয়াত এ মুশতাকী' 'তারীখ এ শেরশাহী' 'মখজানে আফাগানা' ও 'সালাতীনে আফগানা' প্রধান।

ওয়াকিয়াত এ মুশতাকী : এই গ্রন্থের লেখক শেখ রিজকুল্লাহ মুশতাকী ১৪৯১ - ৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফারসি ও হিন্দি উভয় ভাষারই কবি ছিলেন। ওয়াকিয়াত এ মুশতাকীতে বাহলুল লোদী থেকে নিয়ে আকবরের রাজত্বকালের সময় পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এতে শাসকদের সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে।

তারীখে শেরশাহী : এই গ্রন্থের লেখক আব্বাস খাঁ সরওয়ানী আকবরের রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর আদেশে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৭৯ খ্রি.)। এতে শেরশাহ সম্পর্কিত অজস্র ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হুমায়ূন ও শেরশাহ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর জন্য এ গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী। ইলিয়ট ও ডাসন "হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ান্স" এর চতুর্থ খণ্ডে এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

সালতীনে আফগানা : আহমদ ইয়াদগার তাঁর এ পুস্তকে নিজেকে আফগানদের সেবক বলে উল্লেখ করেছেন। এঁর পিতা গুজরাতে আসকারির উজির ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এটি "তারীখে শাহী" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ পুস্তক বাংলার শাসক দাউদ শাহের আদেশে (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু হয়) লেখা হয়। এতে লোদী ও সূর বংশের শাসকদের বিবরণ রয়েছে। মোগলদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলীও এতে বিবৃত হয়েছে। বাবুর কর্তৃক হুমায়ূনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার যে বিবরণ আহমদ ইয়াদগার দিয়েছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে হুমায়ূনের যুগের ঘটনাবলী তবকাতে আকবরী থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে এর কয়েকটি স্থানে আরো উপযোগী উপকরণ সামগ্রী রয়েছে।

মখজানে আফগানা : খান জাহান এর আদেশে নিয়ামতউল্লাহ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এটি লিখতে শুরু করেন। ডার্ন 'হিস্ট্রি অব আফগানস' নামে এ গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এতে লোদী ও সূর বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তারীখে দাউদী : এ গ্রন্থের লেখক আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সমকালীন ছিলেন। লোকেদের আফগান সুলতানদের কথা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে দেখে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ বাংলার আফগান শাসক দাউদ শাহকে (১৫৭২-৭৬ খ্রি.) উৎসর্গ করেছেন, যদিও জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি এটি রচনা করেন। মূল গ্রন্থ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ অধ্যায়
প্রধান সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা

(ক) সমকালীন গ্রন্থাবলী

মূল গ্রন্থ

আবুল ফজল — আকবরনামা, খণ্ড ১, কলকাতা, ১৮৭৩ -৮৭।

আবু তুবাব ওয়ালী — তারীখে গুজরাত, কলকাতা ১৯০৯।

আবদুল্লাহ — তারীখে দাউদী, আলিগড়, ১৯৫৪।

আহমদ ইয়ায়দগার — তারীখে শাহী, কলকাতা, ১৯৩৯।

গুলবদন বেগম — হুমায়ূননামা, লন্ডন, ১৯০২।

জায়সী, মালিক মুহমদ — পদমাবত, নাগরী প্রচারণী সভা, কাশী।

ফিরিশতা, মুহম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ — তারীখে ফিরিশতা, নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ।

বদায়ূনী, আবদুল কাদির — মুন্তাখাব উত্তাওয়ারিখ কলকাতা, খণ্ড ১, ১৮৬৮।

বায়েজিদ বিয়াত — তারীখে হুমাযূঁওয়া আকবর, কলকাতা, ১৯৪১।

মুহম্মদ মাসুম — তারীখে সিন্দ য়া তারীখে মাসুমী, পুনা, ১৯৩৮।

মূল গ্রন্থাবলীর অনুবাদ

আবুল ফজল — আকবরনামা, এইচ বেভারিজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ ; আঈনে আকবরী, খণ্ড ১. মি. এইচ ব্লকমান ও ডি. সি ফিলার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৩৯ ; খণ্ড ২ এবং ৩, দ্বিতীয় সংস্করণ এইচ. এস জ্যারেট ও যদুনাথ সরকার কৃত ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯।

আবদুল্লাহ মাহমুদ (হাজী-উদ-দবীর) — জাফহরুল ওয়ালের রাসকৃত ইংরেজি অনুবাদ অ্যান অ্যারাবিক হিস্ট্রি অব গুজরাত।

ইলিয়ট ও ডাসন — হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ান্স, খণ্ড, ১ ৪ ও ৫, লন্ডন, ১৮৭২ ও ১৮৭৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দমীর — কানুনে হুমায়ূনী, ড. বেণীপ্রসাদ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৪০।

গুলবদন বেগম — হুমায়ূননামা, মিসেস বেভারিজের ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৯০২।

জাহাঙ্গীর — জাহাঙ্গীরের আত্মকথার রোজার্স কৃত ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৯ ও ১৯১৪ ; বৃজরত্ন কৃত হিন্দি অনুবাদ, নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী, ২০১৪ সংবত।

জওহর — তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত অর্থাৎ, জওহরের সম্রাট হুমায়ূন সম্পর্কিত স্মৃতিকথা, মেজর চার্লস স্ট্যুয়ার্ট কৃত ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা, ১৯০৪।

নানক গুরু — আদি গ্রন্থ

নিজামউদ্দীন আহমদ — তবকাতে আকবরী, মি. বি. দে কৃত ইংরেজি অনুবাদ, খণ্ড ২ ও ৩ কলকাতা ১৯৩৬ - ৪০।

ফিরিশতা — তারীখে ফিরিশতা, জন ব্রিগস কৃত ইংরেজি অনুবাদ হিস্ট্রি অব দি রাইজ অব মুহামেডান পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ২, ৩, ৪ কলকাতা ১৯০৯ ও ১৯১০।

বদায়ূনী — মুন্তাখাবউত্তাওয়ারিখ এর র‍্যাংকিং লো ও হেগ কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বম বেরি এ — ট্রাভেলস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারস অব দি তার্কিশ অ্যাডমিরাল সীদী অলী রঈস।

বাবুর — দি মেমোয়ার্স অন বাবুর, বাবুরের আত্মকথায় মিসেস এ. এস বেভারিজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৯২১।

বায়েজিদ ব্যুতাত — তারিখ হুমায়ূ ওয়া আকবর ড. বেণী প্রসাদ সাক্সেনা কৃত ইংরেজি অনুবাদ ইলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটি স্টাডিজ, খণ্ড, ৬ অংশ ১, ১৯৩০।

বেলে, ই. সি — হিস্ট্রি অব গুজরাত, (দি লোকাল মুহমেডান ডাইনোস্টিক অব গুজরাত) মিরাআতে সিকান্দারিয় ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৮৮৬।

মির্জা হায়দার — তারীখে রশীদী, ইলিয়াস ও রাস কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

রিজভি, আতহার আব্বাস — মুগল কালীন ভারত, হুমায়ূন, খণ্ড ১, আলীগড়, ১৯৬১ ও খণ্ড ২, আলীগড় ১৯৬২।

হোদীওয়ালা, এস. এইচ — স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, খণ্ড ১, বোম্বাই, ১৯৩৯।

আধুনিক গ্রন্থাবলী

আর্সকিন, উইলিয়াম — হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া আন্ডার দি ফার্স্ট টু সেভারেন্স অব দি হাউস অব তাইমুর, বাবুর অ্যান্ড হুমায়ূন, খণ্ড ১ ও ২, ১৮৫৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থী আর, এস — হুমায়ূন (অপ্রকাশিত)।

অগস্টোস, ফ্রেডারিক কাউন্ট অফনোওর — এম্পেরর আকবর, এ. এস বেভারিজ কৃত ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা ১৮৯০।

ইবনে হাসান — দি সেন্ট্রল স্ট্রাকচার অব মোগল এম্পারার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৬।

ইরউইন, উইলিয়ামস — লেটার মোগলস, খণ্ড ১ ও ২, কলকাতা ১৯২২।

ঈশ্বরী প্রসাদ — দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব হুমায়ূন, ওরিয়েন্ট লংম্যানস, ১৯৪৫।

এডওয়ার্ডস এস. এম. ও এবং গ্যারেট এইচ. এল. ও. — মোগল রুল ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটে প্রেস, ১৯৩০।

এলফিনস্টোন — হিস্ট্রি অন ইন্ডিয়া।

কানুনগো কালিকারঞ্জন — শেরশাহ (কলকাতা ১৯২১)।
দারাশিকাহ (কলকাতা ১৯৫২)।

কাম্মিস্‌সারিয়ট, এম. এস — হিস্ট্রি অব গুজরাত (১৯৩৮) লংম্যানস গ্রীন অ্যান্ড কোম্পানি।

খাঁ, স্যার সৈয়দ আহমদ — আমার আস-সানদীদ (উর্দু) কানপুর, ১৯০৪।

গনী, মুহম্মদ আবদুল — এ হিস্ট্রি অব পার্শিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অ্যাট দি মোগল কোর্ট, খণ্ড ২, ইলাহাবাদ, ১৯৩০।

গ্রেনার্ড, ফারন্যান্ড — বাবুর : ফার্স্ট অব দি মোগলস (লন্ডন ১৯৩১)।

জাফর, এস. এম — দি মোগল এম্পায়ার (পেশোয়ার, ১৯৩৬)। এডুকেশন ইন মুসলিম ইন্ডিয়া (১৯৩৬)।

টড, জেমস — অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অন রাজস্থান, খণ্ড ১ - ২, পপুলার এডিশন, জর্জ রুতালজ অ্যান্ড সন্স (লন্ডন)।

তারাচাঁদ — ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার, ইলাহাবাদ, ১৯৩৬।

ত্রিপাঠী, রামপ্রসাদ — রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি মোগল এম্পায়ার, (ইলাহাবাদ, ১৯৫৫)।
— সাম অ্যাসপেকটস অব মুসলিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইলাহাবাদ, ১৯৫৬)।

নাজিম, মুহম্মদ — লাইফ অ্যান্ড টাইমস অব সুলতান মাহমুদ অব গজনী। (কেম্ব্রিজ, ১৯৩১)।

প্রসাদ, ড. বেণী — হিস্ট্রি অন জাহাঙ্গীর, তৃতীয় সংস্করণ (ইলাহাবাদ, ১৯৪০)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যানার্জি, ড. এস. কে — হুমায়ূন বাদশাহ, খণ্ড ১, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৮ ; খণ্ড ২ লখনৌ, ১৯৪১।
বর্ন, স্যর রিচার্ড — দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অন ইন্ডিয়া, চতুর্থ খন্ড, দিল্লি।
বিল, টমস উইলিয়াম — দি ওরিয়েন্টাল বায়োগ্রাফিকাল ডিকশনারি (কলকাতা, ১৮৮১)।
বেন্দ্রে, বি. এস. — এ হিস্ট্রি অব মুসলিম ইনসক্রিপশনস (বোম্বাই, ১৯৪৪)।
ব্রাউন, পার্সি — ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইসলামিক পিরিয়ড, তৃতীয় সংস্করণ, বোম্বাই।
— ইন্ডিয়ান পেন্টিংস আন্ডার দি মোগলস (অক্সফোর্ড, ১৯২৪)।
ব্রাউন, সি. জে. — দি কয়েন্স অব ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯২২)।
মজুমদার বি — এ গাইড টু মারনাথ (দিল্লি, ১৯৪৭)।
মির্জা, মুহম্মদ ওয়াহিদ — দি লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অব আমীর খসরু (কলকাতা, ১৯৩৫)।
ম্যালিমন জি. বি — আকবর, অক্সফোর্ড, ১৯০৮।
মোরল্যান্ড, ডব্লু. এইচ — ইন্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অব আকবর (লন্ডন, ১৯২০) দি আগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব মুসলিম ইন্ডিয়া (ইলাহাবাদ)।
রায়, এন. বি — দি সাকসেসার্স অব শেরশাহ (ঢাকা, ১৯৩৪)।
রায়, চৌধুরী ড. এম.এল — দি স্টেট অ্যান্ড রিলিজন ইন মোগল ইন্ডিয়া, (কলকাতা, ১৯৫১)।
রায়, সুকুমার — হুমায়ূন ইন পার্শিয়া (কলকাতা, ১৯৪৮)।
রেউ, বিশ্বেশ্বরনাথ — মারওয়াড় কা ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (যোধপুর, ১৯৩৮)।
লা, নরেন্দ্রনাথ — প্রমোশন অব লার্নিং ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং মুহামেডান রুল (লংম্যানস গ্রীন অ্যান্ড (কাম্পানি)।
লাল. কে. এস — হিস্ট্রি অব দি খলজীজ (ইলাহাবাদ, ১৯৫০)।
লেনপুল, স্টেনলি — মেডাইভ্যাল ইন্ডিয়া (লন্ডন, ১৯১৬)
— বাবুর (দিল্লি, ১৯৫৭)।
উইলিয়ামস
এল. এফ রাশব্রুক — অ্যান এম্পায়ার বিল্ডার অব দি সিক্সটিন্‌থ্ সেঞ্চুরি।
— জহীরউদ্দীন মুহম্মদ বাবুর, লংমানস গ্রীন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৮।
শর্মা, শ্রীরাম, — এ বিবসিওগ্রাফী অব মোগল ইন্ডিয়া (বোম্বাই)।
— স্টাডিজ ইন মেভাইভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, সোলাপুর, ১৯৫৬।
— দি রিলিজিয়াস পলসি অব দি মোগল এম্পেরর্স, কলকাতা, ১৯৪০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্মা, এস. আর	—	মোগল এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া (বোম্বাই ১৯৪০)।
শর্মা, জি. এন	—	মেবার অ্যান্ড দি মোগল এম্পেয়ার্স (আগ্রা, ১৯৫৪)।
শরণ, ড. পরমাত্মা	—	স্টাডিজ ইন মেডাইভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি (দিল্লি, ১৯৫২)।
	—	প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মোগলস (ইলাহাবাদ, ১৯৪১)।
শ্যামলদাস, কবিরাজ	—	বীর বিনোদ, খণ্ড ১ ও ২।
শ্রীবাস্তব, আলীবর্দীলাল	—	শেরশাহ অ্যান্ড হিজ সাকসেসার্স (আগ্রা, ১৯৫০)।
	—	আকবর দি গ্রেট (আগ্রা, ১৯৬২)।
	—	মোগল এম্পায়ার (আগ্রা)।
সরকার, স্যার যদুনাথ	—	এ মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯৬০)।
সিংহ, রঘুবীর	—	পূর্ব আধুনিক রাজস্থান (উদয়পুর, ১৯৫১)।
সুফী, জি. এম. ভি	—	আল-মিনহাজ (লাহোর, ১৯৪১)
স্টুয়ার্ট, সি. এম বিলয়ার্স	—	গার্ডেন অব দি মোগলস (লন্ডন, ১৯১৩)।
স্পিয়ার, টি. জি. পি	—	দিল্লি, ইসকে স্মারক আউর ইতিহাস (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪০)।
স্মিথ. ভি. এ	—	আকবর দি গ্রেট মোগল (অক্সফোর্ড, ১৯১৯)।
	—	এ হিস্ট্রি অব ফাইন আর্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান সিলোন বোম্বাই, তৃতীয় সংস্করণ)।
	—	দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড, ১৯২৮)।
হাসান, মোহিদিদুল	—	কাশ্মীর আন্ডার দি সুলতান, কলকাতা, ১৯৪৯।
হীরাচন্দ	—	বাসওয়াড়া রাজ্য কা ইতিহাস (অজমের সন ১৯৩৭)।
	—	ডুঙ্গরপুর রাজ্য কা ইতিহাস (অজমের বি. স. ১৯৯২)।
	—	বিকানের রাজ্য কা ইতিহাস (অজমের, সন ১৯৩৯ - ৪০)।
	—	যোধপুর রাজ্য কা ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, অজমের সন ১৯৩৮)।
	—	উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস (অজমের)।
হেগ, স্যার উলসলে	—	দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, (কেম্ব্রিজ, ১৯২৮)।
হেগ, স্যার উলসলে ও হ্যাভেল ই. বি.	—	ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (লন্ডন, ১৯২৭)।
	—	আরয়ান রুল ইন ইন্ডিয়া।
প্রসাদ, আর. এন	—	রাজা মানসিংহ অব আমের, কলকাতা, ১৯৬৩।
প্রসাদ, ঈশ্বরী	—	এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, ইলাহাবাদ, ১৯৫৮।
হোদীওয়ালা. এস. এইচ	—	হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ ইন মোগল ম্যুমিসমেটিক্স, কলকাতা, ১৯২৩।
	—	স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, খণ্ড ২, বোম্বাই ১৯৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিব, ইরফান — অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অন মুসলিম ইন্ডিয়া, আলীগড়, ১৯৬৩।
রহীম, এম. এ — হিস্ট্রি অব দি আফগানস ইন ইন্ডিয়া, করাচি, ১৯৬১।
ওয়ান নোয়ার — কায়সার আকবর, দু'খণ্ড, এ. এস বেভারিজ কৃত
কুমুদ রঞ্জন দাস ইংরেজি অনুবাদ, কলকাতা, ১৮৯০।
— রাজা টোডরমল, কলকাতা, ১৯৭৯।
খান ইখতিদার আলম — মির্জা কমরান, আলীগড়, ১৯৬৪।
— পলিটিক্স বায়োগ্রফি অব এ মোগল নোবুল-মুনিম খান-এ খানান।
সিদ্দীকী, আই. এইচ — হিস্ট্রি অব শেরশাহ সূর, আলীগড়, ১৯৭১।
আমবাস্ট, বি. পি — ডিসিসিভ ব্যাটলস অব শেরশাহ, পাটনা, ১৯৭৭।
সিনহা, ভি. পি — রাজা বীরবল লাইফ অ্যান্ড টাইমস, পাটনা,১৯৮০।
ভাবী, মোতিলাল — হেমু অ্যান্ড হিজ টাইমস, লখনৌ, ১৯৬১।
ভার্মা, আর. সি — ফরেন পলিসি অব দি গ্রেট মোগলস, আগ্রা ১৯৭৬।
ইসলাম, সিরাজুল ইন্দো পার্শিয়ান রিলেশন্স, তেহরান, ১৯৭০।
এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, লন্ডন, ১৯১৩-৩৭।
— ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নিবন্ধবলী

অবস্থী, আর. এস — দি ডিলে ইন হুমায়ূনস এক্সেশন, জার্নাল, ইউ. পি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৪১।
নিজামী, কে. এ — দি ওস্তারি সেন্টস অ্যান্ড ফেয়ার অ্যাটিচিউড টুওয়ার্ডস দি স্টেট, মেডাইভ্যাল ইন্ডিয়া, কোয়ার্টারলি, খণ্ড ১ নম্বর, ১৯৫০।
ব্যানার্জি, এস. কে — দি বার্থ অব আকবর, প্রিসিডিংস অব দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, কলকাতা, ১৯৩৯।
বেভারিজ, এইচ — মাহদী খ্বাজা, এপিগ্রাফিকা ইন্দো-মুসলিমিকা, ১৯১৫-১৬।
রহীম, এ — মুগল রিলেসন্স উইদ পার্শিয়া, ইসলামিক কালচার, ১৯৩৭।
রায়, এন. আর — হুমায়ূন অ্যান্ড মালদেব প্রিসিডিংস থার্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৩৯।
রায়, সুকুমার — এ লেটার অব দি মোগল এম্পেয়ার হুমায়ূন টু হিজ ব্রাদার কামরান, প্রিসিডিংস অব দি টুয়েন্টি ফার্স্ট সেশন অব দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৫৮, পৃ.৩১৮-১৯।
শর্মা, শ্রীরাম — হুমায়ূন অ্যান্ড মালদেব, জার্নাল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ১৯৩২।
শ্যামলদাস, কবিরাজ — বার্থ ডেট অব আকবর, জার্নাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৮৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীবাস্তব, এ, এল — দি ডেট অব আকবরস বার্থ, হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিক্যাল সাইন্স জার্নাল, আগ্রা কলেজ, আগ্রা, জানুয়ারি, ১৯৫৫।

সাকসেনা, বেনারসী প্রসাদ — মেমোয়ার্স অব বায়েজিদ, ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, খণ্ড ৬, ভাগ ১, ১৯৩০।

স্মিথ, ভি. এ — বার্থ অব আকবর, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকয়ারি, ১৯১৫।

হরিশঙ্কর — সম্রাট আকবর কী জন্মতিথি, সরস্বতী, ইলাহাবাদ, এপ্রিল, ১৯৪৬।

আনসারী, এম. আজহার — অ্যামিউজমেন্টস অ্যান্ড দি গেমস্ অব দি গ্রেট মুগলস, ইন্ডিয়ান কালচার, ১৯৬১, পৃ. ২১-৩১।

হেদায়েতুলুল্লাহ — বাবুর অ্যান্ড আফগান্স—প্রসিডিংস অব পাকিস্তান হিস্ট্রোরিক্যাল কনফারেন্স, ১৯৫৮, পৃ. ২০৩-১৫।

নূরুল হাসান, এস. — দি পজিশন অব দি জমিনদারস ইন দি মোগল এম্পায়ার, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ, খণ্ড, ১ . ১৯৬৪ পৃ. ১০৭-১১৯।

সিনহা, সুরেন্দ্রনাথ — দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ অব দি সুবা অব ইলাহাবাদ, ১৫২৬-১৭০৭, ইন্ডিয়ান কালচার, খণ্ড, ৩৯, ১৯৬৫. পৃ. ৮৫-১০৯।

ব্যানার্জি, এস, কে — দি ক্যাপচার অব কান্দাহার বাই হুমায়ূন, সেপ্টেম্বর ৩ ১৫৪৫, জার্নাল ইউ.পি. হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৪০, পৃ. ৩৯-৫০।

প্রসাদ. বি — কানুনে হুমায়ূনী অ্যান্ড হুমায়ুন, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ১৯৪১, পৃ. ৪৪-৪৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~